ইউরোপের অগ্নিকোণে

শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

ছয় টাকা

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীভানু রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, ২১১, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্তৃক মুদ্রিত।

গোড়ার কথা

১৯৫৩ সালের ২৬শে জুন আপিসে গিয়ে দেখি ওয়ার্লড ফেডারেশন ডেমোক্রাটিক ইউথের আন্তর্জাতিক কমিটি বুখারেস্ট থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। ২৫শে থেকে ৩০শে জুলাই বুখারেস্টে তৃতীয় বিশ্বযুব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হ'বে। ভারতের অন্যতম জাতীয় কিশোর-সংস্থা 'মণিমেলা'র প্রবর্তক ও পরিচালক হিসাবে বিশিষ্ট অতিথিরূপে যোগ দিয়ে বক্তৃতা করার আমন্ত্রণ।

ভেবে পাই না কোন সূত্র ধ'রে কি ভাবে আমার কাছে এ নিমন্ত্রণ এলো! হঠাৎ মনে পড়লো ১৯৪৫ সালে সর্বপ্রথম যখন পৃথিবীর নানা দেশের গণতান্ত্রিক যুব ও কিশোর সংঘগুলিকে নিয়ে ঐ গণতান্ত্রিক ফেডারেশনটির প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ভারতের 'মণিমেলা'র সংগঠনকেও আহ্বান জানানো হয়েছিল। সেই ঘটনার প্রায় আট বছর পরে আবার তাঁরা আমাকে স্মরণ করেছেন—ডাক দিয়েছেন দেখে অবাক হলাম। মনে হলো আমন্ত্রণ এলেও আমার পক্ষে সেটি রক্ষা করা সম্ভব নয় নানাকারণেই। প্রথম সমস্যা আমার নিজের ও মণিমেলা সংগঠনের অরাজনৈতিক আদর্শ হয়তো এতে ক্ষুন্ন হতে পারে। দ্বিতীয় সমস্যা মাত্র ত্রিশ দিন সময়ের মধ্যে টাকা পয়সা জুটিয়ে ও দেশে পৌঁছানো কি সোজা কথা!

উৎসাহ ও আনন্দের বদলে নিরাশা ও নিরাসক্তি মনকে আচ্ছন্ন করলো। সারাটা দিন কোনও কাজই করতে পারলাম না। সন্ধ্যাবেলা আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর ভট্টাচার্য মহাশয়কে টেলিফোনে সব কথা জানালাম। তিনি বললেন—"তোমাকে যেতেই হবে—ভগবানের নির্দেশেই এ আমন্ত্রণ এসেছে—তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তুমি তোমার আপিসের কর্তৃপক্ষকে খবরটি জানাও। তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবেন—তাছাড়া আমিতো আছি।"

ওঁর আন্তরিক প্রেরণা ও পরামর্শ পেয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার ডিরেক্টর সুহৃদপ্রবর শ্রীযুক্ত অশোককুমার সরকার মহাশয়কে সব কথা জানালাম। তিনিও বললেন—এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে টেলিগ্রাম করতে। সকল রকম সাহায্য ও সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই দুই পরম সুহৃদের কাছে আশাতীত ভরসা পেয়ে—টেলিগ্রামেই নিমন্ত্রণের স্বীকৃতি পাঠালাম। বুখারেস্টের আন্তর্জাতিক কমিটির কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া গেল—কলকাতায় বিশ্বযুব কংগ্রেসের জাতীয় কমিটি আমাকে বুখারেস্ট নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন—আমি যেন

সেখানকার কমরেডদের সঙ্গে দেখা করি। ওঁদের আপিসে গিয়ে মিঃ সবরওয়ালের সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু তাঁরা আমার নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে কিছুই যেন জানেন না—এমন একটা ভাব দেখালেন। তবে আমি যদি আটশো টাকা দিয়ে তাঁদের প্রতিনিধি দলে যোগ দিই—তাহলে একটা ব্যবস্থা হতে পারে—এমন কথাই বললেন। সে প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম না। বলে এলাম কমরেডদের দলভুক্ত প্রতিনিধি হিসাবে যাওয়ার আগ্রহ আমার মোটেই নেই। অবস্থা বুঝে তখনই আবার বুখারেস্টে টেলিগ্রাম করলাম। জানালাম, "কোনও রকম সর্তাধীনে, কোনও মতবাদের সমর্থক হিসাবে কংগ্রেসে যোগ দিতে রাজি নই। নিরপেক্ষ অতিথি হয়েই যোগ দিতে পারি।" সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো—"কলকাতার কমিটিকে সেই নির্দেশ দেওয়া হলো।"

আন্তর্জাতিক কমিটির কাছ থেকে কলকাতার কমিটি নির্দেশ পেয়ে আমাকে ১০ই জুলাই জানালেন—২০শে জুলাই নাগাদ চার্টার করা প্লেনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আমাকে রওনা হতে হবে। আমি যেন তার জন্য তৈরী হই।

মাত্র দশদিনের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থাই সম্ভব হয়ে উঠলো—শুধু মাত্র পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন, পরলোকগত পরম শ্রদ্ধাভাজন সুরেশচন্দ্র মজুমদার, সুহৃদপ্রবর শ্রীযুক্ত অশোককুমার সরকার, শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর ভট্টাচার্য প্রমুখ শুভানুধ্যায়ীর আন্তরিক সহায়তায় এ ছাড়া 'মণিমেলা'র অগণিত শুভানুধ্যায়ী, সহযোগী কর্মী-বন্ধুদের, বিভিন্ন মণিমেলার ভাইবোনদের কাছ থেকেও শুভকামনা ও প্রেরণা পেলাম। তাঁদের প্রীতি ও আশীষের পাথেয় নিয়ে ইউরোপের পথে পা বাড়ালাম। যাওয়ার সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাকে একটি সপ্রশংস পরিচয়-পত্র দিয়ে দিলেন। যেটি সঙ্গে থাকায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার ও ভারতীয় দূতাবাসগুলির কাছ থেকে আমি বিশিষ্ট অতিথির সম্মান ও সুখ-সুবিধা লাভ করেছি। এঁদের মহানুভব স্নেহ সহযোগিতার কথা আমি কোনও দিনই ভুলতে পারবো না। এঁরা আমাকে চিরঋণী করেছেন।

বুখারেস্টে থাকার সময় এবং পূর্ব ইউরোপের দেশ রুমানিয়া, হাঙ্গারী ও পোল্যাণ্ডে ভ্রমণ করার সময় যে সমস্ত চিঠিপত্র ও রিপোর্ট ওখান থেকে পাঠিয়েছিলাম, সেগুলি ওসব দেশের কড়া সেন্সরের বেড়া ডিঙিয়ে এদেশে পেঁছায়নি যে, সেটা টের পেলাম—এদেশে ফেরবার পর। আর জানতে পারলাম, পূর্ব ইউরোপের বাইরে এসে—ভিয়েনা থেকে ওসব দেশের অবস্থা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে চিঠিটি আপিসে লিখেছিলাম, সেটি ১৯৫৩ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'রবিবাসরীয় আলোচনী' বিভাগে 'কম্যুনিজমের স্বর্গে' এই নামে ছাপা হয়। এবং সেটি প্রকাশিত হওয়াতে কলকাতার বাঙলা

কম্যুনিস্ট পত্রিকাটি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের মামুলি ভাষায় আমাকে "মিথ্যাবাদী" ও "মার্কিন দালাল" আখ্যা দিয়ে প্রচারকার্য চালাচ্ছেন। অন্যদিকে দেশের জনসাধারণ ও সত্যসন্ধানী নিরপেক্ষ বন্ধুরাও ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আমার পূর্ব ইউরোপের বাস্তব অভিজ্ঞতাটুকুকে তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তারিত জানবার জন্য। কাজেই আমার পূর্ব ইউরোপের দিনপঞ্জী ছাপানোর ব্যবস্থা করে দিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ।

১৯৫৩ সালের নবেম্বর থেকে ১৯৫৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রতি রবিবারে আমার 'পূর্ব ইউরোপের ভ্রমণকাহিনী বহু তথ্য ও অসংখ্য প্রামাণিক ছবি সহযোগে 'রবিবাসরীয় আলোচনী'তে ছাপা হলো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, দীর্ঘ দশ মাস ধরে যখন আমার ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হতে লাগলো তখন ঐ যাঁরা আমাকে "মিথ্যাবাদী" ও "মার্কিন দালাল" বলে প্রচার করে সাফাই গাইছিলেন, তাঁরা আমার হাজির করা নজিরগুলোকে পাল্টা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে খণ্ডন করতে সাহস পাননি। কারণ তাঁদের প্রতিনিধিরাই দেখে এসেছেন যে, আমি ভারতের নিরপেক্ষ সাংবাদিক হিসাবে ওসব দেশের বিশিষ্ট জননায়ক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে কতখানি ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ ও মর্যাদা পেয়েছিলাম। তাছাড়া জানেন আমি ও দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করে তাঁদের বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব অর্জন করে যে সব তথ্য ও সত্য সংগ্রহ করে আনতে পেরেছি, তেমন কিছুই তাঁরা আনতে পারেননি। কারণ তাঁরা ভারতের উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে হীন ও বিকৃত মিথ্যা প্রচারকার্য চালাতে গিয়ে কমিনফর্মের কেনা গোলামের দীনতা ও হীনতার পরিচয়ই দিয়ে এসেছেন।

সোভিয়েট রাশিয়াকে আমি উন্নত ও শক্তিশালী দেশ বলেই জানি এবং স্বীকার করি আর তার মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে দেখতে পাবো—এই আশা নিয়ে পূর্ব ইউরোপে গেছলাম। কিন্তু ঐ প্রবল রাষ্ট্রশক্তিকে পূর্ব ইউরোপের হীনবল ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিতে কম্যুনিজমের নামে শোষণ ও পীড়ন চালাতে দেখে ব্যথিত ও নিরাশ হয়ে ফিরেছি। শুধু তাই নয়, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ইতালী ও ফ্রান্সে মার্কিন ও রুশ দুই শক্তিগোষ্ঠীর ক্ষমতা কাড়াকাড়ির ঠাণ্ডা লড়াই চলার ফলে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের মানুষের দুর্দশা ও দুঃখ বর্তমানে কতটা বেড়ে গেছে—তাও দেখে আতঙ্কিত হয়েছি। তাই নিরপেক্ষ স্বাধীন ভারতের জনসাধারণ ও বিশেষ করে তরুণতরুণীদের মনকে ঐ দুই রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত করে তোলার প্রচেষ্টায় 'পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে ভালো মন্দ যা কিছু দেখেছি, অকপটে তা জানাতে চেষ্টা করবো।' এই সঙ্কল্প নিয়েই দেশে ফিরে কলম ধরেছি। ঐ দুই শক্তিগোষ্ঠীর কোনটিরই প্রচারক ও স্তাবক আমি নই যে, মতবাদ-নিরপেক্ষ মন নিয়ে এই বইটি আগাগোড়া পড়লেই পাঠক সে কথা বুঝতে পারবেন।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমি রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারীর অবস্থা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধগুলিতে যে সব কথা বলেছি, সে সব কথা সমর্থিত হয়েছে আমার প্রবন্ধগুলি ছাপা হওয়ার দু' তিন মাস পরে, ওখানকার যে সমস্ত বিশ্বস্ত নাগরিক ও রাজনৈতিক নেতা দেশের বাইরে আসতে পেরেছেন, তাঁদেরই দেওয়া বিবৃতি ও খবরে। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে—কয়েক দিন আগে হাঙ্গারীর বিতাড়িত প্রধান মন্ত্রী ভারত ভ্রমণে এসে যে সব কথা বলেছেন, পোল্যাণ্ডের জাতীয় সুরকার সঙ্ঘের (Polish Composers Union) ভাইস-প্রেসিডেণ্ট Andrzej Panufnik লণ্ডনে আশ্রয় নিয়ে যে সব কথা বলেছেন, তার সঙ্গে আমার সংগৃহীত তথ্য যে পনেরো আনাই মিলে গেছে—একথাটা তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন, যাঁরা নিয়মিত সব রকম কাগজ পড়েন। এতেই আমার পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিবৃতির দাম অনেকখানি বেড়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়েও আমার এ শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো যদি আমার পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলি পড়ে ভারতের জনসাধারণ মার্কিন বা সোভিয়েট কোনও শক্তিগোষ্ঠীরই অন্ধ স্তাবকতার পথ গ্রহণ না করেন। যদি সবাই মর্মে মর্মে অনুভব করেন যে, নেহরুর নেতৃত্বে নিরপেক্ষ মহান ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলাই পৃথিবীর শান্তিরক্ষার, তথা ভারতের গণতান্ত্রিক স্বাধীন জীবন গড়ে তোলার প্রশস্ত পথ।

পূর্ব ইউরোপ সম্পর্কে আমার প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার ব্যাপারে গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ, তথা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সান্যাল, কানাইলাল সরকার, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, প্রফুল্ল দে প্রমুখ বন্ধুগণ সকল রকমে আমাকে সাহায্য করেছেন। আর সুসাহিত্যিক বন্ধুবর প্রবোধকুমার সান্যাল বইটির নামকরণ করে দিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অন্তরের ধন্যবাদ জানিয়ে।

—লেখক

২৫শে নবেম্বর, ১৯৫

কলিকাতা

লেখক
(বুখারেস্টের বন্ধুদের তোলা ছবি)

বুখারেস্টের পথে

একুশে জুলাই রাত বারোটা। দমদম থেকে উড়োজাহাজ ছাড়লো। চার্টার-করা ভারত এয়ারওয়েজের স্কাইমাস্টার প্লেনে রওনা হলাম বিশ্বযুব সম্মেলনে যোগ দিতে বুখারেস্টের পথে।

বিমানের যাত্রীদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিই যে বিশ্বযুব সম্মেলনের প্রতিনিধি নন, একথাটা টের পেলাম উড়োজাহাজে চড়বার পর। আমিতো প্রতিনিধি নই-ই, আন্তর্জাতিক কমিটির আমন্ত্রিত অতিথি। আমার পিছনের জোড়া আসনে এক গৌরাঙ্গ দম্পতি, এঁরা লণ্ডন পর্যন্ত যাবেন। এঁরা ছাড়া আরও চারজন পাঞ্জাবী যাত্রী রয়েছেন—তাঁরা নাকি লণ্ডনে চলেছেন কাজের সন্ধানে—ইংরেজী বিন্দুমাত্রও জানেন না। সৌভাগ্য আমার এই যে, আমার আসনের পাশের আসনে আগের পরিচিত আমার সহপাঠীর ছোট ভাই শ্রীমান সুহৃৎ মল্লিক চৌধুরীকে পেলাম।

সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশের প্রথম বিমানযাত্রা। কাজেই বিমানে বাড়তি যাত্রী হওয়া সত্ত্বেও বাড়তি হৈ চৈ কলরব বড় শোনা গেল না। সবারই কেমন সেঁতিয়ে পড়া ভাব, এমনকি দু'জনের আসনে তিনজন করে ঠেসে বসানো সত্ত্বেও কেউ ট্যাঁ ফো করলে না। উড়োজাহাজের ককপিটের পিঠে "Fasten Your Belt" আলোর লেখা জ্বলে উঠলো। কেউ কেউ দেখলাম উঠে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের প্যাণ্টের বেল্টটা টাইট করে বাঁধছে। একজন কে যেন বললে—"বেল্টতো কিনে আনিনি!" রসিকতা কি রাসভতা ঠিক ঠাওর পেলাম না। প্লেনে উঠেই আমি আমার বেল্টটা বেঁধে নিয়েছিলাম। সুহৃৎ ভায়ার বেল্টটাও বেঁধে দিয়েছিলাম। যাক্ বিমানের এয়ার হোস্টেস্ (এর বাঙলা করেছি "হাওয়াই সখী") জানালেন, "প্রত্যেকের সীটের দু'পাশে সেফ্‌টি বেল্ট গুটিয়ে গোঁজা আছে, সেটি বার করে

—কিন্তু বাঁধবার কৌশলটি জানা না থাকায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে
দেখে—শ্রীমতী হাওয়াই সখী অনেকের বেল্ট বেঁধে দিলেন।

উড়োজাহাজের প্রোপেলার গর্জন করে উঠলো। যাত্রীদের গুঞ্জ
গেল স্তব্ধ হয়ে। বিমানখানা ট্যাক্সি করে যেন রানওয়ের মু
গিয়ে থেমে গেল। থামবার পর পাইলট যথারীতি ইঞ্জিনগুলো শে
পরীক্ষা করে নেবার জন্য অ্যাক্সিলরেট্ করতেই গুঞ্জনতো বাড়লো
সঙ্গে সঙ্গে ফট্ ফট্ দুম্দাম কয়েকটা শব্দও হলো।

সুহৃৎ ভায়া চাপা গলায় প্রশ্ন করলে—"প্লেনটা থামলো কেন
বেগড়ালো নাকি?" আমি ওকে বললাম—"ভয় নেই, এবার টে
অফ করবে।" বলতে বলতেই বিমান মাটি ছেড়ে শূন্যে উ
পড়লো।

লক্ষ আলোর চুমকী বসানো কলকাতা-রূপসীর আঁধার-কালে
শাড়ির আঁচল লক্ষ্যপথে ঝিক্মিক্ করতে লাগলো কাঁচের জানালা
ফাঁক দিয়ে। জানালা দিয়ে রাতের কলকাতা-সুন্দরীর অপরূপ রূ
দেখতে দেখতে জননী জন্মভূমি বাঙলা মাকে শেষ প্রণাম জানালাম

কয়েক মিনিটের মধ্যে রূপসী কলকাতা অন্ধকারে মিলিে
গেল। বিমানের আলোয় তরুণী হাওয়াই-সখী কফি, স্যান্ডউইচে
থালা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো অতিথি সৎকারের জন্য। সন্ধ্যা
সময় সকলেই বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছি। সবারই জঠরে ক্ষুধা
তাড়না—কাজেই অসময়ে হলেও স্যান্ডউইচ আর কেকের দিকে বাঘ
থাবা বাড়াতে কেউই তেমন দ্বিধা করলে না। ফলে দশজনের জনে
যা খোরাক এসেছিল দুজনেই তা হস্তগত করলে। স্যান্ডউইচ
কেক তো পেটে পুরলেই—তার সঙ্গে টফি লজেন্সও মুঠোভর্তি
পকেটে ভরলে। বিমান ছাড়ার পর তখনই প্রথম মনে হলো এতক্ষণে
যাত্রীরা শূন্যে ওঠার শঙ্কা ভুলেছে, পেট এবং পকেটের তাগিদে জড়
পদার্থ সজীব হয়েছে।

পেট আর পকেটে কিছু পড়লে—মানুষমাত্রেই মুখর হয়ে ওঠে
তাছাড়া এরোপ্লেনের উপরে ওঠার পেটগুলোনো ধাক্কার গুঁতোট
ততক্ষণে অনেকটা নরম পড়েছে। এরোপ্লেন তখন স্থির গতিতে

২

দৌড়চ্ছে। কাজেই সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে খানিকটা সামলে নিয়ে কচ্‌কচানি শুরু করলে। জোড়া জোড়া গলায় ভাঙা লয়তালে যুব সম্মেলনের প্রতিনিধিরা এমনই বেসুরো, বেয়াড়া গান ধরলেন যে, বিমানখানা হাওড়া-আমতা রেলের কামরা হয়ে উঠলো। "আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো" গানের গুঁতোয় অপ্রতিনিধি যাত্রী যাঁদের চোখে ঝিমুনি ধরেছিল, তাঁদের রাগের আগুন জ্বলে উঠলো বটে—তবে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে সাহস পেলেন না।

বিমানের সাহেব ক্যাপ্টেন তাঁর জমকালো সাদা পোষাক আর টুপি লাগিয়ে কটমটিয়ে তাকিয়ে খট্‌খটিয়ে বার দুই বিমানের এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পায়চারী করে গেলেন। কিন্তু তাঁর আবির্ভাবে গানের সুর খাদে নামা তো দূরের কথা, যেন পঞ্চমে চড়লো। ব্যাপার গতিক বেএখ্‌তার দেখে ক্যাপ্টেন সাহেব তাঁর এখ্‌তিয়ারের ভিতর যে কৌশলটি ছিল, সেটি বোধহয় প্রয়োগ করলেন। ককপিটে গিয়ে কি করলেন না করলেন জানি না, তবে পরমুহূর্তেই মনে হলো বিমানটা ভয়ানক দুলছে—মনে হলো ঝপ্‌ করে একবার নামছে আর খপ্‌ করে আবার উঠছে। বিমানের নামা ওঠা আর দুলুনির হোঁচট খেয়ে, গান তো মাঝপথে থামলোই, এমনকি কথাবার্তাও থেমে গেল। মনে মনে ক্যাপ্টেনের বুদ্ধির তারিফ করে কম্বলটা গায়ে টেনে দিলাম। কারণ তখন বিমানটা আরও উপরে ওঠায় শীত ধরতে শুরু করছে। কিছুক্ষণ পরেই বিমানের মাঝখানের বড় আলোগুলো নিভে গেল, জানালার উপরে দু'পাশের মিট্‌মিটে ছোট্ট আলোগুলো জ্বলে উঠলো।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘণ্টা দুয়েক পরে সুহৃৎ ভায়া আমার ঘাড়ের ওপর ঘুমিয়ে ঢলে পড়ায় ঘুম ভেঙে গেল। টয়লেটে যেতে গিয়ে দেখি বিমানের চেহারা বদলে গিয়েছে। বিমানের কামরা কুম্ভমেলার যাত্রি-ট্রেনের কামরাকে হার মানিয়েছে। দু'পাশের আসনগুলির মাঝখানের ফাঁকা পথটুকুতে কম্বল বিছিয়ে আর আগা-পাছতলা কম্বল মুড়ি দিয়ে পথজোড়া করে শুয়ে পড়েছে একজনের পর একজন। এমনকি জোড়া জোড়া আসনের সামনের ফাঁকে ফাঁকেও

কেউ কেউ ঐভাবে শুয়ে পড়েছে। অন্ধকারে কম্বল ঢাকা অবস্থায় কোনটি যে কোনজন তা মালুম হবার জো নেই। কোনদিকে কার মাথা, কোনদিকে কার ঠ্যাং তাও ঠাওর হয় না

টয়লেটে যাওয়া রীতিমত একটা সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। পা বাড়াবো কোন দিক দিয়ে, কোনখানটায়? পা বাড়ালেই ওদের কারুর না কারুর ঘাড়, গোড় মাড়িয়ে ফেলতে পারি। হোঁচট খেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গিয়ে নিজেও জখম হতে পারি! কি করি! যাত্রীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। "ককপিটে" গিয়ে ঢুকছেন হাওয়াই-সখী। কাজেই নিরুপায় হয়ে তিনবার তুড়ি দিয়ে হাই তুললাম। ঘড়ি দেখলাম রাত ৩টা। বাকি দু' ঘণ্টার জন্যে টয়লেটে যাওয়ার তাগিদটাকে স্থগিত রেখে অন্য কোনও দিকে পা না বাড়িয়ে নিজের আসনের দিকেই পা বাড়ালাম।

ইয়া বিসমিল্লা! সুহৃৎ ভায়া গড়িয়ে পড়ে দুটো আসনেই দেহ-বিস্তার করেছে! ওরও নাসিকা গর্জন শুরু হয়েছে! ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে ওকে তুললাম। ওকে দেখালাম বন্ধুদের ঘুমের ব্যবস্থাটা। শ্রীমানও তাই দেখে ইনস্পিরেশন পেয়ে গেল। আমাদের দু'জনের সীটের সামনের পা রাখবার জায়গাটিতে কম্বল বিছিয়ে ভায়া শুয়ে পড়লো। আমিও বাধ্য হয়ে এবং অত্যন্ত খুশি হ'য়ে আমার পা রাখবার জায়গার বদলে ওর বসবার জায়গাটির দখল নিলাম। জুতো খুলে ঠ্যাং দুটো মুড়ে আমিও কাৎ হলাম।

ভোর হতেই ঘুম ভাঙলো। উঠে দেখলাম—অনেকেই ঘুমুচ্ছেন। বিমানযানের মধ্যপথ তখনও পুরোপুরি সাফ হয়নি, তবে ডিঙি মেরে টয়লেটে যাওয়া যাবে। প্রকৃতির বেগ ঘুমের আবেশ দিয়ে দু'তিন ঘণ্টা ঠেকিয়ে রেখেছিলাম—আর তো যায় না।

টয়লেটে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিজের আসনে ফিরে এলাম। হাওয়াই-সখী নূতন প্রভাতের শুভ-সম্ভাষণ আর কফি নিয়ে এলেন। জিভে ঠেকিয়ে কফির স্বাদ গন্ধ উষ্ণতা কিছুই অনুভব করলাম না। কফি এসেছে শুনে যারা তাড়াতাড়ি নিদ্রা-পরিহার করে উঠে বসলেন, তাদের কফির সঙ্গে দু'একখানা করে

স্যাণ্ডউইচও জুটলো। তবে শেষের দিকে যাঁরা জাগলেন তাঁদের হাতে কফির গ্লাস তুলে দিয়ে—হাওয়াই-সখী ঠোঁটজোড়ার ফাঁকে চাপা মৃদু হাসির স্যাণ্ডউইচ পরিবেশন করে জানালেন—"সরি স্যাণ্ডউইচেস্ আর আউট অফ স্টক্।"

একটি বাঙালী ছোকরা ভারী তুখোড়, সে চট্ করে জবাব দিলে—"নেভার মাইণ্ড! উই হ্যাভ মেড্ সাম স্টক্"। তারপরই দেখি পকেট থেকে, কাগজের মোড়ক খুলে খুলে যুব প্রতিনিধিরা অনেকেই আগের রাত্রের সংগৃহীত স্যাণ্ডউইচে কামড় লাগাচ্ছে। মনে মনে ভাবলুম, মজুতদারদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেও এঁরাও মজুত করার সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তাটুকু জানেন এবং কাজে লাগান!

যাক্ সকালের রোদ উঠতেই আমরা করাচী বিমান বন্দরে পেঁছে গেলাম। দমদমের বিমানঘাটি দুনিয়ার একটা সেরা বিমানঘাটি। সে তুলনায় করাচী বিমানঘাটি অনেক ছোট, অনেক পিছনে পড়ে আছে। বিমানঘাটিতে নেমে পাসপোর্ট জমা দিয়ে আমরা বিমানঘাটির রেস্তোরাঁতে গিয়ে বসলাম, সেখানে আমাদের ব্রেকফাস্ট দেওয়া হলো, বিমান কোম্পানীর খরচে। চড়চড়ে ক্ষিধের মুখে ছোটা হাজরিতে কড়কড়ে পাঁউরুটি পোরিজ, পোচ, আলুভাজা পেয়ে সবাই ভারী খুশি! ছোটা হাজরি খেয়ে বিমানঘাটির লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম। সুহৃৎ ও ফেস্টিভ্যাল কমিটির দপ্তরের শান্তি ভায়া বিশ্বযুব সম্মেলনের অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রতিনিধি দলের নেতা বীরেন্দ্র সিংহ, পানজোয়ানী, কুমারেশ চন্দ্র, ঘাটনেকার প্রভৃতি কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করে, তাঁদের ভদ্র ব্যবহারে সত্যিই মুগ্ধ হলাম। ওখানে বসেই বাড়িতে এবং অফিসে দু'খানা চিঠি লিখলাম।

করাচী থেকে বিমান ছাড়লো বেলা সাড়ে ন'টায়। নীচে সিন্ধুনদের ব-দ্বীপ ছাড়িয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে এসে পড়লাম ওমান উপসাগরের উপরে।

দিনের আলোর হাতছানিতে বিমর্ষ বিমানের আঁধার বুক থেকে মুখ তুলে কাঁচের জানালা দিয়ে নীচের দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম।

সঙ্গে আমার ম্যাপ ছিল, এরোপ্লেনের রুটও জানা ছিল, তাই ম্যাপের সঙ্গে নীচের দেখা ছবিগুলো মেলাতে মেলাতে অপূর্ব আনন্দে মশগুল হয়ে চলতে লাগলাম আকাশ [illegible]। সুহৃৎভায়াকেও মাঝে মাঝে জানালার কাছে টেনে এনে [illegible] লাগলাম—অপূর্ব সব দৃশ্য ও ছবি। কিন্তু বুঝলাম ভূ[illegible] ব্যাপারে ওর তেমন আগ্রহ নেই। তাছাড়া ওপর থেকে জা[illegible] দিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখাটাও ওর তেমন বরদাস্ত হচ্ছে না। [illegible] একা একাই বিরাট ধরিত্রীর বিচিত্র রূপের বিচিত্রতায় মগ্ন হয়ে [illegible]লাম। তরুণের দল কেউবা গান গেয়ে, কেউ বা ঘুমিয়ে সময় কাটা[illegible] দেখলাম।

ওমান উপসাগর পার হয়ে পারস্য উপসাগরের উপর দিয়ে ডানদিক ঘেঁষে যখন উড়ে চলেছি তখন ঘড়িতে বেলা বারোটা। নীচে নীল সমুদ্রে সাদা সাদা দু'খানা জাহাজ যেতে দেখে মনে হলো —ছোট্ট কাগজের দু'খানি নৌকো ভেসে যাচ্ছে। বাঁদিকের আসন ছেড়ে উঠে ডানদিকে গিয়ে দেখি রোদের আলোয় উপসাগরের ডান-দিকে পারস্যের রুক্ষ মরুভূমি। তারই মাঝে মাঝে কিছু কিছু খেজুর গাছের সমাবেশে ছোট ছোট গ্রাম আর শহরের ইঙ্গিত ও নিশানা। ঘণ্টাখানেক পরে পারস্য উপসাগরের উপর বাঁদিক ঘেঁষে বিমান উড়ে চললো—তখন নীচে বাঁদিকে আরবের মরুভূমিও নজরে পড়লো। তার কি বিচিত্র রূপ! মনে হলো ঊষর মরুর বালু-সাগরেও ঢেউ খেলে গেছে। তবে সে ঢেউ, অচল অনড়।

আমার ঘড়িতে বেলা সাড়ে পাঁচটা। পেঁছিলাম বসরার বিমানবন্দরে। ওখানে তখন বেলা তিনটা। খাঁ খাঁ করছে রোদ, বিমান থেকে মাটিতে নামতেই মনে হলো আগুনে ঝলসে শিক-কাবাব হয়ে যাবো,—এমনই প্রচণ্ড গরম। দৌড়ে গিয়ে বিমানবন্দরের ঘরে ঢুকে পড়লাম। চেকিং-এর জন্য পাসপোর্ট জ[illegible] দিয়ে বিমানবন্দরের বাথরুমে গিয়ে বেশ করে মাথা মুখ [illegible] নিলাম। তারপর রেস্তোরাঁতে গিয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো, কারণ রেস্তোরাঁর অত বড় হলটা হিমেল-হাওয়া ঠাসা, যাকে বলে এয়ারকণ্ডিশন্‌ড্ করা।

রেস্তোরাঁতে কেতাদোরস্ত ওয়েটার আর স্টুয়ার্ডরা যখন প্লেট সাজিয়ে মুরগীর গোস্ত-পোলাও, স্যালাড, মাছভাজা হাজির করলে—

তখনু আর তর সয়না কারুর। গো-গ্রাসে ভোজন পর্ব শেষ করে লাউঞ্জে গিয়ে বসা গেল। ওখান থেকেও ছবিওলা পোস্টকার্ড কিনে দেশে চিঠি লিখলেন অনেকেই।

ঘণ্টা দেড়েক পরে বিমানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ এলো। বসরা থেকে প্লেন ছাড়লো ৭টায়—ওদের ঘড়িতে বিকেল ৫৷৷টা। প্লেন ছাড়বার পর কো-পাইলটকে জিজ্ঞেস করলাম, এথেন্স পেঁছিতে কতক্ষণ লাগবে? তিনি জানালেন, আট ঘণ্টা। বসরা থেকে প্লেন ছাড়বার ঘণ্টাখানেক পরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। পেটে কিছু ভার পড়ায় চোখ দুটিও ভারী হয়ে উঠলো। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন দেখি রাত ১২টা আমার ঘড়িতে। অন্য সকলেই ঘুমুচ্ছে। পাশের জানালা দিয়ে দেখলাম দিব্যি গোলগাল নিটোল চাঁদ উঠেছে আকাশের কোল আলো করে। চাঁদের আলোয় ভূমধ্যসাগরের নীল জলের ঢেউ দেখে মনে হলো—এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির কত না বিচিত্র রূপই দেখলাম। বিশ্বউপলব্ধির এই যে নতুন পাঠ—সারা জীবন ধরে ভূগোল পড়লেও জানা যেত কি! চাঁদের আলোয় ভূমধ্য সাগরের ওপর দিয়ে যেতে যেতে সহসা দেখি নীচে দূরে একটা দ্বীপের বুকে মাঝে মাঝে আলোর জোনাকীর উঁকি ঝুঁকি! ম্যাপ বার করে তাড়াতাড়ি বসলাম—বুঝলাম ক্রীট দ্বীপ ঐটাই। তারপর ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেলো—আধো ঘুম আধো জাগরণে। সহসা দূরে দেখি নীচে সমুদ্রের একধারে অসংখ্য আলোয় সাজানো এক সহর। বিমানখানাও অনেক নীচে নেমে এসেছে। বুঝলাম এই সেই পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন শহর গ্রীসের রাজধানী এথেন্স। আনন্দ চাপতে পারলুম না। সুহৃৎ ও অন্যান্য বন্ধুদের ডেকে জাগিয়ে দিলুম—দেখো দেখো কি বিচিত্র শোভার সমাবেশ! বিমান থেকে রাতের এথেন্সের শোভা কোনওদিনই ভোলা যাবে না।

এথেন্স বিমানবন্দর একেবারে সমুদ্রের উপকূলে। তাই সেখানে যখন বিমান থেকে নামলাম—দমকা হাওয়ার বেগে প্রায় উল্টে পড়ার

মত অবস্থা। অর জোর হাওয়া, কিন্তু শীতের কামড় একটুও নেই—মনে হলো দক্ষিণে হাওয়ার ঝড়ো বেশ! মলয়ের প্রলয়-রূপ!

এথেন্সের বিমানঘাটিতে যখন লাম আমার ঘড়িতে তখন রাত তিনটা—ওদের ঘড়িতে রাত এগারোটা। এরোড্রোমের রেস্তোরাঁতে তখনও বেশ ভিড় রয়েছে। যাই হোক আমাদের জায়গা রিজার্ভ করাই ছিল। হাতমুখ ধুয়ে বসে গেলাম খেতে। রেস্তোরাঁতে মহিলারাই কেবল পরিবেশন করছেন এখানেই প্রথম দেখলাম। খেতে দেওয়া হলো দু' চামচে ভাত, পাঁউরুটি, আলুভাজা, দুটো ডিমের পোচ, শশা সিদ্ধ, খুব বড় বড় লাল টুকটুকে দুটো টমাটো—আর মস্ত একফালি তরমুজ। অত মিষ্টি টমাটো আর তরমুজ আমি এর আগে কখনও খাইনি। যাই হোক্ ঐগুলো খেয়ে কোনওরকমে পেটটা ভর্তি করে নেওয়া গেল।

বিমানঘাটির রেস্তোরাঁর একপাশে গ্রীসের রকমারী শিল্প সৃষ্টির দোকান ও প্রদর্শনী রয়েছে, সেখান থেকে অল্প দু'চারটা জিনিস কিনলাম। ঘণ্টা দুই পরে গ্রীসের রাত একটার সময় বিমানখানা হাওয়ায় ডানা মেলে দিলে। থেন্স শহরের আলোর মালা ক্রমশ চোখের আড়ালে অন্ধকারে মি য়ে গেল। আমরা গা ঢেলে দিলাম নিজের নিজের আসনে। অনেকেই আগের রাতের স্বদেশী ব্যবস্থা অনুযায়ী পথজোড়া করে কম্বল বিছিয়ে গড়াগড় শুয়ে পড়লো। বিমানের বড় আলোগুলো আগের দিনের মতোই নিভে গেল। কয়েক মিনিট পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোর বেলা ঘুম ভাঙতেই আমার ঘড়ির দিকে তাকালাম। বেলা ন'টা বেজেছে। ওখানকার সময় তখন ভোর চার কিন্তু বেশ আলো ফুটে গেছে। ম্যাপটা বার করে নীচের দিকে কিয়ে দেখে বুঝলাম ইতালীর উপকূল ধ'রে এড্রিয়াটিক সাগরের উপর দিয়ে আমাদের বিমান উড়ে চলেছে—বেশ নিচু দিয়েই। সমুদ্রের ধারে ইতালীর উপকূলের আকার প্রকার ও ছোট বড় সহরগুলো যেমন যেমন নজরে পড়তে লাগলো—ম্যাপ দেখে সেগুলো কি কি হ'তে পারে আন্দাজ করে নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। উত্তর-পূর্ব ইতালীর

আনকোনা, রিমিনি শহর ও বন্দর পেরিয়ে পো নদীর সংগম থেকে মোড় ঘুরে উত্তর-পশ্চিম ইতালীর উঁচু-নিচু পার্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়ে বিমান সুইজারল্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে চললো।

ঘণ্টাখানেক পরে সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্ত আরম্ভ হলো যে, তা বোঝা গেল বিমানখানা ক্রমশ উপরে উঠছে দেখেই। কো-পাইলট জানিয়ে গেলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যে বিমানখানা ১৮ হাজার ফুট উঁচুতে উঠবে। আল্পস পর্বতমালা ডিঙিয়ে জুরিখ পেঁছিবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। যাত্রীদের মধ্যে এতক্ষণ পরে চাঞ্চল্য পড়ে গেল। কারুর কারুর মনে ভয় এবং উদ্বেগের সঞ্চার হলো। দু'চারজন ছাড়া কাঁচের জানালায় চোখ লাগিয়ে চমৎকার সাদা বরফে ঢাকা আল্পস পাহাড় দেখবার দুঃসাহস বড় কেউ দেখালে না।

সুহৃৎ ভায়াকে টেনে নিয়ে সে দৃশ্য দেখলাম, নিজে দেখলাম যতক্ষণ বিমানখানা আল্পস পর্বতমালার উপর দিয়ে উড়ে চললো।

বিমানখানা যখন সবচেয়ে উঁচুতে ওঠে তখন অনেকেরই শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। তাই—বিমানের মাঝখানে অক্সিজেন সিলিণ্ডার রেখে অক্সিজেন গ্যাস্ খুলে দেওয়া হলো। তা সত্ত্বেও খানিকক্ষণের জন্য আমরা সকলেই শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট একটু আধটু টের পেলাম। প্রায় ৪৫ মিনিট ধ'রে আল্পস্ পর্বতমালা অতিক্রম করে বিমানখানা আবার যখন নীচে নামতে লাগলো, তখন চোখে ভেসে উঠলো জুরিখ শহরের নীল সরোবর ও পাহাড়ের গায়ে রঙচঙে ছবির মত ঝকঝকে ঘরবাড়ি। সবুজ মাঠ, পাহাড়, বন আর রকমারী রঙীন ফুলের বাগান।

দেখতে দেখতে জুরিখ শহরের প্রান্তসীমায় জুরিখ এরোড্রোমের উপরে বিমান এসে পড়লো। উপর থেকে বিমানঘাটির নতুন বিরাট বাড়িটি ও কংক্রীটে বাঁধা বিরাট লম্বা রানওয়ে দেখা গেল। জুরিখ বিমানঘাটিতে আমরা বিমান থেকে নামলাম যখন তখন আমার ঘড়িতে ১০॥টা—জুরিখের সময় প্রায় ৬টা। অর্থাৎ কলকাতা ছাড়ার প্রায় ৩৪ ঘণ্টা পরে বুখারেস্টের পথের প্রথম পর্যায়ের বিমানযাত্রা এখানেই শেষ হলো।

জুরিখেই বুখারেস্ট যাত্রার প্রথম পালা—বিমান পর্ব শেষ হলো। ঘাটির দিকে বিমানখানা যখন নামতে শুরু করলে—তখন দেখলাম, আসল 'জুরিখ' শহরটা চকিতেই চোখের আড়ালে স'রে গেল। কলকাতা থেকে কলকাতার বিমানঘাটি যেমন আট দশ মাইল দূরে দমদমে, তেমনি 'জুরিখ' বিমানঘাটিও জুরিখ শহর থেকে যে বেশ কিছুটা দূরে সেটা ঠাওর পেলাম।

বিমান থেকে মাটিতে পা দিয়ে বিমানঘাটির আসল বাড়িখানা দেখে সকলেরই প্রায় তাক্ লেগে গেলো। যেমন অদ্ভুত তার গড়নের কায়দা, তেমনই আবার ফুল আর রকমারী গাছ পাতা দিয়ে ঝক্-ঝকে তক্তকে ক'রে সাজিয়ে রাখার আশ্চর্য কেরামতি। কন্‌ক্রীটে বাঁধানো এরোড্রোমের রানএওয়ের দু'পাশে সবুজ ঘাসের কার্পেটের উপর রকমারী রঙীন মরশুমী ফুলের কেয়ারীতে নক্সা কাটা। চোখ জুড়িয়ে গেল। জুরিখ বিমানঘাটি দেখেই সুইস্ জাতির খাঁটি রসবোধ ও সৌন্দর্যজ্ঞানের আভাস পেলাম। বিমানঘাটির গড়নের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের বিষয় হ'লো যে, বিমানঘাটির বাড়িটির দেওয়ালগুলি পনের আনাই কাঁচ দিয়ে তৈরী। ঠিক যেন মহা-ভারতের গল্পের স্বচ্ছ ফটিকের তৈরী একটি প্রাসাদ। বিমানঘাটির এক একটি তলা আবার আমাদের এখানকার বাড়ির তিনতলা সমান উঁচু।

কোন্ দিকে কোন্ পথে বিমানঘাটির দিকে এগুতে হবে সেটার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত হুড়োহুড়ি দৌড়োদৌড়ি ক'রে এগুবার উপায় নেই। চার ধারে সেপাই পুলিশ খাড়া মোতায়েন! কাজেই ক্ষিদে তেষ্টা মেটাতে—শেষটা বিমানঘাটিটা দুই চোখ দিয়ে চাটতে শুরু ক'রে দিলে অনেকেই। খানিক বাদে হঠাৎ বিমানের এক কর্তা সামনে এসে বললেন—"ফলো মি প্লিজ!" অর্থাৎ 'দয়া ক'রে আমার পিছু নিন্।'

যথা আজ্ঞা শিরোধার্য! তাঁকেই দলের শিরোমণি ক'রে আমরা সবাই যে যার সঙ্গের ছোটখাটো পুঁটলি-প্যাঁটরা নিয়ে গুটি গুটি এগুতে লাগলাম। বিমানঘাটির সিঁড়ির কাছ বরাবর পোঁছে দেখি,

ইয়া পেল্লায় কাঁচের তৈরী সদর দোর, এ'টে সে'টে বন্ধ! লোকজন, চাপরাশী, দারোয়ান কেউ সেখানে মোতায়েন নেই।

আমরা আমাদের পথপ্রদর্শকের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। কয়েক ধাপ ওঠবার পর দেখি কি, 'চিচিং-ফাঁক' না বলতেই কাঁচের দরজাজোড়া আপনা থেকেই খুলে গেল দু'ফাঁক হয়ে। বুঝলাম ইউরোপের মাটির ভেল্কীবাজি অটোম্যাটিকের ম্যাজিক শুরু হলো!

দরজা গ'লে ভেতরের একটা হল পার ক'রে আর একটা হলঘরে আমাদের লাইন ক'রে ঢোকানো হ'লো—দেখলাম, লেখা রয়েছে Das Zollamt। মস্ত হলটার চারিদিকে প্রায় দু' ফুট উ'চু টেবিলের মত বেড়া দেওয়া প্ল্যাটফরম্। তার পেছনে চাপরাশধারী ছাই ছাই রঙের ইউনিফর্ম পরা রাজপুরুষের দল। বুঝতে দেরি হলো না যে, এটাই কাস্টমস্ চেকিং হল্। জানানো হ'লো, বিমান থেকে সকলের বাকি সমস্ত মাল নামলে—কাস্টমস্ তদারক হবে। কাজেই কিছুটা দেরী হবে, তবে ইতিমধ্যে আমরা পাসপোর্ট জমা দিয়ে উপরে গিয়ে বিশ্রাম ক'রতে পারি।

কাস্টমস্ হলের লোহার বেড়ার ধারে—কোণঘে'ষা একটা বাক্স-ঘরে পুলিশ অফিসার ব'সে আছেন, তাঁর কাছে একে একে পাস-পোর্ট জমা দিয়ে ফটক পেরিয়ে আমরা উপরে লাউঞ্জে গেলাম।

লাউঞ্জের চার ধারে কাঁচের স্বচ্ছ দেয়ালের বাইরে দূরে আল্পস পাহাড়ের দৃশ্য যেমনই মনোরম, তেমনই সুন্দর তার ভিতরকার পরিবেশ। কালো ভেলভেটে মোড়া সাদা কাঠের তৈরী সোফা কৌচ আর টেবিলগুলো মনে হ'লো সবেমাত্র যেন তার আগের দিন তৈরি হ'য়ে এসেছে, এমনই সযত্নে রাখা। হলের ভেতরে চারধারে ছোট ছোট ফুলের গাছে রকমারী রঙীন ফুল তো আছেই—বড় বড় পাতাওলা লতা কাঁচের দেওয়াল বেয়ে লতিয়ে উঠেছে। রকমারী গাত্রবর্ণের যাত্রীরা রঙীন ফুলের মতই রকমারী পোযাকে সেই পরিবেশের বিচিত্রতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু তখন এই সৌন্দর্য উপভোগ করবার তাগিদের চেয়ে ৩৪ ঘণ্টার বিমানযাত্রায় দেহের ভিতরে বাইরে যে ক্লেদ ও মলিনতা জড়ো হয়েছে তাই ঘোচাবার

তাগিদটাই জোরালো হ'য়ে উঠলো। উল্টোদিকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাথরুম ও টয়লেটে গেলাম। প্রাতঃকৃত্য সেরে, গরম জলে মুখ-হাত ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে অনেকখানি ভব্য সভ্য হ'য়ে লাউঞ্জে ফিরে এলাম।

ফিরে এসে দেখি, সঙ্গীরা কেউই সেখানে নেই। খুঁজতে খুঁজতে এরোড্রোমের রেস্তোরাঁর কাছ বরাবর গিয়ে দেখি—সেখানে তুমুল জটলা! কি ব্যাপার! না, আগে ভাগে দু' চারজন মুখ হাত না ধুয়েই রেস্তোরাঁতে ঢুকে পড়েছিল, তারা বিনা পয়সাতেই ব্রেক-ফাস্ট মেরে দিয়েছেন। পরে যখন বাকি সবাই সেই খবরটা পেয়ে ওধার পানে ধাওয়া ক'রেছিলেন—তখন বিমান কোম্পানীর হুজুররা নাকি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এখানে যাঁদের যাত্রা শেষ হ'য়েছে তাঁদের ব্রেকফাস্ট খাওয়ানোর দায় ও'দের নয়। খেতে পারো—গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে। ছেলেছোকরার দল এই নিয়ে মহা হৈ-চৈ করছে—দলের মাতব্বররা তাঁদের বোঝাচ্ছেন। আর বিমান কোম্পানীর মুরুব্বিরা ব্যাপার বেগতিক দেখে স'রে পড়েছেন।

চেঁচামেচি দেখে আমি এগিয়ে গিয়ে হেসে বললাম—"চার্টার্ড প্লেনে ভাড়া সস্তা, কাজেই এই দুরবস্থা। চেপে যাও ভাইসব, চেপে যাও! কেলেঙ্কারী ক'রো না। এতো আর কলকাতা শহর নয় যে, জিগির তুলবে 'মোদের দাবী মানতে হবে' আর অমনি চার পাশে ভিড় জ'মে যাবে। চাই কি দু' চারখানা খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে সমর্থনও পেয়ে যেতে।"

একজন বললে, "ঠাট্টা নয় বিমলদা! দিশী ক্যাপিট্যালিস্ট কোম্পানীর বজ্জাতিটা দেখলেন তো? এর প্রতিবাদে আপনাকে কিছু লিখতেই হবে।" এমন সময় প্রতিনিধিদলের আর এক মাতব্বর এসে খবর দিলেন যে, বিমান কোম্পানী এইটুকু জানিয়ে দিয়েছেন, বিমানঘাটি থেকে জুরিখ রেল স্টেশনে আমাদের যাওয়া এবং মালপত্তর নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের খরচেই করতে হবে। শ্রীযুত পানজোয়ানী ও বীরেন্দ্র সিংহ ভায়া সবাইকে জানালেন, দুই থেকে তিন ফ্রাঁ অর্থাৎ আড়াই টাকার মতো শেয়ারে ভাড়া পড়বে একটি বাস আর সেই সঙ্গে মাল ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার

ট্রেলার ভাড়া করতে। গোদের ওপর বিষফোড়া। কাজেই অত উত্তেজনা সব শ‍ুকিয়ে আমসী!

সিচুয়েশনটা বদলে গেল। আমারও খেয়াল হ'লো—হাতঘড়িতে সময়টা বদলে নিই। ও হরি! কব্জি খালি! ম‍ুখ হাত ধ‍ুতে গিয়ে টয়লেটে ঘড়িটা খ‍ুলে রেখেছিলাম, পরতে ভুলে গেছি। ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেছে! এতক্ষণ আমার ঘড়ি হাত বদল ক'রে অন্য হাতে চ'লে গেছে! যাক! তব‍ুও পড়ি কি মরি ক'রে ছ‍ুটে গেলাম টয়লেটে! গিয়ে দেখি, ঘড়ি যেখানকার সেখানেই রয়েছে। একজন ভদ্রলোক সেই ওয়াশ-বেসিনেই ম‍ুখ ধ‍ুচ্ছেন। আরও কত লোক আমার পরে এবং ও'র আগে ম‍ুখ হাত ধ‍ুয়ে গেছেন, কিন্তু আশ্চর্য পরের ঘড়িটি হাতে ধ'রে তাঁরা কেউই হাত কলঙ্কিত করেননি। ইউরোপের সাধারণ মান‍ুষের সততার প্রথম পরিচয়ে সেদিন মাথা ন‍ুয়ে পড়লো।

ঘড়ি ফিরে পেয়ে কাঁটা ঘ‍ুরিয়ে হাতে পরলাম যখন, তখন বেলা আটটা। কাস্টমসে ডাক পড়লো। আমাদের কার‍ুরই স‍ুটকেশ ইত্যাদি ও'রা বড় একটা খ‍ুললেন না। শ‍ুধ‍ু জিজ্ঞেস করলেন—'ব্যক্তিগত মাল আছে?' 'ডিক্লেয়ার করার মত কিছ‍ু নেই তো?' ছোট হাঁ এবং একটি ছোট্ট 'না' জবাবে খ‍ুশী হলেন কাস্টমস অফিসারেরা। সব মালে একটা ক'রে খড়ির টিক মেরে দিলেন খোশ মেজাজে। বিমানঘাটির পোর্টাররা আমাদের মালগ‍ুলো ইলেক্‌ট্রিক ট্রলিতে বোঝাই ক'রে নিয়ে অটোবাসের ট্রেলরে গ‍ুছিয়ে সাজিয়ে দিলে। সবাই যে যার মাল মিলিয়ে নিয়ে আমরা বাসে চেপে বসলাম।

প্রকাণ্ড বাস—প্রায় ৫০জনের বসবার জাগয়া, মখমল মোড়া আসন। সবাই উঠে বসবার পর ড্রাইভার এসে তার আসনে বসতেই দেখি কি, বাসের দরজাগ‍ুলো ফোঁস্ শব্দ ক'রেই ফস্ ক'রে আপনা আপনি বন্ধ হ'য়ে গেল। বাস ছ‍ুটে চললো শহরতলীর ভিতর দিয়ে জ‍ুরিখ শহরের দিকে।

শহরতলীর পথঘাট এমনই ঝকঝকে তক্‌তকে পরিষ্কার যে, রাস্তায় কোথাও এক ট‍ুকরা ছেঁড়া কাগজ প'ড়ে আছে, এটা দেখতে পেলাম না। ছোট বড় প্রতিটি বাড়ির জানলার বাইরে রকমারী রঙীন

ফুলভরা গাছের টব সাজানো। ...সে ঘরবাড়ির এই বিশেষত্বটুকু আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পনেরো কুড়ি মিনিট পরেই আমাদের বাস 'জুরিখ' বানহফ্ বা স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমরাও নেমে পড়লাম। বাসের লোকেরাই ফুটপাথে আমাদের সকলের মাল নামিয়ে দিলে। অদ্ভুত বেশধারী ধুতি পাঞ্জাবী, পায়জামা ও প্যাণ্ট সার্ট পরা এতগুলি জীবকে এক সঙ্গে স্টেশনের সামনে দেখে ভিড় জমে গেল। দলের পাণ্ডারা ওঁদের ব্যবস্থানুযায়ী জুরিখে তাঁদের স্বগোত্রীয় বন্ধুদের অর্থাৎ স্থানীয় ফেস্টিভ্যাল কমিটির সদস্যদের খোঁজে এধার ওধার ছুটাছুটি ক'রতে লাগলেন।

একটি মহিলা দেখতে অনেকটা চীনাদের মতোই, আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাচ্ছি, আমি কি করি ইত্যাদি। সব কথার জবাব এবং আমার পরিচয় জানবার পর মহিলাটি বললেন—"আমি আপনাদের যদি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারি তবে অত্যন্ত খুশী হবো।" আমি মহিলাটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানলাম—ওঁর নাম লুডমিলা, কোরিয়ার মেয়ে, বয়স সাতাশ আটাশ। সুইজারল্যাণ্ডে উনি বহুদিন আছেন, ছবি আঁকেন এবং সমাজসেবা করেন। ওঁর স্বামী ডক্টর বার্নহার্ড ওয়েক—সুইস ইকনমিস্ট। এক অডিটরের অফিসে চাকরি করেন।

আমি ভাবলাম মহিলাটি যখন সমাজসেবা করেন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই উনি কোনও একটা প্রতিষ্ঠানের সদস্যা বা হোমরা-চোমরা কেউ হবেন। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কোন্ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজসেবা করেন?

মহিলাটি হেসে বললেন—"কোনও প্রতিষ্ঠানে যুক্ত নই আমি, নিজেই যতটুকু পারি, সমাজসেবার কাজ করি।"

মহিলার কথা শুনে কৌতূহল হলো। জিজ্ঞেস করলাম—"সমাজসেবার কি কি কাজ করেন আপনি?"

লুডমিলা বললেন—"'তেমন কিছু নয়। আমার স্বামী রোজ সকালে সাতটার সময় বেরিয়ে যান; আমিও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। কোনও কোনও দিন স্টেশনে আসি। স্টেশনে ভদ্র বিদেশী টুরিস্ট দেখলে তাঁর গাইড হয়ে তাঁকে শহরটা ঘুরে দেখার ব্যাপারে

সাহায্য করি। যেদিন তেমন কাজ থাকে না, [illegible]
ডিস্‌পেনসারীর সামনে [illegible]
আসেন, তাঁদের বাড়ীতে [illegible]
আছে কি না জিজ্ঞেস করি। যাঁদের সেবা করার লোকের অভাব আছে জানান, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে বারোটা অবধি রোগীর সেবা করি। বারোটায় বাড়ি ফিরে আমাদের রাঁধা-বাড়া সেরে স্বামীর সঙ্গে দুপুরের খাওয়া খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ি। রোগীর বাড়িতে পাঁচটা অবধি কাজ করি।”

আমি বললাম—“সব দিন এরকম কাজ পান আপনি?”

উনি হেসে জবাব দিলেন—“যেদিন এসব কাজের কোনটাই পাই না, সেদিন বড় কোনও রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, বুড়ো বুড়ি আর অন্ধদের হাত ধরে রাস্তা পার হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করি। এই রকম করে যেটুকু পারি অপরকে সাহায্য করি।” শুনে আমি অবাক! বললাম—“আপনি নিজেই একটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান।”

ইতিমধ্যে আমাদের দলের পান্ডারা দেখলাম যোগাযোগ ঘটিয়ে ফেলেছেন ও'দের সগোত্রীয় সুইস্ যুব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে—তাঁদের প্রতিনিধিরাও এসে গেছেন। আগে থেকেই সেসব ব্যবস্থা করা ছিল। এ ছাড়া আরও বহু সুইস যুবক যুবতী যারা ইরেজী বলতে পারেন, তাঁরাও ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন আমাদের চার পাশে। সকলের মুখেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কৌতূহলী প্রশ্ন। গান্ধী আর নেহরুকে ওরা সবাই জানে এবং শ্রদ্ধা করে। ভারতবর্ষকে ওরা ভালবাসে, এই কথাটা জোর গলায় জানিয়ে ওরা প্রায় সকলেই যে আমাদের সাহায্য করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব—সেটাও প্রকাশ করলে। ঠিক হ'লো—স্টেশনের লেফ্‌ট্ লাগেজ রুমে আমাদের ভারী মালপত্র জমা দিয়ে আমরা ঘুরতে বেরুবো। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চার পাশের নতুন সুইস্ বন্ধুরা, ছেলে এবং মেয়েরা কাঁধে পিঠে ক'রে আমাদের মালপত্র ব'য়ে নিয়ে চললো - লাগেজরুমে। সুইস্ যুবক যুবতীদের এইভাবে যেচে এসে ভাব করা এবং মোট বয়ে বিদেশী অতিথিদের সাহায্য করার আন্তরিকতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে

গেলাম। মিসেস ওয়েক নিজেই আমার ভারী সুটকেসটা ব'য়ে নিয়ে চললেন। কত বারণ করলাম, শুনলেন না। প্রতিনিধিদলের কর্তারাই মালপত্র সব বুঝে নিয়ে লাগেজরুমে জমা করে দিলেন। তারপর ওখানকার ফেস্টিভ্যাল কমিটির চাঁইরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন—বেশ খানিকটা হেঁটে আমরা ফোক্সহাউস রেস্তোরাঁতে পৌঁছালাম।

মিসেস লুডমিলা রেস্তোরাঁর দরজা অবধি আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে এলেন। কয়েক মিনিটেই তিনি তাঁর মিষ্টি মধুর ব্যবহারে আমাকে যেন ঘনিষ্ঠ করে নিলেন। উনিই প্রস্তাব করলেন যে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুরে এসে, তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন 'জুরিখ' শহরটা দেখিয়ে আনতে। ভারী খুশী হলাম বিদেশের মাটিতে পা দিয়ে অপরিচিত মানুষের মধ্যে এমন একটি অতিথিপরায়ণা বন্ধু পেয়ে, তাঁকে তো ধন্যবাদ দিলামই, মনে মনে ভগবানকেও অশেষ ধন্যবাদ জানালাম।

সাদামাটা ব্রেকফাস্ট জুটলো। সুইস্ বান, রোল, জ্যাম আর কফি। ওখানেই বেলা দু'টায় সবাই দুপুরের লাঞ্চ খেতে পাবে এটাও জানিয়ে দেওয়া হ'লো।

ব্রেকফাস্ট খাওয়া সারা হ'তেই দেখি, লুডমিলা এসে গেছেন। যুব'প্রতিনিধিরা আর তাঁদের দলের নেতারা তাঁদের সুইস্ বন্ধুদের সহায়তা নিয়ে অস্ট্রিয়ার 'ভিসা' সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। আমারও 'ভিসা' ছিল না। তাই এক পাউন্ড দক্ষিণার সঙ্গে ও'দের হাতেই আমার পাসপোর্ট, ফটো আবেদনপত্রটা গুঁজে দিলাম। পানজোয়ানী সাহেব জানালেন, বেলা ১২টায় হ্যালেনবাড সুইমিং পুলে সবাইকে জুটতে হবে। কারণ ভিসার ব্যাপারের পাকা খবর তখনই জানা যাবে। কয়েকজন ভিসা করাতে গেল, বাকি সবাই ঘুরতে বের হলো।

লুডমিলার সঙ্গে আমি একাই শহর দেখতে বের হলাম। লুডমিলাকে জানালাম—প্রথমেই আমি পাউন্ড ভাঙিয়ে কিছু সুইস্ ফ্রাঁ নিতে চাই। লুডমিলা বললে—"টাকা ভাঙানোটা পরে হবে, আগে

তুমি ডাকঘরে গিয়ে চিঠি ফেলে আসবে চল।” আমি বললাম—“টাকা না ভাঙালে টিকিট কিনবো কি দিয়ে?”

—“আমি ফ্রাঁ ধার দেবো, পরে শোধ দিও। ভয় নেই, সুদ লাগবে না।” তাই হ'লো, লুডমিলা চার ফ্রাঁ আর কয়েক সেণ্ট দিয়ে টিকিট কিনে দিলে—চিঠি ফেলে দিয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ভাঙিয়ে তার ধার শোধ ক'রে দিলাম।

তারপর ট্রামে চড়লাম—আমি আর লুডমিলা। ট্রামে উঠে ভাড়া কত দিতে হবে জিজ্ঞেস করতেই লুড্‌মিলা বললে—“ট্রাম বাসের ভাড়া লাখ পঞ্চাশ নয় যে, তোমাকে দিতে হবে, ওটা আমিই দেবো কারণ তুমি আমার বিদেশী বন্ধু, তুমি আমাদের অতিথি।” আমি অনেক আপত্তি করলাম—ও কিছুতেই শুনলে না। বরং নিতান্ত ঘনিষ্ঠ পরিচিতের মত শাসন ক'রে বললে—“যতক্ষণ জুরিখে থাকবে, ততক্ষণ আমি যা বলবো তাই মেনে নেবে।” অবাক হ'য়ে গেলাম। শ্রদ্ধায় মন নত হ'লো—বিদেশিনীর আতিথেয়তায়।

প্রথমেই গেলাম প্যারেড প্লাৎসে। জুরিখের চৌরঙ্গী। সব-দিকের ট্রাম বাস চক্কর মারছে। তারপর সেণ্ট পিটার টাওয়ারে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় টাওয়ার ঘড়ি দেখলাম। লুড্‌মিলা জানালে, ঘড়িটার ব্যাস ২৮ ফুট ৫ ইঞ্চি! তারই এক পাশ দিয়ে জুরিখ শহরের ভিতর লিমাত (Limmat) নদীর নীল জলের স্রোত ব'য়ে চলেছে। তার পুল পেরিয়ে গ্রোশমুনস্টর বা গ্রেট ক্যাথিড্রাল গির্জার যমজ চূড়া ও ভিতরটা ঘুরে দেখলাম। গির্জার ভিতরে আট ন'শো বছর আগেকার শিল্পীদের নিপুণ হাতের কারুকলা দেখে মন ভরে উঠলো। ওখান থেকে রামি স্ট্রাসে ও হট্টিঙ্গার স্ট্রাসে এই দুই রাস্তা পার হয়ে 'ডোলডার ভেল্লেনবাড্' অর্থাৎ নকল ঢেউ জাগানো সুইমিং-পুলে পেঁাছলাম। পথে কুনস্‌টহউস আর্ট মিউ-জিয়াম 'শওসপাইয়েলহওস' রঙ্গালয়ের বিরাট প্রাসাদগুলি দেখিয়ে দিলে লুডমিলা।

ডোলডার ভেল্লেনবাড সুইমিং পুল দেখে মনে হ'লো, নকল সমুদ্র তৈরি ক'রে রেখেছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় নেচে নেচে স্নান করার যে আনন্দ, সেটা যাতে সমুদ্রে না গিয়েও সবাই উপভোগ

করতে পারে তারই জন্যে এই বিরাট ও অভিনব ব্যবস্থা। কি উপায়ে যে এইভাবে ঢেউ সৃষ্টি করা হচ্ছে, লুডমিলা তা বোঝাতে চেষ্টা করলেও আমার পক্ষে তখন তখনই সেটা বুঝে ওঠা সম্ভব হ'লো না; কারণ বিরাট বিস্ময়ের চাপে মাথাটা তখন রীতিমত কাবু হ'য়ে পড়েছে।

ওখান থেকে ফেরার পথে Stadtheatre বা স্টেট থিয়েটারের বিরাট বাড়িটা দেখে জুরিখ হ্রদের ধারে উটোকোয়াই (Utoquai) অর্থাৎ হ্রদের ধারে বিহারবীথিতে এলাম। কী সুন্দর জায়গা! হ্রদের ধারে আগাগোড়া লোহার রেলিং দিয়ে বাঁধানো লম্বা সড়ক— গাছের সারির কালো ছায়ার জালে ঢাকা। মাঝে মাঝে বেঞ্চি পাতা। বেঞ্চিতে ব'সে দু'জনে একটু জিরিয়ে নিলাম, শরীরটা খুবই ক্লান্ত মনে হ'চ্ছিল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই খেয়াল হ'লো—বেলা ১২টায় 'হ্যালেনবাড' সুইমিং পুলে ভিসার ব্যাপারে সকলকে যে জুটতে হবে। তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সী নিয়ে লুডমিলা আর আমি সেখানে পেঁাছে গেলাম।

সুইমিং পুলের হলে পেঁাছে দেখি দলের নেতাদের মুখে বিষাদের ছায়া—অস্ট্রিয়ার ভিসা যাঁরা আনতে গেছেন—তাঁরা তখনও ফেরেননি। বাকি আর সবাই দেখি দিব্য নিশ্চিন্ত! চান টান ক'রে টেরি বাগিয়ে টিপ্‌টপ্! আড়াই ফ্রাঁ দিলেই ওখানকার পাবলিক বাথে চান করা যাবে, তোয়ালে সাবান পাওয়া যাবে, শুনে স্নান করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। পয়সা জমা দিতেই সাবান তোয়ালে আর জামা-কাপড় জুতো খুলে রাখার আলমারির চাবি পাওয়া গেল। দোতলায় পুরুষদের চানের ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

চান করবার চমৎকার ব্যবস্থা—শাওয়ার বাথ গরম জলে চান করে খুব আরাম হলো। চান সেরে ফিরে এসে শুনি, অস্ট্রিয়ার 'ভিসা' পাওয়া গেছে। তারপর আবার দল বেঁধে সবাই হাজির হওয়া গেল সেই রেস্তোরাঁতে। পাঁউরুটি, সুপ, মস্ত মাছ ভাজা, বরবটি, শাক সেদ্ধ টমাটো আলুভাজা, আর ক্রীম ঢাকা স্ট্রবেরী দিয়ে পেট ভরানো গেল।

খাওয়ার পরই কেমন যেন আমার শরীরটা ভার ভার মনে হ'তে

লাগলো নড়তে চড়তে খারাপ লাগছিল। সংগীদের সবাইকে বললাম—ওঁরা বড় কেউ কথাটায় তেমন কান দিলেন না। আমি খুব নার্ভাস্ হয়ে পড়লাম। 'লুডমিলা' আসতে তাকে বললাম—"আমার শরীর খুব খারাপ মনে হ'চ্ছে, তুমি আমাকে কোনও হোটেলে একটা ঘর ঠিক ক'রে দেবে চল, আমি একটু ঘুমুবো, বিশ্রাম করবো।" লুডমিলা বললে—"খামকা এই ক' ঘণ্টার জন্যে কতগুলো টাকা খরচ করাটা ঠিক হবে না। দেখো তোমার যদি অসুবিধা না হয়, তবে তুমি আমার বাড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রাম করতে পারো। তাই বরং চলো।" স্বল্পসময়ের পরিচিতা বিদেশিনীর বাড়ি যেতে আমার কেমন বাধো বাধো ঠেকলো। আমি বললাম—"না থাক! ও কিছু না, এখনই ঠিক হয়ে যাবে।"

লুডমিলা কপালে হাত দিয়ে দেখে বললে—"তোমার গা'টা বেশ গরম হয়েছে, দেরি করো না, চলো—কাছেই আমার ফ্ল্যাট।" ও একরকম জোর ক'রেই ধ'রে নিয়ে গেল। নিরুপায় হ'য়ে আমিও গেলাম ওর সঙ্গে।

লুডমিলার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি যখন—তখন পা আর চলছে না। যাক, কোনও মতে তো ওদের ফ্ল্যাটে পেঁাছলাম। দু'খানি ঘর, একটি রান্নাঘর নিয়ে কোনওরকমে থাকেন ওয়েক দম্পতী।

ড্রয়িং রুমে ডিভানে বসিয়ে লুডমিলা তাড়াতাড়ি চা ক'রে আনলে। চা খেয়ে শীতটা একটু কমলো, কিন্তু অস্বস্তিটা গেল না। লুডমিলা বললে—"দাঁড়াও গরম জল চড়িয়েছি, তোমাকে ফুটবাথ দিলেই এখনই সুস্থ হ'য়ে যাবে।" ও এরকম ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো দেখে আমি খুবই অপ্রস্তুত হচ্ছিলাম—অস্বস্তি ও মনের উদ্বেগও বড় কম হচ্ছিল না। তাড়াতাড়ি বড় একটা এনামেলের গামলায় গরম জল এনে আমাকে পা ডুবিয়ে বসতে বললে, সারা গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে দিলে। এভাবে গরম জলের ও গরম কম্বলের উত্তাপে শরীরের অস্বস্তিটা বেশ খানিকটা কমে গেল। কিন্তু কম্বল খুলতেই একেবারে হাড়ভাঙা কাঁপুনি এসে সর্ব শরীর কাঁপিয়ে দিলে।

আমি ডিভানের ওপর শুয়ে পড়লাম, লুডমিলা পাশের ঘর থেকে লেপ কম্বল এনে আমাকে বেশ করে ঢেকে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা ওষুধও এনে খাইয়ে দিলে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। ঘুম যখন ভাঙলো তখন সন্ধ্যা ৭॥টা।

চোখ খুলে লেপ টেনে মুখ বাড়িয়ে দেখি, এক সুদর্শন যুবক আর লুডমিলা আমার বিছানার পাশে ব'সে আছেন। "গুড্ ইভনিং মিঃ ঘোষ—হাউ ডু ইউ ফিল নাউ!" বলে যুবকটি উঠে এসে আমার কপালে হাত দিলেন। আমি তাঁর হাতটা চেপে ধ'রে বললাম, "ভাল হ'য়ে গেছি আপনার মহানুভব স্ত্রীর সেবাযত্নে। আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।"

লুডমিলা বললে, "ওসব কথা এখন থাক! শরীরটা সুস্থ বোধ করছো, না ডাক্তার ডাকবো?"

ধড়মড়িয়ে উঠে বললাম—"না! না! ডাক্তার ডাকতে হবে না! আমার বন্ধুরা কোথায়? আমাকে তাদের কাছে নিয়ে চলো।"

লুডমিলা হেসে বললে—"ভয় নেই! বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেবো ঠিকই, কিন্তু তার আগে গরম জলে চান সেরে এসো—বড্ড ঘেমে গেছ।" ডক্টর ওয়েক উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি এনে দিলেন ড্রেসিং গাউনটা। চান করতে ভরসা হলো না। বাথরুমে গিয়ে গরম জলে গা হাত মুছে জামা কাপড় পরে ঘরে ঢুকে দেখি—খাবার টেবিলে খাবার সাজানো।

ডক্টর ওয়েক বললেন—"কিছু খেয়ে নিন, লুডমিলা আপনার জন্যে ভাত আর মাংস প্রাচ্যরীতিতে মশলা দিয়ে রেঁধেছেন।"

আমি তখন নানান চিন্তায় নার্ভাস—খাওয়ার ইচ্ছা নেই জানলাম, "আমায় মাপ করুন, আজ আর কিছু খাব না।"

ওঁরা দু'জনেই নাছোড়বান্দা, না খাইয়েও ছাড়বেন না। অগত্য ওঁদের সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে বসতে হ'লো। একটু আধটু মুখে দিতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক ধ'রে ওঁদের দু'জনের সঙ্গে গল্প করলাম। ডক্টর ওয়েক ভারী চমৎকার আর পণ্ডিত মানুষ। রবীন্দ্র নাথের কবিতার জার্মান অনুবাদ পড়েছেন। তাই নিয়েও আলোচন হ'লো। ওঁর ভারী আপশোষ। আমার সঙ্গে বেশীক্ষণ গল্প করা

সৌভাগ্য হ'লো না ও'র। বার বার অনুরোধ জানাতে লাগলেন, বুখারেস্ট থেকে ফেরার পথে আমি যেন জুরিখে এসে ওঁদের সঙ্গে দু'একদিন কাটিয়ে যাই।

লুডমিলা বললে—"ফেরার পথে না এলে বুঝবো ইণ্ডিয়ানরা আনগ্রেটফুল! অকৃতজ্ঞ!" আমি বললাম—"তোমার এই অকুণ্ঠ সেবা যত্নের ঋণ কোনওদিনই ভুলতে পারবো না।" লুডমিলা বললে, "ছেঁদো কথায় আমরা ভুলি না, বুখারেস্ট থেকে ফেরার পথে জুরিখের পথটা না ভুললেই খুশি হবো।" বললাম—"বেশ আসবো।"

আরও অনেকক্ষণ গল্প করার পর ডক্টর ওয়েক রাত দশটায় মিসেস লুডমিলা ও আমাকে বাসে তুলে দিলেন। বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। লুডমিলা আমাকে শুধু স্টেশনেই পৌঁছে দিলে না—আমার বন্ধু ও সঙ্গীদের সঙ্গে বুখারেস্টের পথে ভিয়েনা যাবার গাড়িতে চড়িয়ে দিলে। পাশে ব'সে বার বার ক'রে বললে— "খুব সাবধানে যেও—ঠাণ্ডা লাগিও না।" গাড়ি ছাড়বার পয়লা ঘণ্টা বাজলো। নেমে যাবার সময় হাতখানা ধরে লুডমিলা শুধু মনে করিয়ে দিয়ে গেল—"মিঃ ঘোষ! প্লিজ ডোণ্ট ফরগেট ইওর প্রমিজ্।"

আমি ওর আঙুলকটা মুঠোয় চেপে বললাম—"নেভার! ইণ্ডিয়ানস আর এভার গ্রেটফুল।"

জুরিখ থেকে যে ট্রেনে আমরা সওয়ার হলাম, সে ট্রেনটা ইণ্টারন্যাশনাল লাইনের 'অ্যালবার্গ এক্সপ্রেস' নামেই পরিচিত। প্যারি থেকে ভিয়েনা এর দৌড়। ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে। কাজেই ভিড় ছিল বেশ। তবে আমাদের বড় বিশেষ অসুবিধা হয়নি। কারণ জুরিখ থেকে এই ট্রেনে একটা বগী জোড়া হয়, আর সেটিতেই আমাদের সকলের সীট রিজার্ভ করা ছিল। বরাতের জোরে বগীখানার একটেরে ১নং কম্পার্টমেণ্টে আটটি আসনের মধ্যে মাত্র আমারই কেবল একখানা সীট রিজার্ভ ছিল। আর লুডমিলাই সেটা খুঁজে পেতে বার করে ছিল বলেই নিরিবিলিতে একটু জায়গা পেলাম। ছেলে-ছোকরার দল গোটা গাড়িটাকে

হ্রড়ম্রড়িয়ে-দ্রড়দাড়িয়ে তোলপাড় [illegible]। ভাবলাম, বয়সে কিছ্রটা প্রবীণ আর কমরেড দলভুক্ত [illegible]লেই ওরা আমাকে এভাবে একঘরে করে দিয়েছে। হঠাৎ তেমন [illegible] প্রতিনিধি দলের অন্যতম নেতা শ্রীয্রক্ত পানজোয়ানী আমার কা[illegible] এসে জানিয়ে গেলেন, অন্য কামরায় তাঁর আসন থাকলেও, তিনি [illegible]মার কামরায় আসবেন সঙ্গী হতে। খ্রশী হয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

ল্রডমিলাকে নামিয়ে দিতে করিডর বেয়ে যখন যাচ্ছি, তখন দেখি কি, সীট আর রিজার্ভেশন নম্বরের পরোয়া না রেখেই গোটা বগীটার সব ক'টা কামরাতেই আমাদের সঙ্গীরা মালপত্তর ঠেসে মৌরসী পাট্টা গেড়েছে। আট-আটজনের কম্পার্টমেণ্টে দ্রজন দ্রজন করে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে শ্রয়ে পড়েছে। নির্ভেজাল ভারতীয় কায়দায় বসবার কামরাটাকে স্লিপিং কোচে পরিণত করেছে। বিদেশী যাত্রী যাঁদের ঐসব কামরায় আসন রিজার্ভ করা ছিল, তাঁরা অমন ব্যাপার-স্যাপার দেখে করিডরে দাঁড়িয়েই দ্রর থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারছেন। কিন্তু তব্র কেউ ওঁরা এগিয়ে গিয়ে বলছেন না—'গাত্রোৎপাটন কর্রন মশাইরা, আমরাও টিকিট কিনেছি, আমাদেরও আসন রিজার্ভ আছে।'

জ্ররিখ স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল ২৩শে জ্রলাই রাত ১১টা ৩৪ মিনিটে। মিসেস ল্রডমিলা ও জ্ররিখের ফেস্টিভ্যাল কমিটির তর্রণ-তর্রণীরা র্রমাল নাড়িয়ে, গান গেয়ে আমাদের বিদায় জানালে।

নিজের কামরায় ফেরবার পথে করিডরে বিদেশী যাত্রীদের ভীড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—ইরেজীতে বললাম—"আপনারা কয়েকজন ১নং কম্পার্টমেণ্টে আসতে পারেন, ওখানে বসবার মত গ্রটিকয়েক আসন খালি আছে।" কিন্তু না রাম, না গঙ্গা! 'হাঁ', 'না' কিছ্রই জবাব এলো না—কেউ কেউ বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে একট্র ম্রচকি হাসলেন, কেউ বা ম্রখটা জানলার দিকে ঘ্ররিয়ে নিলেন। ব্রঝলাম, ইংরেজী জবান ওঁদের নাগালের বাইরে। ভদ্রতা প্রদর্শনে নির্রপায় হয়ে অভদ্রের মত নিজের কামরায় এসে ঢ্রকলাম। দেখি কি, পানজোয়ানী সাহেব নীল আলো জ্বালিয়ে আমার সামনের চারটি আসন একাকার করে লম্বা হয়েছেন। তাঁকে

সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে বললাম—'কমরেডদের গিয়ে বলুন, মাল-পত্তরগুলো গুছিয়ে বাঙ্কে তুলে দিয়ে বিদেশী যাত্রীদের বসবার জায়গা করে দিতে।'

উনি বললেন—'আরে ভাই ঘোষ সাহাব! কোন মেরি বাৎ শুনেগে?' তারপর চাপা গলায় চুপি চুপি বললেন ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে শুয়ে পড়ুন। নির্বিকার পরমহংসদেবের মত সদুপদেশামৃত বর্ষণ করে কমরেড পানজোয়ানী পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। পঞ্চ মিনিটের মধ্যেই পানজোয়ানী সাহেবের নাসিকায় পাঞ্চজন্য বাজতে সুরু হলো।

সাম্যবাদী বন্ধুদের সঙ্গে সাম্য বজায় রেখে সুবিধাবাদী হতে নিজের বিবেকে বাধলো। শরীরটা ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়তে চাইলেও মনটা বিদ্রোহ জানিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ালো। পা বাড়ালাম কামরার বাইরে।

করিডর গিয়ে দেখি, ভিড় হাল্কা। মাত্র দশ-বারোটি মহিলা ও পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। বুঝলাম বাদ বাকি সবাই বেগতিক দেখে করিডরের পথ বেয়ে অন্য বগীতে বসবার জায়গার খোঁজে গেছেন। ওদেশের চলন্ত গাড়িতে এক বগী থেকে অন্য বগীতে যাওয়া যায়। কাঁচের জানালা দিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ের গায়ের ঘরবাড়ি আর রাস্তার আলোগুলো ঝিকমিকিয়ে উল্টোদিকে ছুটে যাচ্ছে। ওঁরা সবাই নিঃশব্দে সেই দিকে তাকিয়ে আছেন।

গাড়ি এসে থামলো সুইস সীমান্তের Buchs (বুখস্) স্টেশনে। রাত তখন একটা বেজে বারো মিনিট। গাড়ি থামতেই সুইস সীমান্তরক্ষী পুলিশের লোকরা গাড়িতে এসে আমাদের প্রত্যেকের পাসপোর্টের সুইস ভিসায় সীমান্ত অতিক্রম করার ছাপ মেরে দিলে। জিজ্ঞেস করলে, আমাদের কার কাছে কত সিগারেট বা সুইস মুদ্রা আছে। আধ ঘণ্টা পরে গাড়ি ছাড়লো। পনর মিনিট যেতে না যেতেই অস্ট্রিয়ার সীমান্তে Feldkirch স্টেশনে গাড়ি পেঁাছে গেল। অস্ট্রিয়ার সীমান্তরক্ষী পুলিশ ও কাস্টমসের লোকরা গাড়িতে উঠলেন, গাড়ি ছেড়ে দিল দু মিনিটের মধ্যেই। তখন তাঁরা চলন্ত গাড়িতেই এক কামরা থেকে আর এক কামরায় গিয়ে সকলের

পাসপোর্টে অস্ট্রিয়ার ভিসা বা ছাড়পত্র তদারক করে, মোহর মেরে অস্ট্রিয়ায় ঢোকবার অনুমতি দিয়ে গেলেন। কাস্টমসের লোকরা শুধু জিজ্ঞেস করলেন—ডিক্লেয়ার করার মত কিছু কাছে আছে কি না, বাক্স-প্যাঁটরা খোলাখুলির হাঙ্গামা থেকে রেহাই দিলেন। এই সব ঝামেলায় যাঁরা দিব্য নাক ডাকিয়ে ঘুম লাগাচ্ছিলেন, তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হলো।

ব্লিউদেন্‌জ (Bludenz) স্টেশনে পুলিশ আর কাস্টমসের লোকেরা নেমে গেলেন। নতুন কিছু যাত্রী ট্রেনে উঠলেন—আমাদের বগীতেও চার-পাঁচজন পুরুষ আর একটি মহিলা উঠলেন। মহিলাটির কোলে পশমের পোষাকে জড়ানো ফুটফুটে একটি ঘুমন্ত শিশু। মহিলাটর সঙ্গে তাঁর স্বামীও রয়েছেন। ওঁরা দুজনে একটু বসবার জায়গার খোঁজে আমাদের সঙ্গীদের আলো নেভানো কামরা-গুলোতে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন, তবে সেখানকার অবস্থা দেখে ঢুকতে সাহস পাচ্ছেন না। আমি এগিয়ে গিয়ে ঐ ভদ্রলোকটিকে বললাম, 'আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, বসবার জায়গা আছে।' স্বামী বেচারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্ত্রী বললেন, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার স্বামী ইংরেজী জানেন না, আমি জানি।' তারপর মহিলাটি বোধ হয় তাঁর স্বামীকে আমার প্রস্তাবটার কথা জানালেন, তখন স্বামী ভদ্রলোক এক গাল হেসে 'দাঙ্কে! দাঙ্কে!' অর্থাৎ ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! বলতে বলতে আমাকে অনুসরণ করলেন। বুঝলাম ওঁরা অস্ট্রিয়ান।

আমি কামরায় ঢুকে আলো জ্বালিয়ে বললাম, 'আসুন, আপনার খোকাটিকে ভাল করে শুইয়ে আরাম করে বসুন।' ভদ্রমহিলা ইংরেজীতে বললেন—'আপনার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা করলাম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

কামরার দুপাশে ভেলভেট-মোড়া বেঞ্চীতে চারজন করে লোকের বসবার জায়গা। মহিলাটি খোকাটিকে জানালা থেকে একটু দূরে শুইয়ে দিলেন, স্বামী গিয়ে খোকার মাথার কাছে জানালার ধারে বসলেন, খোকার মা খোকার পায়ের কাছে বসে আমাকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, উল্টোদিকের বেঞ্চীতে

আমার বন্ধু শুয়ে আছেন, ওখানেই আমি বসছি, আপনারা আরাম করে বসুন।'

মহিলাটি বললেন—'না! না! ভদ্রলোক আরাম করে ঘুমুচ্ছেন, ওঁর অসুবিধে করবেন না। আপনি এখানেই বসুন, কোন অসুবিধা হবে না।' হাত ধরে টেনে ওঁর নিজের পাশেই বসালেন।

ভদ্রলোক উঠে এসে সিগারেটের বাক্স খুলে সিগারেট অফার করলেন আমাকে এবং নিজের গিন্নীকে। তিনজনে একই আগুন থেকে সিগারেট ধরানো গেল। থার্ডম্যান ভদ্রলোকই হলেন, মরবার ভয় না রেখে।

তারপর পরিচয়ের পালা শুরু হলো। ভদ্রলোকের নাম Mr. Woisetschlager, ভদ্রমহিলার নাম Gisi ওরফে মিসেস ভয়েসেটস্ক্লাগের। ভদ্রলোক ভিয়েনার পোস্ট অফিসে কাজ করেন। গিসি বাচ্চাদের স্কুলে পড়ায়। বুঝলাম, কর্তার চেয়ে গিন্নীটি বিদুষী। থাকেন ভিয়েনার ম্যারিয়াহিলফের স্ট্রাসেতে। বাচ্চা হ'তে ছুটি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন, ছ' মাস পরে শহরে ফিরে যাচ্ছেন। ও'দের নামের বানানটা নোটবুকে তখন-তখনই লিখে রেখেছিলাম, তাই নির্ভুল বাংলাতে পারলাম। কথা-প্রসঙ্গে ওঁরাও আমার পরিচয়টা খুঁটিয়ে জেনে নিলেন। আমি যে সাংবাদিক, একথা শুনে গিসি ওর স্বামীকে বিড় বিড় করে কি যেন বললেন।

যাক, কথাবার্তা গড়িয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে ইতিমধ্যে ট্রেনও আরও অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে—হঠাৎ একটা গুম্ গুম্ শব্দ শোনা গেল। 'ব্যাপার কি!' গিসি জানালে—'ট্রেন আলবের্গ টানেলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। অস্ট্রিয়ার পাহাড় ভেদ-করা এই টানেলটা নাকি ছয় মাইল লম্বা। গৌরব জড়ানো সুরে বললে—'দিনের বেলা এলে দেখতে পেতেন আমাদের দেশে পাহাড়ের গায়ে গ্যালারী কেটে অসংখ্য পুল আর ছোট-বড় টানেল তৈরী করে এখানে কি অদ্ভুত উপায়ে ইলেকট্রিক ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা হয়েছে! এমনটা আর কোন দেশে নেই।' রাতের আঁধারে সে বিস্ময়কর ব্যবস্থাটা দেখতে পেলাম না বলে কোন দুঃখ হলো না, কারণ তার চেয়েও বিস্ময়কর জিনিস দেখলাম।—একটি সাধারণ অস্ট্রিয়াবাসীর মনে নিজের

দেশের রেলপথটুকুর সম্বন্ধেও কতটুকু জ্ঞান, কতটা দরদ, কতখানি গৌরববোধ।

আমাদের গল্পের মাঝখানেই গিসির স্বামী কখন উঠে গেছলেন, খেয়াল করিনি। খানিক পরে তিনটি বোতল নিয়ে কামরায় ঢুকলেন। গিসি বললেন—'হের ঘোষ! বিয়ার ইচ্ছা করুন।' আমি বললাম—'আমি মদ খাই না।' গিসি হেসে উঠে ওর স্বামীকে জর্মান ভাষায় কি যেন বললে, দুজনেই হেসে উঠলেন হো-হো করে। হাসির কারণটা পরে বুঝলাম—'বিয়ার'কে মদ বলেছি—এই কারণে। আমাকে ওঁরা বোঝালেন বিয়ারটা মদ নয়, সাধারণ পানীয়, জলের বদলে ওদেশের সবাই খায়, অতএব আমিও খেতে পারি নির্ভাবনায়। কিন্তু তাতেও আমার ভাবনা এবং মনের দ্বিধাটা কমলো না। জানালাম, আমি ওটা খাব না। গিসির স্বামী ডাইনিং-কার থেকে এক বোতল লেমনেড এনে বললে—'লিমোনাদ্'! ওঁরা দুজনে বিয়ারের বোতলে চুমুক দিয়ে সাবড়ে দিলেন। আমি দাঙ্কে বলে ঢক্ ঢক্ করে লেমনেডটা খেয়ে তেষ্টা মেটালাম।

মিঃ ভয়েসেটস্ক্রাগের জানালার ধারে খোকাটির মাথার ধারে গিয়ে বসলেন। আমি ও'দের দুজনকে দুটি সিগারেট দিয়ে নিজেও একটা ধরালাম। ঘড়িতে দেখলাম, রাত তিনটে, ভাবলাম এবার একটু ঘুমনো দরকার। কোণের দিকে ঠেসান দিয়ে চোখ বুজলাম।

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন ভোর পাঁচটা। গাড়ি "ইনসব্রুক" স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। গিসির স্বামী তখনও ঘুমে অচেতন, গিসির বাচ্চাটা শুধু জেগে উঠে মায়ের কোলে খেলা করছে।

চোখ মেলেই দেখলাম কামরার বাইরে দূরে পাহাড়ের কোলে পূর্বদিকে নবজাতক তপনদেবের রাঙা মুখের হাসি কামরার ভেতরে মায়ের কোলে রাঙা খোকার খেলা। মনটা আনন্দে ভরে উঠলো—মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'সুপ্রভাত, সার্থক দিন।' গিসি বললে, 'সুপ্রভাত! হের ঘোষ!'

টয়লেটে গিয়ে মুখ ধুয়ে করিডরের কাঁচের জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। রীতিমত ব্যস্ত এবং মস্ত স্টেশন যে এটা, তা বুঝলাম। তার চারপাশে পাহাড়ের কোলে চমৎকার শহরটি। পাহাড়ের ওপরে

নীচে ঘরবাড়িগুলি ছবির মত সাজানো, অবাক হয়ে দেখছিলাম। এমন সময় গিসি এসে পাশে দাঁড়ালো, আমি কিছু বলবার আগেই ও বললে, 'ফেরার পথে এই শহরটা দেখে যাবেন, এখানে অনেক দেখবার জিনিস আছে—সম্রাট ম্যাক্সি-মিলিয়নের স্মৃতিমন্দির, অ্যাম্ব্রাস ক্যাসল আর যাদুঘরে অপূর্ব সব সংগ্রহ।' আরও অনেক ইতিহাস আর তথ্যই সে পরিবেশন করলে বেশ পাকা গল্প বলিয়ের কায়দায়। তারিফ করে বললাম—'গিসি তুমি একেবারে জাত-মাস্টারনী। অস্ট্রিয়ার ইতিহাস-ভূগোল বোধ হয় তোমার ঠোঁটস্থ, তাই না?'

গিসি সলজ্জ হাসি হেসে বললে—'মাস্টারনী বলে নয়, আমার নিজের দেশের ইতিহাস-ভূগোলটা না-জানলে সেটা যে লজ্জার কথা হবে।' ভাবলাম এই কথাটা আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক মাত্রই যখন বুঝতে শিখবে, তখনই দেশটাকে আপনার বলে মনে হবে। আধ ঘণ্টা পরে গাড়ি ছাড়লো।

আমরা দুজনে করিডরে দাঁড়িয়ে কামরার বাইরে দৃশ্য দেখতে দেখতে গল্প করতে লাগলাম। মোৎসার্ট শুবার্ট, ব্রাহমস্-এর প্রসঙ্গ তুলতেই গিসি আরও খুশি হয়ে ওঁদের সম্বন্ধে অনেক নতুন কথাই জানালে। হঠাৎ একটা পুলের ওপর দিয়ে গাড়ি যাওয়ার শব্দে চমকে উঠতেই বাইরে দেখা গেল—অস্ট্রিয়ার পাহাড়ের কোলে—একটা লাগামছাড়া ঘোড়ার মত ছুটে চলা স্রোতস্বিনী। নদীটা পেরুবার কিছু পরে এসে গেল Kitzbuhel স্টেশন ও শহরটি। গিসি চিনিয়ে দিলে আল্পসের কয়েকটা শৃঙ্গ, দেখা গেল ক্যাথলিক চার্চটা। ৭টায় ওখান থেকে গাড়ী ছাড়লো। আমরা দুজনেই কামরায় গিয়ে বসলাম। গিসি ধরে বসলো—'ইণ্ডিয়ার গল্প বলো।' গান্ধী আর নেহরুর গল্প শোনবার আগ্রহটাই ওর বেশী। গল্প শুরু করলাম, সঙ্গে যেসব ছবি ও বই ছিল, তা বার করে ওঁর স্বামীকে দেখতে দিলাম। ভারী খুশী। গল্পে গল্পে এক ঘণ্টা যে গড়িয়ে গেছে টের পাইনি। Zell am See স্টেশনে গাড়ি থামলো যখন, বেলা আটটা। গিসি বললো—'চলো এই সুন্দর জায়গাটা দেখতে চলো। আল্পস্ পাহাড়ের কোলে এই হ্রদ সারা ইউরোপে বিখ্যাত। গোটা ইউরোপের

ছেলে-বুড়ো এখানে বেড়াতে এসে ক্যাম্প করে থাকে, নৌকো নিয়ে বাইচ খেলে, মাছ ধরে ছিপ ফেলে।'

করিডরে গিয়ে দেখি, সত্যিই ভারী সুন্দর। পাহাড়ের কোলে বিরাট হ্রদটি। হ্রদের ধার দিয়ে ট্রেনখানা গুড়ি গুড়ি এগিয়ে চললো। দেখলাম, লেকের চার ধারে অসংখ্য তাঁবু পড়েছে, মোটর গাড়ির পেছনে বাঁধা সচল ঘরবাড়িও কয়েকটা রয়েছে। অত সকালেই ছেলে-মেয়েরা কেউবা সাঁতার কাটতে লেগে গেছে, কেউবা সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে নৌকো ভাসিয়ে হল্লা করতে করতে চলেছে। দেখলাম, আমাদের সঙ্গী-সাথীরাও অনেকেই করিডরে এসে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছে।

পানজোয়ানী সাহেবের তখন ঘুম ভেঙেছে। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ-হাত ধুয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন রেস্তোঁরাতে। ব্রেক-ফাস্টটি সেখানেই আমরা সারলাম দল বেঁধে। ছেলেরা বললে,—'বিমলদা বিদেশে এসেও বেশ তো আপনি জমাচ্ছেন দাদা।' ওঁদের কথাবার্তা কি করে বোঝেন বলুন তো?' আমি বললাম, 'চেষ্টা করলেই বোঝা যায়, ভদ্রতার পরিচয় দিয়ে মিশতে পারলেই এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায়।'

বলা বাহুল্য, এর পরেই আমাদের কামরায় ছেলে-ছোকরাদের অনেকেই ভিড়ে পড়লো। গিসি ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলাম। গিসি তাঁর স্বচ্ছ সরল সুন্দর ব্যবহারে ও গল্পে সকলকেই মুগ্ধ করে দিলে। ওঁর গল্পের বিষয়বস্তু ছিল সোভিয়েট রাশিয়া আর আমেরিকা এই দুদল মতলববাজের চাপে পড়ে অস্ট্রিয়ার দুর্গতিটা কিরকম হচ্ছে! আমি খুব উপভোগ করলাম।

গল্পগুজবে দিনটা কোথা দিয়ে কেটে গেল খেয়ালই নেই। ভিয়েনার ওয়েস্টবানহফ স্টেশনে পেঁাছলাম আমরা বেলা তিনটে নাগাদ। ক্ষিদে-তেষ্টায় পেট তখন চোঁ-চোঁ করছে।

ভিয়েনা স্টেশনে নেমেই দেখলাম—প্ল্যাটফরমের ওপরকার ছাউনিগুলি কংক্রীট ঢেলে তৈরী করা হয়েছে, তবে ওপরের পলেস্তারাটা আর দেওয়া হয়নি। গিসি বললে—'নতুন করে স্টেশন তৈরী হচ্ছে। যুদ্ধে পুরানো স্টেশনটা একেবারে গুঁড়িয়ে গেছলো। গিসি ও গিসির স্বামী অনুরোধ জানালেন—ওঁদের বাড়িতে যাওয়ার

জন্য। আমি বললাম—'সঙ্গীদের ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। এজন্য ওঁরা যেন আমায় মাপ করেন।' গিসি বললে, 'বেশ তাহলে বুখারেস্ট থেকে ফেরার পথে যখন ভিয়েনা আসবেন তখন গরীবখানায় একবার আসবেন।' 'চেষ্টা করবো' বলে ওঁদের দুজনের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় জানালাম।

ভিয়েনা স্টেশনের লাগেজ-রুমে মালপত্তর জমা দেওয়ার পর ঘাটনেকার ভায়া ওঁদের স্বগোত্রীয় কমরেডদের ঘাটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। রুমানিয়া ও হাঙ্গারীর ভিসা কারুরই নেই। সেটি যোগাড় না হলে নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু! গোপনে গোপনে দলের চাঁইরা কি সব পরামর্শ-টরামর্শ করলেন, আমাকে জানালেনও না, আমি জানতে চাইলামও না। বীরেন্দ্র সিংহ ভায়া স্টেশনের বুফেতে নিয়ে গিয়ে সকলকে স্যান্ডউইচ, কেক, কফি ইত্যাদি খাওয়াবার ব্যবস্থা করলেন। আর জানালেন সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে। সস্তায় বীয়ার পেয়ে অনেকে আকণ্ঠ তা পান করেই পেট ভরালেন। আমার ক্ষিদেটা মিটলো না। কি আর করি! স্টেশনের দোতালায় গিয়ে এক পাউন্ড ভাঙিয়ে ৬৮ শিলিং পেলাম। দোতালার রেস্তোঁরাতে চুপি চুপি নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে কিছু খেলাম। তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে স্টেশনের ট্যুরিস্ট আপিসে গিয়ে খোঁজ নিলাম—কি উপায়ে সহরটা চট করে দেখে আসা যায়। ওঁরা জানালেন তখনই একটা ট্যুরিস্ট বাস ছাড়বে—দু'ঘণ্টা ঘুরিয়ে আনবে। লাগবে মাত্র ১২ শিলিং অর্থাৎ দু' টাকা দশ আনার মত। তখুনি একটা টিকিট কিনে ট্যুরিস্ট বাসে গিয়ে উঠলাম।

ওয়েস্ট বানহফ স্টেশন থেকে বাস ছেড়ে চললো—ম্যারিয়া-হিলফের স্ট্রাসে ধরে বুর্গরিং, ডক্টর লুয়েসার রিং, অপেরা রিং প্রভৃতি কয়েকটি রাস্তা দিয়ে। এই রাস্তাগুলোর নাম রিং এইজন্যে যে, এগুলো পর পর জোড়া লেগে ভিয়েনা সহরের কেন্দ্রটাকে বেড় দিয়ে রেখেছে। রাস্তায় যেতে যেতে বাসের গাইড রাস্তাগুলোর নাম আর দু'পাশের যা কিছু দ্রষ্টব্য দেখিয়ে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে যেতে

লাগলো। যাবার পথে প্রথমেই দেখলাম ভিয়েনার জগৎ-বিখ্যাত অপেরা হাউস, একটা দিক বোমায় বিধ্বস্ত। আজও ভারাবাঁধা অবস্থায় রয়েছে দেখে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। ভিয়েনা সহরে পথের দু'ধারে ছোট বড় সব বাড়িতেই বিগত যুদ্ধের গোলা-গুলির চিহ্ন এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া দেখলাম আর্ট হিস্ট্রী মিউজিয়াম আর ন্যাচারাল হিস্ট্রী মিউজিয়মের প্রাসাদ দুটি, পার্লামেণ্ট ও রাঠ হাউস পার্ক ইত্যাদি। ভিয়েনার সবচেয়ে বিখ্যাত দ্রষ্টব্য সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রালও দেখলাম। গথিক স্থাপত্যের এত সুন্দর ও বিচিত্র নিদর্শন গোটা ইউরোপে নেই। গির্জাটির ছাদে রঙীন টালি সাজিয়ে অপরূপ রূপ দেওয়া হয়েছে। গির্জার ভিতরেও অপূর্ব সব কারুকার্য ও খোদাই করা মূর্তি এবং ছবি দিয়ে সাজানো।

তাড়াহুড়ো করে দ্রষ্টব্যগুলো দেখে—সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ আবার স্টেশনে ফিরে এলাম। দেখলাম, আমাদের দলের অনেকেই তখন ভ্যাবা গঙ্গারামের মতন স্টেশনের বেঞ্চিগুলো জোড়া করে বসে আছে। বড় বড় চাঁইদের পাত্তা নেই। কানাঘুষায় শুনলাম, রাত্তির হলে—গা ঢাকা দিয়ে ভিয়েনার সোভিয়েট এলাকায় ঢুকতে হবে, সেখানেই রুমানিয়া বিশ্ব-যুব সম্মেলনের বড় ঘাঁটি [illegible], তারাই আমাদের রুমানিয়া আর হাঙ্গারীর ভিসা ইত্যা[illegible]রে দিয়ে পরের দিন আমাদের বুখারেস্ট যাত্রার ব্যবস্থা করবেন।

বুঝলাম ব্যাপার বেগতিক! ওঁদের ভরস থাকলে রাত্রের খাওয়াও জুটবে না, কাজেই চট করে গা-ঢাকা দি[illegible] সতগুলি ক্ষুধার্ত সঙ্গীকে ফেলে রেখে রেস্তোরাঁয় গিয়ে নেহা[illegible] ছোটলোকের মত একলাটি খেতে হলো। উপায় কি! রেস্তে[illegible] সকলকে ডেকে খাওয়ানো তো চাট্টিখানি কথা নয়! ওদের পরামর্শ দিলাম, গাঁটের কড়ি ভাঙিয়ে কিছু শিলিং খরচ করে খেয়ে এসো। অনেকেই জানালে সঙ্গে বিশেষ তেমন রেস্ত নেই। অনেকের থাকলেও ভাঙাবার ইচ্ছা নেই! ভরসা ওঁদের দলের নেতারাই খাওয়াবেন।

রাত ন'টা নাগাদ দলের ছোটবড় নেতারা এক-একটি করে আবির্ভূত হতে লাগলেন। দশটার সময় হুকুম এলো হাঁটো।

ঘাটনেকার ভায়া পথ দেখিয়ে চললেন। চলেছি তো চলেইছি। কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, এসব কথা কেউ কাউকে বলছেও না, জিজ্ঞেসও করছে না। সবাই কিন্তু মনে মনে গজরাচ্ছে। বোঝা গেল, ঘাটনেকার ভায়া কমরেড্দের আড্ডায় যাওয়ার পথটি গুলিয়ে ফেলেছেন। অথচ কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হচ্ছে না। মাইল তিনেক চোরের মত হাঁটবার পর একটা রাস্তার মোড়ে ওখানকার একদল যুবকের সঙ্গে আমাদের নেতারা জুটলেন, কি সব কথাবার্তা হলো। তারপর তাঁদেরই মধ্যে একজন পথপ্রদর্শক হলেন। তাঁকে অনুসরণ করে আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেনে চড়লাম। গোটা দুই তিন স্টেশন পার হয়ে আমরা আবার রাস্তার ওপরে উঠে ডোনাউ-এ (ডানিয়ুব) খালের পুল পেরুলাম। সঙ্গীটি তখন আমাদের নিঝুম থমথমে একটা রাস্তা দিয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চললেন। পথে রাশিয়ান সৈনিকদের ঘোরাফেরা করতে দেখেই বুঝলাম—আমরা ভিয়েনার সোভিয়েট এলাকায় পৌঁছেছি। রাত বারোটায় 'টেবর স্ট্রাসে' রাস্তায় 'হোটেল স্টিফানি'-তে পৌঁছলাম।

হোটেলের ভেতরে বাইরে কোথাও লোকজন বড় একটা দেখতে পেলাম না। ম্যানেজারের ঘরের বাইরে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে —ভিয়েনার পথপ্রদর্শক কমরেডটি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন, তারপর আমাদেরও ভিতরে ডাক পড়লো। হোটেলের ম্যানেজারের সহকারী একে একে আমাদের পাশপোর্টের ফটোর সঙ্গে চেহারা-গুলো আড়চোখে মিলিয়ে নিয়ে, পাশপোর্টগুলি নিয়ে নিলেন, তার বদলে হাতে দিলেন ঘরের নম্বর লেখা চাক্তি-সমেত একটি করে চাবিকাঠি। কোনও কোনও চাবিকাঠির মালিকের ভাগ্যে জুটলো, একার জন্য—একক শয্যা এবং একক কামরা। কারুর বরাতে একঘরে জুড়িদার সহ জোড়া-বিছানা। বারো নম্বর কামরায় আমার সঙ্গে ভাগীদার হলেন সুপরিচিত ভলিবল খেলোয়াড় সুনীল চাটুজ্যে। বুখারেস্টের পথে এই ক'দিনেই ওর সঙ্গে পরিচয়টা মোটামুটি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, কারণ সুনীলভায়া খেলোয়াড়, তার উপর যেমন বিনয়ী, তেমনই ভদ্র। এর আগে উনি বিশ্ব অলিম্পিকে

যোগ দিতে হেলসিঙ্কি গেছলেন, সে সময় ইউরোপের কিছু দেশও ঘুরে এসেছেন। নিজের এবং অপরের মর্যাদা রেখে চলতে জানেন। ওকে আমার কামরায় সঙ্গী পেয়ে খুবই খুশী হলাম।

চাবি হাতে পেয়েই নেতারা সুটসাট যে যাঁর কামরায় বোধহয় সট্‌কে পড়লেন, কাজেই তাঁদের কাউকেই কাছেপিঠে দেখতে পেলাম না। সঙ্গীরা সারাদিন আধপেটা খেয়ে উপোসী, মুখ শুকিয়ে আমসী। হোটেলের লাউঞ্জে গিয়ে সবাই বসে পড়েছে, খাওয়ার ডাক পড়বে এই আশায়। আমি রগড় দেখতে সেদিকে পা বাড়ালাম। এ এসে বলে—কি খেলেন? ও এসে জিজ্ঞেস করে—মিঃ ঘোষ খাওয়ার ব্যবস্থাটা কোথায় জানেন?

ওঁদের ভেতরে যারা উদ্যোগী পুরুষ তারা চব্যচষ্যের সন্ধানে এধার ওধার ছুটলেন কিন্তু চিবোবার মতো বিশেষ কিছু জুটলো না। কাজেই দলের নেতাদের মুণ্ডু চিবোতে চিবোতে লাউঞ্জে ফিরে এসে জটলা লাগালেন। কমরেড্‌দের মুখ রীতিমত বেশ রেড্ (Red) হয়ে উঠলো। হট্টগোল বেড়ে উঠলো। দু'চারজন কমরেড্ যাঁদের সঙ্গে এরই মধ্যে আমার পরিচয়টা একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তাদের কাছে গিয়ে কানে কানে বললাম, "অশান্তি আর অপ্রীতির উত্তেজনায় ক্ষিধেটা বাড়বে বৈ কমবে না। অতএব তোমাদের 'শান্তি ঔর দোস্তী' শ্লোগ্যানটি স্মরণ ক'রে—যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। ভুখ্ থাকলেও ভুখা মিছিল বার করবার পক্ষে স্থান এবং কালটা উপযুক্ত নয়।" ঠিক তেমন সময় হোটেলের একজন স্টুয়ার্ড এসে গম্ভীর গলায় বললেন—"জেণ্টলমেন্ প্লিজ প্রসিড্ টু ইওর রেস্‌পেক্‌টিভ রুমস্" অর্থাৎ ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা আপনাদের স্ব স্ব কামরায় গমন করুন। অনুরোধটা আদেশের মতই শোনালো। তিনিই বলে দিলেন কোন্ তলায় কার কামরা।

সুনীলকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলের চারতলার—বারো নম্বর কামরায় ঢুকলাম। দরজা বন্ধ করে জামা জুতো খুলে হাতমুখ ধুয়ে—এক গ্লাস জল খেয়ে সেরেফ আণ্ডারউইয়ার পরেই কম্বলের তলায় ঢুকে পড়লাম। উপায় কি স্লিপিং স্যুট ইত্যাদি সবই তো

জুরিখ হ্রদের ধারে বিহার-বীথি
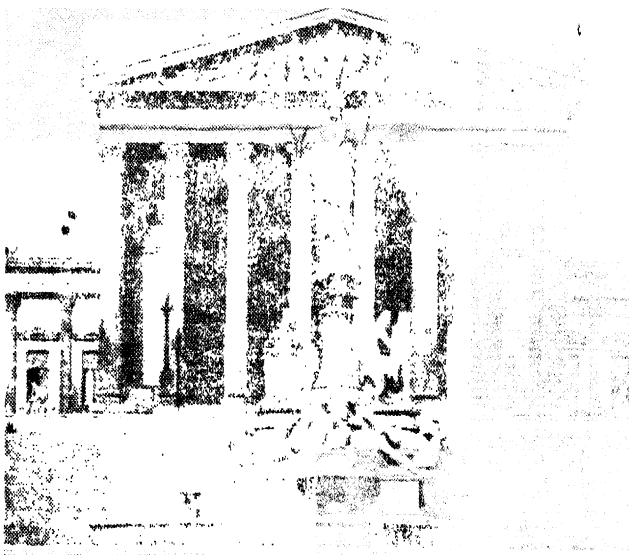
ভিয়েনার রাট হাউস বা পার্লামেন্ট
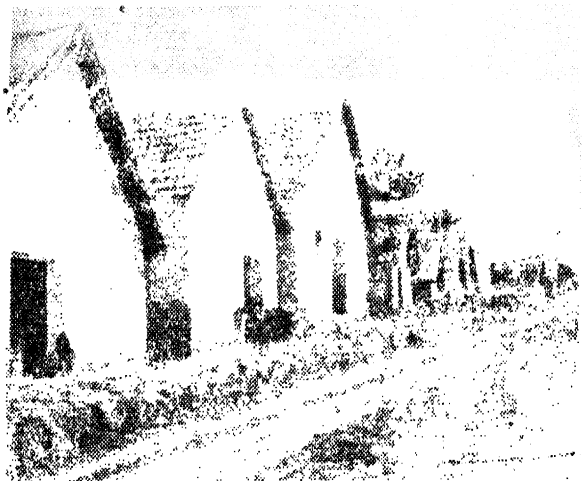
স্টেশনের লাগেজরুমে সুটকেসে পুরে রেখে এসেছি। সুনীল ভায়া খেলোয়াড় মানুষ—ঢক্ ঢক্ করে চার পাঁচ গেলাস জল খেয়ে নিলে। আমি তো অবাক! "ব্যাপার কিহে?"

সুনীল হেসে বললে—"খালিপেটে ঘুম হবে না, তাই পেটটা ভরিয়ে নিলাম দাদা।"

পরের দিন অর্থাৎ ২৫শে জুলাই সকালে ঘুম ভাঙলো যখন দেখি ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বেজেছে। সুনীলভায়া তখনও ঘুমুচ্ছে, তাড়াতাড়ি ওকে ঠেলে তুললাম। বললাম, "ওঠো হে! দেরি করলে আবার ব্রেকফাস্টটাও ফস্কে যেতে পারে।" জামাজুতো পরে নীচে গিয়ে শুনলাম, বাইরে বাগানে ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা হচ্ছে। সেখানে গিয়ে দেখি, দলের অগ্রণীরা অনেকে অগ্রেই ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে, হাঙ্গারীর আর রুমানিয়ার ভিসা ফর্ম ব্যগ্রহস্তে বিতরণ করছেন আর দেদার তাড়া লাগাচ্ছেন সকলকে ওটা তাড়াতাড়ি পূরণ করে দেওয়ার জন্যে। হাঙ্গারীর ভিসার তাড়া ওঁদের থাকলেও হাঙ্গারের তাড়নাটাই অন্য সকলের বেশী, তাই আগের দিনের উপোসের চোটে ব্রেকফাস্ট টেবিলের রোল (একরকম পাউরুটি) নিয়ে কলরোল শুরু হয়ে গেছে। জ্যাম, মাখন রোল আর কফি, যে যতটা হাতাতে পারলে—তাই দিয়ে ব্রেকফাস্টটা সারলে। তারপর আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে ফেস্টিভ্যাল কমিটির অফিসে গিয়ে যে যার সই করা ফর্ম জমা দিলাম।

রুমানিয়া আর হাঙ্গারীর ভিসা করাতে তিনটি তিনটি করে ছ'টি ফটোগ্রাফ দরকার হবে এটা ওখানকার ফেস্টিভ্যাল কমিটির কর্তারা জানালেন। তখন অনেকেরই মাথায় বাজ পড়ল। কারণ, বাড়তি ফটোগ্রাফ বড় কেউই তাঁরা সঙ্গে আনেন নি। যাঁদের ফটো ছিল না, তাঁরা তোলাতে ছুটলেন। সুনীল আর আমার সঙ্গে প্রয়োজনমত ফটো ছিল, আমরা ফটো এবং ফর্ম জমা দিয়ে ভিয়েনা শহরের রুশ এলাকা ঘুরতে গেলাম। পথেঘাটে অনেক রুশ পুলিশ ও সৈনিক দেখলাম।

একটা ট্যাক্সী নিয়ে ঘুরে দু'জনে কয়েকটা জিনিসপত্র কিনে, সেলুনে দাড়ি কামিয়ে ফিরে এলাম ফেস্টিভ্যাল আফিসে বেলা একটা

নাগাদ। ফটো তোলাতে গেছলেন যাঁরা—তাঁদের ফটো তখনও এসে পেঁছয়নি বলে বাকি আর সকলেরই ভিসার আবেদন আটকা পড়ে রয়েছে। যাক্ ফেস্টিভ্যাল কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হলো, ফটো এলে ও'রাই ভিসা করিয়ে আনবেন—আমাদের তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। তারপর ও'দের পক্ষ থেকে একজন আমাদের সবাইকে নিয়ে গেলেন—একটা রেস্তোরাঁতে। সেখানে স্যুপ, ভাত, মাংস এবং যাঁরা নিরামিষাশী তাঁরা ভাত ও টমাটো আলুসেদ্ধ খেয়ে জঠরজ্বালা জুড়োলেন। বেলা তখন প্রায় তিনটে।

খাবার পর ফেস্টিভ্যাল আফিসে ফেরার পথে—আমাদের পথ-প্রদর্শক নিয়ে গেলেন—'Stalindenkmadt (স্ট্যালিন পার্ক)—সোভিয়েট অধিকৃত ভিয়েনায় সোভিয়েট বীরদের বীরত্বের স্মৃতি-স্তম্ভ ও স্মৃতি-মন্দির দেখাতে। এটি দেখে সঙ্গীরা যেন তীর্থ-দর্শনের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আমার কিন্তু মনে হলো, বিরাট ও বিপুল অর্থব্যয় করে এই স্মৃতি-স্তম্ভের পাথরগুলো বর্বর যুগের সাম্রাজ্যবাদীদের বিজয়স্তম্ভের মত চাপানো হয়েছে পরাজিত অস্ট্রিয়ান জাতির বুকে। কারণ, তারই পাশে ঐ অঞ্চলের বহু বিরাট প্রাসাদ ও বাড়িগুলি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে গত মহা-যুদ্ধের ধ্বংসলীলার ক্ষতবিক্ষত অবস্থা নিয়ে। দেখলাম, সোভিয়েট স্মৃতি-স্তম্ভের জাঁকজমকের চারিপাশে জানালা কপাট-হীন বাড়িতে—অধিকৃত ভিয়েনার বহু মানুষ কুকুর বেড়ালের মত আস্তানা নিয়ে রয়েছে। সাম্যবাদ ও যুদ্ধশান্তির আদর্শ যাঁরা জোর-গলায় প্রচার করেন, তাঁরা আদিমযুগের সাম্রাজ্যবাদীদের মতো অন্য এক জাতির বুকে অন্য এক জাতির দেশে আপন জাতির সৈনিকদের যুদ্ধ-কীর্তিকে এমন জোর করে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৎপর কেন? এই প্রশ্নটাই আমাকে ভাবিয়ে তুললে। আমাদের দেশে যাঁরা বিদেশীদের কীর্তি-স্তম্ভগুলি অপসারিত করা হচ্ছে না বলে আন্দোলন করেন, তাঁদেরই মত ও পথের প্রতিনিধিরা আধমরা অস্ট্রিয়ার বুকে সোভিয়েট কীর্তি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা দেখে গদগদ হয়ে ওঠেন কোন্ মনোভাব থেকে সেটা বোঝা খুব শক্ত হলো না।

যাই হোক্ ওখান থেকে ফিরে ফেস্টিভ্যাল আফিসে পেঁছলাম

বেলা চারটা নাগাদ। হাঙ্গারী ও রুমানিয়ার ভিসা পেয়ে গেলাম, আমরা সবাই। তবে অন্যান্য দেশের 'ভিসা'র ছাপ যেমন পাসপোর্টের ভিতরের পাতাতেই দিয়ে দেওয়া হয়, কমিউনিস্ট দেশ-গুলির ভিসা তেমনভাবে না দিয়ে আমাদের আলগা কাগজেই দেওয়া হলো। এর ভিতরকার কারণটা হলো এই যে, বিদেশের বহু প্রতিনিধির পাসপোর্টে ঐ সমস্ত দেশে যাওয়ার এনডর্সমেণ্ট বা অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও ওসব দেশে ঢোকাতে হবে। আমাদের দলের মাত্র দু'তিনজনের পাসপোর্টে ইউরোপের সমস্ত দেশে যাওয়ার অনুমতি ছিল, বাকি সকলেরই ঐ অনুমতিটি ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈদেশিক সম্পর্ক ও নীতির নিয়ম লঙ্ঘন করে ভিসা দেওয়ার জন্য এই কৌশলটি অবলম্বন করা হলো যে তা বুঝলাম। অর্থাৎ, এ ব্যবস্থাটি অবলম্বন করায়, পাসপোর্টে ভিসার ছাপ না থাকায়, বিভিন্ন দেশের সরকার, তাঁদের বিনা অনুমতিতেই যাঁরা ওসব দেশে ঘুরে এলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত নজির বা প্রমাণ খাড়া করতে পারবেন না বলেই মনে হয়।

তারপর শোনা গেল, অস্ট্রিয়ার সোভিয়েট রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল দিয়ে বাসে চাপিয়ে আমাদের অস্ট্রিয়ার সীমান্ত পার করে হাঙ্গারীর সীমান্তের 'হেগায়াশালোম' বলে একটি স্টেশনে পেঁছে দেওয়া হবে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে আমরা হাঙ্গারীর ভিতর দিয়ে রুমানিয়ায় পেঁছবো। দলের নেতারা স্টেশনের লাগেজরুম থেকে আমাদের সকলের মালপত্র নিয়ে এলেন। যে যার মালপত্তর মিলিয়ে ট্রেলরে তুলে দিলাম। তারপর বিরাট একটা বাসে আমাদের দলের ৩৮ জন আর সেই সঙ্গে অন্যান্য দেশের দশবারোজন চেপে বসলাম। বিদেশী সঙ্গীদের মধ্যে ভেনিজুয়েলার জে ক্যামিনো বলে একটি তরুণ ও পশ্চিম জার্মানীর একজন সাংবাদিক, কোনও একটি পত্রিকার প্রতিনিধি হের ভেরনারের সঙ্গে বাসেই আলাপ হলো। ভেরনারের সঙ্গে ক্যামেরাও রয়েছে দেখলাম।

বেলা পাঁচটায় ভিয়েনা থেকে বাস ছাড়লো, পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যেই শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গ্রাম ও চাষের ক্ষেতের মাঝখানের পাকা রাস্তা দিয়ে বাস ছুটে চললো। ঘণ্টাখানেক পরেই অস্ট্রিয়ার

সীমান্ত হায়েনবুর্গে এসে বাস দাঁড়ালো। ওখানে মাঠের মাঝখানে সীমান্ত ঘাঁটি। রাস্তার নিশানা-বোর্ড দেখে বুঝলাম, এই সীমান্ত ঘাটির বাঁদিকের পথ ধরে মাইল তিনেক গেলেই চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্ত ব্রাতিশ্লাভা। ডানদিকের রাস্তা গেয়ে হেগেশালোম। তাই এই সীমান্ত ঘাটির সামনে রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারীর সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। পুলিশ ও কাস্টমসের লোকরা পাসপোর্ট ও মালপত্র তদারক করে গেলেন। ডানধারের পথ ধরে আমাদের বাস হাঙ্গারীর গাঁয়ের পথে ছুটে চললো

ভেরনারের সঙ্গে ভাব জমে উঠেছে, ও খুব ভাল ইংরেজী বলতে না পারলেও মোটামুটি চলনসই গল্প চলছে। আমাদের বাসও চলেছে হাঙ্গারীর গ্রামের পথ ধ'রে। রাস্তার দু'ধারে ক্ষেত, খামার আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম—চাষীদের ঘরবাড়ি। সর্বত্র রাস্তাটা খুব চওড়া এবং বাঁধানো যে তা নয়, আমাদের দেশের মফঃস্বলের রাস্তার মতই গাঁয়ের বুক চিরে---দু'ধারে গ্রাম রেখে চলেছে। কাজেই হাঙ্গারীর গ্রামের অবস্থাটা চোখে পড়ল।

দেখলাম, হাঙ্গারীর সাধারণ গেরস্থদের ঘরবাড়ি আমাদের দেশের গ্রামের ঘরবাড়ির মত দুর্দশাগ্রস্ত, মলিন, ছোটখাটো। আমাদের গ্রামে মোটর বা বাসের শব্দ পেলে যেমন ছেলে বুড়ো গ্রামবাসী ঘর থেকে রাস্তার ধারে ছুটে আসে, ওদেশেও তার ব্যাতিক্রম নেই।

ঘর থেকে ছুটে-আসা, পথের ধারে ভিড়-করা গ্রামবাসীদের সহজ ও স্বাভাবিক রূপটাও তাই নজর এড়ালো না। দেখলাম, মেয়েরা নোংরা ছেঁড়া পোশাক পরে রয়েছে, ছেলেবুড়ো অনেকেরই গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো বড় কারো দেখলাম না। আমার পাশে জানালার ধারে জার্মান-সাংবাদিক ভেরনর বসেছিলেন। মাঝে মাঝে উনি বাসের জানালা দিয়ে ক্যামেরায় ছবি নিচ্ছিলেন। ভরসা পেয়ে ওঁকে বললাম, "কমিউনিস্ট দেশে সব মানুষের সকল দুঃখ কষ্ট ঘুচে গেছে এমনটাই তো শুনেছি তবে ওদের এ অবস্থা কেন ? ভেরনার হেসে বললেন—"শুধু দেখে যান।"

হাতের ক্যামেরাটা দেখিয়ে বললেন, "কথাটি না ক'য়ে কাজ করে যান।" আমি বললাম, "দু'জনে কাজ করে কাজ নেই। আপনার

ফসলের ভাগ দেবেন।" ভেরনর হেসে বললেন, "খুশী হয়ে দেব, যদি নিরাপদে ফসল ঘরে তুলতে পারি।" (এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ক'মাস পরে ইউরোপ ঘুরে ফিরে এসে দেখি কি ভেরনার তাঁর ফসলের ভাগ বহু ফটো পাঠিয়ে দিয়েছে।)

যাক, গল্প করতে করতে আর তারই ফাঁকে ছবি তুলতে তুলতে—আমরা সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ হেগেয়াশালোম গ্রামের ভিতর দিয়ে—রেল স্টেশনে পেঁছে গেলাম। ছোট্ট স্টেশনটি, স্টেশনের সামনে বাস এসে দাঁড়ালো। হুকুম হ'লো—যতক্ষণ না আমাদের নামতে বলা হয়, ততক্ষণ আমরা যেন কেউ আসন ত্যাগ না করি।

দিনের আলো তখনো রয়েছে, তবে পড়ন্ত রোদের ঘুমন্ত চোখ ধীরে ধীরে জুড়ে আসছে। কিন্তু স্টেশনের বাইরে কাছে দূরে চারপাশে জেগে রয়েছে খাড়া সেপাইদের জোড়া জোড়া চোখ। দু' জাতের, দু' ধাঁচের পোশাক আর ইউনিফর্ম পরা সেপাই-সৈনিক ঘোরাফেরা করছে। একদল সেপাইয়ের লাল পোশাক, লাল টুপি। যেমন ঝক্‌ঝকে, তেমনি জাঁদরেল তাদের চেহারা। ওদের তুলনায় আর একদলের পোশাক এবং চেহারা দুই-ই নিরেশ।

কমরেড্‌রা লাল পোশাক, লাল টুপিধারী সেপাইদের চেহারা আর পোশাকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো। একজন অতি উৎসাহী কমরেড পিছনের আসন থেকে বললে, "সোভিয়েট সোলজার-গুলোর পোশাক আর চেহারাটা দেখছেন বিমলদা?" হেসে বললাম —"দেখছি বৈ কি! হাঙ্গারীর সোলজারদের সাজ-পোশাক আর চেহারাগুলোও সেই সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছি, সত্যি কী অদ্ভুত তফাৎ!" কমরেডটি ভারী খুশী। আমার জবাবের গূঢ় মর্মার্থ মস্তিষ্কগত করতে না পেরে বললেন, "দেশে ফিরে এটা লিখবেন দাদা।"—"নিশ্চয়ই!"

মিনিট পনের কুড়ি বাসের ভিতর বসে থাকার পর, এক ভদ্র-লোককে সঙ্গে নিয়ে একটি মহিলা আমাদের বাসের ভিতরে উঠে এলেন। ভদ্রলোক হাঙ্গারীয় ভাষায় দু' চার কথা বললেন, ভদ্রমহিলা তার ইংরেজী তর্জমা করে দিলেন। তখন বুঝলাম ব্যাপারটা! ভদ্রলোক হেগেয়াশালোম ফেস্টিভ্যাল কমিটির প্রধান হিসাবে ছোট

একটি বক্তৃতায় আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন যে, স্টেশনে আমাদের সামান্য আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছে, সে রাতটা ঐ গ্রামে কাটাতে হবে, পরের দিন ভোরে ও'রা আমাদের বুদাপেস্টের পথে রওনা ক'রে দেবেন। তাঁর বক্তৃতার পর ভারতের প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে পানজোয়ানী সাহেব পাল্টা ধন্যবাদ জানালেন। রেওয়াজ অনুযায়ী "শান্তি ঔর দোস্তী"—"পিস এণ্ড ফ্রেণ্ডশিপ" আওয়াজ তুললেন বন্ধুরা। অফিসারদের হাতে পাসপোর্ট ও ভিসা জমা দিয়ে বাস থেকে নামবার অনুরোধ জানালেন ভদ্রমহিলা। আমাদের সঙ্গে ভিয়েনা থেকে যিনি পথপ্রদর্শক হয়ে এ পর্যন্ত এসেছিলেন—তাঁর সঙ্গে করমর্দন ক'রে ধন্যবাদ জানিয়ে পাসপোর্ট ও ভিসা জমা দিয়ে বাস থেকে নামলাম।

বাস থেকে নামতেই চারধারে নজরে পড়লো অসংখ্য গ্রামবাসী দূর থেকে আমাদের দেখছে, তবে কড়া সেপাইদের বেড়া ডিঙিয়ে বড় কেউ আমাদের ধারে কাছে ঘেঁসতে সাহস পাচ্ছে না যে সেটা তাদের রকম-সকম দেখেই ঠাওর পেলাম। স্টেশনের ভিতরে ঢুকে প্রথমে একটা বড় গুদামঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। জানান হ'লো—ওখানেই আমাদের মালপত্র আসছে, সেগুলি মিলিয়ে নেওয়ার জন্য যেন অপেক্ষা করি এবং হাতমুখ ধোওয়ার কাজটাও যেন সেরে নিই। সকলের মালপত্তর মিলিয়ে নেওয়া, হাতমুখ ধোওয়া, পোশাক বদলানোর কার্য ইত্যাদি সারতে সারতেই অনেকটা সময় লাগলো। আমি আমার কাজ সেরে স্টেশনের এ মুড়ো ও মুড়ো পায়চারি করতে লাগলাম। ছোট্ট স্টেশন, প্ল্যাটফরমের বালাই নেই, তবে বিশ্বযুব উৎসব উপলক্ষে সারা স্টেশনটাকে রকমারী পতাকায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তার মাঝখানে রয়েছে স্তালিন, লেনিন আর হাঙ্গারীর প্রধানমন্ত্রী রাকোসীর মস্ত মস্ত ছবি। বাইরের চেয়ে অনেক বেশী সোভিয়েট সোলজার স্টেশনের ভিতরে ঘোরাফেরা করছে। স্টেশনের 'বার' বা পানালয়ে তাঁদের কেউ কেউ মদ্যপান করছে।

পায়চারি করছি, এমন সময় ভেরনার এসে চাপা গলায় বললে, "ঘোষ! একটা মজা দেখবে এসো।" কী ব্যাপার! গিয়ে দেখি, স্টেশনের বাইরের জনতার ভিতর যাদের পোশাক পরিচ্ছদ মোটামুটি

ভালো ও পরিষ্কার, তেমন কিছু কিছু মেয়েপুরুষকে স্টেশনের ভিতরে আসবার জন্য ডেকে নেওয়া হচ্ছে, তবে ছেলেছোকরাগুলো কিছু কিছু ফাঁক ফোঁক গ'লে আড়াল-আবডাল দিয়ে স্টেশনের পিছন দিকটায় এক পাশে জড়ো হয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এ রগড়টা দেখতে ভরসা হলো না। ওখান থেকে স'রে এসে হাঙ্গারীয় পথপ্রদর্শিকার সঙ্গে আলাপ জমালাম। পরিচয়ে জানলাম, ও'র নাম মিসেস ইভা রোনা, বুদাপেস্টে কোনও এক ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী, ইংরেজী এবং ফরাসী বলতে পারেন। তাই ক'দিনের জন্যে এই সীমান্ত স্টেশনে—বিশ্বযুব সম্মেলনের অতিথি অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায় দোভাষীর কাজে ও'কে পাঠানো হয়েছে এবং ও'র মত আরও কয়েকজন, যাঁরা ইতালীয়ান, জার্মান, স্প্যানিশ ইত্যাদি ভাষা বলতে পারেন, তাঁদেরও এখানে এনে রাখা হয়েছে। ও'র সহকারিনী এলিজাবেথ হাজ্‌ডুর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলেন। ইভার বয়স প্রায় চল্লিশ, এলিজাবেথের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। দু'জনেই সুন্দর ইংরেজী বলতে পারেন। ও'রা আমাদের সকলকে স্টেশনের শেষ প্রান্তের বড় একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

ঘরের মধ্যে বড় একটা টেবিলের দু' পাশে চেয়ার সাজিয়ে প্রায় ষাট জনের মত বসবার জায়গা করা ও টেবিলে সাজানো রয়েছে এক একজনের জন্যে গোটা আস্টেক ক'রে ছোট ছোট একরকম পাউরুটি, চিজ্‌, সালামী (সসেজ জাতীয় মোটা এবং বড় মাংসপিণ্ডের থেকে কাটা পাতলা পাতলা কয়েকটা চাকতি), টমাটো, প্যাপরিকা (বেগুনের মত বড় বড় লঙ্কা) আর মস্ত এক এক বোতল করে মিনারেল ওয়াটার। বিদেশের আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য যে দেশে ভোজের এই ব্যবস্থা—সে দেশের খাদ্যের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হয় কি? যাক রাত আটটায় কফি, পাউরুটি, চীজ্‌, টমাটো আর লঙ্কা দিয়েই ডিনার সারতে হ'লো। উগ্র গন্ধের চোটে সালামীটা বড় কেউ মুখে দিতে পারলে না। দেখলাম ঘরের বাইরে জানালার ধারেই কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, কয়েকজনের গলায় লাল কাপড়ের টুক্‌রো; বুঝলাম, এরাই কমিউনিষ্ট দেশের পাইওনীয়ার। দেখলাম, তারা লোলুপ দৃষ্টিতে আমাদের খাবারগুলোর দিকে তাকাচ্ছে।

ভাবলাম, আমাদের বাড়তি খাবারগুলো ওদের বিলিয়ে দিলে কেমন হয়! দু' খানার বেশী রুটি, সামান্য চীজ্ ও দু' পেয়ালা কফি ছাড়া আমরা কিছুই খেতে পারিনি। এছাড়া আমার সামনে অনেকের ভাগের বাড়তি রুটি" সালামী, টমাটো আর প্যাপরিকাগুলো ছিল, হাত বাড়িয়ে সেগুলো ওদের দিকে তুলে ধরতেই একেবারে চিল ছোঁ মারামারি! কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, দেখলাম, বয়স্ক লোকরা আবার গায়ের জোরে বাচ্চাদের কাছ থেকে সেগুলোতে ভাগ বসাতে কসুর করলে না। জানালার ধারে আমার কাছাকাছি, সুহৃৎ ভায়া, শান্তি পাল প্রভৃতি বন্ধুরা ছিলেন, তাঁরাও অনেকেই সেদিন আমার মতোই ছোট ছোট ছেলেদের দিকে বাড়তি খাবারগুলো এগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা সেকথা আজ স্বীকার করবেন কিনা জানি না। কমিউনিষ্ট হাঙ্গারীর খাদ্যের প্রাচুর্যপরিচয়টা এভাবে দেখতে না পেলেই খুশী হতাম।

পেটের খোরাকে ফাঁক পড়লেও—ফুর্তির খোরাকে যাতে ফাঁক না পড়ে, তাই ঐ ঘরে হাঙ্গারীর দশ বারোটি যুবক-যুবতীকে বেশ জমকালো টুপি আর রঙীন নক্সাকরা জাতীয় পোশাকে সাজিয়ে হাজির করা হলো। জানানো হলো, নাচ হবে। ঘরের ভিতর ও আশে-পাশে তখন বেশ ভিড় জমে গেছে। যে ক'টি ছেলেমেয়ে নাচতে এলো, তাদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য কিন্তু সত্যিই দেখবার মত। ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে নাচ হ'লো, হাঙ্গারীর ছেলেরা আমাদের দলের দু'টি মেয়েকে এবং মেয়েরা আমাদের দলের ছেলেবুড়ো সবাইকে ধ'রে টেনে নিয়ে নাচিয়ে তবে ছাড়লো। এমন কি, বার বার নাচবার অক্ষমতা জানানো সত্ত্বেও আমাকেও রেহাই দিলে না। আমাদের দলের ছেলেরা তরুণ এম এল এ সুহৃৎ মল্লিক চৌধুরীর নেতৃত্বে নজরুলের 'চল চল' গানটা কোরাসে গেয়ে ওদেরও খুশী করে দিলে।

নাচ-গান শেষ হবার পর, রাত এগারোটা নাগাদ স্টেশন থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'লো গ্রামের অন্ধকার পথ দিয়ে একটা স্কুল-বাড়িতে। স্টেশনের অত কাছে—গ্রামের পথেও কোনওরকম আলোর ব্যবস্থা নেই দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। গ্রামের স্কুলটাও সাধারণ একতলা বাড়ি। সেখানে কয়েকটা ঘরে সারি সারি

খাটিয়া বিছিয়ে শোবার জায়গা করা হ'য়েছে বুখারেস্ট-পথ-যাত্রী মুশাফিরদের জন্য। বাথরুম ও পায়খানার দুর্দশা দেখে বোঝা গেল অনেক যাত্রীই সেখানে রাত্রি কাটিয়ে গেছেন, এর আগে। সারাদিন শ্রান্তির পর বিছানা পেয়ে পোশাক বদলে সবাই গড়াগড় শুয়ে পড়লাম। জানানো হয়েছে—ভোর পাঁচটায় তৈরী হয়ে স্টেশনে যেতে যেতে হবে।

মিসেস ইভা রোনা পরদিন ভোর সাড়ে চারটায় এসে জাগালেন। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে পোশাক চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম সবাই তাঁর সঙ্গে। গ্রামের পথ তখনও খালি। স্টেশনে আমাদের পাসপোর্টের সঙ্গে প্রত্যেককে বুখারেস্টে যাওয়ার একটি ক'রে টিকিট দিয়ে জানানো হ'লো—পথখরচের জন্য ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে হাঙ্গারীর মুদ্রা নিতে পারি। আমি এক পাউন্ড ভাঙিয়ে বত্রিশ ফোরিণ্ট পেলাম।

হেগেয়াশালোম থেকে ট্রেন ছাড়লো সাড়ে পাঁচটায়। গাড়ি ও ইঞ্জিনের দশা আমাদের দেশের মতই। কাঠের বেঞ্চি, নোংরা, গদির বালাই নেই। গোটাতিনেক স্টেশন পার হয়ে বুদাপেস্টে পৌঁছলাম বেলা আটটায়। স্টেশনটা বেশ পুরানো আর বড়ো, তবে স্তালিন, লেনিন, রাকোসীর পেল্লায় পেল্লায় ছবি আর নতুন রঙচঙে পতাকা দিয়ে মুড়ে তার দৈন্য ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে। বুদাপেস্ট স্টেশনে গাড়ি থামতেই একদল যুবক-যুবতী ব্যান্ড বাজিয়ে গান গেয়ে, ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের নামিয়ে নিলে—মালপত্রও ওরাই নামালে। প্ল্যাটফরমের বাইরে স্টেশনের চত্বরে নিয়ে গিয়ে আমাদের ব্রেকফাস্ট খাওয়ানো হ'লো সেই মামুলি পাউরুটি, মাখন ও কফি। সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হ'লো এক এক বোতল মিনারেল ওয়াটার আর দুপুরের খাবার, লাঞ্চ-প্যাকেটের মস্ত ঠোঙায় ভরে আবার ঐ একই ফিরিস্তির খাবার, তবে বাড়তির মধ্যে ছিল—এক টুকরো সিদ্ধ মাংস, আর দুটো আপেল।

সাড়ে ন'টায় নতুন ট্রেনে সওয়ার হয়ে বুদাপেস্ট ছাড়লাম। ঐ ট্রেনের অন্যান্য কামরায় ইউরোপের ভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরাও চলেছেন দেখলাম। ভেরনার কোথায় গা-ঢাকা দিলে খুঁজে পেলাম না, সুনীলভায়াকে আমার কামরায় ডেকে নিলাম। বুদাপেস্ট ছাড়বার

পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে হাঙগারীর উত্তর দিকের পাহাড়গুলোর পাদদেশ বেয়ে গাড়ি ছুটলো—তারপর দু'ধারে চাষের ক্ষেত আর গ্রাম রেখে সমতল ভূমিতে নেমে এলো। 'নাদাইকতা' (Nagykata) উজ্‌শাশ্‌ (Ujszasz), শোল্‌নক্‌ (Szolnok) প্রভৃতি ছোট বড় কয়েকটা স্টেশনেও ঐ একই ধরনের সাজসজ্জার ঘটা দেখলাম, প্ল্যাটফরমে তরুণ-তরুণীদের ছুটোছুটি ফুল দেওয়া, করমর্দন করার আগ্রহ ও আয়োজন দেখে অভিভূত হয়ে পড়লাম। দেখলাম, কমিউনিস্ট তরুণ-তরুণীর একতা, অপূর্ব, অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্য এবং আন্তরিকতা। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করে কেমন খট্‌কা লাগলো, প্রতিটি স্টেশনেই ভিতরে বাইরে রেল লাইনের ধারে ধারে সোলজার-দের পাহারা এবং স্টেশনের বাইরে অনেককে তারা আগলে রেখেছে। বুড়ো-বুড়ীদের কাউকে প্ল্যাটফরমের ভিতরে আসতে দিচ্ছে না। এর কারণটা কি! এই কথা ভাবতে ভাবতে বসেছিলাম, এমন সময় ভেরনার এসে আমাকে ডাকলে। বললে, "লাঞ্চ খাবে না—বেলা যে একটা বাজলো।" বললাম, "সঙ্গে লাঞ্চ-প্যাকেট তো রয়েছে—খেলেই হবে।"

"প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে এসো"। ভেরনার বললে। প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে ভেরনারের সঙ্গে গাড়ির করিডর বেয়ে ওর কামরায় গিয়ে বসলাম।

সেখানে হেইডেম্যান বলে হামবুর্গের আর একজন জার্মাণ সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের সঙ্গে ভেরনার আলাপ করিয়ে দিলে। ভেরনার জিজ্ঞেস করলে—"কি রকম দেখছো?" আমি বললাম—"সত্যিই অদ্ভুত! কিন্তু নবীন ছাড়া প্রবীণদের কাউকে প্ল্যাটফর্মে দেখছি না কেন বুঝছি না।" তারপর ও যা বললে তা শুনে চিত্তির চড়কগাছ। ও বললে—সবাইকে প্লাটফর্মে আসতে দিলে এ দেশের নবীনদের হাসির পাশে প্রবীণদের কান্নাটাও নজরে পড়বে, তাছাড়া ওদের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছে, যারা তোমাদের লাঞ্চ-প্যাকেটের কিছু ভাগ পাবে, এই আশাতেই ভিড় করেছে। আমি তখন হেগেয়া-শালোমের খাবার কাড়াকাড়ির ঘটনাটা ওকে বললাম—। ও বললে—ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি সে ইতিমধ্যেই অনেকবার ঘটিয়েছে, প্ল্যাটফর্মের

ফ্লুল আর করমর্দন কুড়োবার দিকে হাত না বাড়িয়ে, হাত বাড়িয়েছিল প্ল্যাটফর্মের উল্টো দিকে। লাইনের ধারে কাছে শুধু হাতে এসে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদের দিকে ওর লাঞ্চ-প্যাকেটের খাবারগুলো সুযোগ সুবিধামত বিলিয়ে দিতে!

ওর কথা শুনে আমি হতবাক্! ভেরনার বললে—"কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ছবি তুলে নিয়েছি, তোমাকে পাঠাবো। তা ছাড়া সুযোগ-সুবিধা পেলে এখনই তোমাকে আবার ঐ ঘটনা ঘটতে দেখাবো ব'লেই তো তোমার লাঞ্চ-প্যাকেটটা সঙ্গে আনতে বললাম।" বুঝলাম ওর খাবারগুলো ও সমস্তই বিলিয়ে দিয়েছে।

আমি বললাম—"ক্ষুধার্ত হাঙ্গারীয়ানদের খাদ্য-বিতরণ করার আগে—আমি আপাতত ক্ষুধার্ত জার্মাণ বন্ধুটিকে কিছু খাদ্য দিতে চাই এবং নিজেও কিছু খেতে চাই।" ভেরনার হো-হো- করে হেসে বললে—"ক্ষুধার্ত ভারতবাসীরা নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অপরকে খাওয়ায় যে তা আমরা জানি, ধন্যবাদ।" লাঞ্চ-প্যাকেট খুলে—ওকে মাংসের মস্ত টুকরো আর সালামী খণ্ডটা দিলাম, আমি পাঁউরুটি, চিজ্ আর একটা আপেল খেলাম। জাত বাঁচাতে গিয়ে পেট ভরানো গেলো না। ভেরনার বিশেষ কিছুই খেলে না, লাঞ্চ-প্যাকেটটা হস্তগত করলে। হঠাৎ খেয়াল হলো ট্যাঁকে তো হাঙ্গারীর ফোরিণ্ট রয়েছে, রেস্তোরাঁ-কারে গিয়ে দেখা যাক না খাবার মত কিছু পাওয়া যায় কিনা। ভেরনারকে প্রস্তাবটা জানাতেই ভেরনার বললে—"বোকারা ভোজ দেয়, চালাকরা কব্জি ডোবায়, চলো।"

রেস্তোরাঁ-কারে গিয়ে স্যুপ ও বড় বড় লঙ্কার ভেতরে ভাত ও টমাটোকুচির পুর দেওয়া 'গুলিয়াশ্' খেলাম। পেটটা ভরলো। দু'জনের এই সামান্য খাওয়ার খরচ লাগলো ২৬ ফোরিণ্ট, অর্থাৎ প্রায় ন' টাকার মত! রেস্তোরাঁ-কারে খেয়ে গল্প করতে করতেই 'গায়োমা' ব'লে ছোট্ট একটা স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। আমরা দুজনেই উঠে পড়লাম। ভেরনার দৌড়ে গিয়ে লাঞ্চ-প্যাকেটটা কামরা থেকে নিয়ে এসে প্লাটফরমের উল্টোদিকে করিডরে গিয়ে দাঁড়ালো, আমি সঙ্গে গেলাম। লাইনের উল্টোদিকে বেশ কয়েকজন গ্রাম্য নর-নারী জড়ো হয়েছে, ওদের খাবার দেখাতেই এক

দল দুঃসাহসী লোক হুড়মুড় ক'রে ছুটে এসে হাত বাড়ালে। —ওদের ভাষায় সবাই কি যেন একটা কথা বলতে লাগলো, অনুমানে বুঝলাম, "আমাকে দাও, আমাকে দাও" এই কথাই বলছে। পলকের মধ্যেই লাঞ্চ-প্যাকেট খালি! একজন সোলজার ওদের দিকে দৌড়ে আসছে দেখেই ওরা আবার দুড়দাড়িয়ে ছুটে গিয়ে লাইনের ওপারে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গেল, আমরাও ভেরনারের কামরায় এসে ভাল মানুষের মতো বসে পড়লাম।

বেলা তিনটা নাগাদ আমরা হাঙ্গারীর সীমান্ত—"লোকোশ্লাজা" স্টেশনে পেঁছিলাম। ছোট্ট স্টেশন, প্ল্যাটফরম নেই, চারধারে সেপাই-সোলজার গিজ্ গিজ্ করছে। স্টেশনে মাইকে বিভিন্ন ভাষায় নির্দেশ শোনা গেল—'পাসপোর্ট ও ভিসা চেক বা পাস-কন্ট্রোল হবার পর বুখারেস্ট-যাত্রীদের নামিয়ে এনটারটেন করা হবে।'

পাসপোর্ট ও ভিসা জমা দিয়ে আমাদের যথারীতি এনটারটেন করা হলো, কফি আর সসেজ দিয়ে—নাচ-গানও কিছু হ'লো। স্টেশনের যে কামরা থেকে রেকর্ড বাজিয়ে স্পীকারে শোনানো হচ্ছিল, আমি সেখানে চুপি চুপি হাজির হলাম। আমাদের জাতীয় সংগীত "জনগণ-মন অধিনায়ক" "বন্দে মাতরম্", "সারে জাহাঁ সে আচ্ছা" প্রভৃতি কয়েকটা গানের রেকর্ড, যা আমার সঙ্গে ছিল, সেগুলি নিয়ে। ঐ স্টেশনের ইণ্টারপ্রেটারকে ধরে হাঙ্গারীয় ভাষায় "ভারতীয় জাতীয় সংগীত বাজানো হচ্ছে" এই ঘোষণা দিয়ে একটার পর একটা রেকর্ড বাজানো শুরু করে দিলাম! ভারতের জাতীয় সংগীত শুনে হাঙ্গারী ও আর আর দেশের সহযাত্রীরা সবাই তারিফ করতে লাগলেন। তবে ভারতীয় সঙ্গীরা কেউ কেউ যে খুশী হয়নি সেটাও টের পেয়েছিলাম তাদের টীকা-টিপ্পনী শুনে। ঘণ্টাখানেক পরে গাড়ি ছাড়লো।

রুমানিয়ার সীমান্ত স্টেশন 'কুর্তিচী'তে পেঁছিলাম—বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ। সেখানে আবার পাসপোর্ট ও রুমানিয়ার ভিসা চেক ক'রে গাড়ি থেকে আমাদের নামানো হ'লো, মালপত্রও নামলো—কারণ ও'রা ট্রেন বদলি না করে কামরা-বদলি করে আরাম-কামরায় জায়গা দেবেন, যাতে রাত্রে ঘুমিয়ে যেতে পারি। কাজেই কুর্তিচীতে ঘণ্টা

দুয়েক কাটলো। নাচ, গান, ফুল দেওয়া, ফটো তোলা তো হ'লোই। তাছাড়া, কেউ কেউ স্নান, দাড়িকামানো ইত্যাদিও বিনা পয়সায় সেরে নিলে। আমিও স্টেশনের সেলুনে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে এলাম। কুর্তিচীতেই আমাদের রাত্রের খাবারের প্যাকেট ও যার যার পছন্দমত পানীয়ের বোতল সঙ্গে দিয়ে, ওখানকার ফেস্টিভ্যাল কমিটি ইণ্টারন্যাশনাল ট্রেনের একটা কোচে আমাদের উঠিয়ে দিলেন। হাঙ্গারীর রেলের কামরার কাঠের বেঞ্চ থেকে কালো ভেলভেটে-মোড়া আসনে প্রোমোশন হলো।

সুনীল আর আমি এক কামরায় ঠাঁই নিলাম। দিব্যি ভেলভেটে মোড়া গদি পেয়ে—ঠ্যাং ছড়িয়ে লম্বা হলাম। ঘুমে চোখ জুড়ে এলো কিন্তু ঘুমোবার উপায় কি আছে! অ্যারাদ্, রাড্না, বারজাভা ইলিযা প্রভৃতি ছোট বড় সব স্টেশনেই রাত বারোটা অবধি একই কায়দায় ফুল দেওয়া আর করমর্দনের পালা চললো। প্রতিটি স্টেশনের সাজ-সজ্জা, আর ফুল দিয়ে ফুল্ল করার ব্যাপার দেখেই বুঝলাম, কি অদ্ভুত অরগানাইজ্ড প্রচার কৌশল! কী বিপুল অর্থব্যয়! রুমানিয়ার এইটুকু পথ আসতেই গাড়ির প্রতিটি কামরা ফুলে ফুলে ভরে গেল। সুনীল বললে,—"দাদা এ যে একেবারে ফুলশয্যা!"

আমি বললাম—"ফুল দিয়েই ওরা 'ফুল্' করে দেয় যে তা ঠাওর পাচ্ছি। যাক এরপর সারা গাড়ি জুড়ে নাচ-গান ফুর্তি হুড়োহুড়ি চললেও, আমরা দু'টি নিরীহ প্রাণী গুঁড়ি সুঁড়ি মেরে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের শ্রান্তির পর ঘুমে চোখ জুড়ে গেলো।

ভোরে যখন চোখের পাতার জোড় খুললো—তখন চেয়ে দেখি রুমানিয়ার পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে আমরা চলেছি, চারধারে পাহাড়। খানিক পরে 'ওরাসুল স্ট্যালিন' বা স্ট্যালিন শহর স্টেশনে গাড়ি থামলো। আগে এই স্টেশনের নাম ছিল ব্রাসভ্, স্ট্যালিন-মাহাত্ম্যে স্টেশনের নাম বদলে গিয়েছে, এ তথ্যটি জানা গেল গাড়ির এক ইনটারপ্রেটারের কাছ থেকেই। তারপর এলো পাহাড়ের গায়ে সিনাইয়া স্টেশন। বর্তমানে রুমানিয়ার মন্ত্রী, যন্ত্রী, সাহিত্যিক, শিল্পীরা এখানেই ছুটি কাটাতে বা বই লিখতে আসেন।

এরপরে 'প্লোয়েস্টি' স্টেশনে যখন গাড়ি এসে দাঁড়ালো, তখন দূরে পাহাড়গুলো আকাশের গায়ে আবছা হয়ে মিলিয়ে গেছে। গাড়ি চল্‌লো এর পর সমতল ভূমি, মাঠক্ষেত পেরিয়ে। জানতে পারলাম, বুখারেস্ট আর ঘণ্টাখানেকের পথ। ইনটারপ্রেটার ও ফেস্টিভ্যাল কমিটির প্রতিনিধি এসে আমাদের মালপত্রে বিশেষ লেবেল বেঁধে দিলে তাতে আমাদের নাম ঠিকানা লি[illegible] দিলাম। দাড়ি কামিয়ে পোশাক পরিচ্ছদ বদলে ফিট্‌ফাট্ [illegible] গেলাম।

বুখারেস্ট নর্থ স্টেশনে গাড়ি [illegible]লো বেলা আটটায়। স্টেশনে হাজার হাজার যুবক-যুবতীর ভি[illegible] শুধু তাই নয়! সুন্দরী তরুণীরা রুমানিয়ার জাতীয় পোশা[illegible] সেজে এসে ক্যানা ফুলের গুচ্ছ দুলিয়ে হাত তুলে চেঁচাতে লাগে[illegible] "পাচে সে প্রিয়েতেনিয়ে" —ভারতীয় সঙ্গীরা আওয়াজ তুললে, "শান্তি ঔর দোস্তী।" অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরাও আপন আপন দেশের ভাষায় "শান্তি ও বন্ধুত্বের" ধ্বনিতে গোটা স্টেশনটাকে মুখরিত ক'রে তুললে।

রুমানিয়ার অতিথি

বুখারেস্ট নর্থ স্টেশনে গাড়ি পেঁছলো—২৭শে জুলাই, বেলা আটটায়।

আমার কামরায় হাজির হলেন বিশ্বযুব কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন কর্মকর্তা ও রুমানিয়ার কয়েকজন সাংবাদিক। প্রত্যেকেই ফুলের তোড়া উপহার দিলেন, করমর্দন করলেন। জানালেন, "অন্যান্য প্রতিনিধিরা নেমে যাওয়ার পর আপনাকে বিশেষ সম্বর্ধনার সঙ্গে নামানো হবে, কারণ আপনি বিশ্বযুব কংগ্রেসের আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের একজন—সাধারণ প্রতিনিধি নন।"

নিজের অসাধারণত্বের চেয়ে ভারতের একমাত্র আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বুকটা দশ হাত হয়ে উঠলো বটে, তবে মুখটা শুকিয়ে গেলো এই দেখে যে সাঙ্গ-পাঙ্গ যারা পাঁচ ছ'টি দিন রঙ্গ রসে সঙ্গ দিয়েছিল, তারা সবাই রণে ভঙ্গ দিয়েছে; আগেভাগেই মালপত্র নিয়ে ট্রেনের অন্যান্য দেশের যাত্রী-প্রতিনিধিদের ভিড়ে হারিয়ে গেছে। আমার মালপত্রগুলিও নেমে চলে গেছে আমার আগেই।

মিনিট পনেরো অপেক্ষা করার পর আমাকে যখন গাড়ি থেকে নামানো হলো—দেখলাম স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের জনতা সারিবেঁধে দাঁড়িয়ে রাস্তা ফাঁকা করে দিয়েছে আমার যাওয়ার জন্য। আমি বিশ্বযুব কংগ্রেসের কর্মকর্তা ও রুমানিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে এগিয়ে চললাম, ভারতীয় পোশাকে, ভারতীয় কায়দায় জোড়হাত করে নমস্কার করতে করতে। দুপাশ থেকে তরুণ-তরুণীরা ফুলের গুচ্ছ নাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। অসংখ্য চলচ্চিত্র-ক্যামেরা ও সাধারণ ক্যামেরায় চারিদিক থেকে ভারতীয় অতিথিটির ছবি নেওয়া হচ্ছে যে সেটাও নজরে পড়লো। জনতার ভিতর থেকে ধ্বনিত হচ্ছে "ত্রিয়েস্কা ইণ্ডি" "ত্রিয়েস্কা রুমানা"—রুমানিয়া ভাষায় যার মানে

হলো, 'দীর্ঘজীবী হউক ভারত,' 'দীর্ঘজীবী হউক রুমানিয়া।' আর সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে হাঁক উঠছে—"পাচে সে প্রিয়েতোনিয়ে।"

প্ল্যাটফরমের বাইরে আসতেই নজরে পড়লো—দূর থেকে ভারতীয় সঙ্গীরা আদর অভ্যর্থনার বিড়ম্বনাটা দেখেছেন। হাত নেড়ে ওঁদের বিদায় জানালাম, চেঁচিয়ে বললাম—"পরে দেখা হবে।"

অভ্যর্থনা সমিতির কর্তারা স্টেশনের বাইরে আমাকে একটি সুন্দর মোটরে তুলে দিলেন,। "দিনু ম্যানোলে" নামে একটি যুবকও আমার সঙ্গে উঠলেন। জানানো হলো—ম্যানোলেই আমার সেক্রেটারী ও দোভাষীরূপে কাজ করবে। অতিথিকে গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে ওঁরা পিছনের গাড়িতে উঠলেন।

বুখারেস্ট শহরের ভিতর দিয়ে গাড়ি ছুটে চললো—দেখলাম রাস্তাঘাট বেশ চওড়া চওড়া। চারিদিকে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলিতে কিম্বা কোনও কোনও জায়গায় বড় বড় খুঁটি পুঁতে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে রাশিয়া, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও চীন এই পাঁচটি দেশের লম্বা পতাকা। অদ্ভুত সেগুলি সাজানোর কায়দা। তাছাড়া অন্যান্য দেশের ছোট বড় অসংখ্য জাতীয় পতাকাও রাস্তার ধারের ঘর বাড়ি ও দোকানগুলির ঘোমটা হয়ে ঝুলছে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের পতাকা তারই মধ্যে দু' এক জায়গায় নজরে পড়লো। শুধু তাই নয়, রাস্তার ধারে ধারে বড় বড় লম্বা-চওড়া বাড়িগুলির দেওয়ালে রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট পেত্রু গ্রোজা ও মন্ত্রিসভার চেয়ারম্যান বা প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়ু দেজ'এর ছবি। কোথাও কোথাও স্তালিন লেনিনের বিরাট বিরাট ছবি টাঙানো রয়েছে। কলকাতার রাস্তার তুলনায় পথে ঘাটে লোকজনের ভিড় অনেক কম, তবে সাদা পোশাকপরা পুলিশের সংখ্যাটা রাস্তার লোকজনের তুলনায় বেশী বলেই মনে হলো।

পাঁচ-সাত মিনিটের পাক মেরেই আমরা বুখারেস্টের কেন্দ্রস্থল—বুলভার্দু রিপাবলিচি রাস্তার উপরে অ্যাম্বাসাডর হোটেলে পৌঁছে গেলাম। বারো তলা বাড়ি এটি, স্টেট হোটেল, স্টেটের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়।

এই সরকারী হোটেলেই দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট আমন্ত্রিত
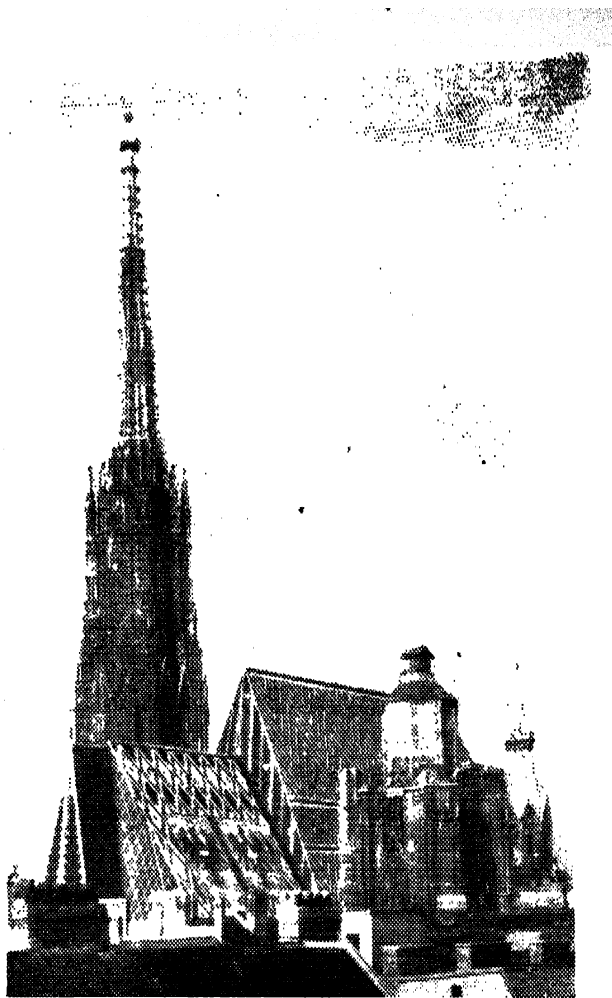
ভিয়েনা—সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল

কের্তা গ্রামের গ্রাম্য কিণ্ডারগার্টেন স্কুল : ছাত্র-ছাত্রীরা এক টুকরো রুটি ও জ্যাম দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছে। কয়েকটি ছেলেমেয়ের পায়ে জুতা নেই।

অতিথি ও বিশিষ্ট কয়েকজন সাংবাদিকদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। সাধারণ প্রতিনিধি অন্যান্য সাংবাদিকদের ছোটখাটো হোটেল ক্যাণ্টনমেণ্ট বা স্কুল-কলেজের হোস্টেলে যায়গা দেওয়া হয়েছে।

হোটেলে পেঁছিবামাত্রই দেখলাম দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরাই, যাঁরা আমাকে স্টেশনে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ও'রা আমার হাতে কংগ্রেসের নিমন্ত্রণ-পত্র ও ব্যাজ দিয়ে আমার পাসপোর্টটি চেয়ে নিলেন, জানালেন যথাসময়ে ওটি ফেরৎ পাওয়া যাবে। ও'রাই আমাকে লিফ্‌টে চড়িয়ে ছয়তলার ৫২২ নম্বর ঘরে পেঁছে দিলেন। আগাগোড়া কার্পেটে মোড়া চমৎকার ঘর, সোফা কোচ চেয়ার টেবিল আলমারি ইত্যাদি সাজানো। দুগ্ধ ফেননিভ শয্যার পাশেই টেলিফোন, ঘরের সংগে লাগোয়া বাথ ও টয়লেট। ঘরে ঢুকে দেখি আমার জিনিসপত্র সুটকেস সবই পেঁছে গেছে। ও'রা জিজ্ঞেস করলেন, "এ ঘরটিতে আপনার কোনও অসুবিধা হবে না তো!" আমি বললাম "না! চমৎকার ব্যবস্থা! ধন্যবাদ!"

ম্যানোলে—বললে, "আপনি চানটান করে—নীচে লাউঞ্জে আসুন, আমি সেখানে অপেক্ষা করছি।" হোটেলের পরিচারিকা 'পেরেশা' এসে আমার পোশাক-পরিচ্ছদ জুতো জামা সমস্তই যেটি যেখানে রাখবার গুছিয়ে দিয়ে গেল; কিন্তু মুস্কিল হলো পেরেশা ইংরেজী বোঝেন না। ইসারা ইঙ্গিতেই সব বোঝাতে হলো। নজর পড়লো ষ্টেট হোটেলের মেড্‌ হলেও, পেরেশার পোশাক ও জামাকাপড় বেশ মলিন ও জীর্ণ।

বুখারেস্টের গ্রীষ্ম চলেছে। আমাদের দেশের মত কটকটে রোদ আর গরম, তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে বাথটবে নেমে শাওয়ারের ফোয়ারায় ঠাণ্ডা-গরম জলে স্নান সারলাম।

সেজেগুজে লাউঞ্জে নামলাম দশটায়। ওখানেই ম্যানোলে অপেক্ষা করছিল—গাড়ি ছিল বাইরে দাঁড়িয়ে। ম্যানোলে জানালো যে এই হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থাটা বন্ধ আছে। ডাইনিং হলটা মেরামত হচ্ছে। "এথিনি প্যালেস হোটেলে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে ও আমাকে নিয়ে যাবে কংগ্রেসের অধিবেশনে। দু'দিন হলো কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে। আমাদের বুখারেস্ট পেঁছাতে এমনিতেই দেরি

হয়ে গেছে, তাই কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে যাওয়ার জন্য আমিও যে ব্যস্ত একথাটা তাকে জানা...।

"এথিনি প্যালেস" হোটেল, ...র হোটেল থেকে দু'-তিন মিনিটের হাঁটা পথ, তবুও গাড়িতে... গেলাম। সেখানে ব্রেকফাস্ট খেলাম পাঁউরুটি, মাছ ভাজা ও ...মের ওমলেট। তিনদিন পরে সেদিনই কপালে মনের মত খাবার জুটে... চা পাতলা জল, সামান্য ফিকে রঙটুকুই আছে। দুধ নেই, লেবুর টুকরো ও সামান্য চিনি। বললাম, আর এক পেয়ালা চা একটু কড়া করে তৈরি করে আনার জন্য—কিন্তু কড়া চা বলতেও সেই ফিকে চা-ই এলো। ম্যানোলে জানালে 'চা'টা ওদেশে দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য তাই দু'চারটি চায়ের পাতা ভিজিয়েই এদেশে চা তৈরি হয়। ওদেশে বড় কেউ চা খায় না, খায় কালো-কফি, দুধ চিনি না দিয়েই।

ব্রেকফাস্ট সেরে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি ছুটলো বুখারেস্ট শহরের বড় রাস্তা ধরে উত্তরমুখো। শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে ফ্লোরিয়াস্কা স্পোর্টস হলে পেঁছলাম বেলা এগারোটা নাগাদ। (ওখানেই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল ছ দিন ধরে।) তখনও অধিবেশন চলছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের আমার প্রবেশপত্র দেখাতেই ওঁদের মধ্যে একজন আমাদের দু'জনকে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। হলের দোতলায় সভামঞ্চের বাঁদিকের বারান্দায় প্রথম সারিতে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে আমার জন্য নির্ধারিত আসনটি ওঁরাই দেখিয়ে দিলেন। পাশেই আর একটি আসন আমার ইন্টারপ্রেটারের জন্য।

দেখলাম, অদ্ভুত ব্যবস্থা, কংগ্রেসের প্রত্যেক... শ্রোতার কানে হেড ফোন লাগানো। আমাদের আসনের সামনে টেবিলের মত জায়গাটিতে সাজানো রয়েছে আমাদের কানে লাগানোর জন্য হেড ফোন, আগের অধিবেশনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও অধিবেশনের কর্মসূচী, কাগজপত্র, দুটো কাচের প্লেটে আঙুর, প্লাম, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি। চেয়ারের পাশে নীচে একটা বালতিতে বরফের মধ্যে কয়েকটা বোতলে বিভিন্ন ধরনের পানীয়, অরেঞ্জেড্, লেমনেড্ ইত্যাদি, অর্থাৎ

কংগ্রেসের বক্তৃতা শুনতে শুনতে খিদে তেষ্টা পেলে—হাত বাড়ালেই সব পাওয়া যাবে।

টেবিলের মত জায়গাটির সামনে কাঠের গায়ে ক'টা প্লাগ পয়েণ্ট আর ভলিয়ুম-কণ্ট্রোলের চাবি। এক একটা পয়েণ্ট এক একটা ভাষা শোনবার জন্য—ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান, রুশ, স্প্যানিশ ও এস্‌প্যারেণ্টো এই সাতটি ভাষায় অনুবাদ করে বক্তাদের বক্তৃতা শোনানো হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ইংরেজী ভাষার প্লাগ পয়েণ্টে আমার হেড-ফোনের প্লাগ লাগিয়ে কানে দিলাম। পরিষ্কার বক্তৃতা শোনা যেতে লাগলো; কিন্তু মন বসলো না বক্তৃতায়। চোখজোড়া হলের চারধারে রকমারী দেশের রকমারী পোশাক পরা মানুষ, আর হলের উপরে কাচের ছাদের নীচে নানা দেশের রঙচঙে পতাকার মালার শোভা দেখে, দিশেহারা হয়ে ঘুরতে লাগলো। একসঙ্গে একশোটার বেশী দেশের মানুষ আর পতাকা দেখতে পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়!

সভাপতিমণ্ডলীর বসবার জায়গা বক্তৃতা মঞ্চের পিছনে উপরের ধাপে। আর তারই পিছনে ছাই রঙের কাপড়ের উপরে রুমানিয়ান ভাষায় বড় বড় অক্ষরে লেখা তৃতীয় বিশ্বযুব কংগ্রেস। হলের চারধারে "শান্তি আর বন্ধুত্ব", "Peace and Friendship" এই কথাটি নানা ভাষার হরফে লেখা। কংগ্রেসের ব্যবস্থা বন্দোবস্ত, সাজসজ্জার পরিপাটি সত্যিই দেখবার মতো।

ফ্লোরিয়াস্কা হলে বিশ্বযুব কংগ্রেসের বন্দোবস্ত যতখানি জমজমাট, ঠিক ততখানি জমজমাট হয়ে উঠলো না সকালের অধিবেশনের বক্তাদের বক্তৃতাগুলো। তার কারণ, সাতাশে জুলাই সকালবেলাতেই কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির খবর এসে পৌঁছেছে রুমানিয়ায়। খবরটা জেনে আমারও খুবই আনন্দ হলো। কিন্তু সেই আনন্দের আবেগে কংগ্রেসের সকালের গোটা অধিবেশনটাই কোরিয়ান প্রতিনিধিদের সঙ্গে গলা জড়াজড়ি, ফুল ছোড়াছুড়ি, চুমো খাওয়ার হুড়োহুড়িতেই কাটলো। এ ব্যাপারটা আমার চোখেই শুধু যে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল তা নয়, অধিবেশনের পর আরও অনেককেই সে মন্তব্য করতে শুনেছি। অধিবেশনে যে দু'চারজন

বক্তৃতা দিলেন—তাঁদের বক্তৃতাতেও রুশ-কোরিয়াস্তুতি ছাড়া নতুন জীবন-প্রস্তুতির কিছু বড় শুনতে পেলাম না।

অধিবেশনের মাঝখানেই নীচে নেমে গেলাম। ভারতীয় সঙ্গী ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করলাম। ভারতবর্ষ থেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করতে যে ক'জন গেছেন, তাঁরা ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে আরও কয়েকজন কমরেড এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গেও আলাপ হ'লো। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা যাঁরা ইংরেজী বলতে পারেন তাঁরাও কয়েকজন এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন, অটোগ্রাফ নিলেন। ম্যানোলেকে সঙ্গে নিয়ে ঐ হলের এক পাশে কংগ্রেসের সেক্রেটারীর দপ্তরে গেলাম, বিশ্বযুব কংগ্রেসের সেক্রেটারী জ্যাক ডেনির সঙ্গে দেখা করতে। ওখানে বন্ধুবর সারদা মিত্রের সঙ্গে আলাপ হলো। আমার বক্তৃতা কখন হবে জানতে চাইলে ও'রা জানালেন, পরের দিন সকালেই আমার বক্তৃতা দাখিল করতে হবে, পরে ও'রা সময় জানাবেন।

বেলা দেড়টায় কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলো। দু'টো নাগাদ ম্যানোলে ও আমি এথিনি প্যালেস হোটেলে ফিরলাম—নির্ধারিত গাড়িতেই। ওখানে আমাদের বিমানের অন্যতম সঙ্গী সত্তর বছরের বৃদ্ধ মিঃ ভূতের সঙ্গে দেখা। তিনি ভারতীয় সাইক্লিস্ট ফেডারেশনের সভাপতি, বিশ্বযুব উৎসবের স্পোর্টস কমিটির সদস্য। তিনি তাঁর টেবিলেই সাদরে ডেকে নিলেন। পরামর্শ দিলেন ভাত ও মুর্গী ফরমায়েস করবার জন্য। শুধু তাই নয়, এটাও জানালেন, দেশ-বিদেশের যে কোনও মদ আমি পছন্দ করি, তাই এখানে বিনা পয়সায় পেতে পারি, কারণ এ'রা তার ঢালোয়া ব্যবস্থা করেছেন। আমি তাঁকে জানালাম—"ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস"। টেবিলের উপর অরেঞ্জেড ও লেমনেডের বোতল দেখিয়ে বললাম, ঐ পানীয়তেই আমার প্রাণ জুড়োবে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

ম্যানোলে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে "তোবারিশে!" (যার মানে হলো 'কমরেড্') হাঁক পেড়ে আমার ফরমায়েস মত খাবার তাগিদ দিয়ে আনিয়ে নিতে লাগলো—স্যুপ, পাঁউরুটি মস্ত এক টুকরো মাছ ভাজা শেষ হলো। তারপরে ভাতের সঙ্গে আধখানা মুরগী সেদ্ধ,

টমাটো, প্যাপরিকা (বড় লঙ্কা) ও আর একটা প্লেটে বেগুন-পোড়ার মত চটকানো কি একটা বস্তু দিয়ে গেল! বস্তুটা মুখে দিয়ে মনে হলো, বেগুনসেদ্ধর মতই লাগছে, তবুও পাকাপাকি পরিচয়টা জানবার জন্য ম্যানোলেকে জিজ্ঞেস করলাম, "বস্তুটা কি হে কমরেড?" ম্যানোলে তাড়াতাড়ি তার পকেট থেকে তেলচট্‌চটে পুরানো একটা বই বার করে' বেশ কয়েকটা পাতা উল্টে-পাল্টে জবাব দিলে—"এগ প্ল্যাণ্ট।" সর্বনাশ! আরও গোল বেধে গেল, বললাম—"ইট্‌ ডাজ নট সিম টু বি এ প্ল্যাণ্ট! বাপু এটিতো গাছ বলে মালুম হচ্ছে না! ম্যানোলে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে শুদ্ধ করবার চেষ্টায় বললে—"এক্সকিউজ্‌ মি স্যার ফ্রুট অব দি এগ প্ল্যাণ্ট।"

"এগ্‌ প্ল্যাণ্ট!" কি রে বাব্বা! ভেবে কুল পাই না, হঠাৎ ছেলেবেলায় পড়া ওয়ার্ডবুকের জ্ঞানটা মাথায় চাড়া দিতেই খেয়াল হ'লো—"এগ্‌ প্ল্যাণ্ট" মানে বেগুনগাছ। তাহ'লে বস্তুটি নিষিদ্ধ কিছু নয়, বেগুন সিদ্ধ! আন্দাজটা বে-আন্দাজ হয়নি ভেবে খুশী হলাম; কিন্তু তার চেয়ে খুশী হলাম, যখন জানলাম, ম্যানোলের হাতের বইটাতে ঐ রুমানিয়া ভাষা থেকে ইংরেজী এবং ইংরেজী ভাষা থেকে রুমানিয়ান শব্দ ও সংক্ষিপ্ত বাক্য মায় উচ্চারণ দেওয়া আছে।

আমি বললাম—"তোবারিশে! তোমার বইটা আমাকে ক'দিনের জন্য ধার দিলে বাধিত হবো। রুমানিয়ায় যখন এসেছি, তখন রুমানিয়ার ভাষা কিছুটা শিখতে হবে।"

ম্যানোলে খুশী হয়ে বললে—"বেশ তো! ওটা আপনার কাছেই রাখুন, রুমানিয়ান ভাষা খুব শক্ত নয়; ইংরেজীর সঙ্গে অনেক শব্দের বেশ মিল আছে। এই যেমন ধরুন—Ora আর Hour Nou—New, Floare—Flower" ম্যানোলের কথা শুনে খুবই উৎসাহিত হলাম।

"তাই নাকি! চমৎকার! অনেক ধন্যবাদ!"

বইটা পকেটে পুরে আঙুরের পুর দেওয়া কেক, আইসক্রীম আর কফি দিয়ে পুরো খাওয়া সেরে—পুরাভিমুখী হলাম—

অ্যাম্বাসাডার হোটেলের পথে। হোটেলে পেঁৗছে দিয়ে ম্যানোলে জানালে—"আপনি এখন বিশ্রাম করুন, বিকেল ছ'টা নাগাদ গাড়ি নিয়ে আমি আসবো।" ম্যানোলে চলে গেল—বেলা তখন সাড়ে তিনটা।

হোটেলের কামরায় গিয়ে—জামা জুতো খুলে—খালি-গা ক'রে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। অসহ্য! বুখারেস্টে গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ আর খোলাফাটা গরম। ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু অত বড় স্টেট হোটেলে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান নেই যে [illegible] দিয়ে হাওয়া খাবো। হাওয়ার বদলে গ্লাস দুই ঠাণ্ডা জল খেয়ে—খাতা কলম নিয়ে টেবিলের ধারে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম।

ম্যানোলের দেওয়া বইটা খুলে—গুড মর্ণিং="বুনা সিওয়া" (Buna Siwa), গুড্ ইভনিং="বুনা সিয়ারা" (Buna Seara) গুড্ নাইট্=নোয়াপ্টে বুনা (No[illegible] Buna), থ্যাঙ্ক ইউ= মুল্‌তুমেস্ক (Multumesc) ইত্যাদি [illegible]ও বহু কথা যেগুলি রুমানিয়ার লোকদের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব করতে কাজে লাগতে পারে—ঝাড়া মুখস্থ করে ফেললাম এবং নোট বুকে লিখে নিতে লাগলাম—যতটা পারি।

লিখতে পড়তে যে ছ'টা বেজে গেছে সে খেয়াল নেই; এমন সময় বিছানার পাশে টেলিফোন বেজে উঠলো—ক্রি-রি-রিং।

—"হ্যালো!"

—"গুড্ ইভ্‌নিং মিঃ ঘোষ। ম্যানোলে হিয়ার, ওয়েটিং উইথ দি কার, উড্ ইউ কাম ডাউন প্লিজ?"

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নীচে গেলাম। ম্যানোলে জানালে, "আজ বিকালে অধিবেশন নেই, আমি গাড়ি [illegible]পে বুখারেস্ট শহরটা বেড়িয়ে আসতে পারি।"

আমি বললাম—"Multumesc Acesta Esta informatcia bune" ("মুলতুমেস্ক! আচেস্তা এস্তে ইনফর্মাতসিয়া বিনে।") ধন্যবাদ! এ অতি সুসংবাদ।

আমার মুখে রুমানিয়ান ভাষা শুনে ম্যানোলে অবাক! বললে, "এরই মধ্যে রুমানিয়ান কথা শিখে ফেলেছেন? আপনার বাহাদুরী আছে। বিশ্রাম করেননি বুঝি?"

—"বিশ্রাম এবং ফূর্তি করতে এখানে আসিনি, রুমানিয়াকে জানতে ও চিনতে এসেছি, সে কাজে তোমার ঐ বইটা খুবই সাহায্য করবে; তাই ওটা নিয়েই তিন ঘণ্টা কাটিয়েছি। আমাকে ঐ বই একটা কিনে দিতে হবে।"

—"আমার বইটাই এখন কাজে লাগান—পরে ও বই কিনে দেবো।" ম্যানোলে ও আমি গাড়িতে চড়লাম।

সোফার ম্যানোলেকে জিজ্ঞেস করলে—"Unde mergem"? (উন্দে মার্জেম)—আমরা কোথায় যাবো?

মজা করার জন্যে ম্যানোলে বললে—"মিঃ ঘোষ! রুমানিয়ান ভাষায় এবার সোফারের জবাবটা দিন।"

ঠকবার পাত্র আমিও নই—চট্ করে বইয়ের পাতা উল্টে বলে দিলাম—La centrul orasului sau la parcul Pentra Copii (লা চেন্ট্রুল ওরাশুলুই, লা পার্কুল পেনত্রু কপি) যার মানে হচ্ছে—শহরের মাঝখানে অথবা ছেলেমেয়েদের কোনও পার্কে।

সোফার হেসে বললে—"Gata Congratulitate—গাটা কন্‌গ্রাচুলিতেত্—অলরাইট কন্‌গ্রাচুলেশন!

মোটরে চড়ে হোটেলের সামনের উল্টোদিকের রাস্তা ধরে রিপাব্‌লিক স্কোয়ার ঘুরে—দি আর্ট মিউজিয়াম অফ দি রুমানিয়ান পিপল্‌স রিপাব্‌লিকের সামনে দিয়ে, ইউনিভার্সিটি স্কোয়ারে পড়লাম। ইউনিভার্সিটির বাড়িটি দেখলাম, আগেকার পুরানো বাড়ি। ইউনিভার্সিটির সামনে—সেক্সপীয়র, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বারো জন মনীষীর প্রতিকৃতি সাজানো হোর্ডিং টাঙানো রয়েছে। হাতে আঁকা বড় বড় ছবি। রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখে গর্বে আনন্দে বুকটা ফুলে উঠলো। তারপর রিপাব্‌লিক বুলেভার্দ, নিকোলাস ব্যালেচেস্কু বুলেভার্দ প্রভৃতি বড় বড় কয়েকটা রাস্তা ঘুরে গাড়ি চললো শহরের বাইরে আর্দিয়ালুন বুলেভার্দে গাছের ছায়া ঢাকা নতুন রাস্তা ধরে।

পথে যেতে ম্যানোলে আমাকে দেখিয়ে দিলে—রুমানিয়ার বৈদেশিক দপ্তর, যানবাহন দপ্তরের বিরাট বিরাট নতুন বাড়িগুলি। সমস্ত সরকারী বাড়ি ও প্রাসাদের গায়ে ঝোলানো রয়েছে রুমানিয়ার

প্রেসিডেণ্ট পেত্রু গ্রোজা ও প্রধানমন্ত্রী জর্জিউ দেইএর মস্ত মস্ত ছবি—দু' এক যায়গায় স্তালিন লেনিনের ছবিও দেখলাম। এছাড়া নজরে পড়লো রুমানিয়ার বুকে সোভিয়েট সৌহার্দের সদম্ভ দুই বিরাট প্রতীক, একটি হ'লো বিরাট ব্যয়ে নির্মিত—সোভিয়েট সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ আর একটি হ'লো স্তালিন স্কোয়ারে মার্শাল স্তালিনের আকাশ-ছোঁয়া শ্বেতপাথরে গড়া বিরাট মূর্তি। এই মূর্তির পাশ দিয়ে গিয়ে আমরা স্তালিন পার্কের এলাকায় ঢুকলাম। বিরাট পার্ক, বিরাট হ্রদকে ঘিরে। এই পার্কের আয়তন যে কত বড় তা ম্যানোলেও বলতে পারলে না, শুধু জানালে, ওর মধ্যে একাধিক প্রমোদভবন, রেস্তোঁরা, ওপন্-এয়ার থিয়েটার ইত্যাদি আছে। জায়াণ্ট হুইলের মত কার্নিভ্যালের বিরাট দুটো "দত্যিচরকী" দূর থেকেই নজরে পড়লো। ম্যানোলে জানালে, ঐখানেই ছেলেদের খেলবার জায়গা। দেশ ছাড়বার পর থেকে ক'দিন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখ দেখিনি, অথচ ছোটদের প্রতিনিধিত্বেই এদেশে এসেছি, তাই ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালাম।

ছেলেদের খেলবার জায়গায়, সেই দত্যি চরকী দুটোর এক পাশে গিয়ে আমাদের গাড়ি থামলো। কিন্তু ও মা! ছেলেদের খেলবার জায়গায় ছেলেমেয়েরা কই! ছেলেমেয়েদের দেখতে না পেয়ে বিস্ময় প্রকাশ করাতে ম্যানোলে ও গাড়ির সোফার এদিক ওদিক থেকে গোটা দশবারো ছেলেমেয়েকে ডেকে ডুকে জোগাড় করে আনলে। সংগে সংগে তাদের মা-বাবারাও আমার অদ্ভুত ভারতীয় পোশাক দেখে ছুটে এলো। লোকগুলির চেহারা ও ছেলেমেয়েগুলির সাজ-পোশাক ও স্বাস্থ্য দেখে মোটেই খুশী হ'তে পারলাম না। শুনে আসছি কমিউনিষ্ট দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মাত্রে স্বাস্থ্যবান ও আনন্দসমুজ্জ্বল। কিন্তু বাস্তবে দেখলাম, তা নয়, আমাদের দেশের ছোটদের মতই ম্লান মলিন। জামাকাপড়ও সাদামাটা, ময়লা-পুরাণো। অনেকেরই পায়ে জুতা নেই, জুতো থাকলেও অনেকের পায়েই মোজা নেই।

আমার প্রশ্নের জেরায় জানা গেল, পার্কের দেখাশোনা করবার জন্য যেসব মালি মজুর মিস্ত্রি আছে, ওরা অধিকাংশই তাদেরই

সিসিমিগু হ্রদে নৌকা বিহার
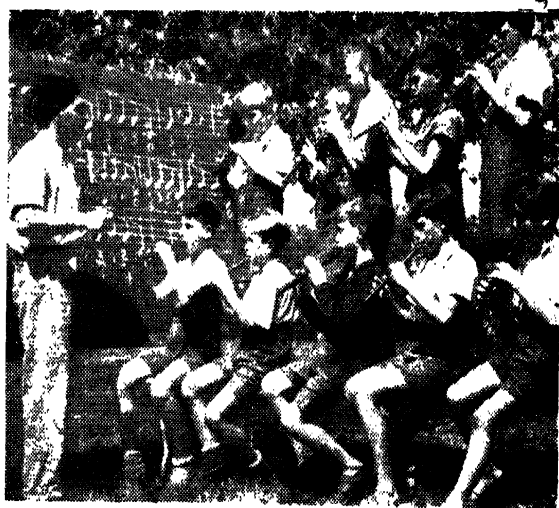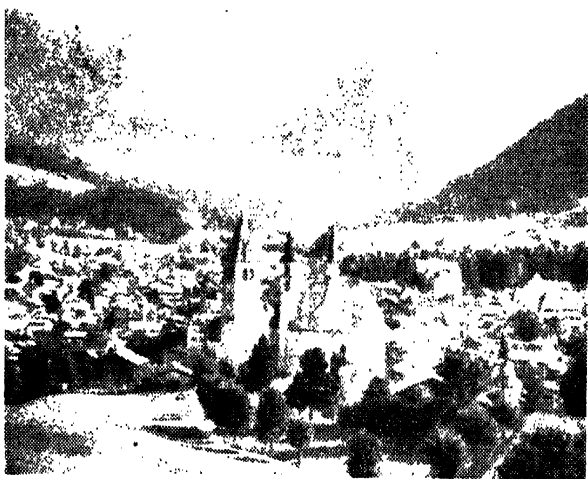
অষ্ট্রিয়ার কিট্‌শবুহেল শহর ও ক্যাথলিক গির্জ্জা

হাঙ্গারীর একটি স্টেশনে ছেলেবুড়ো খাবার চাইছে

ছেলেমেয়ে। তাই অমন লাজুক আর মলিন। যাই হোক, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব জমালাম—রুমানিয়ার ভাষায় প্রশ্ন করলাম,—'কুম্‌তে কিয়ামা?' (তোমার নাম কি?), 'কেতস্‌ আন আই?' (কত বয়স?), 'উন্দে স্কোয়ালা মার্জ'হ (কোন্‌ স্কুলে যাও), 'চে লুক্‌রা এস্তে পে তাত?' (বাপ কি কাজ করে?) ইত্যাদি। যেসব ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ভাব হ'লো—তাদের সকলের নাম আমার মনে নেই। তবে যারা আমার অনুরোধে সাহস করে আমার খাতায় বাঁকা বাঁকা অক্ষরে নাম লিখে দিয়েছিল—তারা হচ্ছে সোফিকা মাইচু, ম্যারিয়ানা পেটকু, রডিকা আইভানচু ইত্যাদি। বাদ বাকি সবাইকে যখন বললাম—"ভে রোগ স্ক্রিয়াস্‌ কিয়াম।" (নামটি লিখে দাও)—অধিকাংশই জানিয়েছিল—"নিয়াম নু কুনোয়াস্তেম স্ক্রিয়াত্‌" (আমরা লিখতে জানি না)ঃ এর থেকেই বুঝলাম, সোভিয়েট দেশে যাই হোক না কেন, সোভিয়েট নিয়ন্ত্রিত কমিউনিস্ট রাজ্য রুমানিয়ার সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এখনও আমাদের দেশের মতই লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পায়নি। অবস্থার হেরফের যে সেখানে এখনও আছে তা টের পেলাম। আমাকে ঘিরে তখন চারধারে ভিড় জমে গেছে। কখন আমাদের সবার অগোচরে ওখানে একজন পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে সেটা টের পাইনি।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। প্রশ্নগতিক বেয়াড়া দিকে যাচ্ছে। পুলিশটা ম্যানোলেকে কি যেন বলতেই ম্যানোলে আমাকে তাড়া লাগাতে লাগলো। ওদিকে বাচ্চারা আমাকে ছাড়তে চায় না, ওদের মা-বাবারা অনেকেই তখন দূরে একটু সরে পড়েছেন। ছোটদের সবাইকে বললাম—"আমি আমার দেশের ছোটদের খুব ভালবাসি, তাদের জন্য বই লিখি, অতএব সময় পেলেই আবার তোমাদের সঙ্গে মিলবো, আজকে আমাকে ছুটি দাও।" গাড়িতে এসে বসলাম—ছেলেমেয়েরা তাদের মা-বাবারা—হাত নাড়িয়ে আমাকে জানালে—"লা রিভিয়ে-দেরে।" অর্থাৎ গুড্‌ বাই। রুমানিয়ার সাধারণ মানুষ ও ছেলেমেয়ে-দের মধ্যে আন্তরিকতার মধুর স্পর্শ পেয়ে মন ভরে গেল। গোধূলি-বেলায় রুমানিয়ান শিশুদের রাঙা মলিন মুখের বিষাদের ছায়া অস্তগামী সূর্যের ম্লানমুখখানিতেও সন্ধ্যা হয়ে নেমে এল। সূর্য-

দেবও বিদায় জানিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলেন। পার্কের উইলো পপলারের ডালে ডালে ডেকে উঠলো রুমানিয়ার রকমারী পাখি।

ঘড়িতে যখন আটটা তখন সন্ধ্যা হলো।

হ্রদের চারধারে চক্কর মেরে পৌঁছলাম এথিনি প্যালেস হোটেলে। ডিনার খেয়ে—অ্যাম্বাসাডার হোটেলে ফিরলাম রাত দশটায়। রাত বারোটা অবধি জেগে কংগ্রেসের বক্তৃতার খস্ড়া তৈরি করলাম।

বিছানায় শুতে গিয়ে দেখি আর এক মস্ত বিপদ! একে এই গরম! তার ওপর পালকের গদি আর বালিশের স্তূপে সারা দেহটা ঢুকিয়ে ঘুম আর আসে না! শেষ রাতে বেশ কিছুটা ঠান্ডা পড়াতে কোনওরকমে ঘুমোনো গেল।

পরের দিন ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল। না ভেঙে উপায়কি! একে অভ্যাসের দোষ, তায় রুমানিয়ার রোদ জানলা গলে হামলা করেছে আমার ঘরে। ছড়িয়ে পড়েছে আমার চোখ-মুখের পরে! শয্যা-ত্যাগের ইচ্ছা না থাকলেও উঠতে হলো চোখ রগড়ে। ভাবলাম মুখ-হাত ধুয়ে একটু মর্নিং ওয়াক করে আসি একা একা।

নীচে নেমে দেখি, লাউঞ্জ খালি—তখনও কেউ নামেন নি। চাকর-চাকরানীরা ঝাড়ামোছা করছে। রিসেপশানে চাবিটা জমা দিতেই যে লোকটি সেখানে ছিলেন, 'সুপ্রভাত' জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'এত ভোরে একা একা কোথায় যাচ্ছেন? পথ হারাবেন না তো?' জানালাম—'না। কাছাকাছি একটু মর্নিং-ওয়াক করবো, ফিরবো এখুনি।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তা ধ'রে খানিকটা এগিয়ে গেলাম দিক এবং নিশানা ঠিক রেখে। বড় রাস্তা ফেলে 'প্যাত্রিয়া' সিনেমার পাশ দিয়ে মাঝারী এবং ছোট কয়েকটা রাস্তা পার হয়ে চললাম। দেখলাম, প্রায় সব রাস্তাই ফাঁকা ফাঁকা। বিশেষ লোক-চলাচল শুরু হয়নি। পুলিশ-পল্টনরা তখনও মোড়ে মোড়ে মোতায়েন হন নি চারিধারে। তবে ঝাড়ুদারনীরা রাস্তাঘাট সাফ করার কাজে লেগেছে। তাদের ছেঁড়া ময়লা সাজপোশাকেও দারিদ্র্য ও দুর্দশার ছাপ এমনই জড়ানো যে, তার সঙ্গে কোনও মিল খুঁজে পেলাম না

তাদের সাজপোশাকের, যারা রুমানিয়ার স্টেশনে স্টেশনে আমাদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিল। এছাড়া দেখলাম এক জায়গায় ছেলে-বুড়ো একদল লোক কিউ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। কী ব্যাপার! রেশনে পাঁউরুটি দেওয়া হচ্ছে। ভিড়ের সারিতে রকমারী অবস্থার ছাপ দেখলাম। সাজেপোশাকে তাদের দশাও আমাদের দেশের মতই।

পথ চলতে রুমানিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখের দিকের আরও কয়েকটা বাস্তব ছবি নজরে পড়ে গেল। এক জায়গায় দেখলাম, রাস্তায় ফেলে-দেওয়া ময়লা ছেঁড়া কাগজ কুড়োচ্ছেন এক বৃদ্ধ। এছাড়া একাধিক বুড়ো-বুড়ীকে এখানে সেখানে, পথের ধারে এটা-সেটা কুড়িয়ে বেড়াতে, ঝেঁটিয়ে আনা জঞ্জালের স্তূপগুলোতে সন্ধানী চোখে কি যেন খুঁজতেও দেখলাম। এমন দৃশ্য একাই যে শুধু আমি দেখেছি তা নয়। পয়লা আগস্ট যুব-উৎসবের অতিথিরা বুখারেস্টে এসে ভিড় জমাবার আগে যে দুচারজন ভোরবেলা রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তাঁরাই দেখেছিলেন এমন সব ঘটনা।

এসব দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ খেয়াল হলো, দেশে চিঠি লিখতে হবে, কাগজে রিপোর্ট পাঠাতে হবে সে কথাটা একদম ভুলে গেছি। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হোটেলে ফিরে চিঠি ও রিপোর্ট লেখা শেষ করলাম; কিন্তু দেশে চিঠি ও টেলিগ্রাম পাঠানোর জন্য রুমানিয়ার যে পয়সাকড়ি দরকার হবে, সেটা কোথা থেকে কিভাবে জোগাড় হবে, সেটা বুঝে উঠতে পারলাম না।

তাই তাড়াতাড়ি চিঠি লেখা শেষ করে ছ'তলা থেকে একতলার লাউঞ্জে নামলাম। দেশ-বিদেশের সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও আমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে আগের দিনই আলাপ হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে যাঁরা সেখানে ছিলেন সকলেই "সুপ্রভাত" জানালেন—নতুন আরও কয়েকজন এসে করমর্দন করে পরিচয় করলেন। লণ্ডনের 'রয়টা'রের প্রতিনিধি মিঃ স্ট্যানলী ক্লার্ক, ফ্রান্সের L Humanitate পত্রিকার মঁসিয়ে জাঁ পিয়েরে শাবরল, অস্ট্রিয়ার "Die Union" পত্রিকার হের ওলফ্‌গ্যাঙ্গ হ্যামারস্‌ক্ল্যাগ, অস্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ 'ট্রিবিউন' পত্রিকার মিঃ লেণ্ট ফক্স প্রভৃতি সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিপত্র ও রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত এবং সেই

বাবদ রুমানিয়ার টাকা-পয়সা কিভাবে পাওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হলো।

ওঁরা জানালেন সাধারণ অবস্থায় এদেশে অন্যান্য অ-কমিউনিস্ট দেশের মুদ্রা বা ট্রাভেলার্স চেকের বদলে রুমানিয়ান মুদ্রা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলেও বর্তমান অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা সে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সব দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে-আনা ট্রাভেলার্স চেক ভাঙানোর ব্যবস্থা হয়েছে স্টেট ব্যাঙ্কে।

ওঁদের মধ্যে একজন আবার আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন যে, এঁরা দেশ-বিদেশের কমিউনিস্ট পত্রিকার প্রতিনিধিদের দেওয়া বিস্তারিত বিবরণগুলি বিশেষ ব্যবস্থায় বিনামূল্যে টেলিগ্রাফ করে পাঠাবার সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছেন—ডাক খরচ ইত্যাদি সমস্ত খরচই বহন করেছেন। তবে অ-কমিউনিস্ট পত্রিকাগুলির বেলায় সে সুযোগ-সুবিধা তো দেওয়াই হচ্ছে না, বরং বেশ কড়া-কড়ির মধ্যে চড়া দাম নিয়ে ছাড়া হচ্ছে। কাজেই আমি যেন আজই ব্যাঙ্কে গিয়ে একেবারে বেশী অঙ্কের চেক ভাঙিয়ে বেশ কিছু রুমানিয়ান মুদ্রা সংগ্রহ করে নিই। কারণ ওগুলো পরে অনেক কাজে লাগবে। বন্ধুটিকে এই সু-পরামর্শটুকু দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানলাম।

এমন সময় ম্যানোলে এসে গেল। এথিনি প্যালেসে গিয়ে চটপট ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে প্রথমেই গেলাম, কংগ্রেস যেখানে হচ্ছিল, সেই ফ্লোরিয়াস্কা হলের প্রাঙ্গণে—বিশ্ব যুব-কংগ্রেসের দপ্তরে। সেখানে আমার বক্তৃতার খসড়াটা দিলাম—আন্তর্জাতিক দপ্তরে ভারতের প্রতিনিধি বন্ধুবর সারদা মিত্রের হাতে। তিনি জানালেন কর্তৃপক্ষ বক্তৃতাটি পড়ে দেখবেন এবং কিছু রদবদল করতে হলে সেটা আমাকে জানাবেন ঘণ্টাখানেক পরে এবং তারপর ওটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের কাজ শেষ হলেই আমার বক্তৃতার সময় জানানো হবে। ওঁর কাছেও জানতে চাইলাম—চিঠিপত্র ও রিপোর্ট পাঠাবার খরচের বাবদ রুমানিয়ার টাকাকড়ি কিভাবে পেতে পারি? উনিও জানালেন—ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে আমি রুমানিয়ার মুদ্রা পেতে পারি।

কাজেই আর দেরী না করে ম্যানোলেকে সঙ্গে নিয়ে Banca Repulicii Populare Romana"তে অর্থাৎ রুমানিয়ার সরকারী ব্যাঙ্কে গিয়ে ৫০ পাউণ্ড ভাঙিয়ে প্রতি পাউণ্ডের বদলে ২৯·৫৪ লেই এই হিসাবে মোট ১৪৭৭ লেই পেলাম। ৫০০, ১০০, ৫০, ২৫, ১০, ৫, ৩, ২ ও ১ লেই-এর রকমারী নোট মিলিয়ে মোট মুদ্রাটা ও'রা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

রুমানিয়ার টাকাকড়ির হিসেব বোঝা খুব শক্ত নয়। দু'রকম মুদ্রা Leu 'লেই' আর Bani 'বান'। ১০০ বানে এক লেই। 'বান' গুলি এক, দুই, পাঁচ, দশ, পঁচিশ নানা দামের নানামাপের গোল গোল ধাতব-মুদ্রা। লেইগুলো নোটেই মেলে।

টাকা পকেটে গ'ুজে ম্যানোলেকে বললাম—সব আগে আমার চিঠি ও রিপোর্ট টেলিগ্রাম করে পাঠাতে চাই। ও বললে, এজন্য প্রেস আফিসে যেতে হবে—সেখান থেকেই চিঠিপত্র টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। গেলাম সেখানে।

বুখারেস্টের পারহন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব্ ল-এর বিরাট বাড়ির সবটুকু জুড়ে বিশ্ব-যুব কংগ্রেসের প্রেস-অফিস বা প্রচার বিভাগের দপ্তর। ওখানেই কংগ্রেস ও ফেস্টিভ্যালের প্রচার সংক্রান্ত সমস্ত বিভাগের আলাদা আলাদা দপ্তর, মায় অস্থায়ী টেলিগ্রাফ, পোস্ট অফিস, রেস্তোরাঁ, বার ইত্যাদির বিরাট ব্যবস্থা হয়েছে। শত শত যুবক-যুবতী সেখানে কাজ করছে।

প্রেস অফিসের ডাক বিভাগে চিঠি ফেলতে গিয়ে জানলাম, ভারতবর্ষে এয়ার-মেলে পোস্টকার্ড ও খামের চিঠি পাঠাবার খরচ যথাক্রমে প্রায় দেড় টাকা ও তিন টাকার মত। উপায় কি, চিঠি ফেলতেই হলো। টেলিগ্রাম বিভাগে যেতে তাঁরা জানালেন—প্রেস অফিসের 'পারমিট' বা অনুমতি-পত্র ছাড়া টেলিগ্রাম পাঠানো যাবে না।

অনুমতি-পত্র নিয়ে আসা হলো—তখন জানালেন, প্রতিটি শব্দের জন্য লাগবে সাড়ে চার লেই অর্থাৎ এক একটি শব্দে প্রায় দু'টাকা লাগবে। একশো শব্দের একটি টেলিগ্রাম পাঠাতে দুশোটি টাকা খরচ। টেলিগ্রামে রিপোর্ট পাঠানোর বাসনা সেদিনই ত্যাগ করতে

হলো। হতাশা আর বিরক্তির বোঝা মনে নিয়ে ফ্লোরিয়াস্কা হলে কংগ্রেসের অধিবেশনে গেলাম।

ওখানে যখন পেঁছিলাম, তখন অধিবেশন শুরু হয়ে গেছে। শুনলাম, বেলজিয়ামের লুভেঁ ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির তরুণ ছাত্র ম্যাথুস বক্তৃতা করছেন। নির্ভীকভাবে তাঁর ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে জানালেন যে, বিশ্ব-যুব কংগ্রেসের কর্মপন্থা ও আদর্শের সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই তিনি একমত না হলেও, তিনি মনে করেন যে, গণতান্ত্রিক বিশ্ব-যুব ফেডারেশনকে সার্থক করে গড়ে তোলার প্রয়াসে কোনও দেশের কোনও যুব প্রতিষ্ঠানের হাত গুটিয়ে দূরে সরে থাকা উচিত নয়। ভারি ভালো লাগলো তাঁর বক্তৃতা, কারণ আমিও বিশ্ব-যুব গণতান্ত্রিক ফেডারেশন সম্বন্ধে ঐ একই মত পোষণ করেই কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন গ্রীস ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিরাও বক্তৃতা করলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধির কণ্ঠে কম্যুনিজমের জয়গান ও সোভিয়েট-স্তুতি ছাড়া নতুন কোন কথা বড় বিশেষ কিছু শোনা গেল না।

যাই হোক, এমন সময় আমার ডাক পড়লো—বিশ্ব-যুব সম্মেলনের সম্পাদকের দপ্তরে। সময় সংক্ষেপ করার অজুহাত দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ আমার বক্তৃতার কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়ার এবং WFDYর প্রশংসাসূচক কিছু উক্তি জুড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন।

ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতারা আমাকে বক্তৃতা থেকে বিরত হওয়ার জন্য বহুভাবে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সবচেয়ে বিস্মিত হলাম—ভারতীয় কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের কেউ কেউ যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামের উল্লেখটি আমার বক্তৃতা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন—এমনকি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চাপ দিয়ে সেটি বাদ দিতে আমাকে বাধ্যও করিয়ে ছাড়লেন। এর কারণ নেতাজী সুভাষ তাঁদের অপপ্রচারের কৃপায় ওসব দেশে হিটলারের সমগোত্রীয় ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর বলেই পরিচিত হয়েছেন এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে প্রতিনিধিদলের অন্যতম নেতাজীর একনিষ্ঠ ভক্ত সুহৃদ ভায়ার সঙ্গে অন্যান্যদের সেদিন বাকবিতণ্ডাও হলো।

পরেও একাধিকবার সুহৃদ ভায়াকে নেতাজীর প্রসঙ্গ নিয়ে কমরেডদের সঙ্গে বাকযুদ্ধে রত হতে দেখেছি)

সম্পাদক জ্যাক ডেনি ও বন্ধুবর সারদা মিত্রের সহযোগিতায় আমি যে আমার স্বাধীন বক্তব্যটুকু বলবার সুযোগ শেষ পর্যন্ত পাবোই, সেইটুকু ভরসা হলো। ভারতীয় প্রতিনিধিদের মাতব্বরেরা বক্তৃতার সুযোগটি থেকে আমাকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করেও বড় বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। আমাকে জানানো হলো— পরের দিন বিকালের অধিবেশনে আমার বক্তৃতা হবে। যাক্ খানিকটা নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হওয়া গেল।

কংগ্রেস থেকে বেলা দেড়টায় এথিনি প্যালেসে গেলাম। দুপুরে ভুরিভোজের পর অ্যাম্বাসাডর হোটেলে নিজের ডেরায় গিয়ে আধঘণ্টা ঘুমিয়ে রুমানিয়ার ভাষা চর্চায় মন দিলাম।

ম্যানোলে এলো বেলা চারটে নাগাদ গাড়ি নিয়ে। তাড়া দিয়ে নিয়ে গেল বিশ্বযুব কংগ্রেসের বিকেলের অধিবেশনে। ঘণ্টা দেড়েক ধরে সেই একঘেয়ে বক্তৃতা অর্থাৎ অ-কমিউনিস্ট দেশের অধিকাংশ যুব-প্রতিনিধির মুখেই স্বদেশের গভর্নমেণ্টের নিন্দা ও প্রকারান্তরে সোভিয়েটের স্তুতি শুনতে শুনতে মেজাজ বিগড়ে গেল। বুঝে উঠতে পারলাম না, এর মধ্যে বিশ্বের যুব সাধারণের কল্যাণে গঠন-মূলক স্বাধীন চিন্তা ও আদর্শের নির্দেশ কোথায়?

সবচেয়ে অবাক হলাম, ঐ অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি দলের অন্যতম নেতা বীরেন্দ্র সিন্‌হা তাঁর স্বদেশের সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা তথ্য মিশিয়ে যা বললেন তা শুনে। বক্তৃতাতে তিনি নিজেকে এবং নিজের দেশকে সেদিন অন্য সকলের কাছে কতখানি হেয় প্রতিপন্ন করলেন যে, তা তিনি নিজেও হয়তো বুঝতে পারেন নি। স্বাধীন ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং পণ্ডিত নেহরুর বৈদেশিক নীতিকে ভারতের কমিউনিস্ট বন্ধুরা যোগ্য মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হলেও পৃথিবীর অন্য সব দেশের লোকই যে সেটি দেয় এবং দিতে চায়, এই সত্যটি তাঁর জানা না থাকায় কংগ্রেসের অধিবেশনে আর সমস্ত বক্তাদের বক্তৃতার তুলনায় তাঁর বক্তৃতাটিই যে সবচেয়ে কম তারিফ পেলো সেটাও দেখলাম।

কয়েকজন হোমরা-চোমরার বক্তৃতাও শুনলাম। বক্তৃতাগুলি শুনে মনে হলো—বিশ্ব-যুব কংগ্রেসের তথা ওয়ার্লড ফেডারেশন অব্ ডেমোক্রাটিক ইয়ুথ সংস্থার মধ্যে যে মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য রয়েছে, তা একটিমাত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং মতবাদের চাপে বিমূঢ় ও মোহাচ্ছন্ন প্রতিনিধিদের দালালীর ফলেই নিরপেক্ষ প্রতিনিধিদের মনে সংশয় ও বিরক্তি জাগিয়ে তুলবে।

বেলা ছ'টা বাজতেই অধিবেশন ছেড়ে উঠে পড়লাম। ম্যানোলেকে বললাম—আমাকে শহরের বাইরে গাড়ি করে ঘুরিয়ে আনলে খুশী হবো। ম্যানোলে বড় ভদ্র ও অনুগত, সে তখনই সোফারকে শহরের বাইরে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে।

বুখারেস্ট শহরের বাইরে—শহরের কেন্দ্র থেকে দশ-পনের মাইল দূরে—শহরতলীর পথ ধরে গাড়ি ছুটে চললো। দেখলাম, শহরের এত কাছে শহরতলীর চেহারা অন্যরকম। সেখানে বড় বড় ব্যারাক ও প্রাসাদ এখনও গড়ে ওঠে নি। গরীবের বাড়ির পাশাপাশি আগের কালের পুরানো প্রাসাদগুলো দাঁড়িয়ে থেকে আগের মতই অসাম্য ঘোষণা করছে। ম্যানোলেকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ছোট ঐ কুঁড়ে ঘরেই বা কারা থাকে, আর প্রাসাদগুলোতেই বা কারা বাস করে? ও সরল জবাবে জানালে—কুঁড়েতে থাকে শ্রমিক চাষী ও মজুরেরা, আর প্রাসাদে থাকে শ্রমিক মজদুর পার্টি বা ইউনিয়নের কর্মকর্তা বা লীডাররা। ও খুব জোর দিয়ে বললে—ধনীরা আর থাকতে পারে না প্রাসাদে। ভাবলাম—ও হরি, এর নাম সাম্যের দেশ! লোক পালটিয়েছে, ব্যবস্থা পালটায়নি! পার্টির নেতৃত্বের আভিজাত্যে মডার্ন অভিজাত শ্রেণী তৈরী হচ্ছে।

বুখারেস্ট শহর ছাড়িয়ে শহরের বাইরে—শহরতলী ও গ্রামের মাঝখান দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলছিল। তাই পাকা রাস্তার দুধারে চাষের ক্ষেত, খামার-বাড়ি, চাষীদের ঘর-বাড়িও নজরে না পড়ে পারলো না। কমিউনিস্ট দেশের প্রচার-সাহিত্য পড়ে আমাদের দেশের অনেকের ধারণা এবং আমার নিজেরও এইরকম একটা ধারণা ছিল যে, কমিউনিস্টদের দেশে চাষীদের আর কষ্ট করে কুঁড়েঘরে থাকতে হয় না—সেখানে গ্রাম আর শহরে বড় বিশেষ তফাৎ নেই এবং সে দেশের

বুখারেস্টের রাস্তায় লেখক ও যাদুকর পি. সি. সরকার
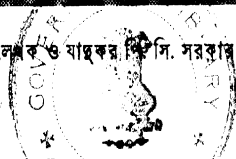
বুখারেস্টের বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে—বোর্ডিংয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবি

সব মানুষেরই দশা ফিরেছে। সাজ-পোশাক ও জীবনযাত্রাতে একই রকম আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা হয়েছে। সকলের জীবনধারণ ব্যবস্থায় একটা নির্দিষ্ট স্ট্যাণ্ডার্ড আনা হয়েছে; কিন্তু রুমানিয়ার রাজধানীর অত কাছে গ্রামের পথে যেতে তাতো দেখলাম না। দূর থেকেই চাষীদের ক্ষেতখামার, ঘরবাড়ি ও তাদের সাজ-পোশাকের যেটুকু আভাস পেলাম, তাতে বুঝলাম—অন্য আর পাঁচটা দেশের মতই ওদেশেও শহর ও গ্রামের জীবনের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক এখনও রয়েছে। বুখারেস্ট শহরের মাঝখানে যে ধরনের স্টেডিয়াম, জিমন্যাসিয়াম আর থিয়েটার হলের ঘটা দেখলাম, তেমন কিছুইতো দেখলাম না শহর থেকে দূরে গ্রামের ভিতরে।

হাঙ্গারীর গ্রামের পথের মতোই—এ পথে যেতেও নজরে পড়লো পথের ধারে 'ছুটে-এসে-ভিড়-করা' গ্রামবাসীদের সাজ-পোশাকের দৈন্য ও মালিন্য। আমাদের দেশে গ্রামের পথে গরুর-গাড়ি বোঝাই করে রকমারি মাল ও ফসল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। ওদের দেশে তার বদলে ঘোড়ায়-টানা গাড়ি বোঝাই করে ফসল ও মালপত্তর নিয়ে চলেছে চাষীরা। তফাৎ শুধু এটাই দেখলাম।

দেখার নেশায় কৌতূহলটা আরও কয়েকমাত্রা বাড়লো—চুপ করে থাকবো ভেবেও চুপ করে থাকতে পারলাম না। ইণ্টারপ্রেটার ম্যানোলেকে বললাম—"চলনা গাড়িটা থামিয়ে—গ্রামের পথে একটু হেঁটে বেড়িয়ে আসি।"

এতক্ষণ চুপ করে থাকলেও এ প্রস্তাবে ম্যানোলে একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠলো—বললে, "আজ আর সময় হবে না, গ্রাম পরে দেখবেন; এখন চলুন আপনাকে লিবার্টি পার্কে সূর্যাস্ত দেখিয়ে আনি। ওখানে ভারী সুন্দর হ্রদ আছে—বেড়াবার চমৎকার জায়গা।" এই বলেই সোফারকে নির্দেশ দিলে গাড়ি ঘুরিয়ে লিবার্টি পার্কে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

গ্রামের পথ পিছনে ফেলে—বুখারেস্ট শহরের প্রান্তসীমার দক্ষিণ দিকে লিবার্টি পার্কে পৌঁছ'লাম। চমৎকার জায়গাটি—পার্কের

মধ্যে সুন্দর হ্রদ। পপ্লারের ছায়ার ঘোমটা ঢাকা কালো কনেবউটির মতই স্নিগ্ধ। হ্রদের জলে নৌকা বিহার করছে তরুণ-তরুণীর দল। হবেও বা ওরা বর-কনে!

জায়গাটি বেশ নিরিবিলি। ঝোপঝাড়ের আড়াল আবডালে মধুমালঞ্চ রচনা করে মধুহৃদয় তরুণ-তরুণীরা এখানে ওখানে প্রেমালাপ করছে যে তাও পড়লো নজরে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা বয়স্ক তেমন কাউকে লিবার্টি পার্কের প্রমোদ-কাননে বড় একটা দেখতে পেলাম না। হ্রদের ধারে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখিয়ে ম্যানোলে বললে—"মিঃ ঘোষ! আমাদের দেশে সূর্যাস্তের দৃশ্য কেমন দেখছেন?"

আমি বললাম—"যেখানে নতুন সূর্যোদয়ের আভাস দেখতে পাবো বলেই ছুটে এসেছি—সেখানে অস্তগামী সূর্য দেখে কি মন ভরে! এখন ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি।"

ম্যানোলে আমার কথার ইঙ্গিতটা ধরতে পারলে না। বললে—"বুঝেছি আপনি ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত! বেশ চলুন এইবার হোটেলে গিয়ে ডিনারটা সেরে নেওয়া যাক।

এথিনি প্যালেসে ফিরে এলাম আটটা নাগাদ—যথারীতি চব্য-চোষ্য লেহ্য-পেয় নিয়ে ভোজন-পর্বে বসা গেল।

খাওয়ার টেবিলে সেদিন আলাপ হলো নরওয়ের "FRIHETEN" পত্রিকার প্রতিনিধি HELGH PAULSEN, জাপানের আসাহী সিমবুম নিউজ-এসেন্সীর প্রতিনিধি কোকোমোটো, মঙ্গোলিয়ান লেখক দান্দাইসাইরিন জেন [illegible], সুইডেনের লেখক ইয়াঙ্গোয়ে বায়ার্নস্টর্ম প্রভৃতির সঙ্গে। খাওয়ার সঙ্গে আলাপের প্রসঙ্গটা সাহিত্য দিয়েই শুরু করা গেল।

নরওয়ের পলসেন ও সুইডেনের বায়ার্নস্টর্ম দুজনেই অবাক হয়ে গেলেন—যখন আমি জানালাম ভারতের বহুলোকই ইবসেন, সেল্মা লাগেরলফ্, ন্যুট হামসুনের লেখা একাধিক বই পড়ে থাকেন—এ ছাড়া জানালাম, আমি নিজে সুইডেনের অতি আধুনিক উপন্যাসও কিছু

কিছু পড়েছি—তবে তার মধ্যে কায়ারস্তিন লাইউংগম্যান (Kjerstin Ljungman)-এর লেখা "The Shining Sea" বইটাই আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে।

জাপানের কোমোমোটো সাহেব চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি জানতে চাইলেন জাপানী সাহিত্য সম্বন্ধে ভারতবাসীরা কিরকম আগ্রহশীল। আমি জানালাম, খুব বেশী না হলেও জাপানী সাহিত্যের মোটামুটি খবর সাহিত্যানুরাগীরা রাখেন। অনেকেই জাপানের কবি ইয়োনে নোগুচির নাম জানেন—কারণ টেগোরের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আমি জানালাম, জাপানের লেখকদের মধ্যে কোয়ো ওজাকী'র লেখা 'কোর্নাজিকি ইয়াসা' (Golden Demon), সাবুয়ো শিমাদা'র "কাইকোকু শিমাৎসু' (Agitated Japan) প্রভৃতি বইগুলি পড়েছি—ভালও লেগেছে।

'কোমোমোটো' শুধু খুশী নয় রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। —মন্তব্য করলেন; "ভারতবর্ষ সত্যিই খুব উন্নত দেশ।" সকলেই জানালেন ওঁরা তেগোরে ও নেহেরুর বইয়ের কিছু কিছু অনুবাদ পড়েছেন। "তেগোরে পৃথিবীর সবসেরা কবি, নেহরু পৃথিবীর সবসেরা রাষ্ট্রনায়ক"—এই মন্তব্য ওঁরা প্রায় সকলেই করলেন। শুনে বুকটা দশ হাত হয়ে উঠলো। গল্প করতে করতে খাওয়ার ফলে সেদিন খাওয়াটা যেন একটু বেশীই হয়ে গেল। ভরা পেট হলেই গা ভারী হয়।

ম্যানোলে জানতে চাইলে এর পর আমি কি করবো? আমি জানালাম- "হোটেলে গিয়ে নিজের বিছানায় টান হবো, আমাকে বাপু তুমি আর টানাটানি করো না।" ম্যানোলে ভারী খুশী, ও আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে—'লা রিভিয়েদেরে' 'বুনা সিয়ারা' সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিলে।

বিছানায় শুয়ে ঘুম আর আসে না। নরম পালকের গদি—গরমে আরামদায়ক নয়। বেডল্যাম্প জ্বালিয়ে—ম্যানোলের বইটা নিয়ে রুমানিয়ান শব্দ মুখস্ত করতে লাগলাম। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে রুমানিয়ান শব্দের সঙ্গে বেশ কয়েকটা সংস্কৃত শব্দের মিল দেখতে

পেয়ে গেলাম। যেমন ধরুন জল Ape (আপে), সাপ—Sarpe (সর্পে), পিতা—Tate (তাত), সাত—Sapte (সপ্তে)), তিন Trei (ত্রেই) এমনি আরও অনেক কথা। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন টের পাইনি।

আগের দিনের মতই খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। হোটেলের বাকি অতিথিদের তখন অর্ধেক রাত। গরম জলে স্নান করে—পুজোপাঠ সেরে—জামাজুতো এ'টে সেদিনও ভোরের ফাঁকা রাস্তায় খানিকটা চক্কর মারতে বেরিয়ে গেলাম। দেখলাম আগের দিনের মতই পথঘাট সাফ করছে। দোকানপাট তখনও সমস্ত বন্ধ—খুলবে বেলা আটটায়।

আনমনে একা পথ চলেছি—এমন সময় পিছন থেকে কে যেন বললে—'গড্ ব্লেশ ইউ' ঈশ্বর তোমকে আশীর্বাদ করুন!—চমকে উঠলাম! পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি এক বৃদ্ধা—পরনে সেলাই-করা ছিন্ন মলিন বেশ। —বললাম "থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ্! ডু ইউ স্পিক ইংলিশ মাদাম? (আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ! আপনি কি ইংরেজী বলতে পারেন মহাশয়া?)।

তার জবাবে বৃদ্ধা চাপা গলায় বললেন—"ইংরেজী শুধু আমিই জানিনা, এদেশের আরও অনেক লোকই জানে, কারণ এদেশে আগের যুগে অনেকেই ইংরেজী ও ফরাসী পড়তেন, তবে বর্তমানে ইংরেজীতে কথা বলা, বা বিদেশীদের কাছে 'ইংরেজী জানি' একথাটা জানানোও এখানে মস্ত অপরাধ বলে গণ্য হয়। তাই ভয়ে কেউ ইংরেজী বলতে সাহস পায় না। আমারও দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভয় হচ্ছে। তুমি দাঁড়িয়ো না। হাঁটতে থাকো, এগোও।" পা চালিয়ে এগিয়ে চললাম বটে, কিন্তু আমারও ভয় করতে লাগলো।

যাক বৃদ্ধার নির্দেশ মতো ভয় আর সাহসের মাঝখানে ঝুলতে ঝুলতে নিরিবিলি একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর তিনি আমাকে সেদিন যা জানালেন তা হলো—এই ভদ্রমহিলা পুরানো

শাসন-ব্যবস্থার আমলে একজন অধ্যাপিকা ও লেখিকা ছিলেন। ভদ্রমহিলার একটি মাত্র ছেলে ছিল—১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক রাত্রে NKVD অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার তত্ত্বাবধায়ক সোভিয়েট কমিশারিয়েটের কর্তারা তাকে ধরে নিয়ে সেই যে কোথায় চালান করে দিয়েছে, তারপর থেকে আর কোনও খবরই তার পাওয়া যায়নি।

"বাছা আমার বেঁচে আছে না মরেছে তা ভগবানই জানেন।" বলে' বৃদ্ধা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। চোখ মুছে বললেন,—"শুধু আমার ছেলেই যায়নি। ধরেছে হাজার হাজার যুবক যুবতীকে, যাদের একমাত্র অপরাধ হলো, তারা সোভিয়েটের তালিম দেওয়া NDF বা National Democratic Front দলের বিরোধিতা করেছিল। বৃদ্ধা আরও জানালেন—শুধু মাত্র জার্মান রক্ত দেহে বইছে, কিংবা নামটা জার্মানদের মতো—এই অপরাধের দোহাই দিয়ে ষাট-সত্তর হাজার রুমানিয়াবাসীকে ওরা চালান দিয়েছে মধ্য-এশিয়ায়—গোলাম-মজুর করে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন আপনি কিভাবে দিন কাটান?" বৃদ্ধা কেঁদে বললেন—"মাসে মাত্র ১৮ লেই (প্রায় আট টাকা) পেনসন পাই তাতে তিন-চার দিনের খোরাকও হয় না। প্রতিবেশীরা লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের অভাবের সংসারের খোরাকের ভাগ যেটুকু দেয় আর রোজ সকালে পথে ঘাটে কুড়িয়ে যা পাই, তাই খেয়েই কোনও রকমে বেঁচে আছি—মরণও হয় না! ভিক্ষা করবো যে সে উপায়ও নেই। তাহলে ধরে নিয়ে গিয়ে যে লাঞ্ছনা করে, তা বলতে পারবো না।"

বৃদ্ধার কান্না দেখে, কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। আর দাঁড়াতে পারলাম না, মানিব্যাগ খুলে ১০ লেই তাঁর হাতে গুঁজে দিলাম—বৃদ্ধা আবার বললেন, "গড্ ব্লেশ ইউ"।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। ঘরে ফিরে ডায়রীতে এই কথাগুলো ঠিক উল্টো করে লিখে রাখলাম, কারণ সোজাসুজি সব কথা ডায়রীতে লেখা নিরাপদ না হতেও পারে এমন একটা আশঙ্কা আমার ছিল।

বেলা আটটায় ঘরের টেলিফোন বেজে উঠলো। শ্রীমান ম্যানোলে লাউঞ্জে নেমে যেতে অনুরোধ জানালে। লাউঞ্জে গিয়ে দেখি ম্যানোলে ও তার সঙ্গে একটি যুবতী! ম্যানোলে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে—জানালে, মেয়েটির নাম মিস এলেন। ম্যানোলের বদলে এখন থেকে এলেনই আমার দোভাষী ও সেক্রেটারীর কাজ করবে। মনে মনে ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, কারণ ম্যানোলে ছেলেটিকে আমার ভালই লেগেছিল—তাকে যখনই যে অনুরোধ করেছি এই কদিন, তা সে তখনই রেখেছে। কাজেই তার বদলে সহসা এই মেয়েটিকে ইণ্টারপ্রেটার হিসাবে পাঠানোর মধ্যে একটা রহস্যের কল্পনা করেই ঐ অস্বস্তি। যদিও দেখেছি হোটেলের অধিকাংশ বিশিষ্ট অতিথি ও সাংবাদিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি করে শ্রীমতী ইনটার-প্রেটার। যুবক দোভাষীদের সংখ্যাটা অনেক কমই ছিল এবং তাদের যে মহিলা প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের সঙ্গেই দেওয়া হয়েছিল তা আমি লক্ষ্য করেছি। বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় কাউকে ইণ্টারপ্রেটার হিসাবে দেখিনি। কাজেই কি আর করি। ওষ্ঠে কাষ্ঠহাসি ফুটিয়ে ম্যানোলেকে ধন্যবাদ জানালাম। 'এলেন' যখন এলেনই, তখন তাঁকেও 'স্বাগতা' করতে হলো।

মিস্ এলেন, ম্যানোলে আর আমি, তিনজনে এথিনে প্যালেসে গিয়ে নিত্যকার মতো পিত্তরক্ষা করলাম—কোকো, ওমলেট ও রুটি মাখন দিয়ে। ব্রেকফাস্ট টেবিলের আলাপ-আলোচনায় এলেনের পরিচয় জানা গেল। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে এলেন, তার বাপ-মা ছোট একটা শহরে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, ইংরেজী পড়েছে। ফরাসী, জার্মান এবং রুশভাষাও সামান্য সামান্য বলতে ও বুঝতে পারে। বুখারেস্টের কোনও এক সরকারী দপ্তরে চাকরি করে, বিয়ে-থা করেনি—একলা একটি ঘর ভাড়া করে থাকে, নিজেই রাঁধেবাড়ে খায়, আর আপিস যায়। বিদেশী ভাষা জানে বলে উৎসবের একমাস তাকে এই ইণ্টার প্রেটারের কাজ করতে পাঠানো হয়েছে আপিস থেকেই। এর বদলে তিনবেলা খাওয়া পাবে, আর উৎসবের শেষে পাহাড়ের স্বাস্থ্যাবাসে পনেরো দিন কাটিয়ে আসতে পারবে বিনা খরচেই। এলেন সাধারণ

মেয়ে হলেও বুদ্ধি অসাধারণ রাখে; সেটা তার পাকানো চেহারা আর প্যাঁচানো কথাবার্তাতেই ঠাওর পেলাম।

খাওয়া শেষ করে তিনজনেই রওনা হলাম যুব-কংগ্রেসের অধিবেশনে। তবে সকালের অধিবেশন সেদিন আর বড় বিশেষ শোনা হলো না। আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা কতদূর এগিয়েছে জানতে গিয়ে রীতিমত ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করতে হলো। জার্মান অনুবাদক ডক্টর ই আর গোল্ড জানালেন, আমার বক্তৃতার অনেক জায়গা অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদকরা গোলমালে পড়ে গেছেন, কারণ Soul, Spirit আর Mind এই তিনটে আলাদা করে বোঝাবার মতো শব্দ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। যাক্, অনেক কষ্টে তাঁদের তো বোঝালাম ব্যাপারটা। এইসব হাঙ্গামা করতেই বেলা গেল কাবার হয়ে। সকালের অধিবেশনের কোনও বক্তৃতাই আর শোনা হলো না।

এরপর দুপুরের খাওয়া এবং সাজ-পোশাক করতেই বেলা তিনটে বেজে গেল। চারটের সময় ভারতের শুচিশুভ্র খদ্দরের চোস্ত শেরওয়ানী গায়ে চড়িয়ে, মাথায় গান্ধীটুপি লাগিয়ে যুব-কংগ্রেসের অধিবেশনে হাজির হলাম ভারতের মহাগুরুদের স্মরণ করে।

বিকালের অধিবেশনে সভাপতি মণ্ডলীতে আসন গ্রহণ করলেন জ্যাক ডেনি, ব্রেজিলের শ্রীমতী জুলিয়া সিলভা, আর অস্ট্রেলিয়ার চার্লস গিলফার্ড। এই অধিবেশনে আমার আগে বক্তৃতা দিলেন যথাক্রমে জর্দান, ফিনল্যান্ড, তুরস্ক, পাকিস্তান, কিউবা, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, কানাডা প্রভৃতি দেশের আমন্ত্রিত অতিথি অথবা প্রতিনিধিদলের নেতারা।

বক্তাদের মধ্যে পাকিস্তানের তিনজন প্রতিনিধির নেতা ডক্টর আব্বাস হামদানীর বক্তৃতায় তাঁর স্বদেশের কুৎসা থাকলেও ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আদর্শের ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রশংসাই ছিল, এবং ডক্টর হামদানী ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্বের প্রচেষ্টায় নেহরু ও মহম্মদ আলির মধ্যে যে আন্তরিক চেষ্টা চলছে, তা সার্থক হোক এই আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করলেন। ফিনল্যান্ডের ইয়ুথ কাউন্সিলের সেক্রেটারী

কার্তু ভার্গোও কতকগুলি বলিষ্ঠ ও যুক্তিসঙ্গত নির্দেশ যুব-কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত করলেন দেখে মনে মনে ভারী খুশি হলাম।

৬-৩৫ মিনিটে আমার ডাক পড়লো। দোতলার আসন থেকে নেমে গিয়ে বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াতেই সকলে আমাকে অভিনন্দিত করলেন। পনের মিনিট ধরে বক্তৃতা দিলাম। বক্তৃতায় যা বলেছিলাম সেদিন—সব কথা এখানে বলার জায়গা নেই। তবে এইটুকু জানাই, বলেছিলাম ঃ—

I am proud to belong to a country which has taught the world both tolerance and universal acceptance. *We believe not only in universal tolerance, but we accept all ideologies in the sphere of culture, religion and politics as true....* It has been possible only for great leaders like Raja Rammohan, Thakur Ramkrishna, Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Sri Aurobinda and last of all for Pandit Nehru, all of whom are very rational' liberal and worshippers of truth and tranquility." বলে এসেছি-" "Now every body is watching with great fear and doubt the new trend of battle of ideologies and 'isms', which are far more dangerous than war of arms, because without causing any physical harm it is destroying mental peace and harmony.... ultimately killing the mind in a living body ......এও বলেছি পৃথিবীর যুবক-যুবতীর মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চা ও চরিত্রের পবিত্রতা, ত্যাগ ও সেবার ভাবটি জাগিয়ে তুলতে না পারলে—পৃথিবীতে শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠার যতো বড় বড় কথাই বলা হোক না কেন, হবে তা মিথ্যা ও ব্যর্থতায় পরিণত। বক্তৃতা শেষ করবার আগে এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করে এসেছি ঃ—

I hope every young soul present in this assembly is representing, first of all his self-regarding senti-

ment, secondly his own ancient heritage, and lastly truth, service and love for humanity. I have joined this Congress with this great faith, that you will neither try to formulate the true code of youth-welfare under the pressure of any pressure group, nor you should be intolerent in giving pressures to friends who have joined this Congress with high hopes."

আমার বক্তৃতার ভিতর দিয়ে স্বামীজী ও গান্ধীজীর কথাই আমি নির্ভয়ে শুনিয়েছি বিশ্বের সহস্রাধিক যুব-প্রতিনিধিকে—তাই আমার বক্তৃতার বহু মতের সঙ্গে বহুজনের মতের মিল না হলেও মন দুলে উঠেছিল শাশ্বত সত্যের আহ্বানে। সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলেন। ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করলেন ভারতের শাশ্বত সত্য আদর্শকে। এমন কি এই গৌরবের আনন্দের ভাগ নিতে ভারতের কমরেডরাও একটু দ্বিধাতো করেনইনি বরং সবাই আনন্দে দাঁড়িয়ে উঠে হাসিমুখে অভিনন্দন জানালেন। অকপটে স্বীকার করলেন যে. ভারতের মুখ উজ্জ্বল করতে পেরেছি, অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছি ভারতের বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথি হওয়ার মর্যাদাকে।

বক্তৃতা শেষ করে আমার আসনে যাওয়ার পথে নানা দেশের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অনেকেই আমাকে ফুল দিলেন, করমর্দন করে। নিজ দেশের রীতি অনুযায়ী কেউ কেউ বা কোলাকুলি করে চুমো খেয়ে অভিনন্দিত করতে লাগলেন। তখন আমি হাতজোড় করে সবিনয়ে তাঁদের সকলকে একটি কথাই বলেছিলাম—

"I do humbly accept your loving homage not on my own behalf but on behalf of our Free India and its people, that have been from eternity truly craving to see real peace, friendship and freedom established everywhere in the universe."

বক্তৃতার শেষে আমার আসনে গিয়ে বসবার পরেও কয়েকজন এসে আমাকে ফুল দিয়ে করমর্দন করে গেলেন। বিভিন্ন দেশের কয়েকজন সংবাদপত্র-প্রতিনিধি এসে আমার বক্তৃতার কাগজটি চেয়ে নিলেন।

কিসব লিখে নিয়ে কাগজগুলি ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। ফিনল্যাণ্ডের প্রতিনিধি কার্তু ভার্গো (Kerttu Vargo) পাশে এসে বসলেন।

ভারতবর্ষের শান্তি ও মৈত্রীর যে আদর্শ ও শিক্ষার কথা বলেছি, তিনি তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন—ভারতের শান্তি ও মৈত্রীর যে আদর্শ তার তুলনা পৃথিবীর কোনও দেশে মেলে না।" উনি আমাকে বারবার ফিনল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ডেনমার্কের "LAND OG FOLK" পত্রিকার প্রতিনিধি ওলা ক্রোমান (OLE KROMANN) ও তাঁর স্ত্রী এসে জানতে চাইলেন যে আমি রুমানিয়া থেকে কোথায় যাবো? আমি জানালাম, সুযোগ সুবিধা হলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি দেখে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপ ঘুরে লণ্ডন থেকে দেশে ফিরবো। উনি জানালেন—আমি যেন অবশ্যই দেনমার্কেও যাই এবং কোপেনহ্যাগেন শহরে ওঁদের বাড়িতে অতিথি হই। বললাম—"ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে নিশ্চয়ই যাবো—আমন্ত্রণের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।"

বক্তৃতার পর বেশ কিছুক্ষণ অভিনন্দন এবং আলাপ আমন্ত্রণ-কারীদের ধাক্কায় আমার দুই সঙ্গী শ্রীমান ম্যানোলে ও শ্রীমতী এলেন কাছে ঘেঁসতে বা পাশে বসতে পারেননি। ক্রোমান দম্পতি চলে যেতে ম্যানোলে করমর্দন করে একগাল হেসে বললে "কন্‌গ্র্যাচুলেশন মিঃ ঘোষ। আপনার বক্তৃতা সকলের খুব ভালো লেগেছে।"

এলেনও করমর্দন করে অভিনন্দন জানালে এবং তাড়াতাড়ি একটা অরেঞ্জাদের বোতল খুলে এক গ্লাস কমলালেবুর সরবৎ আমার হাতে দিলে। ওদের দুজনকেই ধন্যবাদ দিলাম। এমন সময় কংগ্রেস হলের সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করতে শোনা গেল। কি ব্যাপার! জানা গেল জাপানের বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথি—বিশ্বশান্তি পরিষদের অন্যতম সদস্য জাপানী কবি ইকুয়ো ওয়ামা বক্তৃতা দেবেন।

ইকুয়ো ওয়ামা কবি মানুষ। বয়সও হয়েছে প্রায় ষাট-এর কাছাকাছি, তাই তাঁর বক্তৃতার ভাষা ও ভাব যেমন সুন্দর তেমনই বলবার কায়দা। শুনে মুগ্ধ হলাম। তিনিও পৃথিবীর যুবসমাজের কল্যাণে সেদিন একটি বড় দামী কথা বললেন। তিনি বললেন—

'বিশ্বের সমস্ত যুবক যুবতীকে কথা কমিয়ে জাতীয়তা ও ঐক্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে কঠোর শ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।' তাঁর বক্তৃতার শেষে অন্য সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে আমিও তাঁকে অভিনন্দিত করলাম। কবি ওয়ামার পর ইতালীর প্রতিনিধি আল্‌বিয়ানো ফ্রুল্লিন ও কিউবার প্রতিনিধি ফ্লাভিয়ো ব্রাভো বক্তৃতা দিলেন। এর পরেই ঐ দিনের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো।

এলেন তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল—আমার গাড়ি কোথায় আছে দেখবার জন্য। ম্যানোলে সেই ফাঁকে আমাকে একলা পেয়ে জানালে যে ওর 'রুমানিয়ান ও ইংরেজী' ভাষার বইটা ওকে ফেরত দিতে হবে। কারণ এর পরে হয়তো ওর সঙ্গে আমার দেখা না হতেও পারে। ও একটু বিশেষ কাজে নাকি অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। তবে এটাও বললে যে. 'এলেন'কে বইটার নাম লিখে দিলে সেই আমাকে ঐ বই একটা কিনে এনে দিতে পারবে। আমার সঙ্গে ফোলিও ব্যাগের মধ্যেই বইটা ছিল—তখনই সেটা বার করে বইটির নাম ইত্যাদি টুকে রেখে, ম্যানোলেকে বইটা ফিরিয়ে দিলাম।

এলেনও ফিরে এল। জানালে গাড়ি তৈরী. তবে তার আগে লাউঞ্জে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফার আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বললাম—"বেশ চলো।"

লাউঞ্জে যাবার পর এলেন প্রথমেই যাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে তিনি হচ্ছেন হাঙ্গারীর নামকরা খবরের কাগজ "Szabad Nep" অর্থাৎ "Free people" পত্রিকার প্রতিনিধি Andrew Kovesi তিনি আমার বক্তৃতার তারিফ করে অনুরোধ করলেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমি যদি তাঁকে একটি প্রবন্ধ লিখে দিই. তবে তিনি খুব খুশী হবেন। আমি জানালাম, "সময় করে লিখে দিতে পারলে আমিও খুশী হবো—অশেষ ধন্যবাদ।" তারপর তিনিই "Magyer Foto" মদাইর বা হাঙ্গারীর সরকারী ফটো এজেন্সীর প্রতিনিধি আলেকজাণ্ডার বোইয়ান-এর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন—তিনি আমার একটি

ফোটো তুলে নিলেন। এলেন আর একটি মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তিনি চেকোশ্লোভাকিয়ার C T K নিউজ এজেন্সীর প্রতিনিধি Ksenia Birulova—ভারী চমৎকার ব্যবহার ও মিষ্টি কথা। আমার বক্তৃতার ইংরেজী মূলটা চেয়ে নিয়ে উনিও ওঁর নিজের ভাষায় কি সব লিখে নিলেন এবং জানালেন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় গেলে আমি যেন 'প্রাহা' (প্রাগ) শহরে ওঁর খোঁজ করি। সবাই ওঁরা নাম ঠিকানা লিখে দিলেন বা কার্ড দিয়ে গেলেন। আমিও আমার কার্ড দিলাম।

এরপর একটি সুদর্শন যুবক এসে করমর্দন করে নিজের পরিচয় নিজেই দিলে, জানালে তার নাম ডেরিক স্টোন। গ্রেট ব্রিটেনের ব্যাপ্টিস্ট ইয়ুথের পক্ষ থেকে যুব কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। আমার বক্তৃতা তার খুবই ভাল লেগেছে—কারণ যুব-কংগ্রেসের একঘেয়ে বক্তৃতা শুনে সে নাকি তিতিবিরক্ত হয়ে গেছে। এমনকি পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে তখনই আমাকে সেটা দেখিয়ে জানালে যে, "Festival" কাগজের পক্ষ থেকে যুবকংগ্রেস সম্পর্কে তার মতামত জানতে চাইলে সে এই কথাগুলো লিখে দিয়েছে। দেখলাম সে লিখেছে—

"In my opinion the commissions were of greater value than the full sessions, because they allowed more individual contact and discussion to develop. Too often the speeches seemed to me to repeat the same generalities and couched in a harsh language which would not I think attract many young people from the "Western world" who still believe in peace and friendship. I have criticism of what I have seen here, but I am convinced of everyone's *sincerity*."

(১লা আগস্টের "Festival" পত্রিকায় এটি ছাপাও হয়েছিল)।

ভারী খুশী হলাম এই তরুণ যুবকের নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মন্তব্য পড়ে। ওর পিঠ চাপড়ে আদর করে বললাম—একেবারে হক কথা বলেছ—আমারও তাই মত।

এলেন ও ম্যানোলে অস্থির হয়ে উঠছে দেখে লাউঞ্জ ছেড়ে উঠতে

হলো। গাড়িতে উঠেই দেখলাম আমাকে দেওয়া ফুলের গুচ্ছগুলি, ওরা দুজনে মিলে গুছিয়ে নিয়ে এসেছে নিতান্ত সঞ্চয়ীর মতো। বললাম এগুলি দিয়ে কি হবে? এলেন হেসে বললে—"আপনার হোটেলের কামরাটা সাজিয়ে দিয়ে আসবো"

আমি বললাম—"অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী খুশী হবো তোমরা দুজনে এ ফুলগুলো নিয়ে তোমাদের ঘর সাজালে।"

এলেন বললে—"বারে! অন্যে আপনাকে যে ফুল দিয়েছে, সে ফুল দিলে আমরা নেবো কেন?" লজ্জিত হলাম এবং রীতিমত প্যাঁচেও পড়ে গেলাম। মানের দায়ে বলতে বাধ্য হলাম—"বেশ! নতুন ফুল কিনে দেব।"

—"খুশী হয়ে আমরাও নেব।" জবাব দিলে এলেন। ম্যানোলে বেচারা চুপ করেই রইলো।

যাক এলেনের নির্দেশে গাড়ি হোটেলের সামনে এসে থামলো। ম্যানোলের ঘাড়ে ফুলগুলোর বোঝা চাপিয়ে এলেন ৫২২নং ঘরের চাবি চেয়ে আনলে। তিনজনেই ঘরে গেলাম। এলেন ফুলদানির বাসি ফুলগুলো ফেলে দিয়ে নতুন ফুল সাজিয়ে দিলে সুন্দর করে। আমি সেই ফাঁকে টয়লেটে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে একটু চকচকে ঝকঝকে করে নিলুম নিজেকে।

তারপর ওদের বললাম—"তোমাদের কর্তব্য সুন্দরভাবেই তো তোমরা করলে, এজন্য ধন্যবাদ। এখন আমার কর্তব্যটুকু যাতে শেষ করতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করো। আমাকে নিয়ে চলো একটা ফুলের দোকানে।"

এলেন আর ম্যানোলে দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলো—"মিঃ ঘোষ কেন বাজে খরচ করবেন, ফুল আমাদের না দিলেও খুশী হবো।"

—"আমি কিন্তু তোমাদের নতুন ফুল কিনে না দেওয়া পর্যন্ত খুশী হবো না।"

ম্যানোলে বললে—"চলুন তাহলে আজ ব্যালচেস্কু স্কোয়ারে যাওয়া যাক্, ওখানে বেড়ানোও হবে, ফুলও কেনা যাবে।"

ব্যালচেস্কু স্কোয়ার মস্ত পার্ক। বুখারেস্ট শহরের কেন্দ্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সুন্দর বেড়াবার জায়গা দেখলাম বেশ কিছু লোক সেখানে বিকেলের দিকে বেড়াতে এসেছে গ্রামের ফুলওয়ালীরা তাদের কাছে বেসাত করতে রকমারী ফুলের পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। বসিয়েছে শোভা-সৌরভের হাট।

ফুলের সওদা করতে আমরাও হাজির হলাম এক ফুলপসারিণীর কাছে। দেখলাম ফুল কেনবার ব্যাপারে আমাদের দেশের মত সেখানেও পাঁচজনে দর-কষাকষি করছে ফষ্টিনষ্টি করছে, কিন্তু সওদা করছে কম। দু'তিনটে ফুলওয়ালীর দোকান ঘুরে এলেনও দর-কষাকষি করে বারো লেই থেকে দর নামিয়ে পাঁচ লেই অর্থাৎ প্রায় ন'সিকে দিয়ে দু'গুচ্ছ ফুলের দাম ঠিক করলে। আমি পাঁচ লেইর একখানা নোট দিয়ে ফুলগুলি নিয়ে ওদের দুজনকে উপহার দিলাম। ওরা দুজনেই আমাকে বারবার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালে।

ফুলকেনার ব্যাপারে এলেন আর ফুলওয়ালীর মধ্যে দরকষাকষির সময় রুমানিয়ান ভাষায় কথাবার্তা হলো। তার ষোল আনা বুঝে উঠতে না পারলেও কিছু কিছু শব্দ আমার নতুন ভাষাজ্ঞানের জালে ধরে যেটুকু বুঝলাম—তাতে বোঝা গেল গ্রামের ফুলওয়ালীর ঘরে অভাব কষ্ট আছে। আর সেই দোহাই দিয়ে তারা বারবার দাম বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করছে। তাদের কথাগুলো হয়তো অবিশ্বাস্যও নয়। কারণ ব্যালচেস্কু স্কোয়ারে ফুলওয়ালীদের সকলেরই সাজ-পোশাকের দৈন্যটা রকমারী রঙীন ফুলের সমারোহের পাশাপাশি বড় বেশী চোখে লাগল। অধিকাংশ ফুলওয়ালীই পুরুষদের গায়ের ছেঁড়া পুরানো ওয়েস্ট কোট পরে রয়েছে যে তা দেখলাম। ফুল যাঁরা কিনছেন, যাঁরা স্টেশনে স্টেশনে অপরূপ সাজে সেজে এসে ফুল দিয়েছিলেন—তাঁদের সাজপোশাকের সঙ্গে এদের সাজ-পোশাকের এতখানি তফাত যে আমার চোখে পড়বে, এটা আমি ভাবতেই পারিনি।

ফুলকেনা সারা হতেই তাড়া লাগাতে লাগলো এলেন—"চলুন সন্ধ্যা হয়ে এলো—আটটার আগেই হোটেলের বাইরের বাগানের ডিনার

টেবিল দখল করতে না পারলে গুমোট গরমে ঘরের ভিতর বসে খেতে হবে।"

এলেন, ম্যানোলে আমি তিনজনে এক টেবিলে বসলাম, আমার হোটেলের বন্ধু ও সঙ্গী মিঃ হ্যামার্সক্ল্যাগ ও তাঁর জার্মান-ভাষী *মহিলা ইনটারপ্রেটার মিস্ টিল্ডা আমাদের টেবিলে এসে বসলেন। হ্যামার্সক্ল্যাগ এলেনের নাম ও পরিচয় জেনে জানালেন যে, তাঁর স্ত্রীর নামও এলেন এবং তিনিও ক'দিন পরেই যুব-উৎসবে অস্ট্রিয়ার* প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আসছেন। নানা গল্প ও হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে সেদিনকার রাতের ভোজটা খুবই জমে উঠল।

খাওয়ার পর এলেন আর মানোলে আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিল। পরদিন সকালে আমি একটা বইয়ের দোকানে গিয়ে কিছু বই দেখতে চাই এবং ফটোর দোকানে গিয়ে কয়েকটা ফিল্ম কিনতে চাই জানালাম। এলেনও সঙ্গে সঙ্গে ওদের দেশের সরকারী বইয়ের দোকান "Liberira Noastre" বা 'আমাদের পুস্তকালয়' সম্বন্ধে গড় গড় করে অনেক কথাই বলে গেল। আমিও জেরা করতে ছাড়লাম না। জেরার মুখে অনেক কথাই বেরিয়ে এলো। বুঝলাম সুকৌশলে রুমানিয়ার সরকারই ওদেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকা ছাপানো, বই প্রকাশ করা, এমনকি বই বিক্রী করার সমস্ত ব্যাপারটাই নিয়ন্ত্রণ করেন। সরকারের বিনা অনুমোদনে কোনও লেখকের স্বাধীনভাবে পুস্তক-পত্রিকা ছাপাবার বা প্রকাশ করার কোনও উপায় নেই! এটাও জানা গেল সরকারের বিনা অনুমোদনে বিদেশের কোনও বই বা পত্র-পত্রিকাও ওদেশে আমদানী ক'রে যে কেউ বিক্রী করতেও পারে না।

গর্ব এবং আনন্দের সঙ্গে এলেন তার দেশের সুব্যবস্থার যে পরিচয়টুকুও প্রচার করলে, তাতে স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারতের এই লেখকটির যে মাথা ঘুরে গেল সে সেটা টের পেল না।

আমি বললাম—"চমৎকার ব্যবস্থা! বেশ! কাল স্বচক্ষে দেখা যাবে। আজ আমরা সবাই ক্লান্ত। ওঠা যাক। লা রিভিয়েদেরে! বিদায়।"

শ্রীমতী এলেন ও ম্যানোলেকে বিদায় দিয়ে হোটেলের নিজস্ব

কামরায় ফিরলাম—রাত তখন সাড়ে দশটা। তাড়াতাড়ি সাজ-পোশাক বদলে হাত-মুখ ধুয়ে রোজনামচা, চিঠিপত্র আর আমাদের পত্রিকার জন্য রিপোর্ট লিখতে বসলাম। (যদিও বুখারেস্ট থেকে পাঠানো চার পাঁচটি পোস্টকার্ড ছাড়া আমার যে সমস্ত চিঠি রিপোর্ট, ছবি এবং বক্তৃতার অনুলিপি ওখান থেকে পাঠিয়েছিলাম তার একটিও আজও পর্যন্ত এদেশে এসে পৌঁছয়নি)।

সারাদিনের ক্লান্তির পর ঘুমে চোখ জুড়ে আসতে লাগলো— তবু ঐ কাজগুলো শেষ না করে তো উপায় নেই।

কাজ শেষ হলো। দেখলাম, তারিখ বদলিয়েছে। রাত বারোটা বেজে গেছে। বিছানায় গিয়ে শুলাম।

সবে মাত্র ঘুমটি এসেছে—এমন সময় 'ক্রিরিরিং, ক্রিরিং শব্দে ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। এত রাত্রে টেলিফোন! ব্যাপার কি?"

টেলিফোন তুলে নিতেই মহিলা কণ্ঠে শুনতে পেলাম—'ইজ মিস্টার গোস স্পিকিং?" (ঘোষ মশায় কথা বলছেন কি?)।

*"আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি ঘোষ কথা বলছি, বলুন কি বলছেন?' (বলা-*বাহুল্য ইংরেজীতেই কথাবার্তা চললো)—

"আপনার বক্তৃতা শুনে রুমানিয়ার বহু বন্ধু খুশী হয়েছে; ভারতবর্ষের মতোই রুমানিয়াতেও সত্য, সুন্দর ও প্রকৃত শান্তির পূজারী বহু জন আছে, তাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা গ্রহণ করুন।

"ধন্যবাদ! আপনি কে?"

"নিনা—একজন রুমানিয়ান লেখিকা আমাদের দেখা হবে আলাপ হবে।"

"কোথায়? কবে?" জিজ্ঞেস করার আগেই ওপারে টেলিফোনটা রেখে দেওয়ার শব্দ শুনলাম। অবস্থাটা বিস্ময়-বিমূঢ়!

টেলিফোনটা রেখে দিলাম। কিন্তু অত যে ক্লান্তি অবসাদ ঘুমের তাড়া নিমেষে কোথায় যেন উড়ে গেল। আশা, আশঙ্কা, আনন্দ সব মিশিয়ে এক অদ্ভুত উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডায়েরীর পাতায় এক কোণে পদবী শুদ্ধ তাঁর পুরো নামটা লিখে
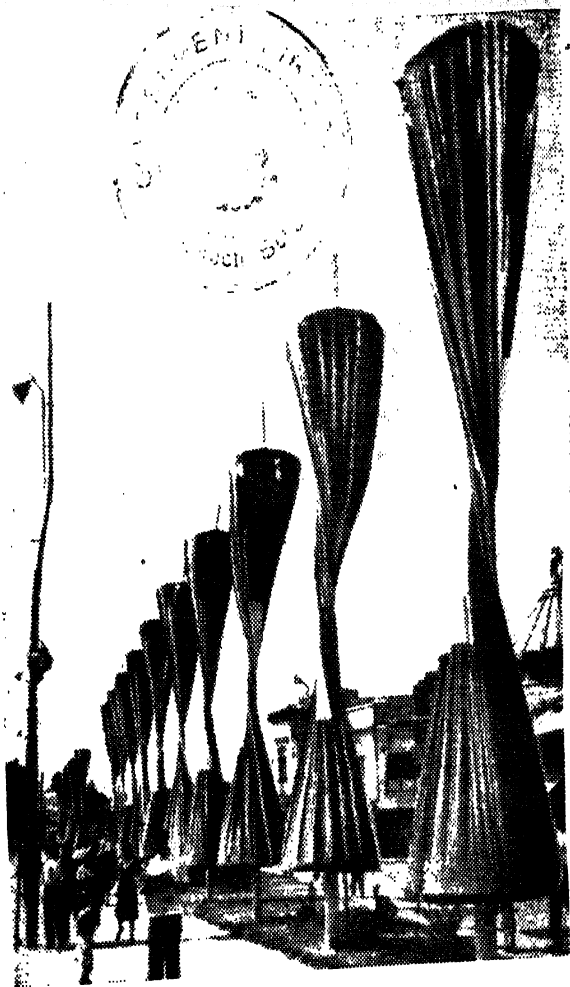
···সহরের রাজপথে পঞ্চ শক্তির পতাকার বাহার···

যুব উৎসবের 'যুবতী দিবসে' ভারতীয় মেয়ে কমরেডরা রাস্তায়
নাচতে নাচতে চলেছেন।

রাখলাম, পাছে ভুলে যাই। বিছানায় গিয়ে শুলাম; কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না ।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম। রুমানিয়ায় আজ কদিন হলো এসেছি, কিন্তু রুমানিয়ার সাধারণ মানুষের কাছাকাছি বড় বেশী আসতে পারিনি। দূর থেকে ওদের যতটুকু দেখেছি, ওদের দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে এই কদিনে যতটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, ওরা ভারতবাসীদের মতই শান্ত, মধুর, দরদী মানুষ। ভারতবর্ষের মতই রোদ, আলো, হাওয়া আর শ্যামল-সবুজ বনানীর শোভা ছায়া এদের জীবনকে সুখে-দুঃখে মধুর করে রেখেছে। অনুমানটা হয়তো মিথ্যে নয়, সেটারই প্রথম আভাস যেন ফুটে উঠল—টেলিফোনের সেতু বেয়ে ভেসে-আসা সে-রাতের সেই অপরিচিতার বন্ধুত্বের আশ্বাসে।

ভাবলাম, রুমানিয়ার বহুজনকে বন্ধুজন হিসেবে পেতে রুমানিয়ার সুখ-দুঃখে জড়ানো বাস্তব জীবনের পরিচয় নিতেই তো এসেছি এত দূরে। ভারতের আর পাঁচজনের মত এদেশে আসিনি স্বদেশের কুৎসা ও নিন্দা রটাতে। দাস মনোভাব নিয়ে আসিনি কোনও একটি বিশেষ দেশের বা বিশেষ গোষ্ঠীর জয়গান করতে।

সকল দেশের সকল মানুষের মধ্যে সত্য ও সুন্দরের স্বরূপ উপলব্ধি করাই খাঁটি মানুষের ধর্ম। সত্যকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র উপরের চাকন-চিকণ আর বাইরের সৌন্দর্যকে মানুষ যখন দেখতে এবং দেখাতে চায়, তখন তা হয়ে ওঠে মৃতের সৌন্দর্য—সুন্দর হয়েও তা ভয়াবহ, কারণ 'সত্যই' হলো সুন্দরের প্রাণ। সত্যকে জানতে হলে সব কিছুর মধ্যে অনেক কিছুকে নোংরা বলে মনে হয়, কিন্তু তাই বলে সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

'রুমানিয়ায় সত্য ও সুন্দরের পূজারী বহু আছে' একথাটি জেনে তাই সে রাতে ভারী আনন্দ হলো। মনে হলো কড়া পাহারায় ঘেরা এ দেশকে দেখা এবং জানা শক্ত হবে না, যদি বুদ্ধি, সাহস ও সততাকে কাজে লাগাতে পারি।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাইনি।

ঘুম ভাঙল পরের দিন ভোর পাঁচটায়।

স্নান, পুজোপাঠ সেরে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। দেখলাম, আগের আগের দিনের চেয়ে ভোরের দিকেই শহরের রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে। রকমারী পোশাক আর টুপি পরা তরুণ-তরুণীরা ছোট বড় দল বেঁধে চলেছে। দেখেই বুঝলাম—তিন দিন পরে যে বিশ্ব যুব ফেস্টিভ্যাল আরম্ভ হবে, তার অতিথিরা কিছু কিছু আসতে শুরু করেছে। রাস্তাঘাট তাই অন্যান্য দিনের চেয়ে সকাল সকাল পরিষ্কার হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, লক্ষ্য করলাম—রাস্তার দু পাশের ল্যাম্পপোস্টগুলোর মতই দোকানপাট আর ঘর-বাড়িগুলোও তাদের মাথায় গায়ে রংচঙে নিশান আর প্রাচীরপত্র লাগিয়েছে। অতিথিদের মন ভোলাতে সেজে উঠেছে উৎসবের সাজে। অর্থাৎ প্রথম এসে বুখারেস্ট শহরের যে সাজগোজ দেখেছিলাম, ক্রমশ তা জাঁকিয়ে উঠছে। আগের কদিন পথে ঘাটে দুঃখ-দুর্দশার যে সব ছবি দেখতে পেয়েছিলাম তেমন কিছুই নজরে পড়ল না। তবে দেখলাম, পুলিশরা অন্য দিনের চেয়ে অনেক সকালেই মোড়ে মোড়ে মোতায়েন হয়ে গেছে। সাহস হলো না বেশী দূর এগুতে। সকাল সকাল হোটেলে ফিরে এলাম।

হোটেলে ফেরার পরই হোটেলের পরিচারিকা 'পেরেশা' এসে আমার জামাকাপড় যেগুলো ধুতে দিয়েছিলাম, সেগুলো দিয়ে গেল। তার সংগে একটা বিলও দিলে। কাপড় ধোলাইয়ের বিল দেখে চক্ষু ছানাবড়া। একটা শার্ট কাচতে তিন লেই (এক টাকা পাঁচ আনা), গরম প্যাণ্ট ধোলাই—১৫ লেই (৬ টাকা ৯ আনা) রুমাল—১ লেই (সাত আনা)। গান্ধী টুপি ১ লেই (সাত আনা)। মোট ২০ লেই।

সংগে সংগে 'পেরশা'কে ধোপার বিল বাবদ কুড়ি লেই আর বকশিস দু' লেই চুকিয়ে দিলাম। পেরশা ভারী খুশী! ইংরেজী বলতে পারে না ব'লে ও খুব দুঃখ জানালে। আমি তখন ওকে অবাক করে দেবার জন্য বললাম—"Sa vorbestum din limba Romanesti"—এসো আমরা রুমানিয়ান ভাষায় কথা বলি।" আমার মুখে রুমানিয়ার ভাষা শুনে ও যেমন অবাক তেমনি খুশী! আমি

তখন ওকে আমার রুমানিয়ান ভাষার খাতাটা দেখিয়ে বোঝালাম যে, রুমানিয়ার ভাষা শেখবার চেষ্টা করছি, ভালো বলতে পারি না। খাতা দেখে ভাঙা ভাঙা রুমানিয়ান ভাষায় ওর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করে দেখলাম—মোটামুটি আমরা পরস্পরকে পরস্পরের কথা বোঝাতে পারছি। খুব আনন্দ হলো।

জানতে পারলাম ও এই হোটেলে চাকরি করে, ওর স্বামী একটা 'ফ্যাব্রিকা টেক্সটিলা' বা কাপড়ের কলে কাজ করে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে থাকে এই হোটেলেরই ছোট্ট একটা কামরায়। ছেলেমেয়ে দুটি। তারা গ্রামে তাদের দিদিমার কাছে থাকে। ওরা দুজনে চাকরি করে যা পায়, তাতে কষ্টে সৃষ্টে কোনও রকমে দিন চলে। বাপ-মা দু'জনের রোজগারেও ছেলেমেয়ে দুটোর খরচ কুলোতে পারে না বলেই ছেলেমেয়ে দুটোকে কাছে রাখতে পারে না। হোটেলের পরিচারিকা হলেও-পেরশা মায়ের জাত—মা। তাই সন্তানকে দূরে রাখার বেদনায় তার চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করে উঠলো। বললে—"মঁসিয়ে ঘোষ! তোমাকে আমার ছেলেমেয়ের ছবি দেখাবো।"

পেরশার কথা শুনে ভাবতে লাগলাম — কলকাতায় "RUMANIA" নামে প্রচার-পুস্তিকায় এদেশের শ্রমিকদের থাকবার জন্য ভালো ভালো কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে ব'লে যে সব কথা পড়েছি, আসলে তা ধাপ্পাবাজি।

কথায় কথায় কোথা দিয়ে সময় কেটে গেছে টের পাই নি। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। এলেন এসেছে, নীচে যেতে ডাকলে।

পেরশাকে জানালাম, "পরে কথা হবে—তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিও।" ও ভারী খুশী। কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে ধন্যবাদ জানাতে লাগলো।

নীচে লাউঞ্জে যেতেই মিঃ হামার্সক্র্যাগ জানালেন, রয়টারের মিঃ স্ট্যান্‌লী ক্লার্ক আমাকে খুঁজছিলেন, তিনি আমার বক্তৃতার কপিটি নাকি চান। মিঃ ক্লার্ক দূরেই ছিলেন। তিনি আমাকে

দেখতে পেয়ে 'সুপ্রভাত' জানিয়ে আমার বক্তৃতার কাগজটি চাইলেন। ওঁকে সেটি ব্যাগ থেকে বার করে দিলাম। উনি জানালেন, রিপোর্ট করে সেটি বিকালে ফেরত দেবেন। অতিথিরা যে যাঁর দোভাষীর সঙ্গে—উপবাস ভঙ্গ করতে গেলেন। আমার দোভাষী এলেনের তখনও দেখা নেই! এলেন তিনি দেরী করেই!

খুব দুঃখ প্রকাশ করে শ্রীমতী জানালেন গাড়িটা বিগড়ে যাওয়াতে তার আসতে দেরি হয়ে গেছে এবং আমার বেড়ানোর হয়তো কিছু অসুবিধা হতে পারে। আমি জানালাম—"অসুবিধা কিসের?" ভালই তো হবে পায়ে হেঁটে ঘুরে সব দেখা যাবে। তাছাড়া আমার ফিল্ম না কিনলেই নয়। ফটো তুলবো কি দিয়ে?" এলেন যথেষ্ট আপত্তি জানালে, কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে আমাকে নিয়ে রওনা হলো এথিনি প্যালেসে। সেখানে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়ে পথে বেরোলাম। বেলা তখন সাড়ে ন'টা।

রাস্তায় বের হ'তেই বুখারেস্টের বিখ্যাত এথিনিয়ামের সামনে দেখলাম, প্রকাণ্ড একটা আমেরিকান 'বুইক এইট' মোটর কার!

প্রশ্ন করলাম—"তোবারিশা! এমন গাড়িটা কার?" ও জানালে ওটার মালিক জাতীয় সরকার; কোনও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর গাড়ি!"

তাজ্জব ব্যাপার! এদেশের সরকারী উচ্চপদস্থের জন্যে আমেরিকার গাড়িও আমদানি করতে হয়। আমেরিকার সঙ্গে এদের আদায় কাঁচকলা। তা সত্ত্বেও—কিভাবে যে আমেরিকান গাড়ি ও-দেশে পৌঁছায়, তা জানবার খুব ইচ্ছে হলেও ভরসা করে সেটা আর এলেনকে জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

কয়েকটা ছোট ছোট রাস্তার অলি গলি বেয়ে আমরা দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চললাম। দেখলাম, পথে রুমানিয়ার বহু সাধারণ লোক থলি ঝুলি কাঁধে পিঠে ফেলে বাজার করে ফিরছে আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মতোই। পথের পাশে ছোট বড় ফুড স্টোর নজরে পড়লো। এলেনকে বললাম, চলো তোমাদের দেশের একটা দোকান দেখে আসি। কি আর করে বেচারা, নিয়ে গেল।

দেখলাম দোকানটা চমৎকার ক'রে বাইরে ভিতরে দিব্য সাজানো —যুব উৎসবের রকমারী রংচঙে নিশান ও ছবি দিয়ে। বড় বড় অক্ষরে দোকানের ভিতরে লেখা রয়েছে "Pace Si Prietenie" "শান্তি আর বন্ধুত্ব।" দোকানে রঙচঙে নানারকম লেবেল আঁটা বোতল আর টিনে ভর্তি খাবার। টিনের গায়ের ছবি ও বোতলের ভিতরকার মাল দেখে দোকানের হাল মালুম হলো। দেখলাম, বড় বড় লঙ্কা, টমেটো, গাজর, বীট ইত্যাদি মাল এবং জ্যাম, চাটনী বা আচার জাতীয় পদার্থেই দোকানের সবটা ভর্তি, সে তুলনায় মাখন বা মাছ. মাংস জাতীয় খাবার—যেমন Porc Butts, Viande Porc শূকর মাংস "Viande de Boeuf" "Langue de Boeuf" (গোমাংস) "Poule boulille et bouillon" (সিদ্ধ করা মুর্গীর মাংস) এমন লেবেল মারা টিনের সংখ্যা দোকানে এতই কম যে, সেটা বড় বেশী নজরে পড়লো।

(দোকানের এমন অবস্থা কেন সেটার ভালো প্রমাণ পেয়েছি রুমানিয়ান সরকারের "Planned economy of Rumanian People's Republic" বইটির ৪৫এর পৃষ্ঠায়। সেখানে লেখা আছে, "In 1952, 11.3 per cent more bread 38.5 per cent more jam etc. than in 1951 were distributed to the working population" রুটির চেয়ে লঙ্কা আর টমাটোর জ্যাম চাটনীটাই বেশী জুগিয়ে দেওয়া হয়েছে শ্রমিক মজুরদের খাদ্য তালিকায়!)

ওখান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিক চক্কর লাগিয়ে পেঁছিলাম গিয়ে একটা দোকানে। দোকানের ওপর লেখা "Laborator Fotografic" অর্থাৎ ফটোগ্রাফীর ল্যাবরেটরী। সেখানে আগের তোলা কয়েকটা ফিল্ম ডেভেলপ ও প্রিণ্ট করতে দিলাম এবং কয়েকটা নতুন ফিল্ম কিনলাম। ওরা রাশিয়ান ও জার্মান দু'রকম ফিল্ম দেখালে। ঐ দু'রকম ফিল্মই ওদের দেশে পাওয়া যায়, তবে দাম খুবই বেশী—এক একটা ফিল্মের রোলের দাম নিলে ১২ লেই অর্থাৎ ৫৲ টাকা ৪ আনা। যার দাম আমাদের দেশে

তিন টাকার মতো। ফটোর দোকানের মালিক ভারী চমৎকার মানুষ। একজন ভারতীয় তাঁর দোকানে গেছে, এই আনন্দে তিনি আর তাঁর খুড়িমা বুড়ি দুজনেই খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভারতের গান্ধী ও নেহরু সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। শুধু তাই নয়, বার বার "গান্ধী মারেলে"—"নেহরু মারেলে"। অর্থাৎ "গান্ধী মহান", "নেহরু মহান" এই কথাই জানাতে লাগলেন। ভারী ভালো লাগলো ওঁদের আন্তরিকতা। এলেন তাড়া লাগাতে লাগলো।

তাড়া খেয়ে সে পাড়া ছেড়ে খানিকটা হাঁটতেই আমরা ক্যালে ভিক্তোরিয়া রাস্তায় সরকারী বইয়ের দোকান "লিব্রেরিয়া নোগাস্ত্রা" পৌঁছে গেলাম।

বইয়ের দোকানটি চমৎকার করে সাজানো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উৎসব উপলক্ষে, অনেক বিদেশী অতিথি বই কিনতে আসছেন। তাই বই যাঁরা বিক্রী করছেন, তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা বলতে পারেন এবং ওদেশের সাহিত্যের খোঁজ-খবর বাতলাতে পারেন; এমন দু'চার-জনকে এনে রাখা হয়েছে। এ ব্যবস্থাটি আমার খুবই ভালো লাগলো, কারণ শ্রীমতী এলেনের পক্ষে রুমানিয়ার সাহিত্যের অত খবর আমাকে দেওয়া সম্ভব হতো না।

তবে বইয়ের দোকানে ও'রা সেদিন যেসব রুমানিয়ান গ্রন্থকারের ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান অনুবাদগুলি আমাকে দেখালেন তাঁর মধ্যে আগের যুগের নামকরা পুরানো রুমানিয়ান লেখক ও কবিদের কোনও বইয়ের বিদেশী অনুবাদ তো দেখলাম না। প্রবীণদের মধ্যে মিখাইল সাদোভিয়ানুর কয়েকখানি বই নজরে পড়লো। নতুন যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে তরুণ গ্রন্থকার 'পেত্রু দুমিত্রু'র (Petru Dumitru) নাম জানতে পারলাম। তাঁর লেখা বই "Noptil din Iunie" (জুন মাসের রাত্রি) Aurel Baranga-র "Iarbarea" (রুগ্ন তৃণ) Alexandru Sabia-র ছোট গল্প প্রভৃতি কতকগুলি বইয়ের বিদেশী ভাষার অনুবাদ দেখলাম। নিকোলা মোরারু (Nicolae Moraru) ও কারাজিয়েল (I. L. Caragiale)-এর

লেখা রুমানিয়ান ভাষার কয়েকটা বইও দেখলাম। দামের তুলনায় বইগুলির ছাপা বাঁধাই খুবই সুন্দর। রুমানিয়ায় এসে বইগুলিই সবচেয়ে শস্তা জিনিস মনে হলো, তাই ঝোঁকের মাথায় এক গাদা রুমানিয়ান ও রাশিয়ান বই কিনে ফেললাম। রুমানিয়ার বইয়ের দোকানে রুমানিয়ান সাহিত্যের বইয়ের চেয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার সাহিত্য, শিশু-সাহিত্য, ও প্রচার সাহিত্যের বইয়ের সংখ্যাই বেশী। সেগুলি যেমনি শস্তা, তেমনি লোভনীয়। সরকারী ব্যবস্থায় অন্য সব জিনিসের চেয়ে বইগুলিই যে শস্তা করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্যও মহৎ। বই দেখতে দেখতে বেলা একটা বেজে গেল।

এলেন তাড়া দিলে—লাঞ্চ খেতে যাওয়ার জন্য। ভাবলাম অতগুলো বই কি করে বয়ে নিয়ে যাবো। বইয়ের দোকানের লোক-গুলি জানালেন তাঁরা বইগুলি আমার হোটেলে পেঁাছে দিতে পারেন। এ ব্যবস্থাটাও আমার ভালো লাগলো।

বইয়ের সওদা সেরে সোজা গেলাম এথিনি প্যালেসে।

লাঞ্চে সেদিন মাছভাজা, মুরগী ও ভাত চাওয়া হলো। পেয়ে খুব খাওয়াও গেল। এলেন জানালে—আজ বিকেলে কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন ও উপহার-বিনিময় হবে, কাজেই সেখানে সকাল সকাল যাওয়া দরকার।

হোটেলে ফিরে তাড়াতাড়ি উপহারের যে সব জিনিস সঙ্গে নিয়ে গেছলাম—যেমন স্বদেশী গান ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড, নেহরুর 'স্বাধীনতার সনদ' বক্তৃতাটির রেকর্ড, কাঠের ও মাটির পুতুল; ক্যালকাটা কেমিক্যালের দেওয়া প্লাস্টিকের ক্যালেণ্ডার ইত্যাদি—সেগুলি দুজনে মিলে গোছগাছ করে নিলাম। এলেন আগেই টেলিফোন করে দিয়েছিল, যথা সময়ে গাড়ি এসে গেল—আমরা বিশ্বযুব কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনে গেলাম।

শেষ অধিবেশনে রুমানিয়ার প্রেসিডেন্ট পেত্রু গ্রোজা'র ধন্যবাদ ও বিশ্বযুব ফেডারেশনের জ্যাক ডেনীর আবেদনই উল্লেখযোগ্য। জ্যাক ডেনীর আবেদনে সে দিন বিশ্বের যুব সমাজের কাছে যে কথাগুলি

বলা হলো—তা আমার খুবই ভালো লাগলো। বিশ্বযুব কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের মধ্যে মহৎ যে অনেক কিছুই ছিল—এ কথা আগেও মেনে নিয়েছিলাম, সেদিনও তাই মনে হলো। শেষ অধিবেশনে বার বার উঠে দাঁড়িয়ে গান করা নাচ আর হাততালি দেওয়ার হিড়িক পড়ল। সবশেষে দেখা গেল রুমানিয়ার পক্ষ থেকে প্রায় একশোটি রুমানিয়ার যুব-যুবতী অপরূপ সুন্দর সাজে সেজে হলে ঢুকলো। ছোট বড় রকমারী উপহারের প্যাকেট নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধি-মণ্ডলীর কাছে গিয়ে তারা উপহার দেওয়া-নেওয়া শুরু করলে যখন, তখন চারিধারে মুহুর্মুহু হাততালি। উঠতে লাগলো হর্ষধ্বনি।

দুটি রুমানিয়ান যুবক-যুবতী আমাকেও একটি প্যাকেটে বেঁধে রুমানিয়ান কুটীর শিল্পের কয়েকটি সুন্দর উপহার দিয়ে গেল। ওদের দু'জনের সঙ্গে করমর্দন করে আমিও রুমানিয়ান যুবক-যুবতীদের দিলাম ভারতের পক্ষ থেকে কয়েকটি রেকর্ড ও অন্যান্য উপহার। W. F. D. Y.-র সেক্রেটারী জ্যাক ডেনীকে দেবো বলে যে উপহারগুলি সঙ্গে নিয়ে গেছলাম, ভিড় ঠেলে গিয়ে সেগুলি তাঁর বরাবরে আর পেঁছে দিতে পারলাম না। (পরের দিন তাই সেগুলি বন্ধুবর নির্মল বসুর হাত দিয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।) শেষ অধিবেশনে সকল দেশের যুবক-যুবতী মেতে উঠলো স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে। সে আনন্দের প্রকাশ দেখে সত্যিই মুগ্ধ হলাম—মনে হলো কংগ্রেসের আলোচনা, বক্তৃতায় সবাই সব জায়গায় মন থেকে সাড়া দিতে না পারলেও—এই যে সবাই বিভিন্ন মতবাদ দলাদলি ভুলে ক্ষণেকের গলাগলি করলো, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এর মূল্য বড় কম নয়।

সন্ধ্যায় স্তালিন পার্কে আজ এক সম্বর্ধনা-ভোজ অনুষ্ঠিত হবে, এলেন সেই ভোজের নিমন্ত্রণপত্রটি এনে দিলে। জানালে—সেখানে আমার আমন্ত্রণ আছে। অতএব কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলে ফিরতে হলো।

রুমানিয়ার ক্যাগারাস অঞ্চলের লোকনৃত্য

ভারতীয় খেলোয়াড়দল রাষ্ট্রীয় পতাকা সোজা করে নিয়ে যাচ্ছে।

উৎসবের উদ্বোধনে ভারতীয় কমরেডরা ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকা

মিনিট পাঁচশেক লাগলো স্নান সেরে পোশাক বদলে তৈরী হয়ে নীচে নামতে। এলেন মুখভার ক'রে জানালে সে আমার সঙ্গে যাবে না—অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে বাসে তুলে দেওয়ার দায় সেরে বিদায় নেবে।

সদয়া হয়ে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বার বার তাকে পীড়া-পীড়ি করতে সে জানালে, রিসেপশান বা ভোজ-সম্বর্ধনায় যাওয়ার উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ তার নেই। তাই সে ওখানে যেতে চায় না, এবং যাবেও না। এর উপর আর কথা চলে না—বাধ্য হয়ে আমাকে অন্যান্য বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে একলাই রওনা হতে হলো।

স্তালিন পার্কে হ্রদের ধারে—রকমারী আলো আর পতাকায় সাজানো বাগানে দেড় হাজার অতিথির জন্য খাদ্য পানীয়ের বিরাট ব্যবস্থা! যথা রাজসূয় ব্যাপার! অবাক না হয়ে পারিনি। প্রচুর পানাহার, বক্তৃতা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর রাত একটা অবধি নাচগান হৈ-হল্লা পুরোদমে চললো। এলেন সঙ্গে না আসায় এই উৎসবের পাশে বার বার তার দৈন্যের কথাটাই মনে খোঁচা হয়ে বিঁধতে লাগলো। মিঃ হামার্সক্ল্যাগ ও অন্যান্য, বিদেশী বন্ধু ও বান্ধবীরা বার বার এসে ওঁদের সঙ্গে নাচে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। আমি বললাম—"আমি নাচ দেখতেই ভালবাসি—দলে পড়ে নাচতে বা নাচাতে চাই না কাউকে।" নাচতে না হলেও ওখানে রাত একটা অবধি কাটাতে হলো—হোটেলে ফিরলাম রাত দেড়টায়।

রুমানিয়ার অন্তরলোকে

আগের দিন রাত দেড়টায় হোটেলে ফিরেছিলাম। শুতে শুতেই রাত দুটো। তাই ঘুমের বহরটা পরের দিন প্রায় এক পহরের পাল্লায় একটু লম্বাই হলো। উঠে দেখি রোদ গড়াগড়ি খাচ্ছে ঘরের মেঝেতে। হাত ঘড়ি তুলে দেখি, ঘড়ির কাঁটা সকালের আড়াই ঘণ্টার চক্কর মেরে দৌড়ুচ্ছে সাড়ে সাতটার বেড়া ডিঙিয়ে।

বিছানা ছেড়ে দৌড়লাম বাথরুমে। স্নান সেরে ধোপ-দুরস্ত খদ্দরের শেরওয়ানী-চুস্ত অঙ্গে চড়িয়ে বসে গেলাম রোজনামচা লিখতে।

রোজনামচা আর দু' চারখানা চিঠিপত্তর যা লেখবার ছিল, লিখে সারলাম চটপট। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজলো, তখনও শ্রীমতী এলেন এলেন না দেখে অস্থির হয়ে পায়চারি করছিলাম। তেমন সময় হাততালির শব্দে চমকে উঠলাম। দেখি কি, হোটেল-বাড়ির সংলগ্ন আর একটি বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে আছে দুটি তরুণী! হাততালি দিয়ে, হাত নাড়িয়ে ওরাই ডাকছে আমাকে। জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম, দু হাত তুলে ভারতীয় রীতিতে ওঁদের নমস্কার করলাম।

ওঁদের মধ্যে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে—'চে নেচিও-নিলেতে?' (কোন্ জাতি?) প্রশ্নটি বোঝা খুব শক্ত হলো না। সহজেই জবাব দিতে পারলাম—"দ্রাজ সুরোরী আচেস্তা এম উন ইন্দিয়ানা" (প্রিয় ভগিনীগণ আমি একজন ভারতীয়)।

ওরা দুজনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—"ত্রায়াস্কা ইন্দি" (দীর্ঘজীবী হোক্ ভারত)! আমিও পাল্টা অভিনন্দন জানিয়ে বললাম "ত্রায়াস্কা রোমানা" (দীর্ঘজীবী হোক রুমানিয়া)। সুজনা দুজনাই হেসে গড়িয়ে পড়লো। ইসারা ক'রে ঘড়ি দেখিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে বেলা দুটোর সময় ওরা আমার সঙ্গে দেখা করতে

আসবে, নীচে হোটেলের দরজায়। আমি বললাম—গাটা! মুলতুমেস্ক! ("বেশতো অশেষ ধন্যবাদ")।

ঠিক তেমন সময় আমার ঘরের টেলিফোনে ঝঙ্কার উঠলো। মেয়ে দুটির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে, ছুটে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম। এলেন এসেছে, সে জানালে তার আসতে দেরি হওয়ার জন্য বিশেষ দুঃখিত, শিগ্গির যেন আমি নীচে নামি। তাড়াতাড়ি বার হতে হবে।

তৈরী ছিলাম, লিফ্‌টে চড়ে শোঁ করে নীচে নেমে গেলাম। নামতে নামতে মনে হলো, রুমানিয়ার ভাষার সেই বই একটা কিনতেই হবে। ওদের ভাষা কিছুটা শিখতে না পারলে কেমন করে রুমানিয়ার সাধারণ লোকজনের সঙ্গে মিশবো, কেমন করেই বা তাদের মনের কথা জানবো। ঠিক করলাম আজই এলেনকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বইটার খোঁজে বার হবো। সেদিন বইয়ের দোকানে গিয়ে সাহিত্যের আলোচনায় মেতে আসল বইটার খোঁজ নিতেই ভুলে গিয়েছি।

লাউঞ্জে যেতেই এলেন জানালে, "চলুন মিঃ ঘোষ, তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নিতে হবে, কারণ আজ বেলা সাড়ে দশটায় একদল সাংবাদিক ও অতিথিকে নিয়ে যাওয়া হবে "Emilia Irza" শিশু হাসপাতালটি দেখাতে।"

শিশুদের হাসপাতাল দেখাতে নিয়ে যাওয়া হবে, শুনে খুবই আনন্দ হলো ; কারণ শিশুদের জন্য যে সব নতুন ব্যবস্থা অন্যান্য দেশে হয়েছে, সেটা দেখবার জন্যই তো বিশেষ করে আমার ইউরোপে আসা।

এথিনি প্যালেসে দৌড়লাম ব্রেকফাস্ট খেতে। ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে ফলিও ব্যাগ থেকে রুমানিয়া ভাষা শেখবার সেই বইটার নাম লেখা কাগজখানা বার করে এলেনকে দেখালাম, বললাম,—"তুমি যদি দয়া করে এই বইটি আমাকে কিনে এনে দাও তবে বড় বাধিত হবো।"

কাগজে লেখা বইটার নাম দেখেই শ্রীমতী এলেনের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলো। সে বললে, "এ বইয়ের নাম আপনি পেলেন কোথা থেকে? এ সব বই এখন আর পাওয়া যায় না।"

আমি ইচ্ছে করে ম্যানোলের নামটা চেপে গেলাম। বললাম—

"ঐ বইটা একজন দোভাষীর কাছেই দেখেছি—সেই বলেছে বইয়ের দোকানে খোঁজ করলেই এ বইটা পাওয়া যাবে। তুমি একটু কষ্ট করে খুঁজে এনে দাও যদি—চিরঋণী থাকবো।"

এলেন বেশ বিরক্তির সঙ্গেই জবাব দিলে—"খুঁজে দেখবো, তবে পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারি না।" বলেই কাগজটা তার ভ্যানিটি ব্যাগে ভরতে যাচ্ছিল। আমি বললাম—"দয়া করে ও কাগজটা নিও না, বইটার নামটা লিখে নাও।" বইয়ের নামটি লিখে নিয়ে কাগজটি ফিরিয়ে দিলে। এলেনের হাবভাব দেখেই বুঝলাম ঐ বইটি পাওয় গেলেও এলেন ওটি আমাকে যে-কোনও কারণেই হোক এনে দেবে না যাই হোক তবু শ্রীমতীকে আগাম ধন্যবাদ দিয়ে রাখলাম।

সত্বর ব্রেকফাস্ট খেয়ে ফিরলাম হোটেলের চত্বরে। সেখা থেকে বাস ছাড়লো সাড়ে দশটায়। বিভিন্ন দেশের সাংবাদিক অতিথি আর তাঁদের দোভাষীর দল মিলে আমরা প্রায় চল্লিশজন রওনা হলাম।

বুখারেস্ট শহরের কয়েকটা রাস্তা পার হয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পেঁছে গেলাম Tei তেজ্ অঞ্চলে—'Emilia Irza' ইমিলিয়া ইর্শা শিশু হাসপাতালের ফটকে। ওখানে হাসপাতালের ডিরেক্টর, কয়েকজন ডাক্তার, নার্স ও সিস্টার আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

হাসপাতালের বাড়িটি পাঁচতলা। একেবারে আধুনিক ধরনের আনকোরা নতুন বাড়ি। ঝকঝকে তক্‌তকে, তবে খুব যে প্রকাণ্ড একটা কিছু তা নয়। জানা গেল, মাত্র কয়েক মাস আগে এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে। বাড়িটির বাইরে রকমারি ফুলের চারা ও লম্বা লম্বা এক রকমের গাছ। চারিধার দিব্যি ফাঁকা।

হাসপাতাল বাড়িটির ভিতরে ঢুকতেই নজরে পড়লো, ঘর এবং বারান্দাগুলো তেমন আধুনিক ধরনের করেই তৈরী, যাতে করে প্রচুর আলো-হাওয়া সর্বত্র পাওয়া যায়।

হাসপাতালের ডিরেক্টরের দপ্তর থেকে শুরু করে গবেষণাগার, ঔষধ দেওয়ার জায়গা, অপারেশন থিয়েটার, বাচ্চা রোগীদের খাবার

তৈরি করবার, এবং খাবার মজুত করে রাখার জায়গাগুলি দেখালেন ওঁরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। ওঁরাই জানালেন হাসপাতালের অধিকাংশ সাজ-সরঞ্জাম, এমন কি এটি তৈরি করার বেশির ভাগ খরচই যুগিয়েছেন—সোভিয়েট রাষ্ট্র।

এর পর আমরা বিভিন্ন রোগ ও বয়স অনুসারে ভাগ করে রাখা শিশুদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গেলাম। ওয়ার্ডগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তবে শিশুদের যে সব খাটে রাখা হয়েছে, সেগুলি খুব ছোট ছোট এবং তার বিছানাপত্র আমাদের দেশের মতই খুব সাধারণ ধরনের বলেই মনে হলো।

শিশু রোগীদের মধ্যে রিকেটগ্রস্ত ও খুব রোগা রোগা ছেলে-মেয়েও কিছু কিছু নজরে পড়লো। রোদ পোহানোর জন্য লতা-পাতায় সাজানো বারান্দায় তাদের খাটগুলি এনে রাখা হয়েছে। মাথায় খুস্কি ও খোশ-পাঁচড়া রোগে ভুগছে এমন শিশু রোগীও কিছু কিছু দেখলাম। এই দু' ধরনের শিশুরোগী দেখেই বোঝা গেল যে, ওদেশে এখনও খাদ্যব্যবস্থা ও বাসস্থানের পরিবেশের মধ্যে গলদ আছে। যাই হোক, এই হাসপাতালে বিনা পয়সায় শিশু রোগীদের চিকিৎসা করা হয় এবং ওষুধপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয় জেনে ভারী আনন্দ হলো।

কত বেড আছে জানতে চাইলাম। কর্তৃপক্ষ জানালেন, ঐ হাসপাতালে মোট দু'শ শিশু রোগীকে জায়গা দেওয়ার মত বেড আছে এবং এটাও জানালেন, শিশুদের জন্য এমন বিশেষ ধরনের হাসপাতাল বর্তমানে আর নেই, তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এমন হাসপাতাল আরও কয়েকটি গড়ে তোলা হবে। তবে বাচ্চাদের মধ্যে যক্ষ্মাগ্রস্তদের জন্য আলাদা একটা টি বি হাসপাতাল আছে।

এলেনকে বললাম—"কতজন ডাক্তার ও কতজন নার্স কাজ করেন এখানে।" এলেন প্রশ্ন করলে রুমানিয়ান জবানে, জবাবটাও এলো রুমানিয়ান ভাষায় "Douazeci si Patru de doctori Si Cincizeci Si Patru de Surori" রুমানিয়ান ভাষার সংখ্যা-গুলোর নাম জানা থাকায় বুঝলাম যে, চব্বিশ জন ডাক্তার চুয়ান্ন জন সিস্টার গোটা দিন রাতকে তিন দফায় ভাগাভাগি করে এদের দেখা

শোনা করেন। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এলেন আমাকে ইংরেজীতে ওটা বলবার সময় দুটো সংখ্যার সঙ্গে তিরিশ তিরিশ ফাউ যোগ ক'রে জানালে চুয়ান্ন জন ডাক্তার আর চুরাশি জন সিস্টার এদের দেখাশোনা করে।

মনে মনে হাসলাম, দোভাষীদের প্রচারকার্যের নমুনাটা দেখে আর এলেনের স্বরূপ জেনে! বিরক্ত হলেও বিরত রইলাম মুখে সেটি ব্যক্ত করতে। কোনও প্রতিবাদও করলাম না। তবে এটা খুবই সত্যি কথা, রুমানিয়ার শিশু হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ, ডাক্তার ও নার্সদের ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি।

হাসপাতাল দেখে ফিরে, সোজা সবাই নামলাম এথিনি প্যালেসে। কারণ ঘড়ির কাঁটা উঠেছে মধ্য-দিনের মিনারে। নিশানা দিচ্ছে মধ্যাহ্ন ভোজনের। খাওয়ার পর ওখান থেকেই বিদায় নিলে এলেন। ছুটলো—প্রেস অফিসে। জানিয়ে গেল বেলা চারটায় হোটেলে আসবে গাড়ি নিয়ে। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, ভাবলাম, বাঁচা গেল। ঘড়িতে তখন দুটো বেজেছে। হন্‌হনিয়ে পা চালালাম হোটেলের দিকে।

হোটেলের দরজায় পৌঁছে দেখি সকালবেলার নবপরিচিতা মেয়ে দুটি ঠিক তাদের কথামতো দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে। এক-জনের হাতে কাগজের একটি ঠোঙা। আমাকে দেখেই দৌড়ে এসে করমর্দন করে আমার হাতে কাগজের ঠোঙাটি দিয়ে বললে—"Acest este prezentand mica pentru noi prietan noastre" (এটি আমাদের নতুন বন্ধুর জন্য আনা সামান্যমাত্র উপহার)

ঠোঙা খুলে দেখি, এক ঠোঙা বিস্কুট—আমি বললাম—"Bravo Asta-i-foarte bine Multumesc!" (বাঃ ভারী চমৎকার! অনেক ধন্যবাদ)!

জিজ্ঞাসা করলাম—"cum va cheama" (তোমাদের নাম কি ?—)

একজন জবাব দিলে—'এলেনা', আর একজন—'ফ্লোরিকা'।

ওরা ভারী খুশী হয়ে বললে—"Vorbiti limbi Romana Foarte Bine" (আপনি চমৎকার রুমানিয়ান ভাষা বলেন)।

আমি বললাম—"Nu! Nu multa! Vorbescum cativa versuri" (না! খুব বেশী নয়! মাত্র কয়েকটি শব্দ বলতে পারি)।

তখন ফ্লোরিকা রুমানিয়ান ভাষাতেই বললে—আমিও ভাঙা ভাঙা ইংরেজী বলতে পারি। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তারপর রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ইংরেজী আর রুমানিয়ান ভাষায় জগাখিচুড়ী করে কোনোরকমে ওদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করা গেল।

জানা গেল—ওরা যেখান থেকে আমার সঙ্গে আলাপ করছিল, সেখানে ওরা কাজ করে। লাঞ্চের ছুটি হওয়ায় খেতে এসেছে বাইরে, এখনই আবার যেতে হবে কাজে। তাই 'আবার দেখা হবে' জানিয়ে ওরা বিদায় চাইলে। আমি ওদের দু'জনকে দু'টি ভারতীয় মুদ্রা ও গান্ধীজীর ছবি ছাপা ভারতীয় ডাকটিকিট উপহার দিলাম। ওরা দু'জনে ভারী খুশী। ধন্যবাদ জানাতে জানাতে চলে গেল।

আমিও ফিরলাম হোটেলের কামরায়। বিছানায় শুয়ে আগের দিনের কিনে আনা বইগুলি ওলটাতে পালটাতে লাগলাম। রুমানিয়ান ভাষার শব্দ লেখা খাতাটি নিয়ে বেশ মন দিয়ে পড়া মুখস্ত করতে লাগলাম; কারণ একটু আগেই এলেনা আর ফ্লোরিকার কথায় বুঝলাম ;ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে বিদেশীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও বন্ধুত্ব করবার সুযোগ দেওয়া হবে রুমানিয়ার জনসাধারণকে। নতুন বন্ধুত্বের মমত্বে মন মত্ত হলো। কিন্তু শ্রীমতী এলেন যেভাবে আমাকে আগলে রাখেন, আর যেভাবে চোখ রাঙান, তাতে তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সাধারণের সঙ্গে মিশবো কোন্ ফাঁকে—সেটাও রীতিমত ভাবনার বিষয় হয়ে উঠলো।

এই সব সাত পাঁচ যখন ভাবছি, ঠিক তেমন সময় দরজায় টক্ টক্ টোকা পড়লো।

উঠে গিয়ে দরজা খুললাম—দেখি স্বয়ং শ্রীমতী এলেন একেবারে

আমার কামরায় হাজির! সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি রুমানিয়ান ভাষার খাতাটা বিছানা থেকে তুলে নিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে বন্ধ করে রাখলাম।

বললাম—"এসো! এসো! বসো, বসো।"

এলেন বললে—"বসবার সময় নেই। শিগ্‌গির পোশাক পরে নীচে আসুন, "Contemporanul" পত্রিকার প্রতিনিধি আপনার জন্যে নীচে অপেক্ষা করছেন। ওঁরা আপনার কাছ থেকে একটা প্রবন্ধ চান। কালই সেটা লিখে দিতে হবে, অবশ্য তার জন্যে মজুরী পাবেন।"

বললাম—"ধন্যবাদ! আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আসছি।"

এলেন নীচে গেল। আমিও তৈরি হয়ে নীচে গেলাম।

'কনতেম্‌পোরানুল' পত্রিকার প্রতিনিধি জানালেন, ওরা আমার কাছ থেকে 'শান্তি' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ চান এবং কাল সকালেই সেটি ইংরেজীতে লিখে দিতে হবে। আমি বললাম, 'ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে শান্তির আদর্শ' এই নামে একটি প্রবন্ধ আমি লিখতে পারি'। প্রতিনিধি বললেন—'বেশ! তাই লিখবেন। তবে কালই যাতে পাই সে চেষ্টা করবেন।'

প্রতিনিধিটি বিদায় নেওয়ার পর এলেন আমাকে জানালে—বুখারেস্ট শহরের আশেপাশে নতুন অনেক এলাকা ও ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে, সেগুলি সে আমাকে দেখাতে নিয়ে যেতে চায়। আমি বললাম—'ওগুলো পরে একদিন দেখবো, আজ আমার মন চাইছে গাছপালা ঘেরা বনজঙ্গলে যেতে—ওখানেই প্রকৃত শান্তি বিরাজ করে। তোমাদের দেশে তেমন সুন্দর জায়গা আছে তো?'

এলেন বললে—নিশ্চয়ই আছে। চলো তোমাকে Baneasa বানিয়াসা জঙ্গলে ও বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়িয়ে আনবো।

গাড়িতে চেপে বসলাম—শহর থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আমরা 'বানিয়াসা'র জঙ্গলে পেঁছিলাম। যাওয়ার সময় 'বানিয়াসা' বিমানঘাটিটা পড়লো ডানধারে—এছাড়া গ্রামের পথ ও বহু ছোট বড় ক্ষেত খামার, চাষীদের ঘরবাড়ি ঘোড়াটানা গাড়ি নজরে পড়লো।

বানিয়াসা জঙ্গলের ছোট্ট সুন্দর একটা পার্কের মাঝখানে দোতলা একটা কাঠের বাড়িতে রেস্তোরাঁ রয়েছে। দেখলাম আশেপাশে সৈন্য ও পুলিশরা ঘোরাফেরা করছে। অমন শান্ত গম্ভীর বনের ধারেও পুলিশ আর সেপাইদের টহলদারি, পায়চারি! কৌতূহল চাপতে পারলাম না। এলেনকে এর কারণটা জিজ্ঞেস করতে সে সহজভাবে প্রশ্নটার জবাব দিয়ে জানালে—ঐখানেই কাছাকাছি রুমানিয়ান সৈন্যদের একটা ঘাটি রাখা হয়েছে, বিমান ঘাটিটাকে পাহারা দিয়ে আগলাবার জন্য।

আমি বললাম—আমাদের দেশের বিমান ঘাটিগুলো আগলাতে কিন্তু এমন করে সৈন্যসামন্ত রাখা হয় না। তোমাদের শান্তি ও সুখের দেশে এত ভয়টা কিসের ?

এলেন বেচারা ফাঁপরে পড়ে হাঁ ক'রেই রইল। জবাব দিতে পারলে না। যাক্ সোফার, এলেন আর আমি তিনজনেই বনের অলিগলি বেয়ে হেঁটে চললাম। ভারী ভালো লাগলো জায়গাটি। বললাম—'চমৎকার জায়গা !'

এলেন টিপ্পনি কেটে বললে—'ভারতীয়রা জঙ্গলের মানুষ, তাই মানুষের চেয়ে জঙ্গলেই ভালো লাগে।' হেসে বললাম—'ধন্যবাদ। রুমানিয়াবাসিনীর এবম্বিধ সৌজন্য ও জ্ঞানের প্রশংসা করি। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। আমরা প্রকৃতির পূজারী, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আমাদের বিশ্ববোধের শিক্ষা হয়, তাই বনভূমি ভালো লাগে।'

এলেন একটু লজ্জিতা হলেও পরাজিতা হলো না। বললে—'বিশ্ববোধের শিক্ষাটা ঠিক বুঝলাম না, বুঝিয়ে বলুন তো।'

অবুঝকে বোঝাতে বললাম যে, এই মুহূর্তে যদি তোমার চোখ দুটো বেঁধে শোঁ করে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য যে কোনও একটা দেশের জঙ্গলে নামাই, চোখটা খুলে দিয়ে প্রশ্ন করি—বলতো এ কোন্ দেশ ! পারবে কি বলতে তুমি সেটা ? পারবে না, কারণ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই বনভূমিতে সব দেশেই সেই এক শাশ্বত স্নিগ্ধরূপ; যার উপর মানুষ তার মোহের তৈরী ঐ জাত, ধর্ম

সমাজব্যবস্থার কোনও মোহরই মারতে পারেনি। সেই শাশ্বত সুন্দর, চিত্তে জাগায় প্রকৃত শান্তি ও ঐক্যের অনুভূতি। ভগবানের গড়া একটা দেশের বনভূমির সঙ্গে অন্য আর একটা দেশের বনের চেহারার ততটা তফাৎ থাকে না, যতটা তফাৎ থাকে মানুষের গড়া শহরের সঙ্গে শহরের। এলেন বললে—'কথাটা তোমার মেনে নিতে পারলাম না।'

সোফার বন্ধুটি কৌতূহলী হয়ে এলেনকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—আমি কি বললাম।

এলেনকে বললাম—সোফার বন্ধুটিকে অনুবাদ করে বলো আমি যা বললাম, দেখ না ওর কি মত? এলেন সোফার বন্ধুটিকে রুমানিয়ান ভাষায় আমি যা বললাম তা বলতেই ও একেবারে আমার হাত দুটো ধরে বললে—'ঠিক বলেছেন। খাঁটি সত্য কথা।' এলেন বেচারার মুখ দেখে মনে হলো, উনিও মনে মনে মেনেছেন কথাটি, তবে মুখে স্বীকার করতে চাইলেন না।

যাক্‌ জঙ্গলে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে ফেরবার পথে আমরা বুখারেস্টের বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলাম। সেখানেও ভারী সুন্দর পরিবেশ! রকমারী গাছ ও ফুল দেখে তৃপ্তির আনন্দ পেলাম। বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতরে একটা নিতান্ত সেকেলে সাধারণ খোলার ছাউনি দিয়ে ছাওয়া বাড়িতে একটা রেস্তোরাঁ রয়েছে।

ওখানে গিয়ে আমরা চা চাইলাম। চাইলেও চা এলো না। কালো কফি পাওয়া গেল। দুধ জুটলো না। দুধের অভাব যে ওদেশে আছে এবারও টের পাওয়া গেল। বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফিরলাম এথিনি প্যালেসে। তখন আটটা বেজেছে, গোধূলির ওড়না জড়িয়েছেন, সন্ধ্যাদেবী, নেমে আসছেন পৃথিবীর মাটিতে।

শহরে সন্ধ্যা নামলো। আমাদের গাড়িও এসে থামলো হোটেলের দরজায়। দেখলাম, হোটেলের সামনে, রিপাবলিক স্কোয়ারের চার পাশে, এথিনিয়ামের সামনের পার্কটায়—রুমানিয়ার হাজার হাজার ছেলেবুড়ো যুবকযুবতী নরনারীর জনতা। এমন ভিড়, এক

জায়গায় এতো লোকজন এর আগে ক'টা দিন তো দেখতে পাইনি। গাড়ি থেকে নামবার উপায় নেই। হোটেলের দরজার সামনে অন্য দিন যেখানে পুলিশের তাড়া আর কড়া পাহারায় কেউ বড় একটা কাছে ঘেঁসতে পেতো না, সেখানেও আজ লোক—গিজ্ গিজ্ করছে।

গাড়ি থেকে নামলাম। সব্বাই একেবারে ছেঁকে ধরলো। হেঁকে বললো—"কোন্ জাতি?" "কোন্ দেশের লোক?" এলেন ভিড় ঠেলে হাত ধরে আমাকে হোটেলের দরজা পার করে দিলে।

এলেনকে জিজ্ঞেস করলাম—কি ব্যাপার বলতো? এ ক'দিন তো এমনটা ঘটতে দেখিনি!"

এলেন জবাব দিলে—"ফেস্টিভ্যালের অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন, আজ থেকে তাই শুরু হলো "ফ্রেটারনাইজিং দি ফেস্টি-ভ্যাল" (উৎসবের মেলামেশা)।

এলেন সবটুকু খুলে না বললেও—বুঝলাম, এই ক'দিনে রুমানিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনের চার পাশে শাসন আর কড়াকড়ির যে বেড়াটা একটু আধটু নজরে পড়ছিল; যেটা ডিঙিয়ে এসে এদেশের মানুষ আর পাঁচটা দেশের মানুষের সঙ্গে ভরসা করে কথা বলতে, মিশতে পারছিল না, সেই বেড়া ক'দিনের জন্য সরিয়ে নেওয়া হলো, বিদেশী অতিথিদের ধোঁকা দিতে। এই খবরটার আভাস এলেনা আর ফ্লোরিকা আমাকে আগেই দিয়ে গেছলো। মনটা আনন্দে ভরে উঠলো এই ভেবে যে, যাক্ রুমানিয়াবাসীর অন্তরলোকের দুয়ার কিছুদিনের জন্য খোলা হলো বিশ্বযুব উৎসব উপলক্ষে।

দেখলাম, অন্য দিনের চেয়ে হোটেলের টেবিলের উপরে রকমারী পানীয়ের বোতলের ঘটা। চার পাশে নতুন অতিথিদের অদ্ভুত রঙচঙে বেশভূষার ছটা এবং ছোটাছুটিটা যথার্থই বাড়-বাড়ন্ত।

এলেন বললে—"ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে আমন্ত্রিত দেশ-বিদেশের নাম-করা খেলোয়াড়, গাইয়ে-বাজিয়ে, লেখক, শিল্পীরা অনেকেই এসে পেঁৗছাচ্ছেন।"

কয়েকজন নতুন অতিথির সঙ্গে এক টেবিলে বসলাম। আলাপ পরিচয়ে জানা গেল—একজন ইস্রাইলের লেখক Aron Meged, আর দু'জন ইতালীয়ান মহিলা—Maria Vittoria Mazza, ইনি ইতালীর পার্লামেণ্টের ডেপুটি, আর Laura Griffo, ইনি হলেন ইতালীর "Avanti" পত্রিকার সম্পাদিকা।

আমাদের দেশে খাওয়ার শেষে পান এবং পানীয়, ওদের দেশে খাওয়ার শুরুতেই পান—এবং সেটা মদ্যপান। সদ্যলব্ধ বন্ধু ও বান্ধবীরা জানতে চাইলেন, আমি কোন্ মদ্য পান করবো। আমি বললাম,—"রোজ যেটি পান করি। অদ্য সেটি এখনও টেবিলে পৌঁছান নি। সেটি হচ্ছে—অরেঞ্জাদ, কমলালেবুর সরবৎ।"

এলেন হেসে বললে—"আজ অরেঞ্জাদ পাওয়া যাবে না, সকলের অনুরোধ রেখে আজ একটু মদই চেখে দেখুন।" অন্যান্য বন্ধুরাও তার সঙ্গে সায় দিলেন। পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

আমি আমার গ্লাসে এক গ্লাস 'Borsec' অর্থাৎ ওদেশের মিনারেল ওয়াটার ঢেলে নিয়ে গ্লাসটা তুলে ধরে বললাম, "এই আমার পানীয়। এটা পান করেই আমি ইতালী এবং ইস্রাইলের সুখ-সমৃদ্ধি ও আপনাদের স্বাস্থ্য কামনা করছি।"

ব্যাপার বেগতিক দেখে—আমার গ্লাসের সঙ্গে বন্ধুরা গ্লাস ঠুকে পান আরম্ভ করলেন। এলেনও তার মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে অভিমানের সুরে বললে—"মিঃ ঘোষ! তুমি বড় বেরসিক!" আমি বললাম—"অভদ্রও কিছুটা, তাই না?"

পানপর্বের পর যথারীতি ভোজনপর্ব শুরু হলো। খাওয়ার মেনুতে ছয় দফা খাবার এলো। মাংসের পুর দেওয়া খাস্তা প্যাটিসের মত একটা মচ্‌মচে খাদ্যবস্তু চিবিয়ে বেশ সুখ পাওয়া গেল। ক্রীমের সঙ্গে আঙুর-আপেলের পিঠেটা মিঠেই লাগল।

খাওয়ার শেষে এলেন বললে—"আজ আর এখনই ঘুমুতে যাওয়া চলবে না মিঃ ঘোষ! খানিকটা হেঁটে বেড়াতে হবে, নাচতে হবে।"

বুঝলাম রঙিন পানীয়ের রঙ লেগেছে শ্রীমতীর মনে—কিন্তু আমার মনটা কেঁপে উঠলো। বললাম—"আমায় মাপ করো। আমি

সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত—কাজও অনেক জমে গেছে। এখন আমি হোটেলে ফিরতে চাই।"

এলেন নাছোড়বান্দা! সে আমার বগলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টানতে টানতে হোটেলের বাইরে রাস্তায় নিয়ে এলো।

রাস্তায় বেরুতেই চার পাশ থেকে একদল ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতী আমাকে ছেঁকে ধরলো। ছোট বড় রকমারী খাতা আর কাগজ বাড়িয়ে সবাই অটোগ্রাফ চায়। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েক-জনের খাতায় আমার নাম সেই সঙ্গে গান্ধী ও বিবেকানন্দের বাণী দু' এক ছত্তর করে লিখে দিলাম। তাতেও খাতা আর ফুরোয় না! —শেষটায় ভিড় এমনই বাড়লো যে, ভিড়ের চাপে মারা পড়ি আর কি? এলেন বার বার তাড়া লাগাতে লাগলো—আমাকে এবং চার পাশের জনতাকে। তাতে ভিড় নড়েও না, সরেও না। শেষটায় পুলিশ এসে ভিড় হটিয়ে—আমাদের রাস্তা করে দিলে।

এলেন আমাকে নিয়ে টানতে টানতে এক রকম দৌড়লই বলা চলে। যেতে যেতে বললে—"অটোগ্রাফ চাইলেই অমন হাঁ করে' দাঁড়িয়ে যাবেন না আর গান্ধী নাম বিলোবেন না মিঃ ঘোষ।"

ভিড়ের ধকল কাটালাম, কিন্তু এলেনের কবলমুক্ত হ'তে পারলাম না। হাঁটতে লাগলাম তার পায়ের তালে তাল মিলিয়ে। খানিকটা এগুতেই দূরে নজরে পড়লো বেশ একটা বড় জমায়েত। কানে ভেসে এলো মিষ্টি ছাঁদের বাজনার সুর, এলেন আনন্দে আটখানা হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো "পোরিনিৎসা। পোরিনিৎসা'।—আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বাজনা এবং বহুজনার মধ্যে ঢুকে পড়লো।

দেখি, পার্কের জনতার মাঝখানে একদল মেয়ে পুরুষ, বেশীর ভাগই রুমানিয়ান যুবতী, অন্যান্য দেশের বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে হাতধরাধরি করে গোল হয়ে নাচছে। এদের ঠিক মাঝখানে লম্বা মিশকালো একজন কাফ্রি যুবক তার মাথার উপর একটা মস্ত রুমাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ দেখি কি, ঐ কাফ্রি ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে একটি সোনাবরণ কন্যার গলার পেছনে

রুমালটা ফেললে। দু' হাতে রুমালের দু' কোণ ধরে তাকে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে এলো—গোল করা নাচিয়ে দলের রিংটার মাঝখানে। রুমালটা মাটিতে বিছিয়ে দুজনেই হাঁটু গেড়ে বসে একে অন্যকে চুমো খেলে! তারপর ছেলেটি মেয়েটির জায়গায় গিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলো। মেয়েটি আবার আর একটি ছেলের গলায় রুমাল দিয়ে ঐভাবে তাকে টেনে এনে হাঁটু গেড়ে বসে চুমো খেলে।

বাজনার তালে তালে নাচ আর চুমো চলতে লাগলো—এলেন আমাকে বার বার বলতে লাগলো, "এসো আমাদের জাতীয় লোকনৃত্যে যোগ দেবে এসো। এ নাচটা এমন কিছু শক্ত নয়।"

আমি বললাম—"খাঁটি ভারতীয়ের কাছে এ নাচ রীতিমত "শক্ত।" এলেন হেসে বললে—"বিদেশীদের এ নাচে নাচানো আমাদের পক্ষে একটুও শক্ত নয়।"

—"তাতো দেখতেই পাচ্ছি।"

বলতে বলতেই সহসা একদল রুমানিয়ান যুবক-যুবতী ভিড় করে এসে আমাদের দু'জনকে নাচের দলে ভিড়িয়ে নিলে। পালাবার পথ নেই, হাতধরাধরি করে গোল হয়ে ঘুরতে লাগলাম। এলেন হেসে হেসে আর সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরলে—আমার কানের কাছে মুখ এনে শুরু করলে চেঁচাতে—

পুনে পেরিনিৎসা তোস্ লেলিতো, ফেতিতো
সি সারুতা কু ফোলোস, লেলিতো ফেতিতো।
"Pune Perinita Tos Letito Fetito
Si Saruta Cu Folos Letito Fetito!"

আমিও ঘুরতে ঘুরতে গানের লাইনকটা সড়গড় করে নিয়ে ওর কানের কাছের মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এর মানে কি এলেন? এলেন বললে—"পেরিনিৎসা" মানে 'ছোট্ট বালিশ'। গানের কলির মানে হলো—"ওগো লেলিতো (ললিতের সঙ্গে মিল আছে) বালিশে মাথা রাখো, সোহাগভরে আমাকে চুমো খাও।"

আমি বললাম—"বালিশ কোথায়?"

এলেন জানালে—"প্রাচীনকালে ছোট ছোট বালিশ নিয়েই এই

লোকনৃত্য হতো, এখন বালিশের বদলে আমরা বড় রুমাল বা স্কার্ফ ব্যবহার করি।"

এলেনের কথা শেষ না হতেই—অদ্ভুত টুপী-পরা একটি ইতালীয়ানছেলে—এলেনের গলায় রুমালের বেড় দিলে, বাধ্য হয়ে এলেনকে আমার হাত ছেড়ে গোলের মাঝখানে যেতে হলো। আমি দেখলাম—এইবার এলেনের পালা এবং আমার পালাবার এই সুযোগ। বোঁ করে দু'পাশের দু'জনের হাত ছেড়ে, ভিড় ঠেলে সোজা বড় রাস্তায়। হন্‌হনিয়ে হোটেলের দিকে পা চালালাম।

রাত্রে বুখারেস্টের রাস্তায় চলতে গিয়ে দেখলাম—বুড়োবুড়িরা ছাড়া বড় কেউ একা একা হাঁটছেন না। জোড়া জোড়া যুবক-যুবতী, কোমর জড়িয়ে গলা জড়িয়ে বেড়িয়ে ফিরছেন। সৈনিক আর পুলিশরাও এক একটি যুবতীকে বগলদাবা করে নিয়ে চলেছেন। বিদেশী অতিথি এবং যুবক যুবতী প্রতিনিধিদের অনেককেই রুমানিয়ার তরুণ তরুণীদের গললগ্ন হয়ে গান করতে করতে হেঁটে যেতে দেখলাম। বুঝলাম—ফ্রেটারনাইজিং দি ফেস্টিভ্যাল! বিশ্ব-যুব উৎসবের বিশ্বপ্রেম লীলা শুরু হয়েছে!

ভাবলাম, এমন খাসা নাচ গান আর অবাধ মেলামেশার ব্যবস্থা যখন হয়েছে তখন দেশ-বিদেশের যুবক-যুবতীরা এই বিশ্বযুব উৎসবে যোগ দিয়ে 'স্বর্গের সন্ধান' নিয়েই ঘরে ফেরে যদি—নিশ্চয়ই তা খুব অন্যায় হবে না।

যাক্, ঘুরে ফিরে হোটেলে পেঁছালাম যখন—রাত তখন এগারোটা। পোশাক-পরিচ্ছদ খুলে—রোজনামচা লেখা চুকিয়ে বিছানা নিলাম। ঠিক করলাম, কাল সকালে এলেন আসবার আগেই রুমানিয়ান ভাষা শেখবার বইটা কিনে ফেলতেই হবে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো যখন, তখন ঘড়িতে সাতটা বেজেছে। সকালের কাজকর্ম সেরে—পোশাক পরে নীচে নেমে গেলাম এবং একাই বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়—বইয়ের দোকানের খোঁজে। খানিকটা

দূর গেছি—এমন সময় আগের দিনের পরিচিতা ফ্লোরিকার সঙ্গে দেখা।

ফ্লোরিকা সুপ্রভাত জানিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"এত সকালে একা একা কোথায় চলেছেন মিঃ ঘোষ?"

আমি বললাম—"একটা বই কিনতে চাই।"

—"কি বই?"

পকেট থেকে বার করে ওকে দেখালাম—বইয়ের নাম-লেখা কাগজটা।

ফ্লোরিকা কাগজটা দেখে বললে—"চলুন, কাছেই একটা বইয়ের দোকান আছে—ওখানে খুঁজে দেখা যাক্।"

মস্ত একটা বইয়ের দোকান। দোকানটি সবে খোলা হচ্ছে। আমরা দুজনেই প্রথম ঢুকলাম দোকানটিতে। ফ্লোরিকা দোকানের একটি মেয়েকে কাগজটি দিতেই মেয়েটি কি যেন সব বললে ফ্লোরিকাকে। ফ্লোরিকাও তাকে কি সব বোঝালে। মেয়েটি বইটি আনতে ভিতরে গেল। ফ্লোরিকা তখন আমাকে বললে—"আপনি একটিও কথা বলবেন না, বইটির দামও দিতে যাবেন না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন।"

মেয়েটি কাগজের প্যাকেটে মুড়ে এনে বইটি ফ্লোরিকার হাতে দিলে—ফ্লোরিকা ওর নিজের ব্যাগ থেকে পাঁচ লেই বার করে দাম চুকিয়ে দিলে।

রাস্তায় এসে ফ্লোরিকা বললে—"এই বইটি বি[illegible]দের জন্য নয়, শুধু মাত্র ইণ্টারপ্রেটারদের জন্য। তাই আপনার ইণ্টারপ্রেটার হিসাবে ওটা যে আমার নিজেরই দরকার, সেই কথা মেয়েটিকে বুঝিয়ে তবেই বইটা কিনতে পারলাম। এই বইটা খুব লুকিয়ে রাখবেন, কাউকে দেখাবেন না।"

"ম্যানোলের বইটা ফিরিয়ে নেওয়া," "এলেনের বইটা কিনে দিতে গররাজী হওয়া"—এ সমস্ত রহস্যই তখন উদ্ঘাটিত হলো আমার মনের পর্দায়। সেই সঙ্গে ফ্লোরিকার সঙ্গে দেখা হওয়া এবং এভাবে বইটা কিনতে পারার মধ্যে ভগবানের অশেষ কৃপার কথাই

মনে পড়লো। রুমানিয়ার অন্তরলোকে পৌঁছবার চাবিকাঠিটি হাতে পেলাম ভেবে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ফ্লোরিকাকে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগলাম। বইয়ের দামটা দিতে গেলাম ও নিলে না। হেসে বললে—"ধন্যবাদ! হিসেব বুঝে নেওয়ার এখন সময় নেই, আটটা বেজে গেছে, কাজে যেতে হবে।"

ফ্লোরিকা ওর কাজে চলে গেল। বলে গেল জানলা থেকে দেখা হবে।

আমি হোটেলে ঢুকে বইটা নিয়ে সোজা উপরে আমার ঘরে চলে গেলাম। বইটা সুটকেসে বন্ধ করে রাখলাম। প্যাকেট খুলে বইটার চেহারা দেখতে ইচ্ছে হলেও ভরসা করে খুলতে পারলাম না, কারণ আটটা বেজে গেছে, এলেন এসে পড়লেও এসে পড়তে পারে—এই ভয়ে।

কথায় বলে, "যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়।—সত্যিই তাই হলো! দরজায় টোকা পড়লো—টক্, টক্।

এলেন ঘরে ঢুকে প্রথমেই এক প্রস্থ অভিমান অনুযোগের অভিনয় করলে। বললে—"কাল রাত্রে ওভাবে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে আসাটা খুবই অন্যায় হয়েছে। এত উত্তেজিত হয়েছিলাম যে, কাল সারারাত ঘুমুতে পারিনি।" এর আর জবাব দেবো কি? চুপ করে রইলাম।

এলেন জানালে—ব্রেকফাস্ট খেয়ে প্রেস অফিসে যেতে হবে—সেখান থেকে আমাদের একদলকে নিয়ে যাওয়া হবে স্তালিন পার্কে—The "J. V. Stalin" Scanteia House বা রুমানিয়ার সরকারী ছাপাখানা দেখাতে।

দূর থেকে এই বিরাট বাড়িটা আগেই দেখেছি। শুনেছি, এই বিরাট ছাপাখানার বাড়িঘর, সাজ-সরঞ্জাম সবই স্তালিনের মহানুভবতা ও সোভিয়েট সরকারের বদান্যতায় পাওয়া গেছে, আর তাই এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে স্তালিনের নামটিও সগৌরবে জড়িয়ে রাখা হয়েছে। জেনেছি, এখান থেকেই সরকারী

নিয়ন্ত্রণে রুমানিয়ার বিভিন্ন ইউনিয়নের মুখপত্র হিসাবে নানা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা ছেপে প্রকাশ করা হয়। রুমানিয়ার কেন্দ্রীয় পিপলস্ পার্টির মুখপত্র "Scanteia"— "স্কানতেইয়া" (সূর্য) পত্রিকাও এখান থেকেই ছাপা হয়ে বেরোয়। তাই আমিও খুব উৎসাহিত হয়ে এলেনকে বার বার ধন্যবাদ জানালাম এই ব্যবস্থাটা করার জন্য।

মিনিট পনেরো কুড়ির মধ্যে এথিনি প্যালেসে গিয়ে প্রাতরাশে পরিতৃপ্ত হয়ে রওনা হলাম—"সি আই পারহন" ইউনিভার্সিটির আইন এবং দর্শনশাস্ত্রের ফ্যাকালটি ভবনের উদ্দেশ্যে। পারহন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও দর্শন বিভাগের এই বাড়িটিতেই বিশ্ব-যুব কংগ্রেস ও সম্মেলনের প্রেস-অফিস বা প্রচার বিভাগ খোলা হয়েছিল, একথা আগেই বলেছি।

অত তাড়াহুড়ো করে প্রেস অফিসে পৌঁছে জানা গেল—যাঁরা প্রেস দেখতে যাবেন, তাঁরা সবাই তখনও এসে পৌঁছাননি। আমি এলেনকে নিয়ে সারা বাড়িটা ঘুরে প্রেস অফিসের বিভিন্ন বিভাগ দেখলাম। সত্যিই ভারি অদ্ভুত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত। ওখানে ঘুরে ফিরে বেলা দশটা নাগাদ আমরা প্রায় ত্রিশজন সাংবাদিক ও অতিথি সরকারী ছাপাখানা দেখতে রওনা হলাম, মস্ত একটা বাসে করে। সঙ্গিনী এলেন সঙ্গে গেল না। প্রেস অফিস থেকে কয়েকজন পুরুষ দোভাষী দেওয়া হলো আমাদের সঙ্গে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা স্তালিন পার্কে বিরাট হ্রদের ধারে "জে-ভি স্তালিন 'স্কানতেইয়া' (সূর্য) হাউসে পৌঁছলাম। বাইরে থেকে দেখলাম বিরাট বাড়ির গোটাটা তখনও তৈরী হয়নি। (কিন্তু ওটি সম্পূর্ণ হলে যেমনটা দেখতে হবে তারই কল্পিত নক্সার একটা ক'রে ছবি আমাদের দেওয়া হয়েছিল)।

ছাপাখানার কর্তৃপক্ষ, 'স্কানতেইয়া' ও অন্যান্য নানা রুমানিয়ান পত্রপত্রিকার সম্পাদকরা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর নিয়ে যাওয়া হলো স্কানতেইয়া হাউসের রিসেপশন রুমে। সেখানে দেখলাম স্তালিনের প্রকাণ্ড ছবি ও মূর্তি রাখা হয়েছে—চারধারে

অসংখ্য রং-বেরংয়ের পতাকার মাঝখানে রুশ ও রুমানিয়ান ভাষায় লেখা রয়েছে 'শান্তি ও বন্ধুত্ব' স্লোগানটি। শুনলাম, সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার এবং যন্ত্রবিদ্‌রাই এই ছাপাখানার পরিকল্পনা করে দিয়েছেন এবং রুমানিয়ায় বসে থেকে ঐটিকে গড়ে তোলার ব্যাপারে রুমানিয়ানদের সাহায্য করছেন। কয়েক কোটি রুবল জুগিয়েছেন সোভিয়েট রাশিয়া। তাই ডবল তিনডবল মাইনেতে এখনও কয়েকজন রুশ বিশেষজ্ঞ ঐ ছাপাখানয় কাজ করেন।

এসব শুনে মনে হলো—"আমেরিকা ডলার ঢেলে ছোট বড় নানা রাষ্ট্রকে কেনা-গোলাম করে রাখছে।" এই বদনাম দিয়ে যে কার্যটির নিন্দায় কম্যুনিস্টরা পঞ্চমুখ; সেই কার্যটি সোভিয়েট রাষ্ট্রও করছেন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে! এই সংশয় সেদিন আমার মনেই যে শুধু জাগলো তা নয়, অনেক স্বাধীন রাষ্ট্রের সাংবাদিকদের মুখেও ঐ সংশয়টা প্রকাশ পেলো।

আমাদের জানানো হলো—'স্কানতেইয়া হাউসে'র সমস্ত বাড়িটা ঘুরে দেখতে মোট আট ঘণ্টা সময় লাগে, কাজেই তিন ঘণ্টায় যতটা সম্ভব, ততটুকুই আমাদের দেখানো হবে। রিসেপশন হলে আমাদের পানীয় ও সিগারেট পরিবেশন করা হলো।

বিদেশীদের জন্য রুমানিয়া থেকে বিভিন্ন ভাষায় যেসব প্রচার-পত্রিকা ও পুস্তিকা ছাপা হয়, তাও আমাদের কিছু কিছু দেওয়া হলো।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমাদের সবাইকে—যিনি যে ভাষাটি বুঝতে পারেন, সেই ভাষার দলে ভাগ ক'রে তেমনই এক একজন দোভাষী এবং গাইডের সঙ্গে ছাপাখানা দেখতে পাঠানো হলো।

নতুন বাড়িটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিরাট বিরাট হলঘরে এক একটি বিভাগ। বিভিন্ন ধরণের মেশিন ও যন্ত্রপাতিগুলিও বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সারি দিয়ে রীতিমত প্ল্যান করে বসানো। বিভিন্ন বিভাগেই কলকব্জা যন্ত্রপাতি যা দেখলাম, যেমন লাইনোটাইপ, রোটারী, ফ্ল্যাটবেড মেসিন, টেলিপ্রিণ্টার ইত্যাদি তার বেশিরভাগই

আনকোরা নতুন এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় তৈরী। কিছু কিছু মেশিন চেকোশ্লোভাকিয়া ও পূর্ব জার্মানীতে তৈরী।

যন্ত্রপাতি ও ঘরদোরগুলো যতটা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে—সে তুলনায় ছাপাখানার শ্রমিক-মজদুরদের পোশাক-পরিচ্ছদ ততটা চক্‌চকে নয়। কারুর কারুর জামা ও প্যাণ্ট ইত্যাদি যে সেলাই-করা তালি-মারা সেটাও আমাদের অনেকেরই নজরে পড়লো। অবশ্য প্রচার-পুস্তিকায় মাথায় টুপি চড়ানো অবস্থায় ছাপাখানার মজুরদের দাঁড় করিয়ে সাজানো ছবিই ছাপা হয়েছে।

দোভাষী এবং গাইডকে জিজ্ঞেস করলাম—"অনেকের গায়ে সেলাই-করা তালি-মারা পোশাক দেখছি, এর কারণটা কি?"

ভদ্রলোক বেশ সরলভাবেই জানালেন, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জামা-কাপড়ের ব্যাপারে এখনও রুমানিয়ায় যথেষ্ট ঘাটতি আছে—তার কারণ রুমানিয়ায় তুলা এবং রেশমের অভাব। লোকটি বললে—সোভিয়েট রাশিয়া কাঁচা তুলা ও রেশম জোগায় বটে, তবে তা থেকে রুমানিয়ার কাপড়ের কলে যেসব ছিট বা কাপড় তৈরি হয়, তার শতকরা আশি ভাগই এখন দিতে হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার ঋণ শোধ করতে। শুধু তাই নয়, তিনি অকপটেই জানালেন—রুমানিয়ায় এক বছরের জন্য একজন লোক মাত্র একজোড়া জুতো ও দু'প্রস্থ পোশাকের মতো কাপড় কিনতে পারে। রেশন-কার্ড দেখিয়ে সস্তা দামে। তার বেশী জুতো-জামা কিনতে হ'লে, কিনতে হয় চারগুণ দাম দিয়ে। তিনি জানালেন, সংসারের খরচ কুলিয়ে যারা এই বাড়তি জামা-জুতো কিনতে পারে না, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে সেলাই-তালি দেখা যায়, ওটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

দোভাষী ভদ্রলোকের সততা ও সত্য-কথায় আমি সত্যিই সেদিন ভারী খুশী হলাম, কারণ আমি এর আগেও রুমানিয়ার আরও কয়েকজনের কাছে রুমানিয়ার খাদ্য ও বস্ত্রের রেশন ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঐ একই খবর পেয়েছিলাম।

আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—সরকারী ছাপাখানায় পুরুষদের সঙ্গে সব বিভাগেই সমানে মেয়েরাও কাজ করছে যন্ত্রের

মতো। বিদেশীদের দেখে দু'দণ্ড হাঁ করে দাঁড়াবার বা কথা বলবার কোনও আগ্রহই তাদের চোখে-মুখে নেই। কৌতূহলের কৌতুকভরা হাসির মৃদু আভাসটুকুও বড় কারুর চোখে-মুখে দেখলাম না। ভারী কথা বলতে ইচ্ছে হলো ওদের কারো কারো সঙ্গে। ভরসা করে ইচ্ছেটা জানিয়ে ফেললাম দোভাষীকে।

দোভাষী বললেন—"বেশ তো!"

একটি জোয়ান ছেলে, ছাপাখানার মেকানিক, তার কাছেই নিয়ে গেলেন দোভাষী, জানালেন নাম তাঁর জর্জি রিস্তিয়া ('Gheorghe Ristea')

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"ক'ঘণ্টা আপনাকে কাজ করতে হয়? প্রশ্নটা রুমানিয়ান ভাষাতেই অনুবাদ করে দিলেন দোভাষী।

মেকানিক রুমানিয়ান ভাষায় জবাব দিলেন—"অবশ্যই আট ঘণ্টা।" দোভাষীর মারফৎ কথাবার্তা চললো।

—"আপনি মাসে কত মাইনে পান?" মেকানিকটি জবাব দিলে— ৩৫০ লেই (১৫৪৲ টাকা) হচ্ছে আমার বেসিক মাইনে, তবে যদি আমি Norm বা রোজের বাঁধা কাজের চেয়ে আট ঘণ্টায় বাড়তি কাজ দেখাতে পারি, যেটি প্রায়ই আমি করে থাকি, তাহলে আমি বাড়তি মাইনে পেয়ে থাকি। সময় সময় ডবলও পাই, তাতেই আমার বেশ চলে যায়—এই তো সবে বয়স আমার আঠারো।"

—আচ্ছা, আপনার মত 'নর্ম' বা বাঁধা মাপা কাজের বাইরে বাড়তি কাজ ক'রে ক'জন বাড়তি রোজগার করতে পারে?

মেকানিকটি তার স্বভাবসুলভ গর্বের হাসি হেসে বললেন— "সবাই তো আমার মতো জোয়ান নয়—অনেকেই পারে না।"

ওঁর কথা শুনে মনে বেশ খটকা লেগে গেল। দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলাম, রোজের বাঁধা কাজ বলতে কি বোঝায়?

উনি বুঝিয়ে দিলেন—সোভিয়েট কর্মপদ্ধতি অনুসারে ওদেশের, প্রত্যেক কল-কারখানায়, এমন কি আপিস দপ্তরের প্রত্যেকটি কর্মীর জন্য আট ঘণ্টার এক রোজে কার কতটা কাজ করতেই হবে—তার একটা নর্ম বা মাপ বেঁধে দেওয়া হয়। আট ঘণ্টায় যারা সেটুকু

কাজ পুরো করতে না পারে, তাদের মাসের বাঁধা মাইনে কাটা যায়। তবে আট ঘণ্টার মাপ-বাঁধা কাজের চেয়েও বাড়তি কাজ যারা করে দিতে পারে, তাদের বাড়তি মাইনে তো দেওয়াই হয়—শ্রমিক ইউনিয়নে পার্টির নেতাদের কাছে তার কদর-আদর দুই-ই যায় বেড়ে। তাদের তখন "স্টাখানোভাইট" Stakhanovite বা 'বীর মজদুর' আখ্যায় সম্মানিতও করা হয়। কাগজে ছবি ছাপা হয়। তাদের ভালো বাসস্থানও দেওয়া হয়। দোভাষীর কথাগুলো শুনে বিদেশী সঙ্গীরা কেউ কেউ একেবারে 'বাহবা' করে উঠলেন। দু'-চারজন গম্ভীরও হয়ে গেলেন।

তবে ব্যাপারটা সংক্ষেপে আমার বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝলাম তা হচ্ছে সাম্যের নামে একটিমাত্র দল-শাসিত রাজ্যে শ্রমিক মজদুরদের কাজ করবার শক্তির তারতম্য অনুসারে অসাম্য ও বিভেদের সৃষ্টি করা হচ্ছে। সাধারণ শ্রমিক, মজদুর ও কর্মীদের কতখানি কম মাইনে দিয়ে কতটা বেশী খাটিয়ে নিতে পারা যায়, সেই চেষ্টাই চলছে। আর তারই সহায়তায় প্রবর্তিত হয়েছে এই 'স্ট্যাখানোভাইট' প্রথা। মুষ্টিমেয় ধনিক ও বণিকের টাকার জোরে অন্য দেশের শ্রমিকদের উপর শোষণ ও পীড়ন চলে—আর এ সব দেশে পার্টির প্রভুরা মুষ্টিমেয় শ্রম-দানবের অমানুষিক শ্রমশক্তিকে মূলধন করেন। তাদেরই কাজের মাপকাঠির লাঠি দেখিয়ে সাধারণ শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করবার এই অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করেছেন।

জানা গেল এমনিতেও সাধারণ মজুর ও মেকানিকদের মধ্যে মাইনের তফাৎও আছে। বিশেষজ্ঞ ও ইঞ্জিনীয়ারদের মাইনে ১৮০০ থেকে ২২০০ লেই; একজন সাধারণ মজুরের মাইনে ১৫০ থেকে ১৮০ লেই—অর্থাৎ মোটামুটি ৬৫ থেকে ৮০ টাকার মতই। অথচ শ্রেণী বিভাগ, আয়ের তারতম্য সাম্যের দেশে নেই—এই কথাই কিন্তু জোর গলায় বার বার প্রচার করা হয়।

তিলে তিলে সঞ্চয় করে ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে বেশী টাকা উপার্জন করে অপরকে বঞ্চিত করাও যেমন অপরাধ, তেমনি অমানুষিক শক্তির অধিকারী হয়ে সেটাকে কাজে লাগিয়ে সহকর্মীদের

প্রতিযোগিতায় হটিয়ে দিয়ে আভিজাত্য, খ্যাতি ও বেশী অর্থ উপার্জন করার এই যে নীতি—এটাও তেমনই অপরাধ কি না, সেটা ভাবলেই বোঝা যাবে। মার্কস্ লেনিনের যে আদর্শকে এতদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি, সেই আদর্শকে বর্তমানে এসব দেশে এতখানি বিকৃত করা হচ্ছে দেখে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

যাক্, এর পরে জানা গেল—সরকারী এই ছাপাখানাটি ছাড়া আরও কয়েকটি ছাপাখানা বুখারেস্টে আছে—সেগুলিও সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে। বেসরকারী কোনও ছাপাখানা ওদেশে রাখা চলে না। সরকারী ছাপাখানা ছাড়া কোনও কিছু ছাপিয়ে বার করার উপায় ওদেশে নেই। এর জবাবে দোভাষীকে জানালাম—"আমাদের দেশ স্বাধীন ভারতবর্ষ—যা খুশি তুমি তাই যে কোনও প্রেস থেকে ছাপিয়ে নিতে পারো।"

দোভাষী শুধু ঢোঁক গিলে বললে—'তাই নাকি !'

সরকারী ছাপাখানার মধ্যে ক্যান্টিন, ক্লাব, পাঠাগার ইত্যাদির ব্যবস্থাও দেখানো হলো। সত্যিই প্রশংসনীয়, কিন্তু কাজ যারা করছে সেখানে, তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের স্পন্দন ও স্ফূর্তি নেই, কারণ রোজের বাঁধা কাজ তোলবার তাগিদেই তারা যন্ত্রের মত খেটে চলেছে। রুমানিয়ার সরকারী ছাপাখানায় রকমারী পত্র-পত্রিকার পাতায় রঙচঙে সুন্দর সুন্দর ছবি ছাপা দেখে পরিদর্শকরা বেশির ভাগই খুব তারিফ করে এলেন। কারণ তাঁদের দেশে বসে ঐসব সুন্দর সুন্দর ছবি ও পত্রিকা দেখেই আগে থেকেই তাঁদের অবস্থাটা হয়েই ছিল—'ফটো দেখে কনে ঠিক করার মতই।' দু'চারজন আমারই মত মুখভার করে এসে বাসে উঠলেন। মনে হলো, রুমানিয়ার সরকারী ছাপাখানা রুমানিয়ার অন্তরলোকের একখানা ভয়াবহ ছবি আমার মতোই তাঁদের অন্তরে ছেপে দিয়েছে।

সরকারী ছাপাখানা থেকে আবার এথিনি প্যালেসে। বেলা তখন প্রায় দুটো। সেখানেই এলেনের সঙ্গে দেখা হলো। তার খাওয়া তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এলেন জিজ্ঞেস করলে—"কেমন দেখলেন, আমাদের সরকারী ছাপাখানা?" আমি বললাম—"চমৎকার! মনের পাতায় স্পষ্ট ছবি ছেপে দিয়েছে।"

হামার্সক্ল্যাগ জানালে—তাঁর স্ত্রী এসে পেঁাছেছেন। তবে তিনি আছেন—অস্ট্রিয়ান যুবক-যুবতী প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনও এক হোস্টেলে, বিকেলে আলাপ হবে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। বললাম—'এটাই সবচেয়ে আনন্দের খবর! বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুপত্নীরও সঙ্গলাভ হলে, দিব্যি ক'দিন রঙ্গে কাটানো যাবে।"

হামার্সক্ল্যাগ তাড়াতাড়ি চলে গেলেন খাওয়া শেষ করে। আমার খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এলেন বসে রইল কাছে। খাওয়া শেষ করে ফটোর দোকানে গিয়ে যে ছবিগুলো করতে দিয়েছিলাম সেগুলো নিয়ে হোস্টেলে ফিরলাম। এলেন পেঁাছে দিয়ে চলে গেল—জানিয়ে গেল পাঁচটার সময় আসবে।

ঘরে ঢুকে জানলার ধারে যেতেই এলেনা আর ফ্লোরিকাকে দেখা গেল। সামনের বাড়ির জানলা থেকে ওরা আমাকে একটা খবরের কাগজ দেখাতে লাগলো।

ফ্লোরিকা জানালে—কাগজে আমার বক্তৃতার কথা ছাপা হয়েছে। আমি কাগজটা দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। অনুরোধ করলাম ওটা আমাকে দিয়ে যাওয়ার জন্য। ঘড়ি দেখিয়ে ইশারা করে জানালে পাঁচটার পর হোটেলের দরজায় দাঁড়াতে। ওরা ছুটির পর বাড়ি যাওয়ার সময় কাগজটা দিয়ে যাবে।

ভয়ানক গরম লাগতে লাগলো—পোশাক খুলে গেঞ্জি আর পায়জামা পরে বিছানায় গিয়ে শুলাম—রুমানিয়ান ভাষার বইটা নিয়ে। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতেই দেখি সাড়ে চারটা বেজেছে। ঘেমে নেয়ে গেছলাম। তাই স্নান-ঘরে গেলাম। স্নান সেরে পোশাক প'রে নীচে গিয়ে হোটেলের দরজায় দাঁড়ালাম। ফ্লোরিকা আর এলেনও রাস্তায় নেমে এলো।

ফ্লোরিকা আমাকে রুমানিয়ান ভাষায় ছাপা—আগের দিন অর্থাৎ

৩১শে জুলাই তারিখের 'Scanteia tineretului' অথবা 'তরুণ সূর্য' নামে ওয়ার্কিং ইয়ুথ ইউনিয়নের মুখপত্র দৈনিকটির এক কপি উপহার দিলে। দেখিয়ে দিলে—তিনের পাতার দ্বিতীয় কলমে আমার বক্তৃতা সম্বন্ধে যে কথাগুলি লেখা হয়েছে। ফ্লোরিকা অনুবাদ করে যা বললে—তাতে জানা গেল—আমার বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ করে প্রশংসাই করা হয়েছে।

এলেন ও ফ্লোরিকা অনুরোধ জানালে ওদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার জন্য। আমি বললাম—'ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই! এখনই আমার অভিভাবিকা শ্রীমতী এলেন এসে পড়বেন—তাঁকে ফাঁকি দিয়ে বেড়ানো কিভাবে সম্ভব, সেটাই যে বুঝে উঠতে পারছি না।'

ওরা দুজনে আমার অসহায় অবস্থার কথা জেনে খুব একচোট হেসে নিলে। তারপর বললে—'আমরাও পালাই! তোমার দোভাষী বান্ধবীটি আমাদের দেখতে পেলে আমরাও বিপদে পড়তে পারি।' ওরা চলে গেল!

লাউঞ্জে বসে তরুণদের খবরের কাগজটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখলাম চার পৃষ্ঠার কাগজ, অতি সাধারণ ছাপা, দাম ২০ বান (ছয় পয়সা)। বড় 'স্কানতেইয়া'ও চার পাতার কাগজ। তারও ঐ একই দাম (সে কাগজেও আমি দেখেছি, ও এনেছি।) ওদেশের কোনও পত্র-পত্রিকাতেই কোন বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। কারণ সাধারণের কেনবার ক্ষমতার মধ্যে নিত্য ব্যবহার্য তেমন কোনও জিনিসেরই বাড়তি উৎপাদন সেখানে নেই, যার জন্য বিজ্ঞাপন দরকার হতে পারে। বিলাস দ্রব্য কেনা সাধারণের ক্ষমতার বাইরে।

কমিউনিস্ট দেশগুলোর খবরেই কাগজ ভর্তি। বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ার নেতা আর নায়কদের বক্তৃতা আর বিবৃতি খুব বেশী। দুনিয়ার আর সব দেশের বড় বড় খবরও ওদেশের কাগজে বড় একটা ছাপা হয় না যে তা দেখলাম। ওদেশের খবরের কাগজ ও পত্র-পত্রিকা তাই অনেকগুলি সংগ্রহ করে নিয়েও এসেছি—কারণ আমার দেশের লোক তো ওসব দেশের রঙচঙে ছবিওয়ালা প্রচার-

সাহিত্য পড়ে এমনই কুল মজিয়ে বসে আছেন যে, প্রমাণ না দেখাতে পারলে বলবেন বিল্‌কুল মিথ্যা কথা।

লাউঞ্জে বসে কাগজখানা ওল্টাচ্ছি। তেমন সময় এলেন এসে গেল। জানতে চাইলে, আমি কোথায় বেড়াতে যেতে চাই। আমি বললাম—'আজ আমার মন চাইছে—রুমানিয়ার নদীর ধারে বেড়াতে—কাছে-পিঠে নদী কোথাও থাকলে সেখানে নিয়ে চলো।'

যথা আজ্ঞা শিরোধার্য। বেশ খানিক চক্কর লাগিয়ে বুখারেস্ট শহরের দক্ষিণ দিকে—নদীর ধারের রাস্তায় গাড়ি চললো। নদীর নাম 'Dambovita'। নদী না ব'লে সেটাকে নালাই বলা চলে। কিছুদূর পর্যন্ত নদীর ধারের রাস্তার মাঝখান দিয়ে ট্রাম চলেছে—তবে বড় বেশী ভিড় নেই গাড়িগুলোতে। পথে যেতে যেতে নজরে পড়লো—রুমানিয়ার স্টেট অপেরা হাউসের প্রকাণ্ড বাড়িটি। ট্রাম রাস্তা ছাড়িয়ে লিবার্টি পার্কের কাছ বরাবর গিয়ে গাড়ি থেকে নামলাম। গাড়ি থেকে নেমে নদীর ধারে বাঁধানো রাস্তা ধ'রে দুজনে অনেকক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম—বেশ নির্জন নিরালা জায়গা। শীর্ণ নদীর বুকে ঝিরঝির বয়ে চলেছে জলের ধারা—নদীর ধারের বাঁধানো পথে খুট্-খুট্ সুট্‌সুট্ চলেছে দুচারটি প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। বোধ হয় বেড়িয়ে ফিরছেন ঘরে।

সূর্য দেবও ফিরে গেলেন আপন আলয়ে। আমরা ফিরলাম—উৎসবের কোলাহল মুখরিত এথিনি প্যালেসের দরজায়।

দাম্বোভিতা নদীর তীর থেকে বেড়িয়ে ফেরবার পথে—গাড়ি থেকেই দেখতে পেলাম—শহরের রাস্তায় রকমারী পোশাক পরা, রকমারী চেহারার নানা দেশের যুবক-যুবতীর ভিড় বেড়ে গেছে। ক'দিন আগেও বুখারেস্টের যে সব রাস্তাঘাট নিরালা নিস্তব্ধ ছিল—হয়ে উঠেছে কোলাহল মুখর, সেজে উঠেছে আলো আর রঙীন নিশানের আভরণে। রাস্তাঘাটই শুধু উৎসবের সাজে সাজেনি, রুমানিয়ার তরুণ-তরুণীরাও রুমানিয়ার রকমারী কাজকরা, সুতোর নক্সাতোলা সাজপোশাকে সেজে চলেছে।

এথিনি প্যালেসের সামনে রিপাব্লিক স্কোয়ারে বহুলোক! আগের দিনের চেয়েও ভিড় বেড়ে গেছে যে, গাড়ি থেকে নামতেই তা ঠাহর হ'লো। হোটেলের দরজায় ভিড় হটাতে পুলিশ দলকে রীতিমত হিমসিম খেতে হ'চ্ছে। কোনওরকমে ভিড় ঠেলে তো হোটেলের ভিতরে পেঁছিলাম। সেখানেও অসম্ভব ভিড়, সমস্ত টেবিলই প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। টেবিলে খালি জায়গা খুঁজছি যখন আমরা, তখন অস্ট্রিয়ান বন্ধু মিঃ হামার্সক্ল্যাগ জানালেন, তাঁর টেবিলে আমাদের জায়গা রেখেছেন এবং মিসেস হামার্সক্ল্যাগ আমার সঙ্গে পরিচয়ের অপেক্ষা করছেন।

খবরটা শুনে খুবই আনন্দ হলো। হামার্সক্ল্যাগকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললাম—ওঁদের টেবিলের দিকে। দেখলাম—ওঁরা দুটি চেয়ার কাৎ ক'রে দিয়ে আমাদের আসন রিজার্ভ করে রেখেছেন।

টেবিলের কাছে যেতেই মিসেস হামার্সক্ল্যাগ—হাত বাড়িয়ে দিয়ে চমৎকার ইংরেজীতে বললেন—"আসুন মিঃ ঘোষ. আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। আপনার গল্প আমার স্বামীর মুখে অনেক শুনে ফেলেছি এরই মধ্যে, তবে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প ও খবর আমি শুনতে চাই আপনার মুখ থেকে।"

আমিও তাঁর করমর্দন করে' বললাম—"অনেক ধন্যবাদ! এ আর এমন বেশী দাবি কি? খুব আনন্দের সঙ্গেই শোনাতে পারবো, এবং শুনতেও পারবো আপনার মুখে অষ্ট্রিয়ার গল্প। আপনি তো চমৎকার ইংরেজী বলতে পরেন।"

মিঃ হ্যামার্সক্ল্যাগ বলে উঠলেন—"উনি আমার চেয়ে ইংরেজীতো ভালই বলেন, তাছাড়া ফরাসী ভাষাটা আরও ভাল জানেন। জানেন মিঃ ঘোষ! ও'র সামনে ইংরেজী ফরাসী বলতে আমার বড্ড ভয় করে। ভারী ভুল ধরেন।"

আমি বললাম—"শুধু ভাষাতেই নয়, আমাদের সব কিছুতেই

ওঁদের ভুল ধরবার অধিকার আছে। সেটা মেনে নিলে আমাদের আনন্দ আর গর্ব দুই-ই বাড়ে।"

ও'রা দু'জনেই হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মিঃ হ্যামার্সক্ল্যাগ ছ ফুটেরও বেশী লম্বা, ও'র স্ত্রী সে তুলনায় ছোট্ট খাট্টো মানুষটি, দেখতে সুন্দরীই বলা চলে। কথাবার্তাও ভারী মিষ্টি। গল্প করতে করতে জানা গেল উনি অস্ট্রিয়ার একটি কম্যুনিস্ট পত্রিকায় সংবাদ অনুবাদিকার কাজ করেন, তবে কট্টর কম্যুনিস্ট নন।

খাওয়ার টেবিলে খেতে খেতে সেদিন অনেক গল্পই হ'লো। খাওয়া যখন শেষ হ'লো—রাত তখন সাড়ে ন'টা।

মিঃ হ্যামার্সক্ল্যাগ জানালেন—আমাদের হোটেল হয়ে' উনি ও'র স্ত্রীকে পে'ছৈ দিতে যাবেন—তাঁর ডেলিগেশন ক্যাম্পে। ওঁর স্ত্রী সেখানেই থাকবেন ক'দিন। হোটেলে তাঁর যায়গা পাওয়া যায়নি।

এলেনকে বললাম—চলো আমরাও আপাতত হোটেলেই যাই ও'দের সঙ্গে। —এলেন বেশ গম্ভীর—বড় বিশেষ কিছু বললো না, চললো আমাদের সঙ্গে।

হোটেলে পে'ছে কামরার চাবি নিতে গিয়ে দেখি একটি চিঠি রয়েছে আমার নামে—একটি সাদা খামে। খুলে দেখি "Contemporanul" পত্রিকার প্রতিনিধি এসেছিলেন। তাঁদের পত্রিকার জন্য আমার প্রতিশ্রুত প্রবন্ধটি নিতে। দেখা না পেয়ে ফিরে গেছেন। পরের দিন আসবেন প্রবন্ধটি নিতে। সর্বনাশ! আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম প্রবন্ধটির কথা।

এলেনকে বললাম, "তুমিও তো মনে করিয়ে দাওনি, ব্যাপারটা? অতএব আজ এখানেই বিদায়। আমি যাই প্রবন্ধটা লিখে ফেলার চেষ্টা করি।"

এলেন গম্ভীর মুখে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ঘরে গিয়ে জামা জুতো খুলে লিখতে বসলাম। প্রথমেই সেরে ফেললাম—নিত্যকারের নিয়মমতো রোজনামচা লেখাটা। তারপর বসলাম প্রবন্ধ লিখতে।

রাত যখন দেড়টা, তখনও প্রবন্ধটা শেষ করে উঠতে পারলাম না; ঘন ঘন হাই উঠতে লাগলো। কাগজ কলম উঠিয়ে আমিও বিছানায় উঠলাম—ঘুমিয়ে পড়লাম পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো—যথারীতি ভোর পাঁচটায়। মুখ হাত ধুয়ে আবার লিখতে বসলাম। প্রবন্ধটা শেষ করলাম। সাতটা নাগাদ স্নান সেরে প্রার্থনা ক'রে জামাজুতো প'রে নীচে নামলাম। বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। কানে ভেসে এলো চারধার থেকে গান বাজনার শব্দ। রাস্তার দু'পাশে ল্যাম্পপোস্টে বাঁধা লাউড স্পীকার থেকেই ভেসে আসছে সুরের ঝঙ্কার। অত সকালেই রাস্তার লোকজনের ভিড়টা খুব বেশী।

নজরে পড়লো বড় বড় কয়েকটা লরী বোঝাই হ'য়ে চলেছে সাদা সিল্কের ঘাঘরা পরা—মাথায় লাল ফুলের মুকুট-পরা অসংখ্য যুবতী। আর তাদের পেছনে পর পর কয়েকটা লরীতে নানা রঙের ইউনিফর্ম পরা হাজার হাজার যুবকের দল। কী ব্যাপার! জানতে পারলাম, ওরা হচ্ছে রুমানিয়ার বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও কারখানার যুব-ইউনিয়নের সভ্য সভ্যা—ওরা বিকেলে বিশ্বযুব উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে, ব্যায়াম ও খেলাধুলা দেখাবে। তারই মহলা দিতে—সকাল থেকেই চলেছে "২৩শে আগস্ট" স্টেডিয়ামে।

রুমানিয়ার যুবক-যুবতীর দল লরীগুলোর উপর থেকে হাত নাড়িয়ে "পাচে সি প্রিয়েতেনিয়ে" চীৎকার করে রাস্তার লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। যে সমস্ত বিদেশী অতিথি যুবক-যুবতী পথ চলছিল—তারাও রাস্তা থেকে হাত নাড়িয়ে চীৎকার করে ওদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, রুমানিয়ার জনসাধারণ যারা ঐ সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা বড় কেউ তেমন করে' রুমানিয়ার ঐ সব যুবক-যুবতীদের উল্লাসধ্বনি দিয়ে উৎসাহিত করছে না। তবে বিদেশী অতিথিদেরই উৎসাহটা এ ব্যাপারে খুব বেশী ব'লেই যেন মনে হলো।

ফুটপাথের এক পাশে দাঁড়িয়ে—হাঁ করে এইসব রগড় দেখছি। হঠাৎ পেছন থেকে এসে কে যেন মৃদু চাপড় মেরে বললে—"হ্যালো মিঃ ঘোষ! হোয়াট ইউ ডুয়িং হিয়ার?" অর্থাৎ এখানে কি করছো মিঃ ঘোষ। ফিরে দেখি ফ্লোরিকা।

আমি বললাম—"উৎসবের উদ্যোগ পর্বটা দেখছি। কিন্তু তুমি যে আজ আপিস যাওনি, কি ব্যাপার?"

ফ্লোরিকা ভারী গলায় জানালে—"না বিশ্বযুব উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে আজ আমাদের ছুটি—এটুকুই আমাদের লাভ।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"তার মানে?"

ফ্লোরিকা বললে—"চলো হাঁটতে হাঁটতে তোমায় সব বলছি।"

হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে রাস্তার ধারে পার্কের একটা খালি বেঞ্চিতে বসলাম। ফ্লোরিকা সেদিন আমাকে যা বললে তাতে জানলাম—এই উৎসবের বিরাট খরচের টাকার যোগান দেবার জন্য কলকারখানা আপিস দপ্তরের সবাইকেই রোজের বেশী খাটতে হয়েছে। উৎপাদনের পড়তা কমিয়ে বাড়তি আয়ে হাজার হাজার লেই জুগিয়ে দিতে হয়েছে উৎসবের ব্যাপারে। একাধিক দিনের মাইনেটি বাধ্যতামূলক চাঁদা হিসাবে দান করতে হয়েছে। ফ্লোরিকার একথা যে মিথ্যা নয়, তা জানা যায় ৩১শে জুলাই Scantei Tinortului পত্রিকার ২০ পৃষ্ঠায় Targoviste-এর সংবাদদাতা Pulu Nicolae-এর পাঠানো খবরটি পড়লেই। খবরটিতে আছে, একমাত্র "তারগোভিস্তের" সোভিয়েট-রুমানিয়া পেট্রল কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগের শ্রমিকেরা তিন দিনের বেগার খেটে কত হাজার লেই জুগিয়েছে উৎসবটির জন্য। মেশিন কনস্ট্রাকশন বিভাগ জুগিয়েছে প্রায় ৪৫,০০০ লেই। রেকর্ড সেকশন জুগিয়েছে ৪৩,০০০ লেই। টার্নিং সেকশন জুগিয়েছে ২০,০০০ লেই।

এছাড়া রুমানিয়ার 'ইউনিয়ন অব্ ওয়ার্কিং ইয়ুথের' ও ইয়ুথ ব্রিগেডের কর্তারা হাজার হাজার যুবক যুবতীর কাছ থেকে এই শপথ আদায় করে নিয়েছিলেন, যে তারা বিনা বেতনে বা নামমাত্র মজুরি নিয়ে তাদের সমস্ত শক্তি ও শ্রম দিয়ে চার মাসের

মধ্যে বুখারেস্টের Vergu জেলার পতিত অঞ্চলে ৮০ হাজার লোক বসবার মত এক স্টেডিয়াম ও কালচারাল পার্ক গড়ে তুলবে। রুমানিয়ার “ইউনিয়ন অব্ ওয়ার্কিং ইয়ুথের” আহ্বানে সাড়া না দিয়ে, কাজ না করে উপায় নেই। রুমানিয়ার যুবক যুবতীদের বিশ্বযুব সম্মেলনের আহ্বায়ক হওয়ার গৌরবের লোভ দেখিয়ে তাদের মাতিয়ে তুলে কি প্রচণ্ড কাজই না করিয়ে নেওয়া হয়েছে এই কয় মাসে। “২৩শে আগস্ট” পার্ক ও স্টেডিয়ামটি ছাড়া ঐ পার্কে একটা বিরাট Open-Air-Theatre তৈরী করিয়ে নেওয়া হয়েছে, “Grivita Rosie” ও “২৩শে আগস্ট” নামে অঞ্চলটিতে দুটো সিনেমা হাউস গড়ে নেওয়া হয়েছে বিশ্বযুব সম্মেলনের দোহাই দিয়ে। বুখারেস্টের সবচেয়ে বড় থিয়েটার Music Theatre এই বিশ্বযুব উৎসব উপলক্ষে খোলা হবে—এই তাগিদ দিয়ে তৈরী করিয়ে নেওয়া হয়েছে। বেকার যুবক যুবতীকে নামমাত্র মজুরিতে ভূতের মত খাটিয়ে।

ফ্লোরিকা আরও জানালে—এই বিশ্ব যুব উৎসবের হিড়িক তুলে বুখারেস্টের পথ ঘাট সবই যা'তে তাড়াতাড়ি নতুন ক'রে গ'ড়ে ওঠে তার জন্য অদ্ভুত কৌশল কাজে লাগানো হয়েছে। হাজার হাজার গাছ আস্ত তুলে এনে বসানো হয়েছে—মোড়ে মোড়ে পার্ক তৈরী করে ফেলা হয়েছে। আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম—বললাম—“কি ক'রে তা সম্ভব?”

ফ্লোরিকা বললে—“আমাদের দেশের যুবক যুবতীরা বিশ্বের যুবক যুবতীদের সঙ্গে মেলামেশা করবার, তাদের নাচ গান, অভিনয় দেখাবার আনন্দ পাবে, বিশ্বের অন্য সমস্ত দেশের যুবক যুবতীদের মত স্বাধীন গণতান্ত্রিক অধিকার পাবে। রুমানিয়ার বাইরের দেশে যেতে পাবে। এই আশাতেই মেতে উঠে সরল সহজ মন নিয়ে তারা অসাধ্য সাধন করেছে। সেই আশাটুকু তাদের সফল হ'লে তবেই সব সার্থক হবে।” বলে ফ্লোরিকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে—দেখলাম ওর চোখ দু'টো জলে ভরে উঠেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম। "রুমানিয়ার বাইরের দেশগুলিতে যাওয়ার অধিকার তোমাদের নেই নাকি?"

—"দেশের ভিতরে চলাফেরা করতেই 'বুলেটিন দি আইদিন-তিতেত' বা 'পরিচয়পত্র' লাগে প্রত্যেকটি মানুষের। তা জান কি?"

আমি অবাক! "তবে যে যুব কংগ্রেসে বিভিন্ন দেশের যুবক যুবতীদের অবাধ ভ্রমণ সম্বন্ধে বড় বড় প্রস্তাব করা হলো।"

ও শুধু জবাব দিলে—ঐটাই তো মজা!

আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। শুধু জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি উৎসব দেখতে যাবে না ফ্লোরিকা?"

ফ্লোরিকা বললে—"না! সকলের বসবার মত যায়গা তো নেই স্টেডিয়ামে। মাত্র আশি হাজার লোক বসবার জায়গা আছে—তার মধ্যে তিরিশ হাজার হ'চ্ছে বিদেশের অতিথি। বাকি পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে সরকারী কর্মচারী, পার্টি আর ইউনিয়নের নেতারা থাকবেন। আপনি তো যাবেন সেখানে, দেখবেন রুমানিয়ার যুবক যুবতীর দল কি প্রাণবন্ত! আশা আনন্দে কতখানি উচ্ছল! মনে রাখবেন—ওদের উচ্ছলতার আড়ালে বহু মা-বাবার চোখের জল ঝরছে।

আমি বললাম—"তার পরিচয় আমি কিছু পেয়েছি; কিন্তু উৎসবের দিনে তোমার চোখে জল কেন?"

ফ্লোরিকা হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে বেঞ্চি থেকে উঠে পড়ে বললে—"সে সব কথা বলতে পারবো না। আজ বিদায়!" বলেই সে হন্ হন্ করে চলে গেল। আমিও উঠে পড়লাম বেশ একটু ভয় পেয়েই।

হোটেলে ফিরলাম যখন তখন ঘড়িতে বেলা ন'টা, দেখলাম এলেন তখনও আসেনি। কয়েক মিনিট পরেই এলেন হাজির হলেন হাঁফাতে হাঁফাতে। জানালে—আজ ফেস্টিভ্যাল আরম্ভ হবে বেলা চারটায়। দু'টোর সময় বাস ছাড়বে হোটেল থেকে। আমাকে দলের সঙ্গে

যেতে হবে। এলেন সঙ্গে যাবে না! কারণ তারও কোনও আসন নেই উৎসবে!

এলেন আর আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে এলাম এথিনি প্যালেস থেকে। ফিরে এসে হোটেলের লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে লাগলাম, “Contemporanul” পত্রিকার প্রতিনিধির জন্য। উপর থেকে প্রবন্ধটা এনে এলেনকে পড়ে শোনালাম। এলেন অকপটেই স্বীকার করলে—ভারতের ওসব দার্শনিক তত্ত্ব তার মাথায় ঢোকে না।

এলেনকে বললাম—“আমি আজ সকালে—একা একা বেশ খানিকটা বেড়িয়ে এলাম। দেখলাম সব রুমানিয়ান ছেলেমেয়েরা উৎসবের সাজে সেজে যাচ্ছে।”

এলেন চোখ বড় বড় করে বললে—“একা একা বেড়াতে যাবেন না, রাস্তা হারিয়ে হয়রান হবেন। তাছাড়া গাড়ি ঘোড়া চাপা পড়বার ভয়ও তো আছে। না! না! দোহাই আপনার, আপনি কখনও একলাটি বেরুবেন না, বিপদ আপদ হ'লে আমারই ফ্যাসাদ।”

আমি বললাম—“রাস্তা ঘাট চেনবার মত বুদ্ধি এবং মাথা, আর গাড়ি ঘোড়া দেখবার মতো চোখ দু'টো কি আমার নেই বলে মনে হচ্ছে তোমার?”

এলেন রসিকতা করে বললে—“দু'টো চোখ কেন? রীতিমত চারটে চোখই তো আপনার। তবু বলছি, একা একা বের হবেন না।”

এই সব কথা হচ্ছে—তেমন সময় ‘কনতেম্‌পোরানুল’ পত্রিকার প্রতিনিধি এসে হাজির হলেন।

তাঁকে প্রবন্ধটি প'ড়ে শোনালাম। তিনি বুঝলেন কিনা জানি না, তবে বললেন—“খুব ভালই হয়েছে”। তারপর প্রতিনিধিটির সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা গেল। ওঁকে জানালাম, রুমানিয়ান ভাষায় অনুবাদ করার আগে ওঁরা যেন প্রবন্ধটা ইংরেজীতে টাইপ করিয়ে আমাকে একটা নকল দেন। উনি জানিয়ে গেলেন—ক'দিন পরে পারিশ্রমিক আর একটা নকল পাওয়া যাবে। প্রতিনিধি চলে গেলেন।

এলেন বললে—“বারোটা বাজে—চলুন ভিড় হবার আগে লাঞ্চটা সেরে আসা যাক। আজ সকাল সকাল লাঞ্চ পরিবেশন করা হবে।”

—যথা আজ্ঞা! তাড়াতাড়ি গিয়ে লাঞ্চ খেয়ে ফিরলাম যখন হোটেলে—তখন বেলা ১টা বেজে গেছে। উৎসবে যাওয়ার জন্যে পোশাক বদলে সেজেগুজে তৈরি হয়ে, ক্যামেরাটা নিয়ে নীচে নেমে এলাম।

এলেন Mrs. Magheru নামে একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে জানালে যে, উনিই আমাদের দলের গাইড হয়ে বিশ্বযুব উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবেন। এলেন চলে গেল, আমরা লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

দুটোর সময় বাস আসতেই ডাক পড়লো। বাসে চেপে রওনা হলাম রুমানিয়ার স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতিতে তৈরি "২৩শে আগস্ট" স্টেডিয়াম ও পার্কটির উদ্দেশ্যে।

খানিক দূর যেতেই দেখা গেল, রাস্তায় বিভিন্ন দেশের নাম লেখা শত শত লরী ও বাসে ঐ সব দেশের দর্শক ও প্রতিনিধিরা যে যার জাতীয় পোশাকে সেজে, গান গাইতে গাইতে চলেছে। হেঁটেও চলেছে কোনও কোনও দল। বাসগুলো চলতে শুরু করলে শামুকের গতিতে। জায়গায় জায়গায় রুমানিয়ার বিভিন্ন ইউনিয়নের যুবক যুবতীরা রঙচঙে অদ্ভুত পোশাকে সেজে দলবেঁধে ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বাসের যাত্রী—বিদেশীদের ফুল দিচ্ছে; চেঁচাচ্ছে, শ্লোগান দিচ্ছে। ছুটে এসে হাতে হাত মেলাচ্ছে। রাস্তার দু' পাশে দূরে ফুটপাথের উপর ভিড় করে দাঁড়িয়েছে এসে কাতারে কাতারে রুমানিয়ার জনসাধারণ। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার—অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা! বর্মার সাংবাদিকা Mrs. Daw Amah আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি খুবই উল্লসিতা। গাড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে চললো—বিশ্বযুব উৎসবের প্রাঙ্গণের দিকে।

প্রায় হাজার তিরিশেক অতিথিকে বোঝাই করে নিয়ে চলেছে পর পর হাজারখানেক বাস, লরীর আশেপাশে আগে পিছে চলেছে হোমরা চোমরাদের গাড়ি। তার উপর আছে হাঁটাপথের হাজার লোকের জনতা; ফুল দেওয়া আর করমর্দনের হিড়িক।

এমন টানা-হেঁচড়ায় গাড়ি কি আর চলে! কিছুদূর গড়িয়ে যায়, আবার থামে। এমনি করে চলতে চলতে ঘণ্টাখানেক পরে—আমাদের গাড়িও এক জায়গায় এসে একেবারে থেমে গেল। জানানো হলো—গাড়ি আর যাবে না। এবার হেঁটে সকলকে এগুতে হবে উৎসব প্রাঙ্গণে—"২৩শে আগস্ট" স্টেডিয়ামের দিকে।

বাস থেকে নেমে বুখারেস্টের নতুন গড়ে ওঠা এলাকা "২৩শে আগস্ট" অঞ্চলের ফুটপাথ ধরে আমরা গুটি গুটি এগুতে লাগলাম। নতুন সব রাস্তা তৈরি হয়েছে—তখনও পিচ্ ঢালা হয়নি, কাজেই লক্ষ লোকের চরণাঘাতে ধুলোয় ধুলো চারিধার। ধুলো আর ধাক্কা খেতে খেতে জনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চললাম। দেখলাম, ঐ অঞ্চলে—নতুন ঘর বাড়িও কিছু কিছু তৈরি হয়েছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটবার পর—"২৩শে আগস্ট" স্টেডিয়ামের দরজায় পেঁছলাম। সেখানে ভিড়ের চাপে রোদের হলকানিতে প্রাণ যায় আর কি! যাই হোক্, আমরা বিশিষ্ট ও আমন্ত্রিত অতিথিদের দলে পড়ি—আর মিসেস ম্যাঘেরু আমাদের সঙ্গে ছিলেন বলে—আর পাঁচজনের মতো নাকাল হ'তে হলো না, তবে দেখলাম—জনসাধারণকে কিভাবে পুলিশ ও ভলাণ্টিয়ারদের ধাক্কা ও তাড়া খেতে হচ্ছে।

"২৩শে আগস্ট" স্টেডিয়ামের বাইরের বিরাট প্রাঙ্গণে ঢুকে আমরা এগিয়ে গিয়ে—প্রায় শ' খানেক সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম স্টেডিয়ামের উপরে।—সেখানে আবার নম্বর দেওয়া আলাদা আলাদা প্রবেশপথ। আমাদের জন্য নির্ধারিত প্রবেশপথ ও আসন খুঁজে বার করতে—মিসেস ম্যাঘেরুর সঙ্গে একবার এ দরজা একবার সে দরজায় মাথা খুঁড়তে হলো। মনে হলো, এ অবস্থাটা শুধু আমাদের দেশেই হয় না, সব দেশেই হয়। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত মিসেস ম্যাঘেরু ওখানকার ভলাণ্টিয়ারদের সহায়তায় আমাদের প্রবেশপথ ও আসন খুঁজে বার করে দিলেন।

স্টেডিয়ামের পশ্চিমদিকে মাননীয় অতিথিদের জন্য ছাউনি দেওয়া ছায়াঢাকা ট্রিবিউনে (পুলিশ ও মিলিটারী পাহারায় সুরক্ষিত) যে বিশেষ আসনগুলি ছিল—তারই মধ্যে আমরা বসবার জায়গা

পেলাম। আমরা রোদের হাত থেকে বাঁচলাম কিন্তু দেখলাম—কাঠফাটা রোদে—স্টেডিয়ামের গ্যাল্যারী জুড়ে চারিধারে হাজার হাজার লোক বসে গেছে। স্টেডিয়ামের সবচেয়ে উপরের ধাপে পাঁচিলের উপরে—চারিধারে নানা দেশের জোড়া জোড়া পতাকা উড়ছে পত্ পত্ করে—প্রত্যেক দেশের পতাকা জোড়ার মাঝখানে—নীল রঙের সাইন বোর্ডে সে দেশের ভাষায় তেমন বড় শাদা অক্ষরে "শান্তি আর বন্ধুত্ব" কথাটা লেখা, যাতে করে দূর থেকেও পড়া যায়। তবে দূর থেকে এটাও দেখা যায় যে, স্টেডিয়ামে জায়গা না পেয়ে অসংখ্য লোক ঐসব পতাকাদণ্ডের কাঠামোতে চড়ে বসেছে।

স্টেডিয়ামের মাঝখানে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ—রকমারী খেলা খেলবার জন্যে ছক কাটা জায়গা। ঘাসে ঢাকা মাঠের বাইরে চারপাশে—গোল বেড় দিয়ে দৌড়-পাল্লার ছক কাটা পথ, ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করছে। আমাদের উল্টোদিকে মাঠের ওপারে গ্যালারীর মাঝখানে দু দুটো—চৌকো মস্ত দরজার ফোকর—ঐ দুটোর ভিতর দিয়ে প্রতিযোগিরা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করে।

চারটেয় উৎসব আরম্ভ হবার কথা—ঘড়িতে দেখলাম—চারটে বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। তেষ্টায় ছাতি ফাটছে—মিসেস ম্যাঘেরুকে সে কথা জানাতে—তিনি কোনওরকমে দু' বোতল লেমনেড যোগাড় করে আনলেন। কিন্তু দলের প্রায় সকলের তেষ্টা পেয়েছিল—তাই কোনওরকমে—এক চুমুক করে খেয়ে গলাটা ভেজানো গেল।

কয়েক মিনিট পরে হঠাৎ স্টেডিয়ামের চারধার থেকে হাততালি ও হর্ষধ্বনি শোনা গেল। কি ব্যাপার? জানা গেল, ইউথ ব্রিগেডের যে সমস্ত যুবক-যুবতী তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে—মাত্র চার মাসে এই স্টেডিয়াম গড়ে তুলেছে তারাই সবপ্রথম মার্চ করে আসছে।

হাজার হাজার যুবক-যুবতী বয়স তাদের ষোলো থেকে ছাব্বিশের

কোঠায়। নীল রঙের শ্রমিকের পোশাক পরে—স্টেডিয়ামের দৌড়-পাল্লার পথ ধরে, চারধার বেড় দিয়ে ঘুরে গেল। চারধারের দর্শকরা তাদের বাহাদুরিতে হাততালি দিয়ে চীৎকার করে হর্ষধ্বনি জানালে। কিন্তু স্টেডিয়ামের কারিগর শ্রমিক দলের মুখে চোখে সেই হর্ষধ্বনির প্রতিধ্বনি কই! বিমর্ষমুখে তারা যে আমাদের সামনে দিয়ে যন্ত্রের মত হেঁটে গেল। মনে পড়ে গেল ফ্লোরিকার কথা!

এর পরেই দেখা গেল—একশোজন ট্রাম্পেটিয়ার্স—সুন্দর সাদা পোশাকে সেজে এসে—একসঙ্গে একশ'টি ভেরীতে ফুঁ দিলেন। তূর্যধ্বনি করে—বিশ্বযুব উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করলেন। ভেরীবাদকরা এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই—বিরাট এক ব্যাণ্ড বাজিয়ের দল বাজনার তালে তালে পা ফেলে সবুজ মাঠে এসে দাঁড়ালো। সবাই তখন চুপচাপ্, নিস্তব্ধ!

এরপরে বিশ্বযুব উৎসবের সাদা পতাকাটি বয়ে নিয়ে এলো পাঁচটি মহাদেশের পাঁচটি প্রতিনিধি। তিনটি যুবতী—দুটি যুবক। এঁদের পিছু পিছু একদল ছেলেমেয়ের কাঁধে চ'ড়ে এলো বিশ্বযুব ফেডারেশনের প্রকাণ্ড প্রতীক—সেটিকে দেখা গেল "শান্তি পারাবত" উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে একজোড়া যুবক-যুবতীর মূর্তি। পিছনে বিশ্বযুব ফেডারেশনের অসংখ্য নীলাভ সিল্কের পতাকাবাহী যুবক-যুবতী। শোভাযাত্রা আরম্ভ হলো—রকমারী দেশের রঙচঙে পোশাকে সেজে আপন আপন দেশের একাধিক রঙীন জাতীয় পতাকা সগৌরবে বহন করে চলছে—যুব-প্রতিনিধির দল। দলে মেয়েদের সংখ্যাটাই বেশি। অপূর্ব তাদের বেশভূষা! ইংরেজী অক্ষর অনুসারে দেশের নামের আদি অক্ষর অনুযায়ী একটির পর একটি দেশের প্রতিনিধিদল আমাদের সামনের বাঁদিকের সেই বড় দরজাটা দিয়ে ঢুকে যখন স্টেডিয়ামটিকে বেড় দিয়ে ঘুরে পর পর মাঠে গিয়ে দাঁড়াতে লাগলো সত্যিই তা দেখে মন আনন্দে নেচে উঠলো। ট্রিবিউন থেকে নেমে গিয়ে কয়েকটা ছবি তুললাম।

কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল যখন দেখলাম—ভারতীয় প্রতিনিধি দলটি ভারতবর্ষের একটিমাত্র জাতীয় পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা

করে এলো। শুধু তাই নয়, শ্রীযুক্ত শাণ্ডিল্য পতাকাটিকে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পতাকার মত অর্ধনমিত করে নিয়ে যাচ্ছেন, (ছবিটি এই সঙ্গে ছাপা হলো) দেখে—দুঃখ এবং রাগও হলো। ছুটে গিয়ে ওঁদের বললাম যে, "ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক বা পরাধীন রাষ্ট্র নয়—কাজেই আমাদের পতাকাটিকে এভাবে আপনারা অর্ধনমিত করে নিয়ে যাবেন না—ওটিকে সোজা করে তুলে নিয়ে চলুন।"

ওঁরা সে কথায় কান দিলেন না, কারণ বিশ্বের সব দেশ আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নিলেও—এদেশের কমিউনিস্ট বন্ধুরা এদেশটিকে সোভিয়েট তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে না পারা পর্যন্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নিতে পারছেন না। কেবলই মনে হতে লাগলো—ভারত সরকারের উদার নীতির সুযোগ নিয়ে দেশে এবং বিদেশে এমনই একদল লোক দেশদ্রোহিতার পরিচয় দিচ্ছে। স্বদেশের মর্যাদাকে ধুলোয় লুটিয়ে দৈন্যের কাঁদুনি গেয়ে ভিক্ষার ঝুলি ভর্তি ক'রে আনছে। অথচ হতভাগ্য ভাবপ্রবণ ভারতের লোক—ক'জনই বা সে কথাটা তলিয়ে ভাবেন।

বিশ্বযুব উৎসবে—বিভিন্ন দেশের যুব-প্রতিনিধিদের শোভাযাত্রায়, কোরিয়া, চীন, রাশিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গারী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি কমিউনিস্ট ছেলেমেয়েদের সাজ-সজ্জা ও আড়ম্বর অত্যন্ত সুপরিকল্পিত। তাদের শোভাযাত্রার উল্লাস ও প্রকাশ অল্পবিস্তর একইধাঁজের। তাই সেটা খুব বেশী করেই নজরে পড়লো আমার এবং আর সকলেরই। ঐ সমস্ত দেশগুলি থেকে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে যে সব প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিল, তারা যাতে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, স্বদেশের জাতীয় পোশাকের বৈচিত্র্যটা বিশ্ববাসীর চোখে তুলে ধরতে পারে; সেজন্য রকমারী পোশাক তৈরি করিয়ে অপরূপ সাজে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিল তাদের আপন আপন রাষ্ট্রের শত শত পতাকা ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর ফেস্টুন। এ ব্যাপারে তারা অঢেল পয়সা খরচ করেছে। কারণ এসব সাজের পেছনে তাদের কাজের উদ্দেশ্যটাই হলো—এইসব দেখিয়ে আর পাঁচটা দেশেরযুবক-যুবতীকে তাক্ লাগিয়ে কমিউনিস্ট

হওয়ার হ্যাংলামীটা বাড়িয়ে দেওয়া। ঐসব দেশের প্রতিনিধি ছাড়া এইরকম ব্যবস্থা কিছুটা ছিল—ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, জার্মাণী, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্ট যুব প্রতিনিধিদের শোভাযাত্রায়।

পূর্ব জার্মাণীর যুব প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে লাল, হলদে, কালো রুমাল হাতে নিয়ে পালা করে সেটি নাড়িয়ে—জার্মাণীর জাতীয় পতাকার যে অপূর্ব প্রকাশটি দিয়েছিল—তা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে কাঠির মাথায় একটি করে ক্যাঙারুর কাট-আউট ছবি লাগিয়ে সেটিকে নাচাতে নাচাতে চলেছিল অপূর্ব ছন্দে। ইংলণ্ড ও আরও কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা রঙিন ফুলের তোড়া নাড়িয়ে—ফুল ছিটিয়ে উৎসবে যে প্রাণের সঞ্চার করেছিল—তার পাশে ভারত ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের দীনতা ও হীনতা এতখানি প্রকট হয়ে উঠলো দুটি কারণে। প্রথমত, এই দুই রাষ্ট্রের যুব প্রতিনিধিদলের স্বাজাত্যবোধের অভাব, দ্বিতীয়ত, ও'রা কেউই ভারত ও পাকিস্থানের বিরাট জাতীয় যুব-সমাজের সত্যিকারের প্রতিনিধি নন।

বিভিন্ন ভাষায় 'শান্তি ও বন্ধুত্ব' এই ধ্বনিতে লক্ষ লোকের করতালি হর্ষনিনাদে আকাশ বাতাস মুখরিত হলো। বিভিন্ন দেশের যুব-প্রতিনিধিদল—সত্যিই সেদিন যে মাদকতার সৃষ্টি করলে—তা'তে মন মেতে না উঠে পারে না। কিন্তু ওর মাঝখানে কোরিয়া আর ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিদের কাঁধে তুলে নিয়ে নাচতে নাচতে যাওয়াটা যেন বড় বেশী প্রচারধর্মী আদিখ্যেতা বলেই মনে হ'লো।

শোভাযাত্রার শেষে WFDY-র সাধারণ সম্পাদক জ্যাক ডেনি বিশ্বযুব উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতার পর রুমানিয়ার রাষ্ট্রপতি পেত্রু গ্রোজা—সমস্ত প্রতিনিধি-দের অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বাগত ভাষণ দিলেন। এর পরে উৎসবের মশাল, যেটি বহু দেশের ভিতর দিয়ে রিলে করে বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, সেটি তুলে দেওয়া হলো জ্যাক ডেনির হাতে। সঙ্গে সঙ্গে স্টেডিয়ামের ডানদিকে বিরাট পতাকা দণ্ডে তোলা হলো বিশ্বযুব

উৎসবের পতাকাটি। তার চার ধারে গোল হয়ে দাঁড়ালো তখন বিভিন্ন দেশের পতাকাবাহী দলপতিরা। হাজার হাজার কণ্ঠে শোনা গেল—ওয়ার্লড ফেডারেশন অফ ডেমোক্রাটিক ইয়ুথের ঐক্য সংগীতটি—যার মানে অনেকটা "একই সূত্রে গাঁথা হউক সহস্রটি মন" গানের মতই। অমনি রুমানিয়ার প্রতিনিধিরা স্টেডিয়ামের গ্যালারীর নীচে চারধারে লুকিয়ে রাখা খাঁচাগুলো খুলে হাজার হাজার পায়রা উড়িয়ে দিলে। শান্তির শ্বেত কপোতের প্রতীক হিসাবে।

সুন্দর পরিকল্পনা, সুন্দর ব্যবস্থা! কিন্তু শান্তির কামনাকে উন্মুক্ত ডানায় বয়ে নিয়ে উড়তে পারলো না ওরা—ভয় পেয়ে খানিক উড়েই রুমানিয়ার পায়রাগুলো নীরবে নিঃশব্দে এসে বসে পড়তে লাগল এখানে সেখানে। স্টেডিয়ামের দর্শকদের কাঁধে, মাথায়—হাতে। আমার কাঁধে এসে বসলো একটি 'শান্তি-কপোত'—ধরে তাকে কোলে আশ্রয় দিলাম—দেখলাম ভয়ে বুকটুকু ধুক্ ধুক্ করে কাঁপছে। কদিন বন্দীদশায় থেকে ওড়বার ও নড়বার ক্ষমতা ওরাও হারিয়ে ফেলেছে। বিরাট বিশ্বযুব উৎসবের শান্তি ও বন্ধুত্বের ধ্বনির ব্যঞ্জনার মাঝখানে ছোট ছোট অসংখ্য শান্তি-কপোতের বুকে ভয় ও শংকার কাঁপন জেগেছে—কারণ শান্তির বাণী নিয়ে উড়তে হচ্ছে তাড়া খেয়ে। নীড়ছাড়া, গৃহহারা হয়ে!

এরপর সমস্ত দেশের যুবপ্রতিনিধিদল—মাঠ খালি করে' বসলো গিয়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারীগুলোতে—এক একদিক এক এক রঙের ইউনিফর্মে আলো করে। সেও এক অপূর্ব দৃশ্য! আমিও উঠে গিয়ে বসলাম আমার জায়গায়।

প্রথমে রুমানিয়ার পাইওনীয়র কিশোর-কিশোরী দল—নানা ফুলের প্রতীক হিসাবে নানা রঙের পোশাক পরে মার্চ করে এল। ওর কতকগুলি সুন্দর নাচ ও ব্যায়াম দেখালে।

তারপরে রুমানিয়ার খেলোয়াড়, ব্যায়ামবীর যুবকের দল নানা দলে ভাগ হয়ে কয়েকটি ব্যায়াম ও খেলা দেখালে।

সেই যে সকালবেলা সাদা সিল্কের ফ্রক পরে মাথায় লাল ফুলের মুকুট পরে যে যুবতীদের আসতে দেখেছিলাম, দেখলাম, তারাও দল

(১)

(২)

উপরে পোল্যাণ্ডের দুটি প্রাচীরচিত্র—১নং প্রাচীর-চিত্রে পোলিশ ভাষায় লেখা আছে STRZEZ TAJEMNICY PANSTWOWEJ (Guard State Secrets) যার মানে—"স্টেটের গোপনীয়তা রক্ষা করো।" ২নং প্রাচীর-চিত্রে লেখা আছে—BUMELANT TO DEZERTER Z FRONTU WALKIE POKOJ I SILNA POLSKE (An absentee from work is a deserter from the Struggling Front for Peace and Strong Poland) অর্থাৎ "কাজে অনুপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই—শান্তি এবং বলিষ্ঠ পোল্যাণ্ডের সংগ্রামী ব্যূহত্যাগী বিশ্বাসঘাতক।" কম্যুনিষ্ট দেশে শ্রমিক স্বর্গ রচিত হয়ে থাকলে—এমন প্রাচীরচিত্র লাগাতে হয় কেন?

পাশে—'নোভা হুটা'র—নতুন যুবস্বর্গ গড়ার কাজে নিযুক্ত একটি যুবককে শুধু গায়ে হুইল ব্যারো ঠেলতে দেখা যাচ্ছে।
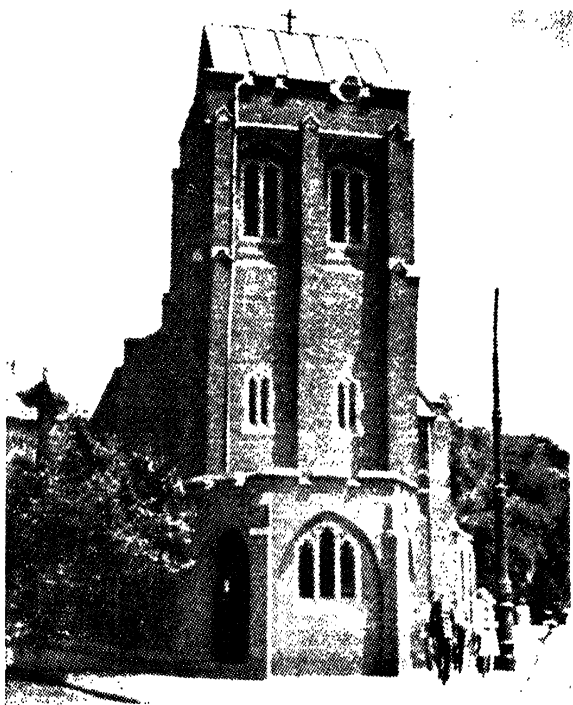
বুখারেস্টের এ্যাংলিকান গির্জা
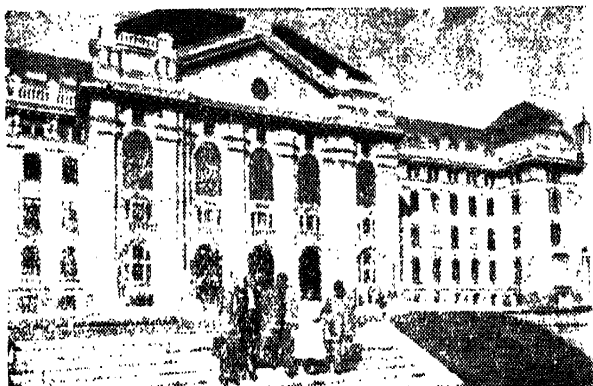
বেঁধে কয়েকটি ব্যায়াম ও খেলা দেখালে। সবচেয়ে অবাক হলাম—যখন প্যারেড করতে করতে তারা এক সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তেই সবুজ মাঠের মাঝখানে—উড়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে একটা শ্বেত পারাবতের ছবি তৈরি হয়ে গেল। অপূর্ব এদের ব্যায়াম কৌশল। মিসেস ম্যাঘেরু জানালেন—ছ'মাস ধ'রে রুমানিয়ার এই সব যুবক-যুবতীরা এই ব্যায়ামগুলি অভ্যাস করছে। ভাবলাম, তা না হলে এমন হয়।

হঠাৎ—দূরে মনে হ'লো, গোল পৃথিবীর প্রতীক—একটা বিরাট গ্লোব বা গোলক বহন করে আনা হচ্ছে—তার উপরে রয়েছে—বিশ্বের নানা দেশের অসংখ্য পতাকা। কাছে আসতে টের পেলাম—ঐ গোলকটা এবং নীচে উপরের সব কিছুই গড়ে উঠেছে জ্যান্ত মানুষের শরীরের নানা ভঙ্গীর টুকরো জোড়া লাগিয়ে। অপূর্ব পিরামিড ফরমেশান! সঙ্গে সঙ্গে দেখি, চারি পাশের মাঠ জুড়ে নানা রঙের ইউনিফর্ম পরা রুমানিয়ার যুবক-যুবতীরা নানা দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিমেষের ইঙ্গিতে বাজনার তালে—তারা এমনভাবে এমন সারিতে মাঠে শুয়ে বা বসে পড়লো, যে গ্যালারীর উপর থেকে আমরা দেখলাম—'শান্তি' এই কথাটি রোমান হরফে, রাশিয়ান হরফে, চীনা হরফে যেন লেখা হয়ে গেল মাঠের জমিতে—"PAIX", "PEACE", "PACE" এই কথাগুলি সবাই পড়তে লাগলো দাঁড়িয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের শেষ গান—রুমানিয়ার জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠলো—দু' হাজার গায়ক গায়িকার সমবেত কণ্ঠে। সবাই উঠে দাঁড়ালাম।

বিশ্বযুব উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ। শুরু হলো পনের দিনব্যাপী বিরাট উৎসবের নানা অনুষ্ঠান। এতক্ষণ পর্যন্ত মিসেস ম্যাঘেরু, আমাদের বাসের দলের লোকরা সবাই ছিলাম এক সঙ্গে, কিন্তু আসন ছেড়ে খানিক এগুতেই ভিড়ের চাপে কে যে কোথায় গুলিয়ে গেলাম—সেটা আর খেয়ালই ছিল না। মাথায় কেবলই মতলব ঘুরতে লাগলো—কবে আমার দেশে ফিরে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের সহযোগিতা আদায় করে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের সবাইকে এক ক'রে এমন একটা বিরাট উৎসব করতে পারবো!

ভিড়ের চাপে ধাক্কা খেতে খেতে যখন আবার স্টেডিয়ামের পিছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে মাটিতে পা দিলাম—হুঁস হলো, দলের চেনা লোক-জনের কাউকেই তো কাছে পিঠে দেখছি না! সর্বনাশ! কি করে হোটেলে ফিরবো!

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে—চারধারে আলো জ্বলে উঠেছে—তবুও সে আলোয় ভিড়ের মধ্যে চেনা লোক খুঁজে পাওয়া ভার! কি করি, এর তার মুখের দিকে তাকাই। যদি চেনা লোক পাই!

আমাকে ঐভাবে চাওয়া-চাওয়ি করতে দেখে—একটি সুদর্শন ভদ্রলোক এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন—পরিষ্কার ইংরেজীতে। পোশাক দেখেই চিনতে পেরেছেন—আমি ভারতীয়। আমার নাম ও পেশা জানতে চাইলেন।

আমি আমার নাম বলতেই ভদ্রলোক আনন্দে অধীর হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"আজই আমি আপনার লেখা একটা প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হয়েছি—"

"আমার প্রবন্ধ? কোথায় পড়লেন?"

"Contemporanul" পত্রিকার জন্য আপনি "প্রাচীন ভারতে শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শ" সম্বন্ধে ইংরেজীতে যে প্রবন্ধটি লিখে দিয়েছেন, সেটি আমাকে দেখাতে এনেছিলেন ঐ পত্রিকার প্রতিনিধি। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ, খাঁটি ভারতীয় দৃষ্টিতে লেখা—বড় ভাল লেগেছে।"

—"আমি বললাম—আপনার নামটা জানতে পারি কি?"

তিনি তাঁর নামটি বলতেই আমিও চমকে উঠলাম। আগেই তাঁর নামটি জেনেছি—বইয়ের দোকানে বই দেখতে গিয়ে। আমি বললাম—"আপনি তো রুমানিয়ার একজন নামকরা লেখক।" (নামটা বিশেষ কারণে গোপনই আমাকে রাখতে হলো এখানে)

তিনি হেসে বিনয় করে বললেন, "হ্যাঁ, সামান্য কয়েকটা বই লিখেছি। তবে ওসব লিখে আমি নিজে একটুও খুশী হতে পারিনি। বইয়ের কথা এখন থাক্। আপনি যদি কিছু মনে না করেন—তাহলে আমার বাড়িতে আপনাকে একটু নিয়ে যেতে চাই মিঃ ঘোষ। আমার স্ত্রী ও বন্ধুবান্ধবীরা উৎসবের দিনে আপনার মতো অতিথি পেলে বিস্ময়ের সঙ্গে বেজায় খুশি হবেন।"

আমি বললাম, "আপনার বাড়িতে যাওয়া, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হওয়া এতো পরম সৌভাগ্য—কিন্তু আমি ভাবছি, আমার হোটেলে পোঁছাবার কথা—সঙ্গী-সাথীদের যে খুঁজেই পাচ্ছিনে।"

লেখকটি হেসে বললেন—"আমি আপনাকে গাড়ি করে হোটেলে পোঁছে দিয়ে আসবো। এখন চলুন আমার সঙ্গে।"

ভাবলাম—ভিড়ের অকুল পাথারে অকুলের কাণ্ডারী নিজেই যখন তরী ভিড়ালেন, তখন সেই তরীতেই ভেসে পড়া যাক। যা থাকে কপালে। উৎসবের অন্তরালে পাওয়া নতুন বন্ধুটির সঙ্গে ভিড় ঠেলে—বেশ খানিকটা হেঁটে গিয়ে তাঁর গাড়িতে চড়লাম।

লেখক বন্ধুটির সঙ্গে তাঁর গাড়িতে তো চড়ে বসলাম। কিন্তু গাড়ি এগুবে কোন্ ধার দিয়ে? চারধারে উৎসবের ভিড় ভেঙে হাজার হাজার লোক পিঁপড়ের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। লরী বাস আর গাড়িগুলো অনবরত হর্ন দিচ্ছে, পুলিশরা বাঁশি ফুঁকছে, কে কার কথা শোনে? ভিন্‌দেশী অতিথিদের অধিকাংশেরই দশাই যে আমার মতো তা তাদের চোখ-মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। দোভাষী সঙ্গী আর গাইড-ছাড়া হয়ে বেচারারা অনেকেই এদিক সেদিক ছুটছে।

যাক রক্ষে! পুলিশরা দেখলাম—বেছে বেছে গাড়ির লেবেলের মার্কা দেখে দেখে গাড়ি ছাড়ছে। আমাদের গাড়িটাও আগে ভাগেই ছাড়া পেল—কারণ যাঁর সঙ্গে গাড়িতে চড়েছি, তিনি রুমানিয়ার একজন নামকরা লোক—হোম্‌রা-চোম্‌রা তো বটেই। তিনি একজন V I P অর্থাৎ ভেরী ইমপর্টাণ্ট পারসন। ওসব দেশেও V I Pদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে, এমন কি সরকারের পেয়ারের লেখক কবিরাও যে সেই দলে পড়েন সেটা আমার সঙ্গী লেখক-বন্ধুটির খাতির-তোয়াজ দেখেই মালুম হলো।

যাক ভিড়ের কবলমুক্ত হয়ে—ফেরবার পথে আমাদের গাড়ি যে সব রাস্তা দিয়ে ছুটে চললো—সে সব রাস্তায় কিন্তু আসবার রাস্তার মতো ভিড় বা ফুল দেওয়ার হুড়োহুড়ি দেখলাম না।

তাই কৌতূহলী হয়ে, সঙ্গী বন্ধুটিকে, আসবার সময় যা দেখেছি তা জানিয়ে, জানতে চাইলাম—এখন এমনটা ঘটবার কারণ কি ?

উনি হেসে শুধু বললেন—"উৎসবের বিদেশী অতিথিদের জন্য আলাদা রাস্তা, আলাদা ব্যবস্থা। সে পথ দিয়ে গেলে—আবার সেই রকমটাই দেখতে পেতেন, তবে তিন চার ঘণ্টার আগে হোটেলে পৌঁছুতে পারবেন না। যাবেন নাকি সেই পথ দিয়ে? তামাসা দেখতে দেখতে?"

"তামাসা ঢের দেখছি! অতিথিদের জন্য বিশেষ রাস্তা ও বিশেষ ব্যবস্থার বাইরে কিছু যদি দেখাতে পারেন, তাতেই খুশী হবো বেশী।"

লেখক বন্ধুটি বললেন—"আপনার জন্য সেটুকু করতে পারবো বলেই ভরসা হচ্ছে। ভয় যাদের করি আমি, আপনি সে দলের মানুষ তো নন।"

আমি বললাম—"এতখানি ভরসা পেলেন কেমন করে?"

তিনি বললেন—"আপনার প্রবন্ধটি পড়ে এবং তার আগে কংগ্রেসে আপনার বক্তৃতা শুনে।"

"কংগ্রেসে আপনি আমাকে দেখেছেন ?"

তিনি হেসে বললেন—"না দেখলে চিনে নিয়ে আলাপ করলাম কেন? শুধু আমি নই, আমার বন্ধুবান্ধবী কয়েকজনও আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। একজন তো সেই রাত্রেই আপনাকে টেলিফোনে কন্‌গ্রাচুলেশন জানিয়েছিল।"

চমকে উঠলাম—মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এলো—"আশ্চর্য ব্যাপার!"

লেখক বন্ধুটি হেসে বললেন—"তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার আপনার মতো মানুষের এদেশে আসা এবং আরও আশ্চর্যের ব্যাপার আপনাকে আমাদের বন্ধু হিসাবে পাওয়া।"

আমি বললাম—"আমারও পরম সৌভাগ্য আপনার মত বন্ধু পাওয়া।"

এর পর রাস্তার ধারে একটা দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড়

করিয়ে—তিনি বললেন—"গাড়িতে একটু বসুন, আমি চট করে বাড়িতে একটা টেলিফোন করে আসি।"

টেলিফোন করে ফিরে আসতেই—আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার বাড়িতেই তো যাচ্ছি আমরা। টেলিফোন করার দরকারটা কি হলো?" উনি হেসে বললেন—"জেনে নিলাম বাড়িতে এখন কোন কোন বন্ধু-বান্ধব আছেন। কারণ আপনাকে আমি তেমন কারুর সামনে নিয়ে যেতে চাই না—যাতে আপনার এবং আমাদের বিপদ ঘটতে পারে।"

"কী সাংঘাতিক! বন্ধু এবং আত্মীয়রাও এদেশে গুপ্তচরের কাজ করে!"

তিনি বললেন—"জোর করে একটি মাত্র মতবাদকেই সকলকে মেনে নিতে বাধ্য করতে হলে এ ছাড়া অন্য পথ কি?"

মনটা কেমন শঙ্কিত হয়ে উঠলো এসব কথা শুনে—আমি বললাম—"এই যদি অবস্থা, তবে কেন এতটা বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন? আমাকে বরং হোটেলেই পৌঁছে দিন।"

বন্ধুটি হাত ধরে বললেন—"আমাদের ভয়ের জীবনে ভারতবর্ষই ভরসা। একজন খাঁটি ভারতীয়কে কাছে পেলে—সত্য ও সুন্দরের আলোচনায় যেটুকু আনন্দ পাবো—সেটুকু যে আমাদের অনেকখানি শক্তি দেবে।—সে আনন্দটুকু থেকে বঞ্চিত করবেন না মিঃ ঘোষ।"

এর পর কথা চললো না। গাড়ি চললো এগিয়ে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বুখারেস্ট শহরের বেশ একটা নিরিবিলি এলাকার কয়েকটা ছোট ছোট রাস্তার মোড় ঘুরে গাড়িটা দাঁড়ালো একটা মস্ত বাড়ির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে—সিঁড়ি বেয়ে আমরা তিনতলার একটা ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম। কলিং বেল টিপতেই একটি সুন্দরী মহিলা—মাথা নুইয়ে মিষ্টি হেসে করমর্দন করে' বললেন—"আসুন মিঃ ঘোষ!

আপনার জন্যে আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি। ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দের জন্য আমাদের অন্তরের শুভকামনা গ্রহণ করুন।”

বন্ধুটি পরিচয় দিলেন—“ইয়োভান্না আমার স্ত্রী।” আমিও হাতজোড় করে নমস্কার বললাম—“রুমানিয়া ও রুমানিয়ার বন্ধুদের প্রতি ভারতবর্ষের শুভকামনা গ্রহণ করুন।”

এর পরে ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখলাম—আরও দুটি মহিলা ও একজন পুরুষ আমাকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন—আমি হাতজোড় করে তাঁদের নমস্কার করলাম। লেখক বন্ধুটি পরিচয় করিয়ে দিলেন—নিকোলাই (Nicolae), লুসিয়া (Lucia), নিনা (Nina)। নিকোলাই একজন অধ্যাপক, লুসিয়া আগে স্কুলমাষ্টারী করতেন ও কিছু কিছু লিখতেন, এখন লেখেন না। নিনা মাঝে মাঝে কবিতা লেখেন।

শ্রীমতী নিনা হেসে বললেন, “সেদিন রাত্রে আপনাকে টেলিফোন করে বিরক্ত করেছিলাম—তার জন্যে খুব রাগ করেছিলেন তো?”

আমি হেসে বললাম—“রাগ করবারই তো কথা? কোথায় কবে দেখা হবে—না জানিয়ে টেলিফোনটা ওভাবে ছেড়ে দিলেন কেন?

—“সেটা টেলিফোনে বলবার উপায় ছিল না। দেখা যেখানে যখন হবার, তখন হলেই হলো। অতএব এখন ক্ষমা করে ফেলুন।”

—আমি বললাম—“ভারতবাসীরা ক্ষমা চাইবার আগেই অপরাধীকে ক্ষমা করে এবং তার শুভবুদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করে।”

ঘরসুদ্ধ সকলেই হো-হো-করে হেসে উঠলেন। কারণ ও'রা সকলেই ইংরেজী জানেন।

এমন সময় লেখক-বন্ধুটির স্ত্রী বললেন—“উঠুন মিঃ ঘোষ! হাতমুখ ধুয়ে খেতে চলুন, খাওয়ার টেবিলে বসেই গল্প হবে।”

আমি লেখকবন্ধুটির মুখের দিকে চেয়ে বললাম—“এমনটাতো কথা ছিল না বন্ধু!”

বন্ধুটি বললেন—“ও ব্যাপারে আমার হাত নেই! আপনার বন্ধুপত্নীর ইচ্ছা সেটাই।”

বন্ধু-পত্নী বললেন—“আপত্তি করবেন না, খাওয়ার সময়ও

হয়েছে; ক্ষিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই? তবে এটাও ঠিক, বিশ্বযুব-উৎসবের বিদেশী অতিথিদের জন্যে রুমানিয়ার হোটেলে-হোস্টেলে যে সব খাবার দেওয়া হচ্ছে, তেমন খাবার আমাদের ঘরে কিছুই নেই; রেশনে যা পাই তাই ভাগ করে খাই।"

আমি দেখলাম এর পরে না বলবার উপায় নেই, তাছাড়া ক্ষিধেও পেয়েছিল ভয়ানক। বললাম—"বেশ চলুন এঁরাও নিশ্চয়ই যোগ দেবেন, আমার সঙ্গে?" লেখকের স্ত্রী জানালেন—"না, ওঁরা ডিনার খেয়েই এসেছেন, কারণ এতগুলি বাড়তি অতিথিকে খাবার দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও বর্তমানে সেটা সম্ভব নয়। ওঁরা আমাদের সঙ্গে টেবিলে বসে আপনার গল্প গিলবেন।"

খাওয়ার ঘরে টেবিলে গিয়ে বসলাম—বন্ধু-পত্নী টেবিলেই সব রান্না সাজিয়ে রেখেছিলেন। তিনিই তুলে তুলে দিতে লাগলেন। প্রথমে এক প্লেট টমাটো স্যুপ—পাঁউরুটির টুক্‌রো সহযোগে গেলা গেল। তার পর টমাটো আর ভাত একসঙ্গে হবিষ্যান্নের মতো সেদ্ধ করা—চীজের গুঁড়ো এবং লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে খাওয়া হলো—মাঝে মাঝে প্যাপ্‌রিকা বা বড় লঙ্কার আচারের চাখ্‌না দিয়ে। এর পরে পরিবেশন করা হলো—পিঠে জাতীয় একটা জিনিস। লেখক-পত্নী জানালেন—মাছ মাংস সব দিন এখানে জোটে না। যেটুকুও বা পাওয়া যেতো তাও এখন মিলছে না তিরিশ হাজার অতিথির আগমনে। তবে উৎসবের দৌলতে মাসখানেক আগে থেকেই মাখন আর চিনিটা বাড়তি কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে, তাই পিঠেটুকু তৈরি করতে পারা গেছে। কিছুদিন আগে সেটুকুও পাওয়া যেতো না। দুধ ছাড়া কালো কুচ্‌কুচে এক কাপ কফি দিয়ে খাওয়া শেষ হলো।

খেতে বসে খাওয়ার টেবিলে সেদিন গান্ধী আর নেহরুর সম্পর্কে অগণিত প্রশ্নের জবাব দিতে হলো আমাকে। ওঁদের দেশে প্রচার করা হয়েছে পণ্ডিত নেহরু কম্যুনিস্ট হয়ে গেছেন—তিনি ঈশ্বর এবং ধর্ম মানেন না। আমি বললাম—এসব মিথ্যা কথা। এছাড়া ওঁদের কথা শুনে বুঝলাম—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কত-রকমের মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছেন ঐ সমস্ত দেশে আশ্রিত ও

ভ্রমণকারী ভারতীয় কম্যুনিস্ট বন্ধুরা, এটি করবার আরও মস্ত সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা, কারণ রুমানিয়া, হাঙ্গারী, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভারতীয় কোনও দূত বা দূতাবাস নেই। শেষ পর্যন্ত ওঁদের বললাম—"ঐ সমস্ত মিথ্যা রাজনৈতিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমাকে আপনাদের দেশের শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু খবর দিন। আমি নিজে একজন শিশুসাহিত্য লেখক, সেকথাও ওঁদের জানালাম।

নিনা বললেন—"একজন লেখকের পক্ষে ছোটদের সাহিত্য রচনার চেয়ে বেশী লোভনীয় ও সুন্দর ব্রত আর কি থাকতে পারে?"

নিনার কথা শুনে বুঝলাম—তিনি সত্যিই কবি এবং সার্থক লেখিকা, তা না হলে ছোটদের সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে এত উঁচু দরের ধারণা থাকতো না। খাওয়ার পরে ড্রয়িং রুমে বসে শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধেই আলোচনা চললো।

জানতে পারলাম—রুমানিয়ার লেখকদের মধ্যে Ion Creanga কতকগুলি অপূর্ব কাহিনী ও রূপকথা লিখে—রুমানিয়ার শিশু-সাহিত্যে সব-সেরা গল্প-বলিয়ের সম্মান পেয়েছেন।

এছাড়া প্রশ্ন করে জানতে পারলাম—বিদেশী লেখকদের মধ্যে মাত্র টলস্টয়, মার্কটোয়েন ও অ্যাণ্ডারসেনের বাছাই করা দু' একখানা বইয়ের অনুবাদ ছাড়া বর্তমানে রুমানিয়ায় অন্য ভাষায় অন্যদেশের শিশুসাহিত্যের বই পাওয়া যায় না। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার আধুনিক শিশুসাহিত্যের অধিকাংশ বইই রুমানিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে শস্তায় বিক্রী করা হয়। টলস্টয়ের 'গোল্ডেন কী' সোনার চাবিকাঠি বইটির অনুবাদ হয়েছে। রুমানিয়ান ভাষায় বইটির নাম হচ্ছে—'Cheita de Aur'।

ছোটদের ছড়া লেখার ব্যাপারে যিনি নাম করেছেন—তাঁর নামটাও জানা গেল—তিনি কবি 'Cicerone Theodorescu'। লেখক-বন্ধুটির পত্নী আমাকে রুমানিয়ার শিশু-সাহিত্যে আগ্রহ-শীল দেখে—খুঁজে পেতে ঘর থেকে দুটো বইও বার করে এনে দেখালেন। একটি জর্জ কোসবুকের (George Cosbuc) লেখা—

'Povestea Gastelor' অর্থাৎ 'হাঁসদের গল্প' আর একখানা হচ্ছে--'Calatorla Lui Illiuta in tara Soarelui' (সূর্যের দেশে জুলিয়াতার ভ্রমণ)। সুন্দর রঙ-চঙে ছবি, বড় বড় অক্ষরে ছাপা। রুমানিয়ার ছোটদের সাহিত্যের বইগুলি দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হলো।

গল্প আর আলোচনা করতে করতে রাত প্রায় যখন সাড়ে দশটা তখন বললাম—"এবার ওঠা যাক।"

লেখক বন্ধুটি বললেন—"বেশ চলুন আপনাকে বিশ্বযুব উৎসবের প্রথম রাতের হৈ-হুল্লোড়টা দেখিয়ে দিয়ে হোটেলে পেঁৗছে দেবো।"

সবাই আমরা উঠে পড়লাম। নীচে নেমে গাড়িতে উঠলাম, আমি, লেখক-বন্ধুটি, তাঁর স্ত্রী, আর লুসিয়া। নিনা আর নিকোলাই বিদায় জানালে।—নিনা তার স্বভাবসুলভ চপলতার সুরে হেসে বললে—"আবার দেখা হবে, যথাস্থানে যথাসময়ে।"

গাড়ি কয়েক মিনিটের মধ্যেই উৎসবের আলো আর পতাকায় সাজানো ঝলমলে রাস্তায় এসে পেঁৗছালো। গাড়ি থেকে না নেমেই দূর থেকে দেখলাম—বড় বড় মোটর আর জেনারেটরের সাহায্যে—সিনেমার স্টুডিওর মতো জোর জোর আলোয় আলো করে তোলা হয়েছে পিয়াতা লিবার্তেতি (লিবার্টি স্কোয়ার), 'পিয়াতা ইউনি-ভার্সিতাতি (ইউনিভার্সিটি স্কোয়ার), পিয়াতা রিপাবলিচি (রিপাবলিক স্কোয়ার) প্রভৃতি চৌমাথা আর পাঁচমাথার মোড়-গুলো। এই সব ক'টা জায়গায় সেদিন রুমানিয়ান যুবক-যুবতীরা রকমারী সাজে সেজে বিদেশের যুবক-যুবতীদের সঙ্গে নাচের হুল্লোড় লাগিয়ে দিয়েছে।

লেখক বন্ধুটি জানালেন—এই নাচ আজ দুপুর রাত পর্যন্ত চলবে। দু'এক জায়গায় যে সেই রুমালগলায় দিয়ে চুমু-খাওয়া-নাচ 'পেরিনৎসা' চলছে পুরোদমে তাও নজরে পড়লো। রিপাবলিক স্কোয়ারের কাছাকাছি গাড়ি আসতেই আমি

বললাম—আমাকে নামিয়ে দিলে হেঁটেই হোটেলে চলে যেতে পারবো।

লেখক-বন্ধুটি বললেন—"হ্যাঁ এখানেই আপনাকে নামিয়ে দেবো তবে একলা না—লুসিয়াও সঙ্গে যাবে। হোটেলের সামনে গাড়ি নিয়ে যাওয়াটা নিরাপদ হবে না। লুসিয়া আপনার হোটেলের খুব কাছাকাছি থাকে—ওর ফ্ল্যাট ও আপনাকে দেখিয়ে দেবে। সেখানে আপনি একা একাই হেঁটে আসতে পারবেন—কোনও অসুবিধা হবে না। লুসিয়ার ফ্ল্যাটেই এখন থেকে আমাদের দেখা-শোনার ব্যবস্থা হবে, সেটাই সকলের পক্ষে সুবিধাজনক এবং নিরাপদ। আর একটি অনুরোধ, আমাদের কথা কাউকে বলবেন না।"

লুসিয়াও চমৎকার মানুষ—ভারতবর্ষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে কারণ ভারতবর্ষের যোগসাধনা, ধর্ম ও দর্শন ইত্যাদির ব্যাপারে সে কিছু কিছু পড়াশুনো করেছে। এ খবরটুকু জানা গেল চলতি পথের আলাপেই। লুসিয়াকে তার ফ্ল্যাটে পেঁাছে দিয়ে, তার বাড়িটা চিনে নিয়ে হোটেলে ফিরলাম যখন তখন রাত এগারোটা।

পরের দিন সকালে উঠে বাইরে যাওয়া হলো না। লেখালেখির কাজ অনেক জমে গেছলো। সেগুলি সেরে নিলাম, তারপর রুমানিয়ার ভাষা শেখার বই নিয়ে বসলাম ভাষা চর্চায়।

এলেন এলো আটটায়। ওর সঙ্গে এথিনি প্যালেসে গিয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে বসলাম। ওখানেই সে আমার হাতে ঐ দিনের একটা প্রোগ্রাম দিয়ে জানতে চাইলে—আমি কোন কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাই। সে সেই মত গাড়ি ও টিকিটের ব্যবস্থা করবে। সারাদিনের প্রোগ্রাম দেখে—চক্ষু ছানাবড়া। দু'টো জরুরী অনুষ্ঠান। একটা সকাল সাড়ে নটায় আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন। অন্যটা বিকেলে আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়নের (ISU) প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন।

এছাড়া সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে শহরের প্রায় কুড়িটা থিয়েটারে বিভিন্ন

দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিচিত্রানুষ্ঠান। উপরন্তু—বিভিন্ন হলে—বিভিন্ন দেশের ব্যালে, কনসার্ট, লোকনৃত্য। বেলা দশটা থেকে বারোটা আর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা এই দু' দফায় প্রায় পঞ্চাশটা দেশের ফিল্ম দেখানো হবে—সহরের গোটা তিরিশেক সিনেমা হলে—আর পার্কের খোলা ময়দানে। তাছাড়া সকালে আটটা থেকে বারোটা—আর বিকেলে তিনটে থেকে সাতটা—এই আট ঘণ্টা ধরে দু জায়গায় লন টেনিস আর ফেস্টিভ্যাল ডেলিগেট-দের স্পোর্টস প্রতিযোগিতা। সর্বনাশ, এতগুলি অনুষ্ঠানের কোনটাতে যাব, আর কোনটাতে যাব না—ভেবে বলা কি সোজা কাজ! এলেনকে বললাম—তুমিই ঠিক করো কোথায় যাওয়া দরকার আর কোথায় গেলে আনন্দ পাবো।

এলেন বললে—এখনই চা খেয়ে যেতে হবে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। বিকেল সাড়ে চারটের সময় স্তালিন পার্কের সামার থিয়েটারে—জার্মানীর বিচিত্রানুষ্ঠান। রাত্রি ন'টায় ব্যালচেস্কু পার্কের সামার থিয়েটারে চীনদেশের বিচিত্রানুষ্ঠান দেখতে যাবেন—আপাতত এই প্রোগ্রামই ঠিক রইল।

আমি বললাম—"বেশ! তাই হবে!" ন'টা বেজে পনেরো মিনিট হতেই—আমরা এথিনি প্যালেস হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তাটুকু পার হয়ে ওপারে 'এথিনিয়াম' প্রাসাদে ঢুকলাম। সাড়ে ন'টায় অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো—ম্যালকম নিক্সন উদ্বোধনী বক্তৃতা দিলেন।

রুমানিয়ার সংগীতনায়ক জর্জ জর্জেস্কুর পরিচালনায় রুমানিয়ার স্টেট ফিলহার্মনিক যন্ত্রী সংঘ—বেঠোভানের একাদশ সিম্ফনীকে সুরের ব্যাকুলতায় অপূর্বভাবে প্রাণবন্ত করে তুললেন। হাজার হাজার হাতে বার বার হাততালি পড়ল। তারপর রুমানিয়ার নামকরা গায়ক পিটার চিতকানেস্কু গোয়াঙ্গা, মিহায়েল স্তিরবেই এবং নামকরা গায়িকা এলেনা চেরনেই ও এমিলিয়া পেনেস্কু একক (SOL0) সংগীত শোনালেন। এই সব গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠে সুরের ওঠা-নামা ও মাধুর্যটুকুই উপভোগ করলাম। শোনা

গেল সমবেত সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত। কনসার্টের পর আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের বিচারক-মণ্ডলী গড়া যখন আরম্ভ হলো—তখন আমি উঠে চলে এলাম। বেলা তখন প্রায় বারোটা। ফটোর দোকানে গিয়ে আগের দিন বিশ্বযুব উৎসবে তোলা ছবিগুলি ডেভেলপ করতে দিয়ে এলাম।

তারপর দুপুরের খাওয়া শেষ করে হোটেলের কামরায় ফিরে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে লাগলাম।

সাড়ে চারটের সময় এলেনের সঙ্গে স্তালিন পার্কের—ছাদখোলা সামার থিয়েটারে হাজির হলাম। বিরাট রঙ্গমঞ্চ—প্রকাণ্ড জায়গায় সিঁড়ির মত ধাপ কেটে হাজার হাজার লোক বসবার জায়গা। এরকম ছাদখোলা থিয়েটার আমি এর আগে দেখিনি, তাই সত্যিই খুব আনন্দ হলো, কিন্তু জার্মানীর প্রোগ্রামে দু' চারটি লোকনৃত্য ছাড়া আর কিছু আমার খুব ভাল লাগল না।

ঘণ্টাখানেক থাকবার পরে ওখান থেকে উঠে লেকের ধারে খানিকটা বেড়ালাম। কয়েকটা বাচ্ছা ছেলেমেয়েকে জুটিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প জমালাম—এলেনের সাহায্য নিয়ে। চড়লাম বাচ্ছাগুলোকে নিয়ে স্তালিন পার্কের দৈত্য চরকীতে। খুব মজা লাগলো। সময়টা কাটলো ভালোই।

এলেনের তাড়া খেয়ে এথিনি প্যালেসে ফিরতে হলো। ডিনার খেয়েই তাড়াতাড়ি রওনা হলাম—নিকোলাই বাল্‌চেস্কু স্কোয়ারের ছাদখোলা থিয়েটারের উদ্দেশ্যে। কারণ দেরিতে গেলে আসন না পাওয়া যেতে পারে—এমন আশঙ্কা এলেনের ছিল। গিয়ে দেখলাম সত্যিই তাই। অসম্ভব ভিড় সেখানে। কোন রকমে আগেভাগে গিয়ে আসন পাওয়া গেল।

চীনদেশের বিচিত্রানুষ্ঠান—বেশভূষায়, গানে বাজনায় অপূর্ব! শুরু থেকেই জমে উঠলো। সব থেকে ভাল লাগলো—চায়ের পাতা তোলা আর প্রজাপতি ধরা নাচ, সিল্কের ফিতে ঘুরিয়ে রিবন নৃত্য। আর মানুষকে সিংহ সাজিয়ে—সিংহ নৃত্য। প্রতিটি নাচই, গান-

বাজনা কল্পনা আর ব্যঞ্জনায় অপূর্ব। নাচ ছাড়া সাইকেলের যেসব অদ্ভুত কসরৎ দেখালেন তিনটি চীনা যুবক-যুবতী, তাও বহুদিন মনে থাকবে। সত্যিই সেদিন এলেনের উপর খুশি হয়ে উঠলাম—এমন একটি অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে আসার জন্য । বার বার তাকে ধন্যবাদ দিলাম। রাত সাড়ে এগারোটায় আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিলে এলেন। চলে গেল সেদিন যেন একটু বেশি খুশি হয়েই।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলো—টেলিফোনের আওয়াজে। লুসিয়া টেলিফোন করছে। সে জানালে—আপনার যদি অসুবিধা না হয় বেড়াতে বেড়াতে চলে আসুন আমাদের এখানে। আমার স্বামী অত্যন্ত খুশী হবেন আপনি এসে আমাদের সঙ্গে চা খেলে।

ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে ছ'টা বেজেছে। আমি বললাম—"ধন্যবাদ! যাচ্ছি আমি, তবে সাড়ে সাতটার মধ্যেই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে, কারণ আটটার সময় আমার ইণ্টারপ্রেটার আসবেন।" লুসিয়া বললে—"বেশ তাই হবে!"

হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই লুসিয়ার ফ্ল্যাটে পৌঁছলাম। কলিং বেল টিপতেই লুসিয়া দরজার ফোকরের কাঁচ দিয়ে আমাকে দেখে নিয়ে তারপর দরজা খুলে দিলে। লুসিয়া তার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। ভদ্রলোককে লুসিয়ার তুলনায় বেশ বৃদ্ধ বলেই মনে হলো। ভদ্রলোকের পুরো নামটা জানা গেল না। তবে লুসিয়া যে ওকে 'টিটি' বলেই ডাকে, সেটি কথাবার্তায় ও পরিচয়ে টের পেলাম। লুসিয়ার স্বামী ইংরেজী বলতে পারেন না, তবে ইংরেজী একটু আধটু বুঝতে পারেন এই কথাই জানালে লুসিয়া।

চা মাখন রুটি, জ্যাম সবই এসে গেল।

চা খেতে খেতে লুসিয়ার স্বামী বার বার বলতে লাগলেন—"লুসিয়া বড় ভাল মেয়ে—ও ভারতবর্ষকে বড় ভালবাসে; আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ওর আনন্দের শেষ নেই। আমিও খুশী হলুম ভারতবাসী দেখে।" আমি বললাম—"ভারতবাসীকে এত বড় ভাবেন

কেন আপনারা?" লুসিয়াই তার স্বামীর হয়ে জবাবটা দিলে—বললে, "ভারতবাসীদের জীবন ঈশ্বরের সঙ্গে জড়ানো বলে—They are men of God।" আমি বললাম—"কম্যুনিস্ট দেশে নাকি ঈশ্বর মানে না কেউ আজকাল?"

লুসিয়া বললে—"মিথ্যে কথা! আগের চেয়ে লোকে এখন ভগবানকে বেশী মানে, বেশী ডাকে। কারণ ঈশ্বর ছাড়া তাদের দুর্গতির হাত থেকে উদ্ধার পাবার অন্য পথ কৈ? আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে গির্জেয় গেলেই দেখতে পাবেন।"

লুসিয়ার ফ্ল্যাটে কলিং বেল বেজে উঠল। চায়ের চুমুক চমকে গেল। লুসিয়া হেসে বললে—"ভয় পাবার কিছু নেই আপনার চেনা অতিথিই এসেছে।"

টিটি গিয়ে দরজা খুলে দিতেই আগের দিনের সেই লেখক বন্ধুটির স্ত্রী হাসতে হাসতে এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন—'কেমন অবাক করে দিয়েছি তো বিমল? দেখ আমি তোমাকে মিঃ ঘোষ বলে ডাকবো না—তোমার প্রথম নাম ঐ বিমল বলেই ডাকবো, তুমিও আমাদের নাম ধরে ডেকো কেমন? নামটা মনে আছে তো? ইয়োভান্নী।"

আমি বললাম—"বেশ তো! যে নামে খুশী ডাকবেন আপনারা। তাতে আমার আপত্তি নেই। লুসিয়া তাড়াতাড়ি দৌড়লো পাশের রান্না ঘরে। আবার চা আনতে। দুটি মাত্র তার ঘর, একটি ঘরেই শোবার, বসবার এবং খাবার জায়গা, পাশে একটি গলির মত সরু ঘরের একপাশে টয়লেট। অন্যদিকে রান্নাঘর। টিটি চা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন। বললেন—"আপনারা গল্প করুন। আমার কাজ আছে।" টিটি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

ইয়োভান্নী হেসে বললেন—"লুসিয়ার ছোকরা স্বামীটিকে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছো?" আমি কোনও জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসলাম। ইয়োভান্নী তখন চাপা গলায় বললে—"লুসিয়া অদ্ভুত মেয়ে। ও সংযমী মেয়ে, ভারতবর্ষের ধর্ম, দর্শন পড়ে ও একেবারে তাতেই মজে গেছে। রুমানিয়ার যুবক যুবতীদের বর্তমানের উচ্ছৃঙ্খল জীবন ও বরদাস্ত করতে পারে না এতটুকু।

যুবকদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচবার জন্য লুসিয়া বিয়ে করেছে ঐ বুড়ো টিটিকে। টিটির আগের পক্ষের জোয়ান জোয়ান ছেলেমেয়ে আছে, তারা কাজকর্ম করে, ফূর্তি ক'রে নেচে কুঁদে বেড়ায়, কিন্তু বুড়ো বাপটাকে এক মুঠো খেতে দেয় না। আগের পক্ষের স্ত্রী ডাইভোর্স করেছে টিটিকে। লুসিয়া একবেলা খেয়ে ওকে খাওয়ায়, এই ওর আনন্দ, এই ওর একমাত্র সুখ। লুসিয়ার স্বামী এখানে থাকে না, সকালে দুপুরে আর রাত্রে খেতে আসে। লুসিয়া একলাই থাকে তপস্বিনীর মতো। ও যোগ-ব্যায়ামও করে। সত্যিই ও বড় অদ্ভুত মেয়ে।"

ইয়োভান্নী আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিল—এমন সময় লুসিয়া ঘরে ঢুকলো চায়ের পেয়ালা হাতে। হেসে বললে—"কি অতো কথা হচ্ছিল চুপি চুপি বিমলের সঙ্গে? নিশ্চয়ই আমার কথা।"

আমি শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম লুসিয়ার মুখের দিকে, বিস্ময় আর পরম শ্রদ্ধায়।

ইয়োভান্নী চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে—"লুসিয়া! রাগ করিস না, তোর তপস্বিনী জীবনের কথাই বলছিলাম বিমলকে।"

লুসিয়ার চোখ জলে ভরে উঠলো—সে বললে, "আমি নিজেই বলতাম সময় হলে। তোমার এত ব্যস্ত হওয়ার কি ছিল?"

আমি বললাম—"পরে বলার সময় হবে কি হবে না এই ভেবে ইয়োভান্নী ব্যস্ত হয়েছে। দোভাষী আর উৎসবের প্রোগ্রামের তাড়া খেয়ে এ কদিন কখন যে কোথায় ছুটে বেড়াতে হয়, অবসর কই!"

লুসিয়া ঘড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে—"অবসর অবশ্যই করতে হবে। তবে এখন ই নয়। আটটা বেজে গেছে। দোভাষী হোটেলে আসবার আগেই যাওয়া উচিত।

ইয়োভান্নী বললে—"রাত্রে আমরা অপেক্ষা করবো এখানেই। সময় করতে পারলে এসো।" ইচ্ছে না থাকলেও আমাকে উঠতে হলো। ঘড়ির তাড়া খেয়ে হন্‌হনিয়ে ছুটতে হলো।

হোটেলে পোঁছে দেখি কি লাউঞ্জে এসে বসে আছেন—মুখ গম্ভীর করে শ্রীমতী এলেন। এলেনকে দেখেই তো আমার মুখ

শুকিয়ে গেল। বুক কেঁপে উঠলো। তবে ঝট করে মাথায় একটা মতলবও খেলে গেল। মনের উদ্বেগটা ঢেকে, ওর হাত দুটি ধরে হেসে বললাম, "ক্ষমা করো এলেন! আমার একজন ভারতীয় বন্ধু এসেছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধিদের শিবির থেকে। ওঁদের ওখানে যাই না বলে বন্ধুরা খুব রাগ করেছেন। তাই তাঁর সঙ্গে ওঁদের আস্তানাটা দেখে আসতে গেছ[illegible] তোমাকেও নিয়ে যাবো আমার ভারতীয় বন্ধুদের কাছে।"

এলেন বললে—"মাপ করুন আপনার ভারতীয় বন্ধুদের কাছে যখন যাওয়ার দরকার হবে, আপনি একলাই যাবেন, আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না।"

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, একলা বেরুবার অনুমতি পাওয়া গেল! বললাম, "ওখানে না যাও ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে নিয়ে যাবে তো?"

ওকে টেনে নিয়ে এথিনি প্যালেসে গেলাম।

ব্রেকফাস্ট খেতে বসে এলেন আমাকে ৩রা আগস্টের প্রেস বুলেটিন, আর ৪ঠা তারিখের প্রোগ্রাম দিয়ে শোনালে —বেলা ৩টা-৪৫ মিনিটে ২৩শে আগস্ট স্টেডিয়ামে—ইণ্টার ন্যাশনাল স্পোর্টস মিটিং অর্থাৎ বিশ্বযুব উৎসবের খেলাধুলো অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, সেখানে যেতে হবে। ব্রেক[illegible] সেরে ইণ্টারন্যাশনাল ডকুমেণ্টারী একজিবিসন দেখতে যেতে [illegible]ব। রাত্রের প্রোগ্রামের টিকিট যে অনুষ্ঠানের পাওয়া যাবে, সেখা[illegible] গেলেই চলবে।

এলেনের ব্যবস্থায় হেনস্থা করবো, ত[illegible]র উপায় কি? ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমরা দুজনে গাড়ি করে রওনা হলাম ফ্লোরিয়াস্কা হলে—ইণ্টার ন্যাশনাল ডকুমেণ্টারী একজিবিশন দেখতে। এই প্রদর্শনীতে সাজানো হয়েছিল বিভিন্ন দেশের যুবক সমাজ, তথা শ্রমিক, মজদুর ও জনসাধারণের নানা কাজ, সুখ, দুঃখ ও জীবন-সংগ্রামের ছবি, নানা রাষ্ট্রের উন্নতি ও দুর্গতির তেমন সব প্রচার-চিত্র, ফটো ও হাতে আঁকা ছবি, যার উদ্দেশ্যই ছিল প্রচার এবং অপপ্রচার এই দুটোই।

এই প্রদর্শনী সম্পর্কে বলে রাখি সে দেশে থাকতেই যে সব কাগজপত্র আমাকে পাঠানো হয়েছিল তাতে জানানো হয়েছিল—

"The central theme of the International documentary exhibition should be the fight of the world youth for peace and a happy future."

এই সৎ উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই আমি আমার সঙ্গে নিয়ে গেছলাম ভারতবর্ষের যুবক-যুবতী ও কিশোর কিশোরীরা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান মণিমেলা সংগঠনের ভিতর দিয়ে সুখ-শান্তিময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ব্যাপারে যে সব কাজ করেছে তারই প্রায় একশো ভালো ফটোগ্রাফের সাহায্যে তৈরী কুড়িটি বড় ছবি। এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে আঁকা—প্রায় একশোটি ছবি। ছোটদের হাতে আঁকা ছবিগুলি দেখানো হয়েছিল আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীতে। কিন্তু ভারতের কিশোর-কিশোরীর নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার সংগঠনমূলক প্রামাণিক চিত্র হিসাবে ফটোগুলি এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়নি। কারণ ঐ ছবিগুলিতে প্রমাণিত হ'তো ভারতের কিশোর-কিশোরীরাও কোনও অংশে পিছিয়ে নেই। তাই ভারতবর্ষের তথাকথিত যুব-প্রতিনিধিমণ্ডলী সেগুলি বাদ দিয়ে—এদেশের শান্তি ও সুখের পথে যুবক-যুবতীর সংগ্রামের পরিচয় হিসাবে এই প্রদর্শনীতে সাজিয়ে দিয়েছিলেন রাজনৈতিক কার্যকলাপের ছবি, যেমন—ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, পুলিশের সঙ্গে ইট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি, বন্দীগাড়ীতে আন্দোলন-কারীদের গ্রেপ্তার করে তোলার ছবি। এছাড়া উদ্বাস্তুদের মধ্যে খিচুড়ি ও কাপড় বিতরণের ছবি। ভারতবর্ষের মজুর ও চাষীদের অর্ধ-উলঙ্গ তেমন কতকগুলি ছবি আর ভারতের চারটি কমিউনিস্ট খবরের কাগজের বিভিন্ন সংখ্যায় দাগ দিয়ে শ্রমিক মজুরদের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা।

(রুমানিয়ার সচিত্র সাপ্তাহিক "Flacara"-র ৯ই আগস্টের সংখ্যায় ভারতীয় মজুরদের ঐ ছবিগুলির ওপর মন্তব্য করে লেখা হয়েছিল—

"Afli despri viata groaznica a muncitorilor indeini care primesc opt annas pe zi. Cu et pot cumpara....4 ziare."

যার মানে হলো—others showed the miserable life

of the Indian workers, whose wages are few annas a day, with a comparative study (4 news papers !)

কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার দেখলাম, কম্যুনিস্ট দেশগুলির পক্ষ থেকে তেমন সব ছবি ও মালমশলা এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে, যেগুলোতে কেবল গড়ার দিকটা দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যায়। যেমন বুলগেরিয়ার পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে দিমিট্রোভগ্রাদ বন্দর ও রুশিয়োরী কোনরোভগ্রাদে কারখানার শ্রমিকদের জন্যে যে সব নতুন ঘরবাড়ি হচ্ছে তার ছবি। হাঙ্গারী ও রুমানিয়ার পক্ষ থেকে ছবির সাহায্যে দেখানো হয়েছে কিভাবে যুবক-যুবতীরা কঠোর শ্রম করে নতুন নতুন রাস্তাঘাট, স্টেডিয়াম, কলকারখানা, বাঁধ ইত্যাদি গড়ে তুলছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে ভোলগা ও ডন নদীর খালকাটার ব্যাপারে যুবক-যুবতীরা কিভাবে কাজ করছে—দেখানো হয়েছে কিভাবে বড় বাঁধ ও বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র ,গড়ে উঠছে। বিশ্বযুব সম্মেলনে আমাদের দেশের যুব প্রতিনিধিরা ও তাঁদের নেতারা কি পারতেন না ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ভারতবর্ষের উন্নতিতে যেসব বাঁধ, গবেষণাগার ও নতুন নতুন কলকারখানা তৈরী হয়েছে—তার ছবি নিয়ে গিয়ে সেগুলি সেখানে সাজিয়ে পাঁচজনকে দেখাতে? তাঁরা কি মনে করেন না, যে এগুলি তাঁদেরই দেশের সম্পদ? তা যদি নাই ভাবেন তবে তাঁরা ভোটের জন্য এদেশে দোরে দোরে ঘোরেন কেন? এই প্রদর্শনীতে শুধু যে ভারতবর্ষের যুবপ্রতিনিধিরাই স্বদেশের দুর্বলতা ও গলদগুলোর এমন সব প্রচার দিতে এবং শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, আর হাঙ্গামার ছবি দিয়ে শান্তি ও সুখের জন্য সংগ্রামের বীরত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন তা নয়, তেমন পরিচয় পেলাম—মিশর, বর্মা, ইন্দোচীন, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল প্রভৃতি কয়েকটা দেশের ছবিমহল দেখতে গিয়ে।

প্রদর্শনী দেখে বেলা একটায় এথিনি প্যালেস হোটেলে গেলাম খেতে।

এথিনি প্যালেসে যেতেই—সেখানে আমার বহুদিনের পুরানো

বন্ধু যাদুকর পি সি সরকারের সঙ্গে দেখা! দুজনে দুজনকে দেখে কত যে আনন্দ হলো, তা বলতে পারি না। আনন্দের চোটে, আর গল্পের বহরে খাওয়ার দিকে মনই গেল না। খাওয়ার পর সরকার-ভায়াকে ধরে নিয়ে এলাম আমার হোটেলে। এলেন জানিয়ে গেল—বেলা তিনটায় রওনা হতে হবে খেলাধুলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে।

গল্পে গল্পে জানা গেল, সরকার আসছে লণ্ডন থেকে-বৃটেনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে। ওদের সঙ্গে আরও অনেক ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী এসেছেন লণ্ডন থেকে। সরকারের মুখেও শোনা গেল আসবার সময় হাঙ্গারীতে সেও দেখেছে মানুষের দুঃখ দুর্দশার ছবি। ওর কাছেই খবর পেলাম—ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল টীম ও অন্যান্য খেলোয়াড়রা বুখারেস্টে এসে পেঁাছে গেছেন। শুনে খুবই আনন্দ হলো। বেশীক্ষণ আর গল্প করা গেল না। উঠতে হলো দু'জনকেই। সরকার উঠেছে এথিনি প্যালেস হোটেলে। ও জানিয়ে গেলো—সময় পেলেই আমি যেন ওর ঘরে আড্ডা দিতে যাই!

তিনটার সময় এলেনের সঙ্গে গাড়িতে ক'রে আবার সেই ২৩শে আগস্ট স্টেডিয়ামের দিকে রওনা হলাম। দেখলাম আগের দিনের মত রাস্তায় ভিড় নেই। আধঘণ্টার মধ্যেই পেঁাছে গেলাম স্টেডিয়ামে—আমার নির্ধারিত আসনে। দেখলাম স্টেডিয়ামে আশি হাজার লোকের জায়গায় লাখো লোক জড়ো হয়েছে।

পৌনে চারটে বাজতেই আবার সেই আগের মতো ট্রাম্পেট বেজে উঠলো—একশো জনের একশো ফুঁয়ের জোরে। প্রথমেই উৎসবের খেলাধুলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পতাকাটি বয়ে নিয়ে এলো একটি রোগা গোছের লম্বা যুবক আর তার পিছু পিছু ছোট বড় নানা দলে ভাগ হয়ে প্রায় পঞ্চাশটা দেশের চার হাজার খেলোয়াড় প্রতিযোগী! ঘন ঘন চারিদিক থেকে লক্ষ লক্ষ হাতে হাততালি।

প্রথমেই এলো আল্‌ব্যানিয়ার তরুণ খেলোয়াড় দল—তার

পেছনে অলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন, বুলগেরিয়া। ইংরেজী অক্ষর অনুসারে নামের আদি অক্ষর অনুযায়ী।

চেকোশ্লোভাকিয়া দল মাঠে পা দিতেই ইমিল্ জ্যাটোপেককে দেখবার জন্য সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলো। জ্যাটোপেককে দেখবার জন্য আমিও কম চঞ্চল হলাম না। জ্যাটোপককে দেখে সেদিন সকলের কি উন্মাদনা। কিন্তু তার চেয়ে ব্যাকুল হলাম আমি কলকাতার ইস্ট-বেঙ্গল দলকে দেখবার জন্যে—প্রথম কথা তারা যে আমার দেশের ছেলে, ভারতবর্ষের গৌরব। তাছাড়া তাদের মধ্যে কয়েকজন যে আমার বিশেষ চেনা মানুষ, বন্ধু। দূর থেকেই দেখলাম ভারতবর্ষের অশোক চক্র আঁকা পতাকা—সেদিন সোজা হয়ে এগিয়ে আসছে। আর তার পেছনে আসছে মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, নীলকোট, সাদা প্যাণ্টের ইউনিফর্ম পরা ভারতীয় খেলোয়াড় দল। মনে মনে বিরাট গর্ব ও আনন্দবোধ করলাম। আনন্দের চোটে উঠে দাঁড়ালাম—চেঁচাতে লাগলাম—"Traiasca al Inde" জয় হিন্দ বলে।

ভারতীয় খেলোয়াড় দল যখন কাছে এলো—তখন দেখলাম, নামকরা ভলিবল খেলোয়াড় সুনীল চাটুজ্যে চলেছে ঝক্‌ঝকে চক্‌চকে ভারতের একটা জাতীয় পতাকা সোজা করে নিয়ে। উৎসবের উদ্বোধনের দিনে ভারতীয় যুব প্রতিনিধিরা ভারতের জাতীয় পতাকাকে অবনমিত করে নিয়ে গিয়ে ভারতের যে মিথ্যা পরিচয় দিতে চেয়েছিল, আজ ভারতীয় খেলোয়াড়রা—তার উপযুক্ত জবাব দিতে পেরেছে সাহস ক'রে। এজন্য তাঁদের উদ্দেশে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

এর পর একে একে আরও কত দেশের খেলোয়াড় দল গেল নানাভাবে নানা রকমের ইউনিফর্ম প'রে। ভারতবর্ষের খেলোয়াড় দলের পাগড়ী আর পোশাকটা আভিজাত্যে ও সৌন্দর্যে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। একথা অনেক বিদেশীই জানালেন আমাকে। সব দেশের সব খেলোয়াড় মার্চ করে গিয়ে যখন মাঠে দাঁড়ালো—তখন আবার ব্যাণ্ড বেজে উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব যুব-উৎসবের খেলাধুলা অনুষ্ঠানের লাল হলদে নীল পতাকাটা পতাকাদণ্ডের

মাথায় খুলে গিয়ে হাওয়ায় উড়তে লাগলো। এরপরে শাদা, কালো আর হলদে চামড়াওয়ালা—একটি ইউরোপীয়ান, একটি নিগ্রো, আর একটি চীনা তিনটি যুবক হাত মিলিয়ে শাদা রঙের শান্তি-পতাকাটিকে পতাকাদণ্ডে টেনে তুললেন। তারপর বক্তৃতা দিলেন বিশ্ব যুব ফেডারেশনের অন্যতম সম্পাদক ম্যালকম নিক্সন। রুমানিয়ার স্পোর্টস্ ও জিমন্যাস্টিক কমিটির সভাপতি ম্যানোলে বোদনারাস্ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করলেন—জানালেন বারো দিন ধ'রে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে রকমারী খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা চলবে।

ঘোষণা করা হলো এরপর রুমানিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ফুটবল ম্যাচ হবে। তখন আমি এলেনকে নিয়ে উঠে পড়লাম। ফেরার পথে গাড়িতে এলেনকে বললাম—"তোমার দেশের দু' একটা গির্জা দেখবার আমার ভারী ইচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় চলো না দু' একটা গির্জা দেখে ফিরি।"

এলেন বেশ বিরক্ত হয়েই বললে—"গির্জা দেখবার অত সখ কেন ঘোষ? তুমি তো পাদ্রী নও। তাছাড়া আমাদের দেশে কেউ ভগবান মানেও না আর গির্জাটির্জাতেও বড় কেউ যায় না, সেখানে কি করতে যাবে?"

বুঝলাম—এলেনের ইচ্ছে নেই আমাকে গির্জায় নিয়ে যাওয়ার। ওকথা চেপে গিয়ে—এলেন শুরু করলে—বিশ্ব-যুব উৎসবের বাকি বারো দিনের প্রোগ্রামের ফিরিস্তি।

উৎসবের অন্তরালে

বিশ্বযুব উৎসবের বাকী বারো দিনের অনুষ্ঠানের ফিরিস্তি আর তার প্রশস্তি রীতিমত অসোয়াস্তির ব্যাপার হয়ে উঠলো। বেটক্করে মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়লো—"দোহাই এলেন, দয়া করে উৎসবের কথা ক্ষান্ত দাও, উৎসবের আড়ালে আবডালে যা ঘটছে পার তো তাই কিছু দেখাও শোনাও।"

—"তার মানে!" ,

—"তার মানে উৎসবটাই জীবন নয়। উৎসবের আড়ালে—হাসি আছে কান্নাও আছে, দুঃখ আছে সুখও আছে। রুমানিয়ায় এসে বিশ্বযুব উৎসবের অনুষ্ঠান ঐ সব নাচ, গান, স্পোর্টস আর হৈ-হল্লা দেখে ফিরে গেলেই তো রুমানিয়াকে দেখা হবে না, রুমানিয়াকে জানা হবে না, রুমানিয়াকে জানানো হবে না ভারতের অন্তরের কথা! অথচ তোমাদের দেশের অতিথি হিসাবে আমার সেই কর্তব্যটুকু করার অবসর মিলছে কই!"

এলেন তার পুরু ভুরু কুঁচকিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—"শুনে খুশী হলাম—এতদিন পরে যাহোক তবু কর্তব্যের প্রশ্নটা তোমার মনে উঁকি দিয়েছে! বুঝতে পেরেছো উৎসবের লক্ষ্যই হলো ভালবাসা দেওয়া, ভালবাসা নেওয়া, বন্ধুত্ব আর শান্তি। উৎসবের কর্তব্য হলো—নিজে মেতে থাকা, অপরকে মাতিয়ে রাখা। তবে তুমি যেরকম হিসেবী আর সাবধানী, তাতে সে কর্তব্য তোমার দ্বারা সম্ভব হবে না। তুমি যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি ভীরু! তা না হলে সেদিন 'পেরিনিৎসা' নাচ থেকে চোরের মত পালিয়ে আসো আমাকে একলা ফেলে?"

অবাক মানি মন্তব্য শুনে। কি কথার কি মানে! মনে মনে রাগলেও অনুরাগে বলি, "ঠিক বলেছ! তুমি যতটা সাহসী, অতটা

সৎসাহস দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমরা ভারতবাসী, মাততে চাই আনন্দে—মত্ততায় নয়।”

এলেন বললে—“তোমার কথা আমি একটুও বুঝি না। কি যে হেঁয়ালী করে কথা বলো?”

আমি বললাম—“তোমার কথা সব বুঝি, কিন্তু সব কথা রাখতে পারি না। ধরেছ ঠিকই, আমি ভীরু, আমি ঠাণ্ডা। উৎসবের উত্তাপটাও সইতে পারছি না—একটু আড়াল খুঁজছি, ঠাণ্ডা আবহাওয়ার।”

এলেন উল্লসিত। হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে—“বেশ! আজ রাত্রে কোনও প্রোগ্রামে না গিয়ে তোমাকে নিয়ে যাবো উৎসবের আড়ালে। নিরিবিলিতে সিসিমিগু হ্রদের বাগানে! বেড়ানো যাবে নৌকো করে দুজনে।” চমকে উঠি ওর কথা শুনে! বললাম—“বিশ্বযুব উৎসবের অন্তরালে-অতিথিদের জন্যে তোমরা নৌকো বিহারেরও ব্যবস্থা রেখেছো, চমৎকার!”

বলতে বলতে গাড়ি পেঁছে গেলো হোটেলের দরজায়।

এলেন জিজ্ঞেস করলে—“এখনই খেতে যাবে না, একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর?”

আমি বললাম—“একটু জিরিয়ে তারপর যাবো। তুমি ঘণ্টাখানেক পরে ঘুরে এসো।”

এলেন চলে গেল।

আমি উপরে গিয়ে স্নান করে বিছানায় গা-এলিয়ে দিলাম। ভাবতে লাগলাম উৎসবের অন্তরালে যাওয়ার বাসনা জানাতে গিয়ে কি বিপদেই পড়লাম। এখন কি ব'লে এলেনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবো! ভাবছি ভাবছি আর ভাবছি! এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো!

ভয়ে ভয়ে টেলিফোন তুললাম—“হ্যালো! কে?”—“আমি ইয়োভান্নী! লুসিয়ার বাড়িতে আমি আর আমার স্বামী যাচ্ছি। তুমি এখনই চলে এসো, ওখানেই আজ সবাই খাবো আমরা একসঙ্গে।”

আমি বললাম—"বলছো যখন যেতেই হবে; কিন্তু দেরী হবে, তোমরা খেয়ে নিয়ো, খাওয়ার হাঙ্গামাটা আমার জন্যে আর কোরো না।"

ইয়োভান্নী বললে—"লুসিয়া তাহলে খুব দুঃখ পাবে! দেরি করেই এসো, আমরা অপেক্ষা করবো।"

ভাবলাম ভগবান রক্ষা করলেন। এ[illegible]ক এড়াবার ফন্দিটা মাথায় খেলে গেল!

এর খানিক পরেই এলেন ফোন করলে নীচে থেকে। নৈশ ভোজ আরম্ভ হয়েছে। তৈরী হয়ে নীচে যাওয়ার অনুরোধ জানালে।

আমি ফোনে বললাম—"অত্যন্ত মাথা [illegible]! শরীরটা ভালো বোধ করছি না। আজ খাবোও না, আর কোথা[illegible]বোও না—এজন্যে ভারী দুঃখিত!" এলেন বললে—"হঠাৎ কেন শ[illegible]র খারাপ হলো! বড্ড দুঃখিত, আমি আসছি তোমার ঘরে।"

এলেন ঘরে এলো—আমি আগেই চুলগুলো উস্কোখুস্কো করে রেখেছি। মুখে খুব যন্ত্রণার ভাব ফুটিয়ে বললা[illegible]—"কি দুর্ভাগ্য দেখ দেখি এলেন! আজ আর তোমার সঙ্গে নৌ[illegible] বিহারে যাওয়া হবে না! যন্ত্রণায় মাথাটা ভেঙে পড়েছে। জ্বর[illegible] ভাব! আজকে বোধ হয় হোটেলের খাওয়া এবং লেকের হাও[illegible] কোনোটাই আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে না। তুমি কি বলো?"

এলেন রীতিমত ঘাবড়ে গেল। কপালে হাত দিয়ে বললে—"না! না! নিজের শরীর বুঝে চলাই দরকার! আজ না হয়, আর একদিন যাওয়া যাবে। আমি যাই, হোটেলের ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসি।" আমি বারণ করলাম, ও শুনলে না। ডাক্তার ডাকতে চলে গেল।

ডাক্তার আসছেন ভেবেই আমার নাড়ির বেগ বেড়ে গেল ভয়ে আর দুর্ভাবনায়!

ডাক্তার এসে নাড়ি টিপে বড়ি দিলেন চারটে। বললেন, আলো

নিভিয়ে চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়তে। যন্ত্রণা না কমলে আরও দুটি বড়ি খেতে। এলেন তাড়াতাড়ি জল এনে দুটো বড়ি তখনই খাইয়ে দিলে। এলেন ও ডাক্তার চলে গেল, আলো নিভিয়ে শুয়ে থাকতে ব'লে।

আমি উঠে বসলাম, আলো জ্বালালাম—রুমানিয়ান ভাষার বইটা বার করে সেটা নিয়েই সময় কাটাতে লাগলাম, কারণ ন'টা নাগাদ হোটেল খালি হয়ে যাবে। অতিথিরা বেরিয়ে যাবেন—উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তখন বাইরে গেলে বড় কেউ টের পাবে না—এই মতলবে।

ন'টা বেজে দশ মিনিটের সময়—পোশাক পরে নীচে গেলাম। দেখলাম হোটেলের লাউঞ্জ খালি। অতিথি অভ্যাগত কিম্বা তাঁদের দোভাষীরা কেউ কোথাও নেই। পরিচারিকারা দু একজন হাসি-গল্প করছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

রাস্তায় বেরিয়ে হন্‌হনিয়ে হাজির হলাম—লুসিয়ার ফ্ল্যাটে। দেখি সবাই সেখানে হাজির। লেখক বন্ধু, তাঁর স্ত্রী ইয়োভান্নী আর নিনা। লুসিয়া আর লুসিয়ার স্বামী তো আছেনই।

ইয়োভান্নী বললে—"আমরা তো ভেবেই আকুল। তোমার আসতে এত দেরি হলো কেন বলতো?"

আমি তখন ওদের বললাম—আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা, যা যা ঘটেছে। কত কাণ্ড ক'রে, কত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তবে আমাকে আসতে হয়েছে। ওরা আমার অবস্থা এবং তার ব্যবস্থার কথা শুনে সবাই খুব হাসতে লাগলো।

লুসিয়া শুধু গম্ভীর গলায় বললে—"কি করবে বলো, যেখানে যেমন অবস্থা, সেখানে সেই ব্যবস্থা। এদেশে মিথ্যা এবং কপট আচরণ ছাড়া সত্যের পথে চলতে গেলে বিপদ যে অনেক, সেটা এর মধ্যেই তুমি বুঝে ফেলেছ—এর জন্য তোমার বুদ্ধির তারিফ করি। আমাদের জন্যে তোমায় মিথ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছে, এজন্য আমরা দুঃখিত। চলো এখন খেতে বসা যাক—রাত হয়েছে।"

লুসিয়ার ঘরে এক পাশে একটা ছোট্ট টেবিলে খাওয়ার জায়গা হয়েছে। ইয়োভান্নী, লুসিয়া, আমি আর লেখক বন্ধুটি খেতে বসলাম। টিটি আগে খেয়ে নিয়েছিল—টেবিলে জায়গা হবে না ব'লে। নিনা বাড়ি থেকে খেয়েই এসেছিল। চারজনে খেতে বসলাম। খেলাম —এক প্লেট করে স্যুপ, তারপর ভাত চীজ আর সামান্য শাকসব্জীর পুর দেওয়া সেই বড়-জাতের লঙ্কা কয়েকটা। আর খানিকটা বেগুন সিদ্ধ। তারপর এক কাপ করে কালো কফি।

লুসিয়া জলভরা চোখে বললে—"খেতে ব'লে তোমাকে কষ্টই দিলাম—হোটেলে কত ভাল খাবার খেতে? কিন্তু এর বেশী তো আমার কিছু দেবার সাধ্য নেই।"

আমি বললাম—"দেখ, খাওয়ার কষ্টটাই যদি মনে করবো, তাহ'লে অত হাঙ্গামা করে এখানে এলাম কেন? রুমানিয়ার অতিথি হয়ে এসে রুমানিয়ার সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে তাদের খাবার ভাগ করে খাওয়ার এই যে সৌভাগ্য, এই যে আনন্দ, এ ক'জন বিদেশী পাবে বলতো? ভারতবাসীর কাছে খাওয়ার পদ আর ভোজ্যদ্রব্যের আড়ম্বরটা কিছু নয় লুসিয়া, শ্রদ্ধা ভালবাসায় অতিথিকে যা দেওয়া যায়—তাই হয়ে ওঠে অমৃত, রাজভোগ।" এই প্রসঙ্গে বিদুরের ঘরে গোলকপতি নারায়ণের খুদ খাওয়ার পৌরাণিক গল্পটা ওদের বললাম।

গল্পটা শুনতে শুনতে লুসিয়ার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝরতে লাগলো। ইয়োভান্নী নিনা ওদেরও চোখ ছলছল করে উঠলো। গল্পটা বলার সঙ্গে সঙ্গে লেখক বন্ধুটি টিটিকে গল্পটা অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন—টিটিও তন্ময় হয়ে সেটি শুনছিলেন।

লেখক বন্ধুটি বললেন—"তোমাদের ভারতবর্ষ মহান্ দেশ—মানুষ আর ঈশ্বরের মধ্যে কোনও ব্যবধান নেই। সকল মানুষের মধ্যে যারা ঈশ্বরকে দেখে—তাদের দেশেই প্রকৃত শান্তি ও সাম্য সম্ভব।"

লুসিয়া বললে—"ভারতবর্ষে মানুষের ঘরে মানুষের অবতারে ঈশ্বর তাইতো বারে বারে জন্মেছেন। ভারতবর্ষে যদি কোনওদিন

যেতে পারি তবেই আমার জন্ম সার্থক, জীবন সার্থক। সেকি আর হবে।"

ইয়োভান্নী বললে—"অত হা-হুতোশ কেন লুসিয়া! এতদিন ধরে ভারতবর্ষকে ভালবেসে ভারতীয় সাধনার পথে প্রার্থনা উপাসনা যেটুকু করতে পেরেছি, তারই পুণ্যফলে আজ আমাদের ঘরে এক পবিত্র ভারতবাসী এসেছেন—আমাদের দেওয়া খাবার খেয়েছেন, এই আমাদের আনন্দ।"

আমি বললাম—"লুসিয়া! ভারতবর্ষকে ভারতবাসীকে তুমি যে শ্রদ্ধার চোখে দেখো—যে নিষ্ঠা ও ভক্তি তোমার মধ্যেই রয়েছে—তুমি ভারতবর্ষে যাবেই একদিন। ভারতবাসীরাও তোমাকে বরণ করে নেবে দেবীর আসনে। তোমারই মত একজন বিদেশিনী ভারতবর্ষকে ভালবেসে—ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন—তাঁকে আজও ভারতবাসী করে রেখেছে তাদের দেবী—তাঁর নাম সিস্টার নিবেদিতা।"

খাওয়ার পর ওরা সবাই সেদিন সিস্টার নিবেদিতার গল্প শুনতে চাইলে। নিবেদিতা ও স্বামীজীর গল্পবলতে বলতেই—রাত বারোটা বাজলো। ওখান থেকে ওঠবার সময় লুসিয়া বললে—"কাল খুব ভোরে উঠে চলে আসবে—আমরা তোমায় গির্জায় নিয়ে যাবো। দেখবে আমাদের দেশেও মানুষ আজ কতবেশী ভগবানে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে—।"

টিটি ও লেখক বন্ধুটি আমাকে হোটেলের দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

পরের দিন সকালে খুব ভোরে উঠে চান সেরেই সাদা পোশাকটা পরে নিলাম। ও-দেশে যাওয়ার সময়—শ্রীমান নন্দ আর উৎপল ভায়া আমাকে যে ধূপকাঠিগুলি উপহার দিয়েছিলেন—তারই একটা প্যাকেট সঙ্গে নিলাম।

লুসিয়ার বাড়িতে যেতেই লুসিয়া আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। পথে যেতে যেতে জানালে—"ইয়োভান্নীও যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে গির্জার উপাসনায়।

লুসিয়া আরও বললে—ইয়োভান্নীও ভারী ভক্তিমতী, ভারী দয়াভরা প্রাণ ওদের স্বামীস্ত্রী দুজনেরই, তবে ওরা খুব চাপা। ইয়োভান্নীর স্বামী রুমানিয়ার নামকরা লেখক ও সাংবাদিক। বহু টাকা রোজগার করে। কিন্তু ওরা রোজগারের বেশীর ভাগটাই গোপনে দান করে দেয় গরীব দুঃখী ও পাদ্রীদের সাহায্য করতে। পাদ্রীদের এদেশে দুর্দশার অন্ত নেই। এমনকি অন্য সকলের যে রেশন কার্ড আছে—ধর্মযাজকদের সেটি পর্যন্ত দেওয়া হয় না। গির্জায় যারা যায়, তারা কেউ কেউ তাদের রেশনের ভাগ থেকে ওঁদের যা কিছু দেয়, আজকাল তাই খেয়ে ওঁরা কষ্টে সৃষ্টে বেঁচে থাকেন। কমিউনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট ওদের হাতে না মেরে ভাতে মারার ব্যবস্থা করেছে।"

এইসব কথা শুনতে শুনতে খানিকপরে আমরা একটা গির্জায় পেঁাছলাম। গির্জাটির সংলগ্ন মঠ বাড়িতে পুরোহিত পাদ্রীরা থাকেন। প্রথমেই তাঁদের কাছে নিয়ে গেল লুসিয়া। দেখলাম সকলেই খুব বৃদ্ধ, সাদা চুল সাদা দাড়ি। আমাকে দেখে তাঁরা সবাই খুব ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগলেন আমার দিকে।

শেষকালে লুসিয়া যাঁকে গুরুর মত মানে আর ভক্তি করে সেই পাদ্রীটির ঘরে নিয়ে গেল। তাঁর বয়স প্রায় নব্বই বছর। তাঁকে দেখে আমারও ভক্তি হলো। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। লুসিয়া রুমানিয়ান ভাষায় আমার পরিচয় দিয়ে তাঁকে জানালে আমি তাঁর আশীর্বাদ চাই। তিনি তখন কাঁপতে কাঁপতে আমার হাতদুটো চেপে ধরলেন। চাপা গলায়—জলভরা চোখে রুমানিয়া ভাষায় যা বললেন লুসিয়া সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে আমাকে তা বলে দিলে।

ঈশ্বরে কী গভীর বিশ্বাস! কী সুন্দর কথাগুলি!

তার মুখ থেকে যে সব কথা শুনলাম, তাতে মনে হলো এঁরাও সত্যিকারের সাধক ও ভক্ত। মানুষের শান্তি কল্যাণ ও মুক্তির জন্য গভীর তাঁদের অন্তরের আকূতি। তিনি বললেন যে, সাম্যের নামে মানুষের ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসকে খর্ব করার নির্মম প্রচেষ্টা চলেছে, কিন্তু ভগবান সত্য বলেই অত্যাচার সত্ত্বেও ভগবানে বিশ্বাস লোকের বেড়ে চলেছে, তবে তারা অনেকেই তা প্রকাশ করতে পারে না। এমন

সময় ইয়োভান্নী এসে ঘরে ঢুকলো। পাদ্রীকে শ্রদ্ধা জানালো তাঁর গালে চুমা খেয়ে ভক্তি ভরে।

পাদ্রী তখন ইয়োভান্নীকে কি যেন বললেন—ইয়োভান্নী আমাকে বললে—"উনি জানাচ্ছেন লুসিয়া নিজে না খেয়ে ওঁকে ওর রেশনের ভাগ দিয়ে যায় প্রতি সপ্তাহে—লুসিয়া ভগবানের আশীর্বাদে ও তার প্রার্থনার জোরে—একবেলা খেয়েও সুস্থ রয়েছে। লুসিয়ার সুস্থ জীবন কামনা করে আমি যেন প্রার্থনা করি। আর অনুরোধ জানালেন—তাঁর সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছে—একথা যেন রুমানিয়ায় কোথাও কারুর কাছে না বলি।

এর পর আমরা তিনজনে গির্জার উপাসনা ঘরে গেলাম। ইয়োভান্নী পেনসিলের মতো সরু সরু কতকগুলি মোমবাতি কিনলে দরজার গোড়ায় একটি পাদ্রীর কাছ থেকে। তারপর জুতো খুলে আমরা উপাসনা মন্দিরের ভিতরে গেলাম।

উপাসনা ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখলাম সামনেই কাঠের ফ্রেমে কাঁচের গায়ে আর ধাতুর পাতে খোদাইকরা যীশু ও মেরীমাতার ছোট বড় নানা মাপের রকমারী ছবি ঝকমক্ করছে। তার দু পাশে দুটি খুপ্রীতে বসে—দুজন কালো পোশাকপরা বৃদ্ধ পাদ্রী অনর্গল মন্ত্র উচ্চারণের ভঙ্গীতে কি যেন পাঠ করছেন। ঘরের মেঝেতে কুশন পেতে তার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে বহু যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও ছেলেমেয়ে। লক্ষ্য করলাম তাদের অনেকেরই চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। যারা আসছেন প্রথমেই তাঁরা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিচ্ছেন বাতি দানে।

ইয়োভান্নী আর লুসিয়া বাতিদানে—আমার পরিবারের প্রত্যেকের নামে একটি করে বাতি, ভারতবাসীদের সকলের কল্যাণে একটি বাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা জানালেন, করলেন শুভকামনা। আমাকে কয়েকটি বাতি দিয়ে বললেন—ওঁদের প্রত্যেকের নামে একটি একটি করে সেগুলি জ্বালিয়ে আমিও যেন তাদের কল্যাণে এবং রুমানিয়া-বাসী সর্বসাধারণের মুক্তি ও কল্যাণে প্রার্থনা করি। সুন্দর শান্ত পরিবেশে মনপ্রাণ ঢেলে বাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করলাম—ভারত-

বর্ষের ধূপগুলিও জ্বালিয়ে দিলাম সেই সঙ্গে। ভারতবর্ষের ধূপের গন্ধ ও রুমানিয়ান মোমবাতির আলোয়, ভারতবর্ষ ও রুমানিয়ার অন্তরের প্রার্থনা যেন এক হয়ে গেল। সকলের সঙ্গে বসে আমিও প্রার্থনা করলাম। ও'রাও উপাসনা করলেন নিজস্ব ভঙ্গীতে।

গির্জা থেকে ফিরলাম আবার লুসিয়ার বাড়িতে। সেখানে কিছুক্ষণ গল্প করে চা খেয়ে হোটেলে পেঁছলাম—আটটার আগেই।

খানিকক্ষণ পরে এলেন ফোন করে খবর নিলে—আমি কেমন আছি আর জানালে প্রেস-অফিসে আটকা পড়েছে। আসতে তার দেরি হবে। আমি যেন একাই ব্রেকফাষ্ট খেয়ে নিই।

ব্রেকফাষ্ট খাওয়া শেষ। ভাবছি কি করি! কোথায় যাই। ঠিক তেমন সময় যাদুকর পি সি সরকার এসে হাজির আমার হোটেলে। এলেনের প্রতীক্ষায় খানিক গল্প করা গেল। তারপর ও এলোনা দেখে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম বেড়াতে।

পি সি সরকারের রাজার পোশাকপরা চেহারা আর আমার সাদা পোশাক। তাই দেখে রাস্তায় ভিড় করে ছেঁকে ধরতে লাগলো—ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সবাই। এগুনোই দায় হয়ে উঠলো। অনেকেই অটোগ্রাফ চায়। সবাই ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে—উনি কি মহারাজা? আমি বলি—"নু! এল্ এস্তে উন্ ম্যাজিচিয়ানো" ('না উনি একজন ম্যাজিসিয়ান) সরকার আমার মুখে রুমানিয়ান কথা শুনে অবাক!

সরকার ভায়াকে বললাম যে দেশে এমন একটা বিশ্ব-যুব উৎসব চলছে, সেই উৎসবের পাশে শুধু লক্ষ্য করো সাধারণ রুমানিয়াবাসীদের সাজ পোশাক আর তাদের রুগ্ন মলিন চেহারাগুলো। পার্টি আর নানা-ইউনিয়নের হুজুগে যুবক-যুবতীর দল ঐ যারা —পার্টির দেওয়া ইউনিফর্ম পরে, নিশান উড়িয়ে প্যারেড করছিল; বিশেষ সাজে সেজে এসে ফুল যারা দিচ্ছিল, এদের সঙ্গে তাদের

মিল খ‍ুঁজে পাচ্ছ কি? লক্ষ্য করো—কম্যুনিজমের স্বর্গে জামা কাপড়ের দুর্দশা! দেখলাম ভিড়ের মধ্যে গলায় লাল কাপড়ের ফালি বাঁধা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। এরাই হলো হাঁকডাকওয়ালা পাইওনীয়ার দলের সভ্য। এই ওদের আসল চেহারা। অথচ সাজিয়ে গুছিয়ে ছবি তুলে কম্যুনিস্টদের দেশের পাইওনীয়ারদের ঢাক পিটিয়ে আমাদের দেশেও আরও নানা দেশের ছেলে-মেয়েদের ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কারুর কারুর পায়ে মোজা আছে, কারুর পায়ে মোজা নেই, ছেঁড়া জুতোগুলোও দেখলাম সরকারকে। ওদের সঙ্গে আমাদের একটা ফটোও তুলিয়ে নিলাম—ভিড়ের একজনকে দিয়ে। (সেই ছবিটা ছাপা হলো) কারণ বিশ্ব-যুব-উৎসবের ভারতীয় প্রতিনিধিরা উৎসবের একদিকের ছবিই নিয়ে যাবে অন্য দিকটা তাঁরা দেখবেনও না, দেখাবেনও না।

তারপর ভিড় ঠেলে—ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলাম ইউনিভার্সিটি স্কোয়ারে। বিশেষ করে সেখানে পৃথিবীর বারোজন প্রতিভার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবিটা দেখে যে গর্বে ও আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছিল, সেই গর্ব ও আনন্দের ভাগটা সরকারকে দিতে—তারই একটা ফটো নিতে ওখানে গেলাম।

সরকারকে ছবিটা দেখিয়ে বললাম—"দেখ ভাই কম্যুনিষ্ট দেশেও বিশ্বের সেরা প্রতিভা হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে গণ্য করা হয় অথচ আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট বন্ধুরা তাঁকে অনেকেই বুর্জোয়া বলে গাল দিয়ে বক্তৃতা করে বেড়ান; প্রবন্ধ লেখেন। এইটাই সবচেয়ে বেদনাজনক।

যাদুকরকে দেখালাম একটি মেয়ে জালের থলিতে ভরে বাজার করে কি নিয়ে যাচ্ছে! গোটা কতক বেগুন, বড় বড় লঙ্কা, আর টমাটো। (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবিতে সে মেয়েটিরও ছবি রয়েছে) এলেন সঙ্গে না থাকায় বেড়াতে বেড়াতে জনসাধারণের সঙ্গে সেদিন রুমানিয়ান ভাষাতে কিছু কথাবার্তা হলো। তাই শুনে সরকার বললে—আপনি এই কদিনে রুমানিয়ান ভাষাও বেশ তো শিখে ফেলেছেন। এওতো ম্যাজিক! কি করে শিখলেন?" কি করে

শিখলাম তাকেও সেদিন বলিনি। শুধু বললাম—"চেষ্টা করলে তুমিও শিখে নিতে পারো।'

সরকারকে সঙ্গী পেয়ে বেপরোয়া। দুই বন্ধুতে স্বাধীনভাবে ঘণ্টা দুই-তিন হাঁটা গেলো।

বেলা বারোটা নাগাদ এথিনি প্যালেসের লাউঞ্জে ঢুকলাম—তখন যাদুকর আর মধুকর দুজনেই গলদঘর্ম। ক্ষিদে আর তেষ্টা দুটোরই তাগিদ জোর। তেষ্টার তাগিদের পাওনাটা আদায় দেওয়া গেল—ঢক্ ঢক্ করে কয়েক গেলাস জল গিলে। কিন্তু ক্ষিদেটা চেপে—সিধে হাজির হতে হলো যাদুকর সরকারের কামরায়। কারণ একটা বাজতে তখনও পাকা পঁয়তাল্লিশটি মিনিট বাকি।

সরকারের কামরায় গিয়ে হাতপা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম ওর বিছানায়; কিন্তু যাদুকর কথার যাদুতে উঠিয়ে বসালে। বার করলে—তার এবারকার ইউরোপ ভ্রমণের পাঁজিপুঁথি। নতুন নতুন খেলা সম্পর্কিত যত রাজ্যের ছবি, খবরের কাগজের কাটিং, বিজ্ঞাপন, পোস্টার মায় দু'চারটে নতুন খেলার হাতিয়ার। কয়েকটা খেলা দেখিয়ে বেবাক অবাক করে দিলে। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হলাম—যখন প্রকাণ্ড একটি টেলিগ্রামের ছাপা কার্বন কপি আমার হাতে দিলে। বললে, "যাদুকরকেও এরা বেকুব বানিয়েছে। উৎসবের বাইরের জাঁকজমক দেখে কালই এই টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছি দেশে। আজ ঘুরে ফিরে দেখে শুনে মনে হচ্ছে—এত তাড়াতাড়ি অতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হয়নি।"

আমি টেলিগ্রামটা পড়লাম। বললাম—"ঠিকই হয়েছে। বিদেশের পয়সায় এদেশে এসে বিনি পয়সায় ভোজ খেয়ে আতিথ্যে আপ্যায়নে গলেছেন অনেকেই। ওদের ঠুলি বাঁধা চোখে এসব দেশ দেখে গিয়ে দেশে ফিরে কতজনেই তো বাড়াবাড়ি করেছেন, তুমি আমি যদি করি তাতে আর দোষটা কি? টেলিগ্রামটা পয়সা খরচ করে করনি তো?"

সরকার জানালে—"না"। টেলিগ্রামটা করতে পয়সা তো লাগেইনি, এমনকি তাকে বলা হয়েছে—সে ইচ্ছা করলেই বিনা পয়সায় যতখুশি টেলিগ্রাম করতে পারবে।

আমি তখন হেসে বললাম, "সাম্যের দেশে সবাইকে এরা সমান চোখে দেখে না হে। এই দেখনা সাংবাদিকের তক্‌মা থাকা সত্ত্বেও আমাকে বিনাপয়সায় টেলিগ্রাম করার অধিকারটা দেওয়া হয়নি, অথচ তোমাকে দেওয়া হলো। প্রচার-বিজ্ঞানে ওরা নিজেরা যাদুকর তাই যাদুকরকেই কাজে লাগাতে চেয়েছে।

সরকার বললে—"কিন্তু রেখেছ তো আপনাকে একেবারে রাজার হালে।"

—রাজার হালেই খাওয়া শোওয়া বেড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে বটে, কিন্তু আসলে চলতে হচ্ছে ঐ দোভাষী শ্রীমতী এলেনের হুকুমে—অনুগত প্রজার চালে। এরপরে সরকারকে বললাম, আসার পর থেকে এলেন কিভাবে আমাকে আগলে রাখে, ভয় দেখায়, শাসন করে ও সোহাগ জানায়।

কথাগুলো শুনে সরকার রীতিমত ঘাবড়ে গেলো—"সাংঘাতিক ব্যাপার! ওপর থেকে কিছুই বোঝবার জো নেই। যাই হোক খুব সাবধানে থাকবেন।"

আমি বললাম—"ভয়ের চেয়ে ভরসাটাই আমার বেশী; কারণ আমার দেশ ও ভগবান এ দুইই এনেছি সঙ্গে। তারপর যাদুকর যখন সহায় তখন আর ভাবনা কি। অতএব ভয় না খেয়ে এখন দুপুরের খাওয়া খেতে যাই চলো।"

নীচে নেমে হোটেলের বাগানের টেবিলে দুজনে খেতে বসলাম—ওয়েটারকে ডেকে বললাম—"Tovarisha! Noi Vrem soupe al leguminoas, si poule bouille et bouillon, si orz si sardele"

(কমরেড, আমরা চাই শাকসব্জির ঝোল, মুর্গীসেদ্ধ, ভাত আর সার্ডিন মাছ।)

সরকার বললে—কি যে ফরমাস করলেন—একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। আমি বললাম—"ভয় নেই! অখাদ্য কিছু আসবে না।"

সরকার বললে—"দোভাষীদের সবচেয়ে দরকার পড়ে খাবার টেবিলে—কারণ যা চাই কিছুই বোঝাতে পারি না ওদের।"

আমি বললাম—"খাওয়ার ব্যাপারে আমরা খুঁতখুঁতে আর বাছবিচারটা বড় বেশী বলেই—তোমার আমার দোভাষীর দরকার হয় —খাওয়ার টেবিলে। ইউরোপের লোকদের তত বেশী অসুবিধা হয় না। কারণ ওরা জানোয়ার বিচার [illegible] মাংস খায় না।"

আমাদের ফরমাস মাফিক খাবা[illegible] টেবিলে এসে পেঁছালো। সঙ্গে সঙ্গে দেখি—[illegible] ইনটারপ্রেটার শ্রীমান থিয়োদুরুও এসে দাঁড়ালো টেবিলের পাশে। থিয়োদুরুকে দেখেই চিনলাম। এখানে আসবার সময়ে বুখারেস্টে গাড়ি পেঁছবার কয়েকটা স্টেশন আগে থেকেই ঐ যুবকটিই আমার কামরায় এসে আলাপ করেছিল। ওই আমাকে গাইড করেছিল বুখারেস্ট স্টেশন পর্যন্ত। থিয়োদুরু আমাকে দেখে এবং সরকার আর আমি দুজনে বন্ধু জেনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়লো। আমাদের টেবিলেই বসলো খেতে। ছেলেটি সত্যিই ভালো, সহজ মানুষ। কিন্তু [illegible]করের ধারণা ও ভারী বোকা। আমি বললাম—তোমার [illegible]গ্যি [illegible] যে বেশী চালাক দোভাষীর পাল্লায় পড়নি। খাওয়া শেষ করলাম—কফি আর আইসক্রীম দিয়ে।

খাওয়ার পর হোটেলের লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম এলেনের অপেক্ষায়। আমার পরিচিত অনেক বিদেশী বন্ধু ও সাংবা[illegible]দক যাঁরা খেতে এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে সরকারের পরিচয় ক[illegible] দিলাম। কিন্তু শ্রীমতী এলেনের কোনও পাত্তাই পাওয়া [illegible]ল না। ভাবলাম অ্যাম্বাসাডার হোটেলেই হয়তো ও খেয়ে নিয়েছে, আমার জন্য অপেক্ষা করছে সেখানেই। সরকারকে বললাম—এবার এলেনের খোঁজে আমার হোটেলে ফেরা দরকার। সারা সকাল তাকে ফাঁকি দিয়ে আড্ডা দিলাম—এর জন্য নিশ্চয়ই সে খুবই রেগে থাকবে।

উঠতে যাবো, ঠিক তেমন সময় রুমানিয়ার সচিত্র সাপ্তাহিক "Flacara" (ফুল্‌কী) পত্রিকার প্রতিনিধি Mr. Baboian Dick তাঁর কার্ড ও একটি পত্রিকা দিয়ে আমাকে জানালেন যে, তিনি তাঁদের পত্রিকার জন্য আমার একটি ফটো তুলবেন এবং সেই সঙ্গে একটি বাণীও চান। আমি বললাম—"বেশ তো! আমার বন্ধু

বিশ্বের একজন সবসেরা যাদুকর, মিঃ সরকারের ছবিও একটা সেই সঙ্গে নিলে খুশী হবো।"

মিঃ বাবোইয়ান ডিকের সঙ্গেই ছিলেন—ঐ পত্রিকার মহিলা স্টাফ ফটোগ্রাফারটি; তিনি তখনই ঐখানে একটি সোফায় বসিয়ে —আমাদের দুজনের দুটি আলাদা ও একসঙ্গে একটি ছবি তুললেন— ফ্ল্যাশ দিয়ে। বাণীটিও লিখে দিলাম ইংরেজীতে। সেটি ১৫ই আগস্টের "Flacara" পত্রিকায় রুমানিয়ান ভাষায় ছাপা হয়েছে, সেই সঙ্গে আমার কংগ্রেসে বক্তৃতা দেওয়ার ছবিটিও, কারণ তাঁদের তোলা ছবিটি আমার পছন্দ হয়নি। ("Flacara" পত্রিকায় ভারতের আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে একমাত্র আমার বাণী ও ছবিটিই ছাপা হয়েছিল।)

পত্রিকার প্রতিনিধি জানালেন—আমার বাণীর জন্য কিছু সম্মান দক্ষিণা তাঁরা পাঠাবেন, তাই আমার বুখারেস্টের ঠিকানাটা তাঁদের দিলাম। মিঃ ডিকের ভারী ইচ্ছে—যাদুকর সরকারের ম্যাজিক একটু দেখেন, আর সরকারের ইচ্ছে ওঁকে তাঁর ম্যাজিক এবং দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর ম্যাজিক সম্পর্কিত মন্তব্যগুলি দেখায়। কাজেই আবার সরকারের ঘরে গিয়ে বসতে হলো—মিঃ ডিককে নিয়ে।

সরকারের সব কিছু দেখানো এবং মিঃ ডিকের ম্যাজিক দেখা শেষ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো। ভোরে উঠেছি, ঘুমে তখন চোখ জুড়ে আসছে।

ওখান থেকে হোটেলে ফিরলাম। ফিরে দেখি লাউঞ্জে বসে আছেন শ্রীমতী এলেন মুখ ভার ক'রে। দেখা হতেই বললে— "কোথায় ছিলে? তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি এখানে বেলা এগারোটা থেকে।"

আমি বললাম—"তোমার আসতে দেরি হবে বলে আমার বন্ধু সরকারের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম ওর হোটেলে বসে। ভেবেছিলাম ওখানেই তোমার দেখা পাওয়া যাবে। ভাবতে পারিনি তুমি এতটা রাগ করবে। কি সংবাদ?"

এলেন বললে—দুঃসংবাদ? তোমার বক্তৃতার নকল পাইনি।

শুধু শুধু সারাটা সকাল নাকাল। তাছাড়া আজকে বিকেলে—তোমার স্পোর্টস দেখাবার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করতেই তো প্রেস অফিসে দেরি হয়ে গেল। তোমার জন্যে এত করি, তবু তুমি আমাকে এড়িয়ে চলো, তাকি বুঝিনা?

আমি বললাম—"তুমিও আমাকে ভারী ভুল বোঝো। দেখো অমন করে রোজ রোজ এক কথা বলে আমাকে দুঃখ দিও না।"

এলেন বললে—"আজ স্পোর্টস মিটিংয়ের সবসেরা অনুষ্ঠান। টিকিটও পাওয়া গেছে—যাও যদি খুশি হবো। চারটের সময় বেরোতে হবে। পারবে তো? না ঘুমুবে?"

আমি বললাম—"নিশ্চয়ই যাবো। তবে একটু বিশ্রাম করে। চারটের সময় তৈরি থাকবো নিশ্চয়ই।" কিছুক্ষণ গল্প করে এলেন বাসায় গেল বেশ বদলাতে।

বিশ্রামের পর চারটের সময় এলেন আসতেই রওনা দিলাম— রিপাবলিচি স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে। এলেনের এক বন্ধু শ্রীমতী আন্নাও আমাদের দলে জুটলো।

সাড়ে চারটে বেজে দু'এক মিনিট পার হয়ে গেছে, স্টেডিয়ামে পৌঁছলাম। বিরাট আর অদ্ভুত করে গড়া এ দেশের স্টেডিয়ামগুলো। চারিধার লোকে লোকারণ্য। হার্ডল দৌড়ের হিট হচ্ছে তখন। তারপর হাতুড়ি ছোড়ার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো। প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে—নরওয়ের স্বেরে স্ত্রান্দি (Svere Strandii), হাঙ্গেরীর শের্মেক (Csermek), প্রাক্তন বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠাতা ইমরে নেমেথ (Imre Nemeth) আর রাশিয়ার ক্রিভোনোশোফ (Krivonosov). জোর প্রতিযোগিতা হলো। হাতুড়ি ছোড়ার পাল্লায় কসরৎ কৌশলের কায়দা দেখে আমি হতভম্ব। তেমনি উত্তেজনা সারা স্টেডিয়াম জুড়ে। যাক্ সকলকে হারিয়ে বিজয়ী হলেন নরওয়ের স্ত্রান্দি। হাতুড়ি ছুড়লেন ৫৮·৪৯ মিটার দূরে। এরপরে মেয়েদের একশো মিটার দৌড়ের হিট, মেয়েদের

হাই জাম্প প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল, হপ্‌স্টেপ জাম্প প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল অনুষ্ঠিত হলো আধ ঘণ্টা ধরে।

মেয়েদের হাই জাম্প প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার মেয়ে আলেকজান্দ্রা চিউডিনা ১·৬৫ মিটার উচ্চতা ডিঙিয়ে বাকী আর দুটি মেয়েকে হারিয়ে বাজি মারলেন বাকী দু'জনের মধ্যে ছিলেন চেকোশ্লোভা-কিয়ার ওল্‌গা মোদ্রাশোভা, রাশিয়ার লিনা কসোভা। চমৎকার এদের স্বাস্থ্য আর দেহের গঠন। কিন্তু উত্তেজনা একেবারে টঙে উঠলো ছ'টার সময় যখন ৫০০০ মিটারের দৌড়ের বাজি আরম্ভ হলো।

জেটোপেক দৌড়ুচ্ছেন। বাস্‌রে! সে কী চিৎকার আর হাততালি! যাক্ এই বাজিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার জেটোপেকই ১৪ মিনিট ·০৩ সেকেণ্ডে দৌড়ের বাজি মেরে দিলেন। দ্বিতীয় হলেন, রুশিয়ার দৌড়বীর ভ্ল্যাডিমির কুট্‌জ, তৃতীয় হাঙ্গেরীর কোভাক্‌স্। বয়সে তাঁরা ছোকরা বা যুবক নন কেউই। ক'জনেরই যেমনি শরীর তেমনি দম। এই বাজিটা দেখার পরই স্টেডিয়ামের বেশীর ভাগ লোকই উঠে পড়লো—কারণ বাকী যা প্রতিযোগিতা ছিল, সেগুলো কোনটাই ফাইন্যাল নয়। আমরা তিনজনেও উঠে পড়লাম।

স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে এলেন বললে—"চলো আজ আমরা তেজ্ (Tei) হ্রদের ধারে নিরিবিলিতে একটু বেড়িয়ে আসি। আন্না খুব সুন্দর গান করতে পারে। ও তোমাকে গান শোনাবে।"

আমি বললাম—"অতি চমৎকার প্রস্তাব।"

তেজ্ হ্রদের ধারে গিয়ে গাড়ি থামলো। সত্যিই ভারী সুন্দর জায়গা। উৎসবের কোলাহল পৌঁছায়নি সেখানে। হ্রদের ধারে বসে নিশ্চিন্ত আরামে মাছ ধরছে রুমানিয়ার সাধারণ মানুষ। উৎসবের সাজানো গোছানো আনন্দের চেয়ে—সেই আনন্দেই তাদের সহজ রূপটি বড় ভালো লাগলো আমার। অনেকক্ষণ ধরে ওদের মাছধরা দেখলাম।

এলেনকে বললাম—"আমারও মাছ ধরতে ইচ্ছে করছে।" এলেন

বললে—“ইচ্ছে হলেও সেটি হওয়ার তো উপায় নেই—মাছ ধরবার অনুমতিপত্র থাকা চাই। মাছ ধ'রে আর কাজ নেই। গান শোনা যাক চলো।”

মনে মনে ভাবলাম—প্রকৃতির গড়া খাল বিল হ্রদ থেকে গরিব মানুষ দুটো মাছ ধরবে, তার জন্যেও অনুমতিপত্র দরকার হয়। বলতে পারলাম না কিছুই। চলতে হলো চঞ্চলার ইঙ্গিতে।

এলেন লেকের ধারে নিরিবিলি একটা জায়গা বেছে নিয়ে রীতিমত গানের আসর বসালে! আন্না ইংরেজি বলতে বা বুঝতে পারে না। এলেনের ফরমাসমত আন্না পর পর কয়েকটি প্রেমের গান গাইলে। গলাটি তার ভারী মিষ্টি। এলেন ইংরেজীতে গানগুলি অনুবাদ ক'রে আমায় শোনালে।

গানগুলির মানে শুনে ওর রকমসকম দেখে মনে মনে খুব হাসলাম। হাল্কা গানে ভালবাসার হ্যাংলামি! এলেনকে জিজ্ঞাসা করলাম—“তোবারিশা (কমরেড্) তোমার ভালবাসার লোকটি কোথায়? কি করেন তিনি?”

প্রশ্ন শুনে বে-সরম শ্রীমতী গরম দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। জানালে যে, ও যাকে ভালবাসতো, সে ওকে প্রবঞ্চনা করে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে। বললো—ওর [illegible]নই বরাত, ও আদর আর ভালবাসা চাইলেও—ওকে কেউ ভাল[illegible]সে না, আদর করে না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা দিলাম—“ভগবানকে ভালোবাসো—ভালবাসা পাবে আশ মিটিয়ে, সেখানে ঠকবার ভয় নেই।

এলেন উত্তেজিত হয়ে বললে—“ভগবান বলে কিছু নেই! ওসব বাজে কথা।”

আমি বললাম—“ভগবান না থাকলে—ভালবাসাও নেই, এটাই শিখে রাখো এই ভারতীয় বন্ধুটির কাছ থেকে।” আন্না এলেনের রকম সকম দেখে অবাক। গান থামিয়ে চুপ করে চেয়ে রইলো আমাদের দিকে।

আমি বললাম, “ধন্যবাদ! সুন্দর তোমার গলা আর গান আন্না!” এলেনকে বললাম—“তুমি ওকে আমার ধন্যবাদ আর প্রশংসাটা জানিয়ে

দাও।" এলেন বললে—"ওকে একটু আদর করে সেটা তুমি নিজেই জানাও।" আন্না এবং এলেনের দুজনের দুটি হাত ধরে আমি ওদের হাতের পিঠে চুমো খেলাম। বললাম—

"ভগবানকে ভালোবাসো—তাঁর প্রেমে ধন্য হও, সুখী হও তোমরা। দেখছো না, আঁধার মাটির বুকে সন্ধ্যা নেমে এসে চুমো খাচ্ছে মাটির পৃথিবীকে—সেও বলছে মানুষের কানে এই একই কথা। সন্ধ্যা হলো প্রার্থনার সময়। সন্ধ্যার সময় শাঁখ বাজিয়ে ঘরে ঘরে ভারতীয়রা স্মরণ করে ভগবানকে প্রতিদিন।"

এলেনের কথাগুলো ভাল লাগলো না। সে বললে—"নিরিবিলিতে এলেই তোমার মুখে ভগবান! ভগবান শুরু হয়ে যায় কেন বলতো?"

"পাছে ভূত ঘাড়ে চেপে বসে—তাই ভগবানকেই সহায় করি। বললাম—অন্ধকার হয়ে আসছে, চলো এখন ওঠা যাক।" এই বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। বাধ্য হয়ে ওরাও উঠলো।

আন্নাকে নামিয়ে দিয়ে অ্যাম্বাসাডার হোটেলে ফিরলাম যখন তখন আটটা। ওখানেই সেদিন রাতের খাওয়া সারা গেলো।

খাওয়ার পর এথিনিয়াম—বা এতেনিউল প্রাসাদে গেলাম এলেনের সঙ্গে। সাড়ে ন'টায় রাশিয়ার মিউজিক একাডেমির ছেলেমেয়েরা কনসার্ট শোনাবে।

কনসার্ট আরম্ভ হতে তখনও একটু দেরি আছে—এলেন এথিনিয়ামের একজন গাইড নিয়ে আমাকে প্রাসাদটা ঘুরিয়ে দেখালে। অদ্ভুত এর ভিতরকার কারুকার্য—আর জাঁকজমক। আগে একদিন এখানে এসেছিলাম, কিন্তু এতো ভালো করে ঘুরে দেখা হয়নি সবটা। জানা গেল, প্রায় সত্তর আশি বছর আগে রাজারা দেশবিদেশের রঙীন মার্বেল পাথর ও কারিগর এনে এটি তৈরি করিয়েছিলেন। ভিনিস ও ইতালীর মার্বেলের অদ্ভুত সব নিদর্শন। সবচেয়ে অদ্ভুত লাগলো—প্রাসাদের উপরে উঠবার সিঁড়িটা আর তার উপরে ভিতরের ছাদের গায়ে রকমারী কারুকার্য। শুনলাম

যুদ্ধের সময় এই প্রাসাদের ছাদের গম্বুজটা বোমার ঘায়ে ভেঙে পড়েছিল।

কনসার্ট আরম্ভ হলো যথাসময়ে। রাশিয়ার প্রায় একশোটি যুবক-যুবতী একই রকমের পোশাকে সেজে এসেছে। বেহালায় বাজালে একটার পর একটা রাশিয়ান ও [illegible]র বিখ্যাত সুরের গৎ। দেশী-কানে বিদেশী সুরের সব গৎগুলির সূক্ষ্ম কাজ যে বোধগম্য হলো, এমন দেমাক করতে পারি না। তবে বাজাবার কসরত আর একসঙ্গে একশোটা বেহালায় ছড় ওঠানামার প্যারেড দেখবার মতো।

ঘণ্টা দেড়েক পরে উঠে পড়লাম ওখান থেকে, কারণ বন্ধ ঘরে বড্ড গরম হচ্ছিল। বিজলী পাখা বা এয়ার কণ্ডিশনিংয়ের কোনও বালাই নেই ওদেশের কোনও সিনেমা থিয়েটারে। কনসার্ট হল থেকে বেরিয়ে এলেনকে ওর বাসার পথে খানিকটা এগিয়ে দিতে গেলাম। ও ট্রামে চড়লো, আমি ফিরলাম আমার হোটেলে। রাত তখন এগারোটা। রিসেপশানে চাবি নিতে যেতেই ওখানকার লোকটি আমার হাতে দুটি খাম দিলে। একটি খাম খুলে দেখলাম, 'কনতেমপোরানুল' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার বাবদ—সম্মানদক্ষিণা হিসেবে একশো লেইয়ের চারখানা নোট অর্থাৎ চারশো লেই সেই সঙ্গে একটি ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি। আর একটি খাম খুলতেই পেলাম—ছোট্ট একটি চিঠি তাতে লেখা—"Please come and meet us at Lucia's place." (অনুগ্রহ করে লুসিয়ার বাড়িতে এসে দেখা করো) লিখে রেখে গেছেন লেখক বন্ধুটি। সময়টাও লিখে গেছেন—রাত দশটা।

শরীরটা খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছিল—তবুও কি আর করি! আস্তে আস্তে পা বাড়ালাম—লুসিয়ার বাড়ির দিকে।

লুসিয়ার ফ্ল্যাটে হাজির হয়ে কলিং বেল টিপতেই লুসিয়া ছুটে এল। দরজা খুলে আনন্দ-অধীর অভ্যর্থনা জানালে। দেখলাম লেখক বন্ধু, তাঁর স্ত্রী ইয়োভান্নী, লুসিয়ার স্বামী টিটি ও'রা চারজনতো আছেনই তা ছাড়া আর একজন অপরিচিতা মহিলা রয়েছেন।

ইয়োভান্নী পরিচয় করিয়ে দিলে। বললে—"উনি রুমানিয়ার একজন বিখ্যাত পিয়ানো বাজিয়ে। উনিও ভগবানে বিশ্বাসী, তাই এসেছেন তোমাকে শ্রদ্ধা দিতে। জানাতে কয়েকটি কথা।"

আমি হাতজোড় করে নমস্কার করে বললাম—"অশেষ ধন্যবাদ। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। কি বলবেন বলুন?"

তার পরে যা ঘটলো তা অভাবনীয়। ভদ্রমহিলা একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, আমার হাত দুটো ধরে রুমানিয়ান ভাষায় কী যেন সব বলে গেলেন।

সব কথা বুঝতে পারলাম না। লুসিয়া অনুবাদ করে যা বললে—তাতে বুঝলাম, ভদ্রমহিলার আইনজীবি ছোট ভাইটিকে ধরে নিয়ে গেছে আজ দু'বছর হলো। তার কোনও খবর পাত্তা নেই। ভাইটি বেঁচে আছে, কি মরে গেছে তাও জানতে পারছেন না কোনও মতেই কারণ ও দেশে ধরে নিয়ে গেলে—তার খোঁজ পাত্তা মেলবার জোটি থাকে না। তাই আমার কাছে এসেছেন—আমি গুণে গেঁথে ওঁকে যদি সে খবরটা দিতে পারি তবে উনি অনেকখানি সান্ত্বনা পান। ওঁর ধারণা ভারতীয় মাত্রেই জ্যোতিষশাস্ত্র জানেন।

লুসিয়ার মুখে ওঁর বক্তব্য শুনে আমি অবাক! ভদ্রমহিলাকে বললাম—"আমায় মাপ করবেন, আমি জ্যোতিষশাস্ত্র জানি না—কোনও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীও নই, শুধু মাত্র ভগবান ও প্রার্থনার শক্তিতে বিশ্বাসী একজন সাধারণ ভারতবাসী। আপনি আপনার ভাইটির কল্যাণে প্রার্থনা করুন—তাতেই তার কল্যাণ হবে, এইটুকুই শুধু বলতে পারি।"

লুসিয়াকে বললাম—"তোমরা যদি এভাবে আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো তাহলে তোমাদের বাড়ি আসা ছাড়তে হবে।"

লুসিয়া ভয় পেয়ে বললে—"আমাদের তুমি ভুল বুঝো না। ও বেচারা ভাইয়ের শোকে কাতর হয়েই তোমাকে এমন অনুরোধ জানিয়েছে। আমরা অমন কথা ওকে কিছুই বলিনি।"

ভদ্রমহিলা ব্যাগ থেকে তাঁর ভাইয়ের একটি ফটো আমাকে দিয়ে অনুরোধ করলেন—আমিও যেন তাঁর ভাইয়ের কল্যাণ কামনায়

প্রার্থনা করি; দেশে ফিরে ভারতের সাধু সন্তদের কাছে তাঁর ভাইয়ের ছবিটি দেখাই। তাঁদের প্রার্থনা আর আশীর্বাদও যেন চেয়ে নিই।"

আমি বললাম—"ভক্তিভরে এ প্রার্থনা করবো—ভগবান আপনার ভাইকে কল্যাণে রাখুন—ফিরিয়ে এনে দিন নিরাপদে।"

ভদ্রমহিলা শ্রদ্ধাভরে আমার গালে আস্তে একটি চুমো খেয়ে শ্রদ্ধা জানালেন (গভীর শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাতে রুমানিয়ান পুরুষ ও নারীরা গালে চুমো খায়, সেটা টের পেয়েছিলাম গির্জাতে গিয়েই), বিদায় নিলেন জলভরা চোখে। টিটিও আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওঁর সঙ্গে চলে গেলেন।

আমি গুম্ হয়ে বসে রইলাম। লুসিয়া ও ইয়োভান্নী বড় বিশেষ কথা বলতে সাহস পেলে না।

লেখক-বন্ধু প্রসঙ্গটার মোড় ফিরিয়ে দিতে প্রশ্ন করলেন—"উৎসব উপভোগ করছো কেমন?"

আমি বললাম—"উৎসব উপভোগ করার চেয়ে—উৎসবের আড়ালে—দু-একটা গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষদের সঙ্গে মিশতে পারলে বেশী খুশী হতাম।"

লেখক-বন্ধু বললেন—"সে সুযোগ আমাদের দেশে মেলা খুবই খুবই শক্ত, তবে এখন উৎসবের হিড়িকে সে কড়াকড়িটা অনেকখানি আলগা করা হয়েছে—এই সুযোগে একলা যদি সাহস করে বেরিয়ে পড়তে পারো ট্যাক্সী নিয়ে, তাহলে বোধ হয় কিছুটা দেখতে পারো। রুমানিয়ান ভাষা কতদূর শেখা হলো?"

আমি বললাম—"শেখা আর হচ্ছে কই! লুসিয়া তো সে ব্যবস্থা করবে না।"

লুসিয়া বললে—"ক্ষমা করো, কাল থেকে নিশ্চয় তোমাকে পড়াবো।" লেখক-বন্ধুটিকে বললে "কিন্তু তুমি এঁর গ্রামে যাওয়ায় ট্যাক্সী ভাড়াটা জুগিয়ো। বিমল রুমানিয়ার লেই পাবে কোথা থেকে?"

আমি বললাম—"তার ব্যবস্থা আমিই করতে পারবো, অনেক

লেই আগেই জোগাড় করে রেখেছি, তা ছাড়া আজই চারশো লেই পেয়েছি "কন্‌তেম্‌পোরানুল" পত্রিকার কাছ থেকে।"

ইয়োভান্নী বললে—"না! না! তোমার ও লেইগুলো খাম-খেয়ালীতে খরচ করে বসো না। লেই দরকার হয়, আমরা তোমায় যথাসাধ্য সাহায্য করবো।"

লেখক-বন্ধুটি জিজ্ঞেস করলে—"রুমানিয়ার পর তুমি কোথায় যাবে ?"

আমি বললাম—"সোভিয়েট রাশিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গারী ও চেকোশ্লোভাকিয়া যাবার ইচ্ছা তো আছে, কিন্তু ওসব দেশের টাকা ও ভিসা জোগাড় করবো কি করে সেটাই ভাবনার কথা।"

লেখক-বন্ধু বললে—"সে ব্যবস্থা করে নিতে তোমার অসুবিধে হবে না, তবে তুমি তোমাদের দলের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া না গিয়ে, পোল্যান্ড ও হাঙ্গারীটা একা একা ঘুরে দেখে যাও। সেটাই তোমার এবং ও দুটি দেশের লোকের পক্ষে লাভজনক হবে। সে সব যোগাযোগ আমিই করে দিতে পারবো আশা করি।"

লেখক-বন্ধুটিকে বললাম—"তোমার বন্ধুত্বের ঋণ কোনও দিনই শোধ করতে পারবো না।"

এর পর ওদের ওখান থেকে উঠলাম। লুসিয়া বললে—"কাল ভোরে পড়তে আসছো তো ? বইটা সঙ্গে এনো।"

হোটেলে ফিরে যখন শুলাম—রাত তখন একটা। উৎসবের অন্তরালে—বন্ধুত্বের আনন্দে ও উত্তেজনায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমুতে পারলাম না।

পরের দিন ৬ই আগস্ট। খুব ভোরেই ঘুম ভাঙলো। তখনও চারধার বেশ ফর্সা হয়নি। তাই বিছানায় গড়াতে লাগলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো—ক'দিন পরেই আমার বিশেষ বন্ধু খান সাহেবের মেয়ে জিন্নাতের বিয়ে। তার বিয়েতে আমি থাকতে পারবো না ব'লে আসার সময় বন্ধু এবং বন্ধুপত্নী অনেক দুঃখ করেছিলেন।

অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, আমি যেন ওখান থেকে একটি কবিতায় জিন্নাতের বিয়ের আশীর্বাদ জানাই ! সেই আপনজনের উৎসবের কথাটাই ভুলে বসে আছি-এ বারোয়ারি উৎসবের তাগিদে !

তাড়াতাড়ি কাগজ কলম নিয়ে বসে ছোট্ট একটা কবিতা ও চিঠি লিখে ফেললাম। লিখলাম আরও দু'খানা চিঠি (সেসব চিঠির কোনওটিই এ-দেশে এসে পেঁছয়নি)।আলো ফুটতেই—গরম জলে স্নান ক'রে প্রার্থনা সেরে বেরোলাম রুমানিয়ান ভাষার বই ও খাতাটি বগলদাবা করে।

লুসিয়ার বাড়িতে পেঁছিলাম ছ'টা নাগাদ। ও রুটি মাখন খেতে দিলে লুসিয়া। তারপর শুরু হলো পড়া। অদ্ভুত লুসিয়ার পড়াবার কায়দা। প্রথমেই ও আমাকে তেমন সব ক্রিয়াপদগুলোর প্রয়োগ ও রূপ বুঝিয়ে দিলে—যেগুলো সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা বলতে সবচেয়ে বেশী দরকার হবে। তারপরে শেখালে প্রিপোজিশন, কনজাংশন ও অ্যাডভার্বের প্রয়োগ। বাঁধা ধরা কতকগুলো বাক্য আর শব্দ তো মুখস্থ করে ফেলেছিলাম আগেই। আমার শেখা শব্দগুলো জুড়ে-তেড়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উচ্চারণ করে দেবার জন্য লুসিয়া সেদিন রুমানিয়ান ভাষাতেই বেশি ভাগ কথাবার্তা চালালে। আমিও ভুলের ভয় না রেখেই রুমানিয়ান ভাষাতেই জবাব দেওয়ার চেষ্টাটা চালালাম। রুমানিয়ান ভাষায় উচ্চারণটা জার্মান ও ফরাসী ভাষার চেয়ে ঢের বেশী সহজ। তাই নিজে নিজেই আমি তা অনেকটা আয়ত্ত করতে পেরেছি একথা লুসিয়া আমাকে জানালে। সাড়ে সাতটা অবধি পড়া চললো পুরোদমে।

তারপর লুসিয়ার কাজে যাবার সময় হলো। সে অনুরোধ করলে—সময় করতে পারলে রাত্রে যেন ওদের সঙ্গে গল্প করতে যাই।

আমি বললাম—"খুব সম্ভব সময় হবে না। কারণ এলেন একটা না একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার তাগিদ নিয়ে হাজির হবেই।"

আটটার সময় হোটেলে ফিরে ব্রেকফাস্ট খেতে বসলাম। অস্ট্রিয়ান সাংবাদিক বন্ধু হামার্সক্ল্যাগের সঙ্গে দেখা হলো ক'দিন পরে। তিনি বললেন—মিঃ ঘোষ! আপনার সঙ্গে দেখাই হয় না যে! আমি আর আমার স্ত্রী এলেন কয়েকবার আপনার ঘরে খোঁজ করতে গেছি। ফিরেছি নিরাশ হয়ে।

আমি বললাম—"দেখা হওয়ার উপায় কোথায় বলুন?, উৎসব যে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। দু' দণ্ড বসে যে আমরা সবাই মিলে একটু গল্পগুজব করবো, তার অবসর কই!"

চা খেতে খেতে আমরা পরস্পরকে জানালাম—কে কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান দেখেছি, কেমন লেগেছে ইত্যাদি। ওঁর মুখেই শুনলাম, রুমানিয়ানদের প্রোগ্রামের রুমানিয়ার লোকনৃত্য নাকি দেখবার মতো জিনিস, ওটা যেন আমি দেখতে না ভুলি। আমি বললাম—"ধন্যবাদ! নিশ্চয়ই দেখবো।"

চা-খাওয়া সেরে লাউঞ্জে এসে বসলাম—দেখলাম লাউঞ্জে সেদিন ভয়ানক ভিড় লেগে গেছে। জায়গায় জায়গায় এক এক দেশের সাংবাদিক অতিথিরা জটলা পাকিয়ে কি যেন একটা ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছেন। কী ব্যাপার! খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আলোচনার বিষয়টা হচ্ছে, অনেকেই নিজেই নি[illegible] নোট বা ট্রাভেলার্স ভাঙিয়ে দরকার মতো রুমানিয়ার লেই [illegible]না। বিদেশীদের টাকা ভাঙানোর ব্যাপারে ক'দিন হলো [illegible] করা হয়েছে। তাই সবাই কিছুটা মুস্কিলে পড়েছেন [illegible]

আমি মনে মনে সেই সাংবাদিক বন্ধুটিকে ধন্যবাদ দিলাম। [illegible] এখানে আসবার পরই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, একসঙ্গে বেশী অ্যামাউণ্টের চেক ভাঙিয়ে রুমানিয়ার লেই জোগাড় করে রাখতে। ভাবলাম তাঁর কথা মতো ঐ কাজটি না করলে আমাকেও বিপদে পড়তে হতো।

মিঃ হামার্সক্ল্যাগ বললেন, "আমারও কিছু রুমানিয়ান লেই দরকার, কারণ এলেন (ওঁর স্ত্রী) কিছু কিনবে বলছিল।"

আমি বললাম—"সে জন্য আটকাবে না, দরকার হলে আমি কিছু

লেই ধার দিতে পারবো। ভিয়েনায় যখন আপনাদের অতিথি হবো, তখন শোধ দিলেই চলবে।" হ্যামার্সক্ল্যাগ ধন্যবাদ জানালেন।

লাউঞ্জেই সেদিন কদিন পরে দেখা হলো ইংলণ্ডের "নিউ স্টেটসম্যান অ্যাণ্ড নেশন" পত্রিকার মিঃ নরম্যান ম্যাকেঞ্জী ও "ডেলী ওয়ার্কার" পত্রিকার মিঃ ম্যাকডুগালের সঙ্গে। ওঁদের কাছে জানতে পারলাম, রয়টারের মিঃ স্ট্যানলী ক্লার্ক ফিরে গেছেন লণ্ডনে। পোলাণ্ডের "Tribuna Ludu" পত্রিকার প্রতিনিধি Bernard Sztatler-এর সঙ্গে আলাপ হলো। উনি জানতে চাইলেন—কদিন পরেই পোল্যাণ্ডে যে আন্তর্জাতিক ছাত্র কংগ্রেসের অধিবেশন হবে, সেটিতে আমি যোগ দিতে যাব কি না। আমি বললাম—"পোলাণ্ডটা দেখে যাওয়ার খুবই ইচ্ছে আছে, কিন্তু ভিসা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা কিভাবে জোগাড় করে উঠতে পারবো, সেটাই বুঝতে পারছি না।'

বার্নার্ড জানালেন—"তার জন্যে খুব অসুবিধা হবে না আপনার। বুখারেস্টের পোল দূতাবাস থেকে ভিসা নিয়ে নিতে পারবেন। আমার দ্বারা যতটা সম্ভব আপনাকে সে সাহায্য করবো।" আমি ওঁকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম।

দশটা বেজে গেল। এলেন এলো না দেখে নিজের ঘরেই ফিরে গেলাম। দেখি আমার ঘরের পরিচারিকা পেরেশার বদলে অন্য একটি বৃদ্ধা পরিচারিকা আমার ঘরটি পরিষ্কার করছে। বেশ লম্বা চেহারা, মাথার চুলগুলি সব পাকা। ঘরে ঢুকতেই সে আমাকে ইংরেজীতে বললে,—"গুড্ মর্নিং মশিয়ে।"

জিজ্ঞেস করলাম—"মাদাম পেরেশা কোথায়?"

ও ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে জানালে—"পেরেশা ছুটি নিয়ে গ্রামে গেছে ছেলেমেয়েকে দেখতে। তার বদলে ওর ওপরই ভার পড়েছে আমার ঘরের কাজের।"

আমি বললাম—"তুমি ইংরেজী জান দেখছি।" ও বললে—"খুব ভাল জানি না, তবে আমার স্বামী জাহাজের কাপ্তেন ছিল, তাই

নানা দেশ ঘোরবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ইংরেজীও সামান্য কিছু শিখে ছিলাম, তবে এখন প্রায় ভুলে গেছি। বললো, আমি ইংলন্ড, স্পেন, আফ্রিকা, এডেন, বোম্বাই এসব জায়গাতেই গিয়েছিলাম। সে প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। সব কথা মনে নেই।"

আমি বললাম—"এখন তোমার বয়স কত? স্বামী বেঁচে আছেন?"

ও জলভরা চোখে জবাব দিলে—"বয়স আমার পঁয়ষট্টি। স্বামী পুত্র সবাইকে হারিয়েছি গত যুদ্ধে। তাই এই বয়সে ভোর পাঁচটা থেকে রাত আটটা অবধি খাটতে হচ্ছে পেটের দায়ে।"

—"সরকার থেকে তোমাদের বুড়ো বয়সে পেনসন দেয় শুনেছি, তুমি তা পাও না?"

—"পাই. মাসে আঠারো লেই; তাতে সাত দিনের খোরাকও হয় না। আমার ছেলে যুদ্ধে মরেছে, তাই এই কাজটা পেয়েছি, নইলে তাও পেতুম না, মরতে হতো না খেয়ে।"

—"তোমাদের দেশে শুনি বেকার নেই কেউ।"

—"মিথ্যে কথা! লক্ষ লক্ষ লোক বেকার আছে। নতুন শাসন-ব্যবস্থায় কম্যুনিস্ট পার্টির লোকেরা বিশেষ করে যুবক-যুবতীরাই কাজ পায়; তবে তাও তাদের পছন্দমত নয়। শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে যাকে যে কাজে পাঠানো হয়, মুখ বুজে তাকে সে কাজে যেতে হয়। পার্টির ইউনিয়নে নাম-না-লেখালে এখানে কাজ পাওয়া যায় না। পার্টির নেতাদের হুকুম মেনে সুনজরে থাকতে না পারলে কাজতো থাকেই না, দেওয়া হয় কঠোর শাস্তি, এমন কি প্রাণদণ্ডও।"

(এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি কম্যুনিস্ট দেশগুলির যে সব খবরের কাগজ আমি যোগাড় করে এনেছি, তার কোনওটিতেই চাকরী—খালির বিজ্ঞাপন দেখি নি। দরখাস্ত করে বা যোগ্যতা অনুসারে সোজা রাস্তায় চাকরী সেখানে হয় না)

স্তম্ভিত হলাম—হোটেলের পরিচারিকার মুখ থেকে এসব কথা শুনে। তারও ভরসা হলো না আর এভাবে বেশীক্ষণ কথা বলতে। চাপা গলায় শুধু বললে—"তুমি ভারতবর্ষের লোক, নেহরুর আর

গান্ধীর দেশের মানুষ বলেই বিশ্বাস করে তোমাকে এসব কথা বললাম, কাউকে বলো না যেন। মাদাম পেরেশার কাছে শুনেছি—তুমি খুব মহৎ লোক। তুমি আমার ছেলের মতো, তাই দুটো দুঃখের কথা বললাম। অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা করো।" এই বলে জলভরা চোখে বৃদ্ধা আমার গালে চুমো খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলো।

জলভরা চোখে বিছানায় শুয়ে পড়ে ভাবতে লাগলাম, কম্যুনিস্ট দেশগুলির ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে, এই বিশ্বযুব উৎসবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মনে যে সব উঁচু ধারণা ছিল, ঘটনার পর ঘটনায় সেগুলি যে শুধু কেবল চুরমার হয়ে যাচ্ছে তা তো নয়, আমার মনটাকেও যেন শঙ্কায় সন্দেহে কণ্টকিত ক'রে দিচ্ছে।

শুয়ে আছি অবসাদ ও চিন্তার দোলায়। তেমন সময় দরজায় ঠক্ ঠক্ ঘা পড়লো। ভয়ে ভয়ে ঘরের দরজা খুললাম।

—"সুপ্রভাত! মিঃ ঘোষ। ক্ষমা করো, আসতে একটু দেরি হয়ে গেলো।" এলেন এসে ঢুকলো ঘরে।

মনে মনে বললাম—"ভাগ্যিস তুমি কয়েক মিনিট আগে এসে পড়োনি"—মুখে বললাম—"ভালোই হয়েছে, একটু বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেছলো। এখন কি করতে হবে তাই হুকুম করো।"

এলেন বললে—"চলো তোমায় সরকারী নিউজ এজেন্সী "AGER PRESS" সংবাদ-প্রতিষ্ঠানটা দেখিয়ে আনি। বেশী দূরে নয়। হেঁটেই যাওয়া যাবে। ওখান থেকে ঘরে এসে লাঞ্চ খাওয়া যাবে।"

আমি বললাম—"তারপর আর আর প্রোগ্রামটা কি শুনি।?"

ও জানালে—"আপাতত ঠিক আছে রাত্রে একটা ভালো অনুষ্ঠান দেখাতে নিয়ে যাবো। দুপুরে সিনেমায় যাওয়া যেতে পারে।"

রুমানিয়ার সরকারী প্রচার বিভাগ ও সংবাদ প্রতিষ্ঠান দেখতে হাজির হলাম। ৭নং 'মাতেই মিলো রাস্তা'র হেড অফিসে। অফিসটি চমৎকার সাজানো গোছানো—ঘরের দেওয়ালে রুমানিয়ার নানাদিকের

নানা প্রচারকার্যের প্রাচীরচিত্র আর ফটো। ওখান থেকে "AGER PRESS" নামে ইংরেজী ও নানা বিদেশী ভাষায় বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। বিদেশে এবং বিদেশীদের কাছে প্রচারকার্য করার জন্য।

জানলাম, ওখান থেকে সরকারী খবরের কাগজে সমস্ত খবর সেন্সর করে পাঠানো হয়। ওখানে রুমানিয়ান কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গেও আলাপ হলো। তাঁরা আমাকে কয়েকখানি "AGER PRESS" বুলেটিন উপহার দিলেন। বুলেটিনগুলি ইংরেজিতে ছাপা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের সংবাদপত্র ইত্যাদিতে কম্যুনিস্ট দেশগুলি ছাড়া অন্য দেশের খবর বড় একটা ছাপা হয় না কেন বলুন তো?" প্রশ্নটাতে ওঁরা খুবই বিব্রত বোধ করলেন। বললেন, "মাত্র চার পাতার কাগজে সব দেশের সব খবর দেওয়ার জায়গা হয় না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "রুমানিয়ায় এসে বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দেশের যতগুলি খবরের কাগজ দেখলাম, সেগুলির কোনটারই আকার চার পাতার বেশী বড় নয় কেন? আপনাদের এসব দেশে শুনি প্রচুর নিউজ-প্রিণ্ট তৈরি হয়। তবে কাগজের পাতা বাড়ায় না কেন?" ওঁরা বললেন, "এর সঠিক কারণটা জানাতে পারছি না। কারণ আমরা নিজেরাই সেটা জানি না।" এলেন আমার প্রশ্ন ও কৌতূহলের রকম সকম দেখে বোধ হয় বিব্রত হলো। বললে—"চলো এবার যাওয়া যাক্।"

ওখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলেছি—সুহৃৎভায়ার সঙ্গে দেখা। সুহৃৎ বললে—"বিমলদা, এখানে এসে আমাদের ভুলেই গেলেন যে একেবারে? খোঁজখবরও নেন্ না আমাদের!"

আমি বললাম, "ফুরসৎ কই ভাই? তা'ছাড়া তোমাদের আস্তানার না জানি ঠিকানা, না জানি পথ! কি করি বলতো? তোমরাও তো আমার খবর নাওনি।" সুহৃৎ আমাকে ভারতীয় প্রতিনিধি শিবিরের ঠিকানাটা লিখে দিলে 56, Strata Popov. এলেনের সঙ্গে সুহৃতের পরিচয় করিয়ে দিলাম। সুহৃতের কাছে

ভারতীয় প্রতিনিধি বন্ধুরা কে কেমন আছেন সব খবর পেলাম। ওকে বললাম, আগামীকাল তোমাদের ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করবো। হাঁটতে হাঁটতে তিনজনে এথিনি প্যালেস অবধি এলাম। সুহৃৎ ওখান থেকে চলে গেল। আমরা খেতে গেলাম।

খাওয়ার টেবিলে বসে দেখলাম, এলেন খুব গম্ভীর। বুঝলাম, সে বেশ রেগে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম—"কি হয়েছে কমরেড! তুমি অমন চুপচাপ কেন?"

এলেন বললে—"তুমি তোমার ঐ ভারতীয় বন্ধুটির সঙ্গে সব কথাই বললে ভারতীয় ভাষায়। আমি যে সঙ্গে রয়েছি সেটা কেউ খেয়ালই করলে না। এতে আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছি।"

আমি বললাম—"ক্ষমা করো, অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। তবে কি জানো নিজের ভাষা বলবার সুযোগ পেলে কেউ কি বিদেশী ভাষা বলে সুখ পায়?"

বুঝলাম, কাজটা অন্যায় হয়েছে আর এলেন খুব চটে আছে। তাই আর কথা কাটাকাটি করতে ভরসা হলো না।

চুপচাপ খাওয়া সেরে হাঁটি হাঁটি করে হোটেলের পথে চলেছি মুখ বুজে। এলেন বললে—"চিঠিপত্র ডাকে দেওয়ার থাকে তো আমাকে দিয়ে যাও, আমি প্রেস-অফিসে যাবো।" আমি বললাম—"ধন্যবাদ! জরুরী কয়েকটা চিঠি ডাকে দিতে হবে যে, সে কথাটা একদম ভুলে গেছলাম। ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলে।"

এলেন বললে, "কোন্ কথাটাই বা তুমি মনে রাখতে পারো? সব সময় তুমি যেন কেমন অন্যমনস্ক আর উদাসী। কি অত ভাবো বলতো?"

বললাম—"ভাবনার কি আর শেষ আছে এলেন?"

হোটেলে পৌঁছে উপর থেকে চিঠি তিনটি এনে এলেনের হাতে দিলাম—আর ডাকখরচ বাবদ সেই সঙ্গে দশ লেই। এলেন যাওয়ার জন্যে উঠে পড়লো, জানালো ও সন্ধ্যা নাগাদ আসবে। আমি বললাম—"পার তো রুমানিয়ান কালচারাল প্রোগ্রামের টিকিট এনো। শুনেছি রুমানিয়ান প্রোগ্রাম খুবই নাকি ভালো হচ্ছে।" আমার

ঐ কথা শুনে এলেনের মুখে হাসি ফুটলো। সে তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দু'খানা নিমন্ত্রণ পত্র বার করে দেখিয়ে বললে—"এই দেখ সেটা আমি আগে থেকে জোগাড় করে রেখেছি। দেখছো তো আমি তোমার মনের কথা টের পাই। তুমি কিন্তু আমার মনের কথা একটুও টের পাও না।"

আমি হেসে বললাম—"জানো এলেন, আমাদের শাস্ত্রে একটি কথা আছে যে মেয়েদের মনের কথা দেবতারাও জানতে পারেন না, আমি তো কোন্ ছার!"

"দেবতারা সেটা জানতে চেষ্টা না করলে কি করে জানবেন?" এই বলে দুষ্টুমির হাসি হেসে এলেন চলে গেল।

উপরে গিয়ে জামা জুতো খুলে সকালে লুসিয়ার পড়ানো নতুন পড়াগুলো পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা টের পাইনি।

ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যা সাতটায়, যখন এলেন এসে নীচে থেকে টেলিফোন করলে। খুব অপ্রস্তুত হলাম। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নীচে গেলাম। আমাদের অ্যাম্বাসাডার হোটেলের ডাইনিং রুমেই ঝটপট্ ডিনারটা সারা গেল। তারপর বার হলাম দুজনে C F R Giulisti থিয়েটারের উদ্দেশ্যে।

রাত ন'টায় সেখানে রুমানিয়ার প্রোগ্রাম আরম্ভ হলো। প্রথম থেকে অনুষ্ঠানটা খুব জমে উঠলো। কারণ সেদিন রুমানিয়ার বিভিন্ন গ্রাম-অঞ্চলের "হোরা" "সার্বা" প্রভৃতি লোকনৃত্য আর লোকসংগীত ছিল অনুষ্ঠানের অংগ। নাচের সাজপোশাকগুলো যেমন জমজমাট তেমনি রঙচঙে আর তেমনি সেগুলির অদ্ভুত নাম। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে এটা জানা গেল যে, বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য নাচে যারা অংশ নিয়ে নাচছে, তারা আসলে কেউ ঐসব গ্রাম্য অঞ্চলের ছেলেমেয়ে নয়। তারা অধিকাংশই শহরের কলকারখানা, স্কুল কলেজ ও বিভিন্ন ইউনিয়নের সভ্য-সভ্যা। এ কথাগুলি জেনে সত্যিই খুব আনন্দ হলো। ভাবলাম আমাদের শহরের ছেলেমেয়েরা,

যুবক-যুবতীরা বিদেশী ঢংয়ের আধুনিক নাচ আর গানের স্রোতে গা না ভাসিয়ে আমাদের নিজের দেশের লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য-গুলিকেও যদি এইভাবে শেখাবার ও দেখাবার ব্যবস্থা করতো তাহলে কত বড় কাজ হতো।

সবচেয়ে ভালো লাগলো আমার সেদিন রুমানিয়ার ফ্যাগারাস্ অঞ্চলের কয়েকটি লোকনৃত্য। সবচেয়ে ভালো নাচ দেখালে সেদিন রুমানিয়ান ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের নাচিয়ে দলটির যুবক-যুবতীরা। পেত্রে কন্স্তানতিনস্কু আর হারালাম্বি আইও-নেস্কুর একক ও দ্বৈত নাচ সত্যিই দেখবার মতো। তবে ওদেশের নাচে আমাদের দেশের মতো কোমলকান্ত দেহভঙ্গীর লীলায়িত ছন্দ মেলে না, চলে রীতিমত কসরতের দাপাদাপি। নাচ শেষ হলো রাত বারোটায়।

এলেন আমাকে হোটেলে পেঁছে দিয়ে যখন বিদায় নিলো রাত তখন বারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট।

পরের দিন ভোরে উঠে যথারীতি স্নানটান সেরে পড়তে গেলাম লুসিয়ার কাছে।

ঘণ্টা দুয়েক পড়াশুনা করে হোটেলে ফিরলাম সাড়ে সাতটা নাগাদ। চিঠিপত্র ও ডায়েরী লিখছি, এমন সময় ঘরের টেলিফোন বেজে উঠলো। উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম। বিশ্বযুব কংগ্রেস ও উৎসবের আন্তর্জাতিক কমিটির ভারতীয় সদস্য বন্ধুবর সারদা মিত্র জানালেন যেন, আজ বিশ্বযুব কংগ্রেস ও উৎসবের সাধারণ সম্পাদক মিঃ জ্যাক ডেনির সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে, যদি আমি তাঁর সঙ্গে ফেস্টিভ্যাল অফিসে যাই। (এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে, মিঃ জ্যাক ডেনি বিশ্বযুব কংগ্রেসে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তাতে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল ও ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘট সম্বন্ধে এমন কতকগুলি মিথ্যা প্রসঙ্গের উল্লেখ ছিল যেগুলি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা একান্ত প্রয়োজন বোধ করেছিলাম এবং সেইমত বন্ধুবর সারদা মিত্রকে কেবলমাত্র জানিয়েছিলাম যে, মিঃ জ্যাক ডেনির

সঙ্গে আমার একটু দেখা হওয়া দরকার।) তাই তিনি সে ব্যবস্থা করে আমাকে ঐ খবরটি দিলেন। তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। ঠিক হলো সাড়ে আটটায় হোটেলের লাউঞ্জে আমরা মিলিত হবো এবং একসঙ্গে ফেস্টিভ্যাল অফিসে যাবো।

বিশ্বযুব কংগ্রেসের প্রায় ৪২ পাতা ফুলস্কেপ কাগজের টাইপ করা যে রিপোর্টটি আমাকে দেওয়া হয়েছিল—তার ৩০ পৃষ্ঠায় ("For Demoratic Rights" এই শিরোনামায় লেখা হয়েছে—

"Young people are fighting in order to be allowed freedom of assembly to discuss their opinions and needs and to organize and work for them. They demand the right to participate in the social life of their people.

Thus the 100,000 secondary school children of West Bengal have carried on, in alliance with their teachers, a long and successful strike, in opposition to a bill depriving them of their right to free organization.") *

মনে রাখবেন এই বিবরণীটি দেওয়া হয়েছিল ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে, তার আগে পশ্চিমবঙ্গে কবে এই 'লঙ' ধর্মঘটটি হয়েছিল? এবং এদেশের ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য কবে বিল উপস্থাপিত করা হয়েছিল? এই কৈফিয়তটা চাইবেন কি এদেশের জনসাধারণ, সরকার ও ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের কাছ থেকে, যাঁরা এইভাবে বিদেশে স্বদেশ সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করেন অর্থসাহায্য আদায় করে আনতে? এই ব্যাপারটি থেকে এদেশের জনসাধারণ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক অভিভাবিকা, সরকার ও ছাত্রসমাজ বুঝতে চেষ্টা করবেন কি যে, কারা, কিভাবে, কোন্ উদ্দেশ্যে এদেশের শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজকে ক্ষেপিয়ে, দেশের স্বার্থ ও সম্মান বিকিয়ে দেশকে কোন্‌পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন?

সাড়ে আটটার সময় লাউঞ্জে নামতেই বন্ধুবর সারদা মিত্রের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন ফেস্টিভ্যাল অফিসে।

সেখানে বন্ধুবর নির্মল বসুর ঘরে গিয়ে বসলাম। ওখানে বসে কয়েকটি চিঠি লিখে—পোস্ট করার জন্য নির্মলবাবুকে দিলাম। (তার একটি চিঠিও এসে পৌঁছয়নি)।

ঘণ্টা দুয়েক ওখানে বসে থাকবার পরে মিঃ মিত্র ফিরে এসে জানালেন, মিঃ জ্যাক ডেনি একটা জরুরী মিটিংয়ে আটকে পড়েছেন, তাঁর সঙ্গে আজ দেখা হবে না, পরে তিনি আবার ব্যবস্থা করবেন। জ্যাক ডেনির দর্শন না মিললেও ওখানেই দেখা হয়ে গেলো ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ শাণ্ডিল্য, মিঃ পানজোয়ানী প্রভৃতি ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে। ওঁরা সবাই আমাকে অনুরোধ করলেন ওঁদের সঙ্গে ভারতীয় শিবিরে যাওয়ার জন্য। বন্ধুবর সারদা মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সবাই ৫৬নং স্মাতা পোপভ-এ ভারতীয় প্রতিনিধিদের আস্তানাতে পৌঁছলাম বেলা বারোটা নাগাদ।

দশ বারো দিন পরে সহযাত্রী ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। তারাও খুশী, আমিও খুশী। তাছাড়া ইউরোপ থেকে যেসব ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমার চেনা-জানা কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দের মাত্রাটা বেড়ে গেল। বিশেষ করে শ্রীযুক্ত ভট্টশালী, কুমারেশ চন্দ্র, শান্তি পাল, ঘাটনেকার, বীরেন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্তা ইন্দ্রাণী রহমান প্রভৃতি বন্ধুদের আন্তরিক মধুর আপ্যায়ন ও ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। ওঁদের সঙ্গেই সেদিন খেলাম ভারতীয় শিবিরে। দেখলাম ওখানকার খাওয়া-দাওয়া খুবই সাধারণ, আমাদের হোটেলের মতো রাজকীয় ব্যাপার নয়। কড়াইশুঁটি, গাজর, বীট, ভেজিটেবল স্যুপ, মাংসের টুকরো দিয়ে সেদ্ধভাত। নিরামিশাষীরা দুধ, স্যুপ, পাউরুটি, টমেটো খেয়েই পেট ভরালে।

খাওয়ার পর ভট্টশালী ভায়ার বিছানায় শুয়ে সকলের সঙ্গে বেশ খানিক জমিয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। ওঁদের কারুর কারুর মুখ থেকেই ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় যুব প্রতিনিধিদের চালচলনের সমালোচনা কানে এলো।

তিনটের সময়ে দল বেঁধে বাসে চেপে ওঁদের সঙ্গে রওনা হলাম

বৃটেনের কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধিদের মিলন-সভায়। মিলন-সভায় বৃটেনের প্রতিনিধিদল ও ভারতীয় প্রতিনিধিদলের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় করে পরস্পরের পিঠ-চুলকানো বক্তৃতা হলো। উপহার দেওয়া-নেওয়া, আলাপ পরিচয়ও হলো। পেটেও কিছু পড়লো চা-বিস্কুট, কেক। শেষকালে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে নামকরা তরুণ গায়ক মিঃ ইভান ম্যাক্‌কল কয়েকটি পল্লী-সঙ্গীত ও একটি হাসির গান শোনালেন। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্তা ইন্দ্রাণী রহমান রেকর্ড বাজিয়ে ভারত নাট্যমের দুটি নাচ দেখালেন।

মিলন-সভা শেষ হলে আমরা দল বেঁধে বাসে চেপে রওনা হলাম ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আর অস্ট্রিয়ার (E. S. K Gratz) দলের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ দেখতে। কিন্তু এমনই বরাৎ, আমাদের বাসের ড্রাইভার বা গাইড কারুরও ঠিকমত জানা ছিল না কোন মাঠে ঐ ম্যাচটা খেলা হবে। ফলে তিন চারটে মাঠ আর স্টেডিয়াম ঘুরে যখন আসল মাঠে পৌঁছলাম তখন সবেমাত্র খেলাটি শেষ হয়েছে। জানা গেল, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দু' গোলে অস্ট্রিয়ান টীমটিকে হারিয়ে দিয়েছে। এ খবরে বুকটা আনন্দে ও গর্বে ভরে উঠলো।

ইস্টবেঙ্গল দলের মিঃ গুহ, মিঃ সাহা প্রভৃতি অনেক চেনা-জানা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। সকলেরই খুব আনন্দ! খেলার শেষে ভারতীয় খেলোয়াড়রা তাঁদের বাসে উঠিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে গেলেন স্পোর্টস ক্যাম্পে।

স্পোর্টস ক্যাম্পে যেতে যেতে দেখলাম রাস্তায় মেয়েদের বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। কী ব্যাপার! হঠাৎ মনে হলো, ওঃ আজ ৭ই আগস্ট—বিশ্বযুব উৎসবের 'যুবতী দিবস'। বিশ্বের নানাদেশ থেকে যেসব যুবতী প্রতিনিধি এসেছেন আজ তাঁদের শোভাযাত্রা হচ্ছে। নানান দেশের মেয়েরা তাদের দেশের জাতীয় পতাকা ও রকমারী ফেস্টুন নিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে। ভারতবর্ষ থেকে যে দুটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে গেছলেন এবং যে কটি ভারতীয় মেয়ে ইউরোপ থেকে এসেছিলেন, দেখলাম তাঁরা সবাই হাত ধরাধরি করে'

রাস্তায় নাচতে নাচতে চলেছেন। তবে তাঁদের সঙ্গে ভারতের জাতীয় পতাকাটি নেই। এটা দেখে ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। রাস্তার দুধারে রুমানিয়ান পুরুষ ও নারীরা ভিড় করে এই শোভা-যাত্রা দেখছে। আমরা শোভাযাত্রার রাস্তা না ধ'রে অন্য রাস্তা দিয়ে স্পোর্টস ক্যাম্পে পেঁছিলাম।

স্পোর্টস-ক্যাম্পে যেতেই বিমানের সঙ্গী চারজন ভারতীয় সাইকেল-দৌড়বীর ও বন্ধুবর সুনীল চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা। ক'দিন পরে আমাকে দেখে ওঁরা ভারী খুশী। ওঁদের কাছে খবর পেলাম ভারতীয় ভলিবল টীম হাঙ্গারীর একটা টীমকে হারিয়ে দিয়েছে। তবে সাইকেল-দৌড়বীররা কেউ ফাইন্যালে উঠতে পারেননি। হাতমুখ ধুয়ে খানিকটা জিরিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড় দলের সঙ্গে ওখানেই রাত্রের খাওয়া খেলাম, কারণ ভারতীয় খেলোয়াড় বন্ধুরা নাছোড়বান্দা। খেলোয়াড়দের শিবিরে খাওয়া-দাওয়ার ফর্দটা মোটা-মুটি ভালোই যে তা দেখলাম।

খাওয়ার পর তাড়াতাড়ি হোটেলে ফেরবার কথা মনে হলো, কারণ এলেনকে না জানিয়ে সারাটা দিনই বাইরে বাইরে কাটিয়েছি। এলেন নিশ্চয়ই আমার উপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে আছে।

স্পোর্টস ক্যাম্প থেকে হেঁটেই ফিরলাম হোটেলে। যখন পেঁছিলাম রাত তখন সাড়ে নটা। দেখলাম হোটেলের লাউঞ্জ খালি —কেউ কোথাও নেই! এলেনকে না দেখতে পেয়ে অনেকখানি স্বস্তি বোধ করলাম বটে কিন্তু শঙ্কাটা গেলো না। কি আর করি! নিজের ঘরে গিয়ে জামাজুতো ছেড়ে, বেশ করে স্নান করে বই মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। সারাদিনের ছুটোছুটি দৌড়-ঝাঁপের ফলে শরীরটা ক্লান্তই ছিল, শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন ৮ই আগস্ট। আলো ফুটতেই নিদ্রা টুটলো। স্নান ইত্যাদি সেরে হাজির হলাম লুসিয়ার ফ্ল্যাটে। বই খাতা বগলে করে।

লুসিয়ার স্বামী টিটিসিয়ান (টিটি), আমিও ও লুসিয়া একসঙ্গে চা খেলাম। লুসিয়া জানালে কাল ওরা কয়েকবার আমাকে ফোন করেছিল এবং রাত্রিবেলা ওরা সবাই এবং আরও কয়েকজন নতুন বন্ধু আমার জন্যে অপেক্ষ করে বসেছিল—ভারতবর্ষের গল্প শুনবে বলে। কাল আমি না আসাতে ওরা সবাই খুব নিরাশ হয়েছে। একথা শুনে আমি বার বার দুঃখ জানিয়ে ক্ষমা চাইলাম। তারপর ঘণ্টা দুয়েক রুমানিয়ান ভাষা চর্চা চললো।

পড়তে পড়তে কথার ফাঁকে সেদিনই প্রথম টের পেলাম যে, লুসিয়া ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী ছাড়া ইতালীয়ান, পোলিশ, হাঙ্গারীর ভাষাও কিছু কিছু জানে। রকমারী ভাষা শেখা ওর একটা নেশা।

আমি বললাম, "অদ্ভুত তোমার প্রতিভা লুসিয়া! কি করে শিখলে এতগুলো ভাষা?" লুসিয়া হেসে বললে, "ঠিক তুমি যেমন করে এই ক'দিনে রুমানিয়ান ভাষাটা মোটামুটি শিখে নেওয়ার চেষ্টা করছো। কাজ চালাবার মতো, লোকের সঙ্গে আলাপ করার মতো বিদেশী ভাষা শিখতে মোটেই দেরি হয় না। যদি ঐ ভাষায় কথা বলবার মতো লোক পাওয়া যায়। তবে ভুলের ভয় না রেখে একটু বেপরোয়া হতে হয়।"

আমি বললাম, "আমাকে তুমি ঐসব ভাষার কিছু কিছু কথা, তার মানে ও উচ্চারণগুলো শিখিয়ে দাও যদি, চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।"

লুসিয়া বললে—"শিখে নিতে পারলে শেখাবো নিজে যতটুকু জানি। তবে মনে রেখো, জার্মান, পোল বা হাঙ্গারীর ভাষা কোনটাই রুমানিয়ান ভাষার মতো সোজা নয়। যেমন দাঁতভাঙা উচ্চারণ তেমন খটমটে বানান।"

আমি বললাম—"ভয় দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করতে পারবে না। বাকি যে ক'টা দিন আছি, এখানে তোমার সহায়তায় সেক'টা দিন যতটা পারি ইউরোপের নানা দেশের কিছু কিছু কথাবার্তা শিখে নেওয়ার চেষ্টা করবো।"

লুসিয়া বললে—"তাহলে আমিও বলি, তোমার ঐ বাঙলা ভাষার কিছু কিছু কথাও আমাকে শিখিয়ে দিয়ে যেতে হবে।"

আমি বললাম—"আমার ভাষার কথা তুমি সহজেই শিখে নিতে পারবে, তোমাদের জিভে আমাদের ভাষার উচ্চারণ শক্ত হবে না।"

লুসিয়ার বাড়িতে পড়াশুনোর পালা শেষ করে হোটেলে ফিরলাম আটটায়। এলেন তখনও আসেনি। একলাই ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ন'টার সময় এলেন টেলিফোন করলে। কাল সারাদিন ছুটোছুটি করে সে আমার দেখা পায়নি বলে টেলিফোনে খুবই রাগারাগি করলে। তাকে সব কথা বুঝিয়ে বললাম যে, কাল ঘটনাচক্রে অমন কাণ্ড ঘটে গেছে, সেজন্য আমিও যথেষ্ট দুঃখিত, ভবিষ্যতে অমনটা আর হবে না।

এলেন জানালে পনেরো মিনিটের মধ্যে সে হোটেলে আসছে, আমি যেন লাউঞ্জে নেমে গিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করি।

লাউঞ্জে নেমে গেলাম। কয়েক মিনিট পরেই যাদুকর সরকার তার দোভাষী থিয়োদুরুকে সঙ্গে করে হাজির! সরকার জিজ্ঞেস করলে, "কি ব্যাপার বলুন তো? আপনার যে আর দেখাই নেই?" আমি বললাম, "দেখা যে দেব, তার ফুরসৎটা কই!"

সরকার বললে—"চলুন ইনটারন্যাশনাল আর্ট একজিবিশানটা দেখে আসি।" আমি বললাম—"একটু অপেক্ষা করো ভাই, আমার দোভাষী শ্রীমতী এলেন না আসা পর্যন্ত আমার নড়বার উপায় নেই।" আগের দিনের সব ঘটনা সরকারকে সবিস্তার জানালাম। বললাম, দোভাষীটি কিরকম চটে আছে আমার উপর। প্রতীক্ষান্তে শ্রীমতী প্রত্যক্ষ হলেন মিনিট দশেক পরেই। আমার সঙ্গে সরকারকে দেখেই বোধ হয় সে তখন আর বড় বিশেষ বকাবকি করলে না। শুধু সরকারের কাছে অনুযোগ করে জানালে, "আপনার বন্ধুটি বেজায় দায়িত্বজ্ঞানহীন।"

আমি তার কথার উপর টিপ্পনী করে সরকারকে শুধু বললাম—"তোবারিশা এলেন বড় বেশী দায়িত্ব নিতে চায় আমার, তাই মাঝে মাঝে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে ফেলি।"

এরপর এলেনকে জানালাম—"মিঃ সরকার ও আমার ভারী ইচ্ছে, আমরা এখন ইনটারন্যাশনাল আর্ট একজিবিশনটা দেখতে যাই—নিয়ে যাওতো ভারী খুশী হবো।" এলেন বললে—"বেশতো! চলো, বেশী দূর তো যেতে হবে না, হেঁটেই যাওয়া যাবে। গাড়িটা তাহলে ছেড়ে দিয়ে আসি।"

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে, আমরা চারজনে হেঁটেই হাজির হলাম—Sala Dalles বা দালেস্ হলে আর্ট একজিবিশনে।

একজিবিশনে ঢুকেই কাগজ কলম বার করলাম। যেসব ছবি দেখবো, তার একটু পরিচয় লিখে রাখতে।

প্রথমে নজরে পড়লো জার্মান শিল্পী রুডলফ ও ফ্রিৎস্ ভের-নারের (বাপ আর ছেলে) আঁকা পূর্ব জার্মানীর একটা রাস্তার দৃশ্য। কতকগুলি সোভিয়েট সৈন্য তাঁদের গাড়ি থামিয়ে একদল জার্মান ছেলেমেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে, ছেলেরা যে তাদের প্রিয় খেলাধুলোর সাজ-সরঞ্জাম ফেলে সোভিয়েট সৈন্যদের সঙ্গ পেয়ে বেশী খুশী হয়েছে, এটাই ছবির বিষয়বস্তু। সোভিয়েট মহত্ব ও অনুরাগ প্রচারের অদ্ভুত নিদর্শন। পূর্ব জার্মানীর শিল্পীদের আঁকা অধিকাংশ ছবির বিষয়বস্তুই যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের গৌরব ও মহত্ব প্রচারকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে, সেটা বুঝতে দেরি হলো না।

ফিনল্যাণ্ডের শিল্পীরা যেসব ছবি পাঠিয়েছেন সে ছবিগুলি কিন্তু এমনটা নয়। ফিনল্যাণ্ডের শিল্পী ভয়োত্তো ভিকাইনেন (Voitto Vikainen) ফিনল্যাণ্ডের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি অদ্ভুত ছবি এঁকেছেন।

হাঙ্গারীর ছবিগুলির মধ্যে দেখলাম কম্যুনিজম প্রচারধর্মী নানা বিষয়বস্তুর রূপায়ন। ফোনয়ী গেৎজা (Fonyi Geza)-র আঁকা ছবিটির নাম "New Peoples at the theatre" ছবিতে দেখানো হয়েছে—কম্যুনিস্ট হাঙ্গারীতে স্ট্যাখানোভাইট, চাষী ও ছাত্রছাত্রীরা নতুন থিয়েটারে পাশাপাশি বসেছে। সাম্যের এই নতুন অধিকার পেয়ে নতুন জন্মলাভ করেছে। হাঙ্গারীর ভাস্কর্য

শিল্পেও লেইয়োস উঙ্গওয়ারী (Lejos ungvary), ইয়োনো গ্রাৎনার (Jeno Grantner) ও কারোলায়ী আঁতাল (Karoly Antal) প্রভৃতি শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির অধিকাংশ বিষয়বস্তু হলো রকমারি খেলাধুলায় খেলোয়াড়দের ভঙ্গী ও দেহগঠনের প্রকাশ।

পোল্যাণ্ডের শিল্পসৃষ্টিগুলি দেখতে দেখতেও ঐ একই প্যাটার্নের অনেকগুলি ছবি দেখলাম। তবে তার মধ্যে আলেক-জান্দার কোভায়াটোভাস্কীর আঁকা কোপার্নিকাসের পোর্ট্রেটটা অদ্ভুত ভালো লাগলো। মনে হলো এই প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর চোখ দুটোতে জ্বলছে সত্যকে জানবার সন্ধানী আলো।

ফরাসী শিল্পীদের আঁকা ছবির মধ্যে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পিকাসোর আঁকা ফরাসী কম্যুনিস্ট যুবনেতা আঁরে মার্তিনের *পোর্ট্রেটটা দেখে দুঃখই পেলাম! কম্যুনিজমের খপ্পরে পড়ে পিকাসোর মতো স্রষ্টা শিল্পীকেও প্রচারধর্মী শিল্পে তুলি ধরতে হয়েছে!*

ফরাসী শিল্পীদের মধ্যে ফুয়োরোঁর আঁকা বিরাট ছবিটার বিষয়বস্তু ও ব্যাপকতা বিস্ময়কর—ছবিটিতে দেখানো হয়েছে ভিক্টর হুগো তাঁর মৃতপুত্র চার্লসকে কাঁধে নিয়ে সিরে লাশাজ কবরখানায় চলেছেন। অস্ট্রিয়া ও বৃটেনের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে বিশ্বযুব উৎসবের উদ্যোগ পর্বে ওখানকার যুবক-যুবতীরা যে সব উৎসব অনুষ্ঠান করেছিল, তারই কয়েকটি ছবিকেই রঙে রেখায় রূপ দেওয়া হয়েছে।

সুইডেনের শিল্পী স্পেনোলোকও সুইডেনের কম্যুনিস্টদের একটি অনুষ্ঠানের তেমনই একটি ছবি এঁকে পাঠিয়েছেন আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনীতে—কম্যুনিজমের প্রচারকার্যের সহায়তা করতে।

সোভিয়েট শিল্পীদের বড় বড় ছবিগুলোই প্রদর্শনীর বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে। সেখানেও স্তালিন, রুশবিপ্লব, রুশের নূতন জীবনের প্রচারধর্মী অসংখ্য ছবি। তবে তার মধ্যে 'গ্যাব্রিলফে'র আঁকা "The Dawn" ছবিটি আমার খুবই ভালো লাগলো।

শিল্পীর শিল্প ক্ষমতা ছাড়া উষার নরম আলোটিকে সুন্দরের মধ্যে উপলব্ধি করার দৃষ্টিটুকুও ধরা পড়লো।

সরকার এবং আমি দুজনেই এত বড় একটা প্রদর্শনী ঘুরে সত্যকারের শিল্পধর্মী সার্থক সৃষ্টি খুব কমই দেখলাম। প্রচারধর্মী চিত্রের সাহায্যে মানুষকে একটি মাত্র দল ও একটি মাত্র মতবাদে বিশ্বাসী করানোর প্রচেষ্টা এসব দেশে শিল্প ও শিল্পীদের কোথায় নামিয়ে এনেছে দেখে মনটা দুজনেরই খুব খারাপ হয়ে গেল।

একজিবিশন দেখে আমরা যে যার হোটেলে ফিরলাম বেলা একটা নাগাদ। যাওয়ার সময় সরকার জানিয়ে গেল রাত্রে ভারতীয়দের গ্যালা প্রোগ্রাম। অবশ্যই সেখানে যাওয়া চাই। আমি বললাম—"ওখানে তো যেতেই হবে।"

খাওয়ার পর এলেন চলে গেল—আমার জন্য ভারতীয় অনুষ্ঠানের টিকিট আনতে। আমি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। খানিকটা গড়িয়ে উঠে লাগলাম রুমানিয়ান ভাষা চর্চায়। ডায়েরী লেখাও সারলাম।

সন্ধ্যার পর এলেন এলো। জানালে অনেক কষ্টে ভারতীয় অনুষ্ঠানের টিকিট পাওয়া গেছে। লাউঞ্জে বসে দুজনে খানিকটা গল্প করে খেয়ে দেয়ে আমরা গেলাম ভারতীয় অনুষ্ঠান দেখতে।

ভারতীয় অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে দেখি—সেখানে দারুণ ভিড়। সকলেরই ধারণা ভারতীয় বিচিত্রানুষ্ঠান অদ্ভুত কিছু একটা হবে। ভিড়ের মধ্যে সেদিন এক নতুন আনন্দ পাওয়া গেল—ডাক্তার মুলগন্দের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে যাওয়ায়। ইনি একজন ভারতীয় ডাক্তার। রুমানিয়াতে আছেন তিরিশ বছর। ওদেশের এক মহিলাকে বিয়ে করে ঘরসংসার পেতে ওখানেই ডাক্তারী করছেন। ছেলেমেয়েরা সব সাবালক বড় সড়। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি। চমৎকার মানুষ। আমাকে ওঁর বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়ে বার বার সেখানে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। জানালেন যে, ওঁর একটি মেয়ে ভারতীয় নাচ, গান কিছু কিছু শিখেছে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। বললেন—"ভারতে ফেরবার খুবই ইচ্ছা, কিন্তু তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের পক্ষে অনুমতি পাওয়া সম্ভব নয়।"

ভারতীয় 'গ্যালা প্রোগ্রাম' আরম্ভ হলো—বেসুরো বেতালা কোরাস গান দিয়ে। যেখানে আর সব দেশের কোরাস গানে একশো দেড়শো যুবক-যুবতী একসুরে তান-লয় রেখে গান শোনাচ্ছে সেখানে ভারতীয় যুব-প্রতিনিধি ছেলেমেয়েরা, যারা কেউ কোনওদিন গান গায় না, তারা যখন গান আরম্ভ করলে তখন বিদেশী দর্শকের দল কি মনে করছিলেন জানি না, আমার তো মনে হলো, ধরণী দ্বিধা হও।

আই-পি-টিএর কয়েকটা গান তাল ছাড়িয়ে বেতালে পেঁছলো। তবে হাততালির অভাব হলো না। মনোহর আইচ তাঁর পেশীর খেলা দেখিয়ে বহুৎ বাহবা পেলেন। পেশী নিয়েই তাঁর পেশা। মিসেস ইন্দ্রাণী রহমান (মিস ইণ্ডিয়া) তাঁর ভারতীয় রঙচঙে শাড়ি আর গয়নার বাহার নিয়ে মঞ্চে এলেন। অনেকক্ষণ ধরে হাততালি চললো। আগের দিন যে নাচটি নেচেছিলেন সেটিই দেখালেন রেকর্ড বাজিয়ে। বিদেশীদের কাছে তাঁর নাচের খুবই তারিফ হলো—হাততালি পড়লো। নাচের শেষে মঞ্চে গিয়ে সবাই তাঁকে ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। আমার কেবলই মনে হতে লাগলো, এই নাচেরই যদি এত তারিফ না জানি ভারতীয় যন্ত্রীসঙ্ঘের বাজনার সঙ্গে ভারতীয় নৃত্যে যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের নাচ দেখলে—এরা কি করবে!

শ্রীযুক্তা ইন্দ্রাণী ছাড়া সেদিন আরও একজন বেঁটে রোগা দক্ষিণ ভারতীয় যুব-প্রতিনিধি নাচ দেখালেন। তবে তাঁর চেহারা ও সাজপোশাক দেখে আর নাচের সঙ্গে বাজনা না থাকায়, বিদেশীরাও হাসাহাসি শুরু করে দিলে। এরপর আরও কয়েকটা বেসুরো বেতালা হিন্দী ও পাঞ্জাবী গানও হলো। সবশেষে যাদুকর পি সি সরকার তাঁর রাজার পোশাকে সেজে মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। পোশাক দেখেই অবাক সবাই। ঘন ঘন হাততালি পড়লো।

যাদুকর সরকার শুধু কয়েকটা তাসের খেলা ও চোখ বেঁধে এক্স্-রে চোখের খেলা দেখালে। তাতেই সবাই অবাক। বিলকুল বেবাক। সরকারের খেলা কয়েকটাতেই ভারতের গ্যালা প্রোগ্রামের মুখরক্ষা হলো। সব দেশের অনুষ্ঠানের শেষে সে দেশের জাতীয়-সংগীত গাওয়া হয়েছিল, হলো না শুধু ভারতীয় গ্যালা প্রোগ্রামে।

রাত বারোটায় অনুষ্ঠান শেষ হলো। ভারতীয় বন্ধুরা (বিশেষ করে ঘাটনেকার ও বীরেন্দ্র সিংহ ভায়া) অনুরোধ জানালে আজ আর হোটেলে ফিরে কাজ নেই। চলুন আজ আমাদের ক্যাম্পেই রাতটা কাটাবেন। এলেনকে জানালাম বন্ধুদের অনুরোধের কথা। এলেন জানালো, তার বাড়ি ওখান থেকে খুব কাছে। সে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। আমিও বন্ধুদের সঙ্গে বাসে চেপেই ভারতীয় প্রতিনিধিদের অস্থায়ী আবাসে গেলাম।

ওখানে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। বীরেন্দ্র সিংহ, প্রশান্ত মুখার্জি, ঘাটনেকার যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘরে একটা বিছানা খালি ছিল। সেটারই দখল পাওয়া গেল। ওঁরা জানালেন পরের দিন খুব ভোরে উঠতে হবে—কারণ কাল সকালে রুমানিয়ার যুবক-যুবতীরা 'রুমানিয়ান যুব-দিবস পালন' করবে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সকলকেই বেরিয়ে পড়তে হবে সাতটার মধ্যেই।

অন্যদিন একলাটি স্টেট হোটেলের নরম বিছানায় শুয়ে আরামের চেয়ে অসোয়াস্তিটা ভোগ করি বেশী। ভারতীয় বন্ধুদের শিবিরের সাদামাটা শক্ত বিছানাই ঢের ভালো মনে হলো। কারণ বিছানায় শুয়ে মুখবুজে কড়িকাঠ গুনতে হলো না। দিব্যি অনেকক্ষণ গল্প করা গেল। প্রশান্ত আর ঘাটনেকার ভায়া মুখফোঁড় লোক। ওদের মুখ ফুঁড়ে তাজ্জব সব খবরও বেরিয়ে এলো।

জানা গেল, প্রতিনিধিদের হাত খরচের জন্য রুমানিয়ার উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ৪৫ লেই (প্রায় ২০ টাকা) করে দিয়েছিল, কিন্তু অনেকেই তা ফুঁকে দিয়ে রীতিমত অসুবিধায় পড়েছে। দোস্তরা রেস্ত বড় কেউ সঙ্গে আনেন নি।

খবর পাওয়া গেল, উৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়ার টিকিটের

ভাগ-বাঁটরা নিয়ে ওদের ভেতরে কি রকম মন কষাকষি চলছে। ভারী মজা লাগলো।

যুব প্রতিনিধিদলের অন্যতম নেতা বীরেন্দ্র সিংহ অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী, তিনি জানালেন যে, ভারতীয় যুব প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশেষ করে যাঁরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন, তাঁদের আচরণে নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সংযমের যথেষ্ট অভাব থাকায় দলের নেতা হিসাবে তিনি খুবই অস্বস্তি বোধ করছেন। তাঁদের নানা সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনতে শুনতে রাত একটা বেজে গেল।

পরদিন ভোর ছ'টায় ঘুম ভাঙলো। উঠে দেখি, টয়লেটের পথে লাইন লেগে গেছে। ওয়াশ বেসিনে যে মুখ ধোবো, তারও উপায় নেই, সেখানেও কিউ। যাই হোক, কোনরকমে মুখহাত ধোওয়া ইত্যাদি সেরে ক্যাম্পের ডাইনিং হলে গিয়ে, পাউরুটি জ্যাম আর কফি দিয়ে ব্রেকফাস্ট শেষ করা গেল।

লাউঞ্জে গিয়ে দেখি মহা হৈ-চৈ! কি ব্যাপার! না, আজকের 'রুমানিয়ান যুব উৎসব' দেখবার জন্য গ্যালারীতে বসবার টিকিট মাত্র পঁচিশখানি জুটেছে প্রায় একশো কুড়ি জন ভারতীয় প্রতিনিধির কপালে। কাজেই সেই টিকিটগুলো লটারী করে যার যার নাম উঠেছে, তারাই উৎসবটা দেখবে গ্যালারীতে বসে, বাকি সবাইকে দূরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে উৎসব দেখতে হবে, এই নিয়েই বেধেছে গণ্ডগোলটা!

নিরীহ ভালমানুষ গোছের দু'চারজন প্রতিনিধি-বন্ধু আমাকে জানালেন যে, ঐভাবে প্রতিটি অনুষ্ঠানেরই গোনাগুনতি টিকিট আসে, আর এমনভাবে ভাগ-বাঁটরা হয় যে, দলের চুনোপুঁটিদের কপালে এ পর্যন্ত বিশেষ কোনও ভালো বা বড় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ জোটেনি। আমি শুধু ওদের কথাগুলো শুনলাম; উপভোগ করতে লাগলাম ওঁদের কথা কাটাকাটি, আর পরস্পরের সমালোচনার ঝাঁঝালো উক্তিগুলো। ভাবলাম, 'শান্তি আর

এক বৃদ্ধা বুখারেষ্টের পথের ধারে ফেলে-দেওয়া পচা আঙুর কুড়োচ্ছে।
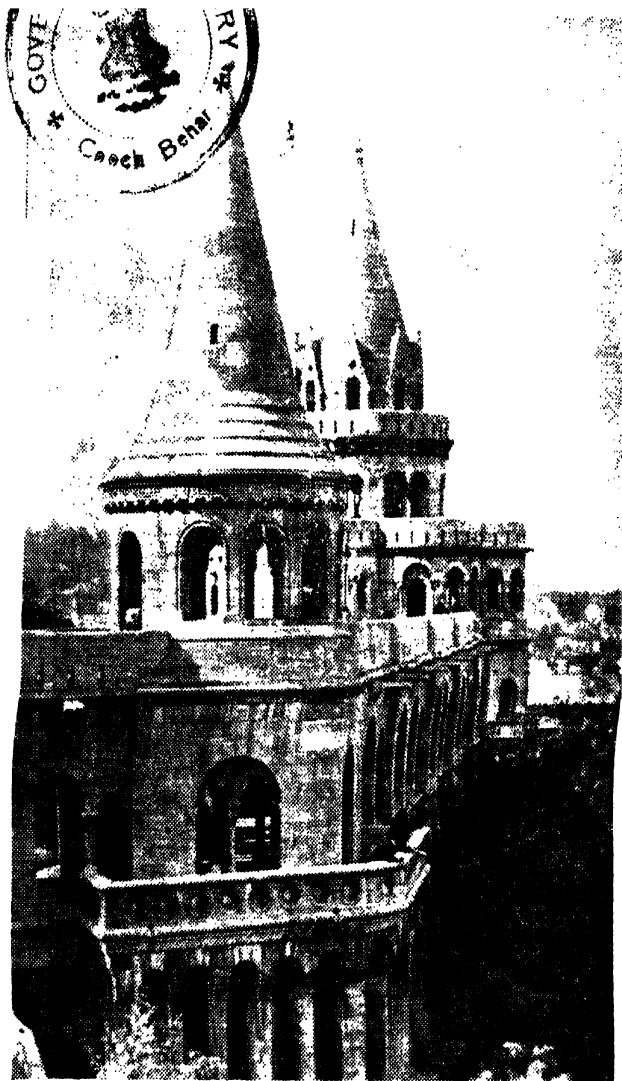
বুদা অঞ্চলে পাহাড়ের উপরে 'ফিশারমেনস্ ব্যাস্টিয়ন' বা জেলেদের দুর্গ

দোস্তীর স্লোগান দেয় এরাই গলা ফাটিয়ে! উৎসবের আমন্ত্রণপত্র আমার সঙ্গেই ছিল, কাজেই ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হলো না।

ক্যাম্প থেকে রওনা হতে হতেই সাড়ে সাতটা বাজলো। দু'খানা বাসে বোঝাই হয়ে ভারতীয় প্রতিনিধি-বন্ধুদের সঙ্গে চললাম স্তালিন স্কোয়ারে।

স্তালিন স্কোয়ারে যে জায়গাটিতে রুমানিয়ান যুব দিবসের মিছিল আর মহড়া হবে সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে আমাদের বাস থেকে নামতে হলো। আমাদের মধ্যে যাঁদের গ্যালারীতে ও ট্রিবিউনে যাবার টিকিট ছিল, পুলিশ ও ভলাণ্টিয়ারদের নির্দেশমতো তারা এগিয়ে চললাম, একপথে। বাকি বন্ধুরা গেলেন অন্যপথে তাঁদের জন্য নির্ধারিত জায়গাটিতে দাঁড়াতে। দেখলাম পথের দু'পাশে সাধারণ বেশভূষা-পরা হাজার হাজার রুমানিয়ান যুবক-যুবতী ও জনসাধারণকে বন্দুকধারী পুলিশ এগুতে দিচ্ছে না—উৎসব প্রাঙ্গণের দিকে।

আমার আসন ট্রিবিউনে থাকলেও আমি ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে গ্যালারীতে গিয়ে বসলাম। দেখি, স্তালিন স্কোয়ারে স্তালিনের আকাশ-ছোঁওয়া স্ট্যাচুটাকে মাঝখানে রেখে চওড়া রাস্তার দু'ধারে প্রকাণ্ড টেম্পোরারী গ্যালারী খাড়া করা হয়েছে। নানা দেশের পতাকা দিয়ে চমৎকার করে সাজানো। দেখতে দেখতে নানা দেশের কয়েক হাজার প্রতিনিধি দর্শকে গ্যালারীর আসনগুলি ভর্তি হয়ে গেল।

বেলা ন'টায় রুমানিয়ান যুব দিবসের উৎসব আরম্ভ হলো। প্রথমে ট্রিবিউনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় শ' পাঁচেক রুমানিয়ান যুবক-যুবতী ব্যাণ্ডের বাজনায় রুমানিয়ান জাতীয় সঙ্গীতটি বাজালে। তারপর রুমানিয়ার সেণ্ট্রাল কাউন্সিল অফ দি ওয়ার্কিং ইয়ুথের ফার্স্ট সেক্রেটারী ভ্যাসিলে মুসার্ট ও ডবলিউ এফ ডি ওয়াই-এর চেয়ারম্যান মিঃ বার্লিংগার অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করে বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল—আমাদের মাথার

ওপরে প্রায় খান দশেক এরোপ্লেন উড়ে এলো। সেগুলো থেকে বিভিন্ন দেশের শত শত পতাকা ছড়িয়ে পড়লো শূন্যপথে চারিধারে।

তারপরেই দেখা গেল, রুমানিয়ার বিভিন্ন জায়গার যুব ইউনিয়নের সদস্য ও সদস্যারা বাজনার তালে তালে মার্চ করে আসছে। সত্যিই সে এক অপূর্ব দৃশ্য। গ্যালারী আর স্ট্যান্ডের দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগলো। একটার পর একটা যুব ইউনিয়নের সভ্য-সভ্যারা চলেছে এক এক রংয়ের পোশাক প'রে—রুমানিয়ার প্রেসিডেণ্ট পেত্রুগ্রোজা ও মন্ত্রীদের বড় বড় ছবি লাঠির মাথায় লাগিয়ে! নানা রকমের নানা রঙের ফেস্টুন আর পতাকা নিয়ে।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগলো যখন রুমানিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের স্পোর্টস ক্লাবের যুবক-যুবতীরা রকমারী রঙের ইউনিফর্মে সেজে, রকমারী খেলা আর জিমন্যাস্টিকের কসরত দেখাতে দেখাতে মার্চ করে চললো। বড় বড় লরীকে নানাভাবে সাজিয়ে তার ওপর নাচ গান ও রকমারী খেলা খেলতে খেলতে রুমানিয়ান যুবক-যুবতীরা শোভাযাত্রায় চলেছে। নানারকম ট্যাবলো ও মূকাভিনয়ও চলেছে শোভাযাত্রায় বড় বড় লরীর ওপর।

এ ছাড়া বড় বড় কয়েকটা প্রকাণ্ড বেলুন ওড়া হলো—শত শত পায়রা ওড়ানো হলো শোভাযাত্রার মাঝখানেই। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন যুব ইউউনিয়ন স্পোর্টস ক্লাবের কয়েক হাজার রুমানিয়ান যুবক-যুবতী ঝকঝকে পোশাকে সেজে প্রায় ঘণ্টা দুই ধ'রে এইভাবে শোভাযাত্রা ক'রে—নানা রকমের প্যারেড দেখিয়ে সকলকেই তাক লাগিয়ে দিলে যে, তাতে সন্দেহ নেই! কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগলো গ্যালারীতে আসার সময় পথের দু'পাশে জীর্ণ মলিন বেশভূষা পরা আরও যে হাজার হাজার রুমানিয়ান যুবক-যুবতীকে দেখে এলাম, তারা কই! তাদের কেন যেতে দেওয়া হলো না রুমানিয়ার যুব দিবসের শোভাযাত্রায়! বেলা এগারোটায় উৎসব শেষ হলো।

ওখান থেকে বেরিয়ে আমাদের বাস খুঁজে পেতেই ঘণ্টা খানেক

লাগলো। বন্ধুদের সঙ্গে ভারতীয় শিবিরে ফিরলাম বেলা বারোটার পর। ওখানেই খাওয়া-দাওয়া সারলাম।

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী জানালেন—এখানে এসে অবধি শহরটা ঘুরে বেড়িয়ে দেখবার সুযোগ হচ্ছে না তাঁর। আমি বললাম—"আপনার সময় হলে কাল সকালে আমার এবং যাদুকর সরকারের সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারেন। আমরা কাল ছবি তুলতে যাব।" শ্রীমতী ইন্দ্রাণী বললেন—তাঁকে সঙ্গে নিলে খুব খুশী হবেন। ঠিক হলো পরদিন বেলা দশটায় ওঁকে তুলে নিয়ে যাবো। বেলা তিনটা নাগাদ হোটেলে ফিরলাম—ট্যাক্সী ভাড়া করে।

হোটেলে ফিরে দেখি—এলেন একটা চিঠি লিখে গেছে—খুব রেগে। লিখে গেছে—'আমি কয়েকবার এসে ফিরে গেলাম, তুমি নিশ্চয়ই তোমার ভারতীয় বন্ধুদের নিয়ে মেতে থাকবে সারাটা দিন, তাই রাত্রে ডিনারের আগে আর আসছি না: ডিনারেই দেখা হবে।'

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল, ভাবলাম আজ রবিবার, লুসিয়ার ছুটি আছে, ওর বাড়িতেই যাই। ওকে সঙ্গে নিয়ে এই ফাঁকে গ্রামের লোকদের অবস্থা ব্যবস্থাটা দেখে আসি।

লুসিয়ার ফ্ল্যাটে গেলাম। অসময়ে আমাকে দেখে সে ভারী খুশী। বললে, "কাল রাত্রে ও আজ সকালে আমরা তোমাকে কয়েকবার ফোন করেছি, পাইনি, কোথায় ছিলে!" আমি তখন সব কথা ওকে বললাম আর জানালাম ওকে সঙ্গে নিয়ে আমার গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছাটা।

লুসিয়া বললে—"তোমার সঙ্গে যেতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে থাকলে গ্রামের লোকরা ভয়ে কোন কথাই বলবে না তোমার সঙ্গে। ভাববে আমি সরকারের চর—পার্টির ইনফরমার। তাই আসল খবর জানতে হলে তোমাকে একলাই যেতে হবে। যাও যদি তোমাকে আমি একটা ট্যাক্সীতে চড়িয়ে দিয়ে, ট্যাক্সী ড্রাইভারকে বলে দিয়ে আসি তোমাকে কোন্ দিকে কোন্ গ্রামে নিয়ে যাবে।" বলি—"বেশ সেই ব্যবস্থাই করো।"

লুসিয়ার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে খানিক দূর যেতেই আমরা একটা ট্যাক্সী পেলাম। লুসিয়া ট্যাক্সী-ড্রাইভারকে বলে দিলে—আমাকে প্লোয়েস্তির পথে কয়েকটা গ্রাম দেখিয়ে সন্ধ্যার আগেই যেন বুখারেস্টে ফিরিয়ে আনে। রফা হলো ওকে তার জন্য তিনশ' লেই অর্থাৎ প্রায় দেড়শো টাকা দেওয়া হবে। ট্যাক্সী-ড্রাইভার মহা খুশী; ও জানালে কোনও ভাবনা নেই, ও নিরাপদেই আমাকে গ্রাম দেখিয়ে পৌঁছে দেবে।

লুসিয়া জানালে, প্লোয়েস্তি বুখারেস্ট থেকে ৫৬ কিলো-মিটার অর্থাৎ প্রায় ৪০ মাইলের পথ। তবে মোটরে যাবার রাস্তা খুব ভালো—আর পথে কয়েকটা গ্রামও পড়বে। অনুরোধ জানালে বেড়িয়ে ফিরে রাত্রে যেন ওদের সংগে অবশ্যই দেখা করি। তা না হলে ওরা খুব ভাববে।

চারটের সময় ট্যাক্সী ছাড়লো—লুসিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে আমাকে বিদায় জানালে।

বুখারেস্ট শহরের রাস্তাগুলো ছাড়িয়ে উত্তরমুখী পথ ধরে ট্যাক্সী 'বানিয়াসা' এরোড্রোমের পাশ দিয়ে ছুটে চললো পিচে মোড়া রাস্তায়। এ পথে আমি আগেও এসেছি।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দু' পাশে শস্যের ক্ষেত রেখে ট্যাক্সী এসে পড়লো একটা গ্রামের মধ্যে। ট্যাক্সী-ড্রাইভার জানালে—"আম ভেনিত সাতুল অতোপেনজ্ দেস্প্রে দেশি সি ত্রেই কিলেমিত্রুল্ দিন বুকুরেস্তি (আমরা Otopeni অতোপেনজ গ্রামে এসে গেছি বুখারেস্ট থেকে তেরো কিলোমিটার দূরে)।

আমি বললাম—গাটা মুলতুমেস্ক। (বেশ! অশেষ ধন্যবাদ) "ভা ভ্রিয়াম ভিজিত আত্ কাতিভা গোস্পোদারিই" (আমি চাষীদের কয়েকটা ঘরবাড়ি দেখতে চাই)

ট্যাক্সী-ড্রাইভার রাস্তার একপাশে মাঠের ওপর ঝোপঝাড়ের আড়ালে গাড়িটাকে নিয়ে গিয়ে রাখলে। আমি মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলাম। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দূরে

খেলা করছিল। ওরা অদ্ভুত পোশাক-পরা এ মানুষটাকে দেখে ছুটে গিয়ে কাছাকাছি বড়রা যারা ছিল, তাদের খবরটা দিলে।

দু'চারজন গ্রামবাসী বেরিয়ে এলো খড়-ছাওয়া মাটির বাড়ি থেকে। দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো আমাকে।

আমি ওদের কাছে এগিয়ে গেলাম। হাত বাড়িয়ে বলাম, "দ্রাজ প্রিতানজ্ দাৎস এম ভোয়া আ স্ত্রান্জ মানা।" (বন্ধুগণ, আমাকে করমর্দন করবার অনুমতি দিন)।

ওরা খুশী হয়ে সবাই হাত বাড়িয়ে দিল। সকলের সংগে কর-মর্দন করে জানালাম—"ইন ন্যুমিলে ইনত্রেজি পোপরেলর দে ইন্ডি ভা ভেনিত পেনত্রু প্রিয়েতানী ইনত্রে ইনডি সি রোমানা" (আমি ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের পক্ষ থেকে এসেছি রুমানিয়াবাসী ও ভারতবাসীদের মধ্যে বন্ধুত্বের কামনা নিয়ে)।

আমার মুখে রুমানিয়ান ভাষায় কথা শুনে ওরা ভারী খুশী! সবাই বল্তে লাগলো "নয় নে বুকুরাম আস্তাস্ (আমরা আজ সত্যিই ভারী খুশী)। ওরা আমাকে ডেকে নিয়ে একটা মেটে বাড়ির ঘরে বসালে। আমার তখন ভারী তেষ্টা পেয়েছে।

আমি বললাম—"ভা ভ্রিয়াম উন পাহারে আল আপে, ভে রোগ"। আমি এক গ্লাস জল চাই অনুগ্রহ করুন।

ওরা আমাকে জল এনে দিলে চমৎকার কাজ করা একটা কাঠের জাগে করে। জল খেয়ে আমার পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে সকলকে অফার করলাম; দেখলাম পুরুষরা সবাই সিগারেট নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো, কিন্তু মেয়েরা কেউ সিগারেট নিলে না। ভারী ভালো লাগলো রুমানিয়ার গ্রামের মেয়েদের এই সলজ্জ ভাবটি।

আমি বললাম—"পেনত্রু আ ফি বুনি প্রিয়েতানী ত্রেবিউ শা নে কুনোয়েস্তেম উনি পে আল্তি" (খাঁটি বন্ধু হওয়ার জন্যই আমাদের একে অন্যকে ভাল করে জানা দরকার)।" স্পুনেতি ভা কাতিভা রেজাল্তেতিলে ভিয়াতা ভোয়াস্ত্রে কারে বুকুরাম মুলতে"।

তোমাদের জীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য আমাকে বলো—সেটাই আমি বিশেষ উপভোগ করবো।

ওদের মধ্যে যে বৃদ্ধ মাতব্বরটি ছিলে, তিনি বললেন—"ভম্ স্পুনেম তোত" ("আমরা সব কথাই বলবো)" "এস্তে ইন্দি কমিউনিস্তে তারা?" (ভারতবর্ষ কি কমিউনিস্ট দেশ?)" আমি বললাম—নু তারা নোয়াস্ত্রা কমিউনিস্ত নু এস্তে, নু সও ভা উন্ কমিউনিস্ত" ("না ভারতবর্ষ কমিউনিস্ট দেশ নয়, আমিও কমিউনিস্ট নই)" নয় ক্রিদেম ইন মোদ প্রোফন্দ ইন সিস্টেমা ইকনমিচে আল গানদী" (আমরা গান্ধীজীর অর্থনীতিতে গভীর বিশ্বাসী)।

ওদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ মাথা হেঁট করে বললেন—"গান্দী মারেলে! গান্দী উন ওম্ আল্ দিভিনা।" (গান্ধী মহান, গান্ধী একজন ঈশ্বরের লোক)।

এরপর ওদের ভয় এবং সংশয়টা অনেকখানি অপসারিত হলো। ওরা আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওদের ঘরবাড়ি ক্ষেত খামার দেখালে। দেখলাম ঘর-বাড়িতে পোশাক, বিছানা ইত্যাদির অবস্থা শোচনীয়। বাসন-কোসন বলতে মাটি ও কাঠের ঘটি। বাটি, থালা, কাঠের চামচে, কাঁটা-চামচে ইত্যাদি। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে পুরুষ শুধু পায়ে বা মোটা মোটা কাঠের খড়ম পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি মহিলা আমারই সামনে একটা ছাগল দুয়ে একটা কাঠের বাটি ভর্তি করে দুধ এনে আমায় খেতে অনুরোধ জানালে। খেতে খুব ইচ্ছা না করলেও দু'চুমুক খেয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম—"মুলতুমেস্ক! আচিয়াস্তা লাপ্তে বিনে" (ধন্যবাদ খুব ভালো দুধ)।

এরপর ওদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ওরা সবাই হাত নেড়ে বার বার "লা রিভিয়েদেরে!" বা 'গুড বাই বলে বিদায় জানালে। কেবল ওদের দলের মুরুব্বি, সেই বৃদ্ধ আমাকে মাঠের পথে এগিয়ে দিতে সঙ্গে এলো। তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম—"আইবে ফেরিচিরে? আইবে দ্রেপতুল, দে আ-সি আলিজে লিবার মোদুল দে ভিয়াতা?" (তোমাদের সুখ হয়েছে? তোমাদের স্বাধীন জীবনযাত্রা নির্বাহের অধিকার আছে?)

বৃদ্ধ জানালে—"নু, মাই গ্রিয়া ইনচা এস্তে ভিয়াতা দেল্ সাতে

নোয়াস্ত্রে" (না! আমাদের গ্রামের জীবন আগের চেয়ে ঢের বেশী অসুবিধা ও কষ্টের জীবন হয়ে পড়েছে)।

বৃদ্ধ আর বেশী দূর এগুলো না, বেশী কথা বললো না। আমি গিয়ে ট্যাক্সীতে চড়লাম। ট্যাক্সী আবার পাকা সড়ক ধরে ছুটে চললো।

মাইল ছ'য়েক দূরে "সাফতিকা" বলে আরও একটা গ্রাম পড়লো, সেখানে আর নামলাম না। আরও প্রায় ছ'মাইল দূরে টাঙকাবেস্তি গ্রামের কাছাকাছি একটা নির্জন জায়গায় গাড়ি থেকে নামলাম। গাড়ি থেকে নেমে বেশ খানিকটা হেঁটে গেলাম। দেখলাম রাস্তায় কিছু কিছু চাষী মজুর হেঁটে যাচ্ছে। ওরা আমার অদ্ভুত পোশাকের দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখছে, কেউ বড় কাছে ঘেঁসছে না। দূরে দেখলাম পুরুষ চাষীরা খালিগায়ে খালিপায়ে মাঠে কাজ করছে। মেয়েরা মাথায় স্কার্ফ বেঁধে তাদের সাহায্য করছে। আমি বেড়াবার ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে রাস্তায় পায়চারী করে বেড়াতে লাগলাম। এমন সময় একটি আধা বয়সী লোক আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে—"চে ভ্রে সা ভিজিতেৎস সি আইচি" (এখানে আপনি কি দেখতে চান?)

আমি বললাম—"ভা ভেনিত দিন ইণ্ডি সি আ ভ্রিয়াম সা কুনেয়োস্তিতি কাতিভা রেজালতেতিলে আল নোয়া ভিয়াতা দিন সাতুল ভোয়াস্ত্রে" (আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি এবং আপনাদের গ্রামের নতুন জীবন সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই)।

লোকটি আমার রুমানিয়ান কথা শুনে ভারী খুশি। বললে—"ভোরবিতি লিম্বা রোমানা ফোয়ার্তে বিনে" (আপনি চমৎকার রুমানিয়ান ভাষা বলতে পারেন। আমি বললাম—"ভা আ ইনভাতাতেম ইয়া দিন উন প্রিতান আল্ রোমানা" (আমি এটি আমার এক রুমানিয়ান বন্ধুর কাছে শিখেছি)। আমি ভেনিত্ লা কংগ্রেস পেনত্রু কা নয় ইনদিয়েনি ভ্রেম পাচে সি ভিয়াতা রিলিজিয়োশী" (আমি কংগ্রেসের এসেছি, কারণ আমরা ভারতবাসীরা চাই শান্তি এবং ধর্মজীবন)।

আমার কথা শুনে লোকটি শুধু বললে—ব্রাভো ইন্‌দিয়েনী এল একস্‌প্রিমা কুরাজুল। ভা ফেলিচিত্‌" (সাবাস ভারতবাসী! এতে আছে সাহসের পরিচয়। আমি আপনাকে অভিনন্দিত করি)। এরপর সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে বসলে। তারপর চাপা গলায় বললে—ভিত্তোরুল নোয়াস্ত্রে এস্তে অ্যামিনিন্তাত্‌ (আমাদের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ) আমি জিজ্ঞাসা করলাম—দে চি (কেন?)

লোকটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—রাসপুন্‌সুল আস্তে সিমপ্লু (জবাবটা অত্যন্ত সোজা)—"নয় নু আইবা দ্রেপ্‌তুল দে আ সি সা রেসপেকতা প্লাসুল তুনুলুই সি ক্রেদিন্তা নোসত্রে (আমাদের স্ব স্ব বিবেকের নির্দেশ ও বিশ্বাসকে সম্মান করার অধিকার নেই।

সবচেয়ে দামী কথা যেটি সে বললে—তা হচ্ছে—"ইনচিউদা লিবার্তিতে নিয়াম আইবে আসারভিরে ইনসিয়াম্‌না রেফুইরিয়া পাত্রিচে ট্রানস্‌ফর্মেরিয়া তিনেরলর ইন স্লাভজ সি ভিক্‌তিমা *প্রোপাগান্দা আজ স্ত্রেইনিলর ইন পোপরিয়া লর তারা*" (আমরা স্বাধীনতার বদলে পেয়েছি পরাধীনতা—যার মানে আমাদের স্বদেশের সম্পদের লুণ্ঠন, যার মানে আমাদের দেশের যুবকযুবতী তাদের নিজের দেশেই পরদেশী, প্রচারের কবলিত বিদেশীদের কৃতদাস)।

এরপর ওদেশের চা-আবাদ সম্বন্ধেও লোকটির সঙ্গে কিছু আলাপ আলোচনা হলো। জানা গেল, ওদেশে এখনও সব জায়গায় সমবেত বা যৌথ প্রথায় চাষের ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি। যৌথ প্রথায় চাষ করে যেটুকু ফসল বেড়েছে তাতে দেশের অভাব দুঃখ ঘোচেনি, কারণ যৌথ চাষের বেশীর ভাগটাই ডেলিভারী দিতে হয় সরকারের মারফৎ সোভিয়েট রাশিয়াকে। এরজন্য সাধারণ চাষীদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভও দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বড় বড় ক্যাপিট্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিতে দেশের অধিকাংশ আয়ই লাগানো হচ্ছে। আর তাই যুবকযুবতীরা—শহরের ফূর্তি আর কলকারাখানার আকর্ষণে ঘর সংসারের মায়া কাটিয়ে গ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে। বুড়ো বুড়িদের চাষে খাটানো হচ্ছে, তাতে সাধারণ চাষের ক্ষতিই হচ্ছে।

(এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি চাষীর কথাটা যে মিথ্যে নয়, তা প্রমাণিত হয়েছে—রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রীর জর্জিউ দেজ নিজেই ২৩শে আগষ্টের এক বক্তৃতায় বলেছেন—"The rate of industrialisation has been excessively accelerated" তিনি বলেছেন জাতীয় আয়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হয়েছ 'excessive capital investments'এ। এর ফলেই নাকি রুমানিয়ার জীবন-যাত্রার মান আশানুযায়ী উন্নত করে তোলা যায়নি। এছাড়া রুমানিয়াতে শাকসব্জী ও খাদ্যাভাব যে আছে তাও ১৯৫৩ সালের ২৯শে জুলাই তারিখের Agerpress সরকারী বুলেটিনের ৮-এ পৃষ্ঠায় এইভাবে স্বীকৃত হয়েছেঃ

"Due to the output of kitchen vegetables being retarded as a result of the cold weather in the Spring of this year, and to the nonfulfilment of the collection and acquisation plans for agricultural produce the supply of the town population with a number of basic foods was not satisfactory. The plan for sales of meat, fats and sugar, has not been fulfilled."

লোকটির সঙ্গে গল্প করতে করতে আর তাঁর ঐ বক্তব্যগুলি লিখে নিতে ওখানেই সন্ধ্যে হয়ে গেলো। আমি ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। ট্যাক্সীতে ফিরে এসে ড্রাইভারকে বললাম আর না এগিয়ে বুখারেস্টে ফিরে যেতে।

হোটেলে ফিরে গ্রাম থেকে লিখে আনা কাগজপত্রগুলো জুতোর বাক্সে লুকিয়ে রাখলাম। স্নান সেরে পোশাক বদলে এলেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সকাল থেকে সারাটা দিন ছুটোছুটিতেই কেটেছে। তার উপর সকলের চোখে ধুলো দিয়ে গ্রামে যাওয়া; সেখানকার লোকজনের

সঙ্গে ঐভাবে আলাপ-আলোচনা করার ফলে সারা দেহে ক্লান্তি। আর মনের মধ্যে এমনই একটা আশঙ্কা ও অস্বস্তি, যে না পারি শুতে, না পারি বসতে।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। এলেন এলো না দেখে নিজেই নীচে নেমে ডাইনিং হলে খেতে বসলাম। খাওয়া শুরু করেছি, এমন সময় এলেন এসে যোগ দিলে আমার সঙ্গে। বড় বিশেষ কিছু বললে না। খালি জিজ্ঞাসা করলে—"ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে সময়টা নিশ্চয়ই খুব ভাল কাটলো? আবার কখন যাচ্ছো বন্ধুদের কাছে? এখনই নাকি?"

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম—"আজ নয়, কাল সকালে একটা এনগেজমেণ্ট আছে, ভারতীয় বন্ধুদের আস্তানায়, তুমিও যেতে পারো আমার সঙ্গে।"

এলেন বললে—"না তুমি একলাই যেও। পথ-ঘাট তো চিনেই গেছ। তবে ইচ্ছে করেন তো এখন তোমায় বেলজিয়ামের গ্যালা প্রোগ্রাম দেখাতে নিয়ে যেতে পারি। কাছেই হবে, সালা প্যাত্রিয়া হলে। দু'খানা টিকিট আছে।"

আমি বললাম—"বেশ চলো যাওয়া যাক।"

খাওয়া সেরে আমরা হাঁটতে হাঁটতে "সালা প্যাত্রিয়া" বা প্যাত্রিয়া হলে হাজির হলাম। আমাদের হোটেলের খুব কাছেই এ হলটা।

গিয়ে দেখি সিনেমা হলের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। ভিড় ঠেলে দরজা গলে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম জনতা ও দর্শকের মারামারি ঠেলাঠেলিতে হলের বড় বড় দরজার কাঁচ চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ে রয়েছে। হলের বাইরে ভিতরে চারধারে পুলিশ। বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে,—হলের ভিতরে ঢুকতে না পেরে।

ভিড় ঠেলে লাউঞ্জে ঢুকে এলেন বললে—"তুমি এখানে দাঁড়াও, ভিতরের অবস্থাটা দেখে আসি।" ও ভিতরে চলে গেল। আমি আর পাঁচজনের মত হলে ঢোকবার চেষ্টা না ক'রে লাউঞ্জের এক-পাশে নিরবিলি এক কোণে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম। পাশের দু'টি চেয়ারে এসে বসলো এক রুমানিয়ান দম্পতি। ওদের কথা-

বার্তা শুনে বুঝলাম ওরা খুব বিরক্ত হয়েছে যুব-উৎসবের কর্তৃ-পক্ষের উপরে। বহুদূর থেকে এসেছেন ওঁরা স্বামী-স্ত্রী। জায়গা না পেয়ে নিরাশ ও বিরক্ত হয়েছেন। ও'দের বক্তব্যটা মোটামুটি যা বুঝলাম তা হচ্ছে এই যে, "আমাদের একাধিক দিনের মাইনে কেটে নিয়ে উৎসবের লক্ষ লক্ষ লেই চাঁদা তোলা হয়েছে। আর আমরাই পাবো না কোনও একটা অনুষ্ঠান দেখতে।" স্বামী ভদ্রলোক ভয়ানক উত্তেজিত, আর তাঁর স্ত্রী তাঁকে সামলাচ্ছেন। বলছিলেন 'চুপ করো, এ সব কথা কেউ শুনে ফেললে মহা বিপদ ঘটতে পারে।"

আমি ওঁদের কথাবার্তাগুলো সব বোঝবার চেষ্টা করছিলাম কান খাড়া করে। বুঝলাম এই রকম ক্ষোভ আর উত্তেজনা রুমানিয়ার আরও অনেকের মনে দেখা দিয়েছিল বলেই সিনেমার কাঁচের দরজা-গুলো অমন করে ভেঙে চুরমার হয়েছে। 'শান্তি ও বন্ধুত্বে'র উৎসবে অশান্তির আভাস ফুটে উঠেছে।

খানিক পরে এলেন ফিরে এসে জানালে "হলের ভিতর বসবার জায়গা নেই, তবে দাঁড়িয়ে দেখার একটা ব্যবস্থা হতে পারে।" আমি বললাম, "না, অত উৎসাহ আমার নেই। আমি হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করবো, সেটাই বেশী আনন্দদায়ক। তুমি বরং প্রোগ্রামটা দেখতে চাও তো দেখো।"

এলেন ওখানেই থেকে গেল। আমি ভিড় ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে পা চালালাম লুসিয়ার ফ্ল্যাটের দিকে।

লুসিয়ার ফ্ল্যাটে পে'ছে দেখি লুসিয়া লেখক-বন্ধু আর তার স্ত্রী তিন জনেই আমার পথ চেয়ে বসে আছেন।

ইয়োভান্নী বললে—"বিমল তুমি আজ ভয়ানক দুঃসাহসিকতার পথে পা বাড়িয়েছিলে, ঐভাবে তুমি গ্রাম দেখতে গেছ শুনে আমি তো ভয়ে মরে যাই। লুসিয়াকে খুব গাল-মন্দ করেছি। যাক! ভগবান তোমাকে রক্ষা করেছেন, ফিরিয়ে এনেছেন। আর কখনো যেওনা অমন করে।"

লেখক-বন্ধু তাঁর স্ত্রীর ব্যাকুলতা দেখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচ্কি মুচ্কি হাসছিলেন।

লুসিয়া বললে—"ভগবান বিমলের ... ! তা না হলে ও এলো কি করে এদেশে? তাই তো আমি ভর... পাঠিয়েছিলাম। তবে আমরা খুব ভাবছিলাম তোমার কথা। ... কি কি দেখলে-শুনলে বলো?"

গ্রামে গিয়ে যা দেখলাম শুনলাম ওদের সাবিস্তারে বললাম।

সব শুনে লেখক বন্ধুটি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "গ্রামের লোকরা যে আমাদের চেয়ে ঢের সৎ ও সাহসী তা বুঝছো ইয়োভান্নী?"

ইয়োভান্নী ঘাড় নাড়লে, বললে—"আমরা শহরের শিক্ষিত মানুষরা রাজনীতির ভাঁওতায় ভুলে সামান্য ব্যক্তিগত সুখস্বার্থের জন্যে দেশের যে সর্বনাশ ডেকে এনেছি, তার জন্যে আমাদেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে ধর্ম ও মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে। গ্রামের লোকরা তো তা করেনি, ওদের তাই সাহস ও সততা দুই-ই আছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"গ্রামের চাষী-মজুরদের কম্যুনিস্টরা পুরোপুরি তাঁবে আনতে পারেনি?"

লেখক বন্ধুটি বললেন—"না এখনও পারেননি। তাই এখনও এদেশে বহু চাষীই তার ব্যক্তিগত জমিতে চাষবাসের দখলটা বজায় রাখতে পেরেছে। সবচেয়ে বড় বাধা পাচ্ছেন আমাদের সরকার, ঐ ছোট ছোট জমির মালিক চাষীদের কাছ থেকেই। ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিয়ে, জুলুম করে' ওদের কাবু করতে পারেনি। অসম্ভব ওদের একতা আর ধর্মবিশ্বাস।"

আমি বললাম—"কি করে তা সম্ভব? গ্রামে গ্রামে তো পার্টির সংগঠন-কেন্দ্র গড়া হয়েছে; তারা চাপ দেয় না?"

এর জবাবে উনি বললেন—"শতকরা ষাটটি গ্রামে পার্টি অর্গানিজেসন গড়া সম্ভব হয়নি। সরকার গ্রামের গির্জা বা প্যারিসে পাদ্রী পাঠিয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে পার্টি-ইউনিয়ন গড়ার চেষ্টা করেছেন। তাতেও কাজ হাসিল হয়নি। এমন ঘটনাও বহু

ঘটেছে—গ্রামের লোকরা যে মুহূর্তে টের পেয়েছে পাদ্রী এসেছেন সরকার ও পার্টির দালালী করতে—সেই মুহূর্তে তারা বক্তৃতার মাঝখানেই দল বেঁধে গির্জা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

"—এর কারণটা কি?"

গত কয়েক বছরে এ দেশের শহরে শহরে বড় বড় কলকারখানা, স্টেডিয়াম, থিয়েটার, ঘরবাড়ি আর রাস্তা তৈরি হয়েছে। আর তার মালমসলা আমদানি করতে কৃষিপ্রধান রুমানিয়ার চাষের ফসলের বেশির ভাগটাই কেড়ে এনে জোগান দিতে হয়েছে সোভিয়েট রাশিয়াকে। শুধু কি তাই? কলকারখানায় যা উৎপন্ন হচ্ছে, তারও বেশির ভাগটাই জুগিয়ে দিতে হচ্ছে সোভিয়েটের ঋণ শোধ করতে। ফলে আজকাল চাষীরা ফসল উৎপন্ন করার কাজে আগের চেয়ে আলগা দিয়েছে—আদায় উসুলও ঠিক ঠিকমত দিচ্ছে না।

লেখক বন্ধুটির কথাগুলি সরকারের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা প্রচারকার্য নয়, তার প্রমাণ আছে ১৯৫৩'র ৩রা আগস্টের "Scanteia" পত্রিকার তিনের পৃষ্ঠায় I Cumpanasu'র লেখা প্রবন্ধটিতে। প্রবন্ধটির নাম—

"Pentrue o mai buna organaziare a muncilor in gospodariile agricole de stat" (For organising a better working of the State agricultural farm)

প্রবন্ধটিতে রুমানিয়ার চাষবাসের গলদ ও ভিতরকার খবর সম্বন্ধে সরকারী অনেক স্বীকৃতি আছে—সব কথা এখানে বলা সম্ভব নয়—শুধু সেই কাগজ থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি!

"Comitele executive ale unor sfaturi populare conducerile unor Gospodarii de stat si insuri Ministerul Gospodariilor Agricole de stat nu au luat din timp masurile necesare pentru organizare muncilor de vara in cele mai bune conditiuni, nu au tras invataminte practice di unele lipsuri ale campaniei de recoltare de anul trecut."

(এর মানে—"গ্রামের পিপলস পার্টির কতক এক্সিকিউটিভ কমিটি স্টেট ফার্মিংএর পরিচালকবর্গ এবং সরকারী কৃষিমন্ত্রী দপ্তরের

কিছু কর্মচারী কৃষিব্যবস্থাকে আরও ভালো অবস্থায় আনার জন্য ঠিক সময়ে ঠিক মত ব্যবস্থা চালু করতে পারেন নি। বছরের শস্য পুরা আদায় করবার ব্যাপারেও তাঁদের ত্রুটি ঘটছে)।

অর্থাৎ কতকগুলি স্টেট এগ্রিকালচার [illegible] পরিচালকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ গাফিলতি আছে, কারণ শ্রমিক চাষীদের আয়ত্তে আনতে পারছেন না।

সেদিন চাষ আবাদের গল্প ছাড়া—ভারতবর্ষের তথা পণ্ডিত নেহরুর নিরপেক্ষতার নীতি নিয়েও আলোচনা হলো। আমি ওঁকে জানালাম—"স্বাধীন ভারতবর্ষ রাশিয়া বা আমেরিকা এই দুই শক্তি-গোষ্ঠীর কারো ফাঁদে পা দেবে না—এটা তোমরা জেনে রেখো। স্বাধীন ভারতবর্ষ এই দু শক্তিগোষ্ঠীর কবল থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ও অপরকে বাঁচাবার জন্য গোড়া থেকেই সংগ্রাম করে চলেছে।"

লুসিয়া বললে—"সে সংগ্রামে ভারতবর্ষ [illegible] হবে, পৃথিবীতে তারা সুখ, স্বাধীনতা ও শান্তি এনে দেবে একথা আমরা বিশ্বাস করি।"

রাত বারোটায় ওখান থেকে ফিরলাম হোটেলে।

১০ই আগস্টের সকাল এলো—নতুন উৎসাহের আলো নিয়ে। আগের দিনের অভিজ্ঞতা সাটে-সংকেতে ডায়েরিতে এমন ক'রে লিখলাম, যাতে অন্য কেউ পড়ে তার এক বর্ণও [illegible] ঝতে না পারে।

ন'টার সময় পোল্যাণ্ডের সাংবাদিক [illegible]টি ঘরে এসে জানালেন—পোল্যাণ্ডে যাওয়ার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন—তাই আমার পাসপোর্টটা চাই। জানতে চাইলেন তাঁকে আমি কিছু *'লেই' দিতে পারি কিনা, যার পরিবর্তে তিনি আমায় পোল্যাণ্ডের মুদ্রা Zloti দেবেন। আমি খুশী হয়ে বললাম নিশ্চয়ই দেবো।* ওঁকে ছয়'শ' লেই দিলাম, উনি আমাকে তিন'শ' 'স্লোতিউ' দিলেন। পাসপোর্ট এবং ওঁর দেওয়া ফর্মটাও সই করে দিয়ে দিলাম সেই সঙ্গে।

দশটার সময় যাদুকর সরকারের হোটেলে গেলাম। সেখান থেকে

গাড়ি নিয়ে গেলাম—স্নাতা পোপভে ভারতীয় শিবিরে শ্রীমতী ইন্দ্রাণীকে আনতে। গিয়ে দেখি রুমানিয়ার দুই মহিলা চিত্রশিল্পী তাঁকে দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকছেন। ওঁরা আধ ঘণ্টা সময় চাইলেন ছবিটা শেষ করার জন্যে। তারপর শ্রীমতী ইন্দ্রাণীকে নিয়ে সরকারের হোটেলে এলাম। ওখান থেকে সরকার ও থিয়োদরুকে তুলে নিয়ে ফটোগ্রাফার বন্ধুর দোকানে গেলাম। ওখানে তিনি আমাদের সকলের কয়েকটা ছবি তুললেন। তারপর আমরা সবাই গেলাম 'বানিয়াসার' জঙ্গলে বেড়াতে। সেখানেও কয়েকটা ছবি তোলা হলো আমাদের।

শহর এবং জঙ্গলের লম্বা পাড়ি দিয়ে ঘুরে ফিরতেই দু'প্রহর বেলা পার। শ্রীমতী ইন্দ্রাণীকে পোঁছে দিয়ে—দুপুরের খাওয়া খেতে বাজলো আড়াইটে। খাওয়া সেরে হোটেলে গিয়ে এক ঘুম দিলাম।

এলেন এলো বিকেল বেলা। জানালে আজ রাত্রে স্তালিন পার্কে রুমানিয়ার সাংবাদিকরা সম্বর্ধনা ভোজ দেবেন। সেখানে আমার নিমন্ত্রণ আছে। একলাই যেতে হবে। এলেন যাবে না।

সাজগোজ করে গেলাম ভোজ-সভায়। গিয়ে দেখি স্তালিন পার্কে হেরাস্ত্রাও হ্রদের ধারে আলোয় সাজানো 'পেস্‌কারাস্‌' বা সাগর-কপোত রেস্তোরাঁ। চার পাশের আলোর মায়ায় উইলো গাছের ছায়া ভেসে চলেছে হ্রদের জলে ঝিকমিকিয়ে। তারই পাশে ঘাসের গালিচার উপরে টেবিল পেতে—প্রায় হাজার লোকের আসন। টেবিলের বুকে নানা রঙের ফুলের মাঝে রঙীন পানীয়। চারপাশে সুন্দরীসঙ্গ আর রসরঙ্গ। হ্রদের থেকে উড়ে আসা ঠান্ডা হাওয়াটা অচেনা অতিথিদের [illegible]নালী রঙের চুলগুলো নাড়িয়ে, টেবিলের ঢাকনা উড়িয়ে [illegible]রছে। প্লেটের ধোঁওয়া, খাবারের গন্ধ চুরি করে নিয়ে দৌড়ুচ্ছে।

খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের বক্তৃতা ও বারে বারে দাঁড়িয়ে উঠে টোস্ট করা

চললো। শুরু হলো ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে বাজনা। সঙ্গে সঙ্গে নাচ আর গান।

অস্ট্রিয়ার সাংবাদিক বন্ধু মিঃ হামার্সক্ল্যাগ আর তাঁর স্ত্রী এলেন আমরা সবাই একসঙ্গেই ছিলাম। হামার্সক্ল্যাগ নাচে যোগ দিলেন। আমি আর তাঁর স্ত্রী একপাশে বসে বসে গল্প করতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের সুস্থির হয়ে বসবার জো আছে কি? বার বার নাচের অনুরোধ আসতে লাগলো। আমি বললাম—"আমি ভারতীয়, নাচতে জানি না। মাপ করুন।" মিসেস হামার্সক্ল্যাগকে বার কয়েক অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাচে যোগ দিতে হলো। ওদেশে মেয়েদের কাছে নাচের অনুরোধ এলে না বলবার উপায় নেই। নিরুপায় আমিও বসে বসে নাচ দেখি। রাত দেড়টায় ওখান থেকে আমরা ফিরলাম।

১১ই আগস্ট। সকাল থেকে শরীরটা কেমন ভালো লাগছে না। এলেন এসে খবর দিলে আমাদের আজ একটা সিগারেট ফ্যাক্টরী দেখতে নিয়ে যাওয়া হবে—বেলা দশটায়।

দশটার সময় আমরা প্রায় চল্লিশজন সাংবাদিক মস্ত একটা বাসে করে সিগারেট ফ্যাক্টরী দেখতে রওনা হলাম। শহর থেকে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে এই সিগারেট ফ্যাক্টরী। পৌঁছুতেই ওখানকার কর্তৃপক্ষ আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। এবং ছোট ছোট দলে ভাগ করে আমাদের ফ্যাক্টরীটা ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে চললেন। আমাদের দলে সেদিন মিঃ হামার্সক্ল্যাগ ও তাঁর স্ত্রীতো ছিলেনই। তাছাড়া ছিলেন "Das Andre Deutschtand" পত্রিকার প্রতিনিধি বিচক্ষণ জার্মাণ মহিলা মিসেস ইনগেবোর্খ ক্রুস্টার, তিনি সঙ্গে থাকায় কারখানাটার সবদিক চোখ রেখে খুঁটিয়ে সবকিছু দেখবার ভারী সুবিধে হলো।

মিসেস ক্রুস্টার আমার পরিচয় জেনে চাপা গলায় আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন যে, রুমানিয়ার কলকারখানায় শ্রমিক মজুরদের সাজপোশাক ও যন্ত্রের মত কাজ করার ব্যাপারটা আমি যেন মন দিয়ে দেখি। উনি জানালেন, উনি এদেশের অনেকগুলো

কলকারখানাই এই কদিনে দেখেছেন এবং সর্বত্রই একটা থমথমে চাপা অসহায়তার ভাব লক্ষ্য করেছেন—সাধারণ শ্রমিক আর মজুরদের মধ্যে। আমি কোনও কথা না বলে—ওঁর কথাগুলো শুনতে শুনতেই কারখানাটা ঘুরে দেখলাম।

কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গেও আলাপ হলো। তিনি জানালেন সিগারেট ফ্যাক্টরীর একজন সাধারণ শ্রমিক মাইনে পায় ১৮০ লেই, আর তিনি এবং বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার ও মেকানিকরা মাইনে পান ১২০০ থেকে ১৪০০ লেই।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার এখানে যা দেখলাম—তা হচ্ছে সিগারেটের বাক্সগুলো বড় বড় বাণ্ডিলে প্যাক করছে প্রায় কুড়ি বাইশজন অন্ধ মেয়ে-পুরুষ কর্মী। চোখে না দেখতে পেলেও হাতে এদের অসাধারণ দক্ষতা। অন্ধদেরও জীবিকা অর্জনের জন্য খাটতে হচ্ছে কলে কারখানায়। না খেটে উপায় নেই। পরের ঘাড়ে বসে বা ভিক্ষে করে ওদেশে খাওয়া জোটে না। শ্রমিকদের দুপুরের খাবার যেখানে রান্না হচ্ছে—কারখানার ম্যানেজার আমাদের সেখানটাও দেখাতে নিয়ে গেলেন। দেখলাম বিরাট বিরাট বৈদ্যুতিক ভ্যাট বা হাণ্ডায় ফুটছে ভুট্টার দানার গুঁড়ো লঙ্কা ও টমাটোর ঘ্যাঁট। সবজির মধ্যে সিদ্ধ হচ্ছে শসা আর বেগুন।

কারখানায় পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাটাই বেশী। তাই ওখানে মজুরদের ছেলে আগলাবার জন্য একটা 'ক্রেশে'ও আছে। সেটা আমাদের দেখানো হলো। ক্রেশেতে যেসব ছেলেমেয়ে দেখলাম—তাদের স্বাস্থ্য মোটেই ভালো নয়। গায়ে মাত্র একটা করে ধবধবে এপ্রন গোছের জামা পরানো। জুতো মোজা কারুর পায়েই নেই। কারখানা সংলগ্ন হাসপাতাল বাড়িটাতেও নিয়ে যাওয়া হলো—পনেরোটা কি কুড়িটা লাল কম্বল ঢাকা বিছানা রয়েছে, তবে সেখানে একটি রোগীরও দেখা পেলাম না।

হাসপাতালের বারান্দায় জড়ো হলেন সাংবাদিকরা। অনেকেই শ্রমিকদের ইউনিয়ন তার নির্বাচন প্রথা ইত্যাদি নিয়ে এমন সব বেয়াড়া বেয়াড়া প্রশ্ন করতে লাগলেন, যার ফলে বিদেশী অতিথিদের মধ্যে

তর্কাতর্কি বেধে গেল। জেরায় পড়ে কারখানার ম্যানেজার সাহেব বিল্‌কুল জেরবার। পরিষ্কার বোঝা গেল—আগের দিনের মালিকদের বদলে পার্টির বড়কর্তারাই এখন কারখানার শ্রমিকদের ইউনিয়ন এবং কারখানার পরিচালক নির্বাচন ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করেন। ট্রেড ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক নীতি চলে দলের কর্তাদের খোশখেয়ালে। মজদুর শুধু ভোট দেয় হাত তুলে।

সিগারেট ফ্যাক্টরী থেকে ফেরবার পথে বাসের মধ্যেও—বিদেশের সাংবাদিক প্রতিনিধিদের মধ্যে ওখানকার ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের গলদ নিয়ে তুমুল তর্ক আর আলোচনা চলতে লাগলো। তবে সব কথা আমি বুঝতে পারলাম না এইটাই দুর্ভাগ্য।

বাসে মিসেস ক্যুস্টার আমাকে বললেন, "এদেশে গণতন্ত্রের নামে সোভিয়েট রাশিয়া চাপ দিয়ে মানুষকে মেকানাইজ্‌ করছে। পশ্চিম জার্মানীতে আমেরিকা ডলার ঢেলে মানুষকে ডেমোক্রালাইজ্‌ করছে।" আমি হেসে বললাম—"ভারতবর্ষ তাই ঐ দু' দলকেই দূরে রেখে চলতে চাইছে।" জানতে চাইলেন ভারতের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে অনেক কথা। যথাসম্ভব তাঁকে বোঝালাম সব।

মিসেস ক্যুস্টার সব শুনে খুশী হলেন। হ্যানোভারে তাঁর বাড়িতে অতিথি হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, আর বললেন, সেখানে গেলে তিনি আমাকে পশ্চিম জার্মানী ও পূর্ব জার্মানীকে ঠিক মত জানবার ব্যাপারে সাহায্য করবেন। মিসেস ক্যুস্টারের রাজনীতির জ্ঞান দেখে আর তাঁর কথা শুনে সত্যি আমি অবাক হলাম।

সিগারেট ফ্যাক্টরী থেকে ফিরে আমরা সবাই সেদিন লাঞ্চ খেলাম এথিনি প্যালেসে। সরকারের সঙ্গে ওখানেই দেখা। মিস্টার ও মিসেস হ্যামার্সক্ল্যার্গের সঙ্গে যাদুকর সরকারের আলাপ করিয়ে দিলাম। ওঁরা দুজনেই সরকারের ম্যাজিক দেখতে চাইলেন। খাওয়ার পর যাদুকর সরকার মিঃ হ্যামার্সক্ল্যাগ ও তাঁর স্ত্রীকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট ম্যাজিক দেখালেন। ওঁরা তাই

দেখেই একেবারে হতভম্ব। প্রশংসায় পঞ্চমুখ! দপ্তরটা সরকারের ঘরে আড্ডা ম্যাজিক আর গল্পগুজবেই কাটলো।

সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে আমাদের খাইয়ে দাইয়ে স্তালিন পার্কের বিরাট কার্নিভ্যালে নিয়ে যাওয়া হলো। দল বেঁধে বাসে চেপে সাংবাদিকের দল চললাম। দোভাষী দলের নেত্রী মিসেস ইয়ারোভিচ্ আমাদের নিয়ে গেলেন—এলেন গেল না।

কার্নিভ্যালের ফটক থেকে বহুদূরে বাস আটকে গেল। ভিড়ের গুঁতোয় এগুবার উপায় নেই! বাস থেকে নামবার পর সঙ্গী আর দোভাষীরা কে কোথায় হারিয়ে গেল তার পাত্তাই রইলো না। লোকের ধাক্কা খেতে খেতে কার্নিভ্যালের ফটকে যখন পৌঁছলাম, দেখি ভিড়ের চাপে মেয়ে-পুরুষ চিঁড়ে-চ্যাপ্টা, কাঁদছে, চ্যাঁচাচ্ছে 'বাপরে' 'মারে' করে। আর পুলিশ ও সেপাইরা পাগলের মত ধাক্কা-ধাক্কি করছে। আমিও ভিড়ের চাপে আধমরা। বেরিয়ে পালাবো যে তার উপায় নেই! ভিড়ের স্রোতে ভেসে চললাম।

ফটক পার হলাম জনসমুদ্রের শেষ ধাক্কায়। হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলাম আমি এবং অনেকেই। যাই হোক রুমানিয়ান ও রাশিয়ান সৈনিকেরা সঙ্গে সঙ্গেই টেনে টেনে তুলে ফেললে আমাদের, তা না হলে মাড়িয়েই মেরে ফেলতো পেছনের লোকেরা ।

ফটকের ওপারে কান্নাকাটি। কজন অজ্ঞান। দেখি মেয়েপুরুষ অনেকেরই জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে, আমারও পায়জামা সামান্য ছিঁড়ে পা দুটো ছড়ে গেছে। খেয়াল হলো দামী চশমাটাও চোখ থেকে কোথায় ছিটকে পড়ে গেছে। লোকের স্রোত আসছে ফটক ভেঙে। চশমা তাদের পায়ের চাপে ধুলো হয়ে গেছে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম বিশৃঙ্খলা।

রুমানিয়ায় বিশৃঙ্খলার যে দৃশ্য দেখলাম, তা কোনওদিন ভুলবো না। বিশ্বযুব উৎসবের প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত রুমানিয়ানদের ছাড়া জনসাধারণকে কার্নিভ্যালে ঢুকতে না দেওয়াতেই—ফটকে ঐ পরিস্থিতি। মন মেজাজ বিগড়ে গেল, ভাবছি হোটেলে ফিরবো।

এমন সময় বর্মার সাংবাদিকা বন্ধু শ্রীমতী দা আম্মার সঙ্গে দেখা। তিনিও খুব বেঁচে গেছেন জানালেন।

আমি বললাম—"এখন হোটেলে ফিরতে পারলেই বাঁচি।" উনি বললেন, "ফেরবার উপায় কি? গাইড্, দোভাষী কাউকে না পাওয়া পর্যন্ত ফিরবেন কি করে?" কথাটা সত্যিই বটে! এই ভেবে আমরা দু'জনেই কার্নিভ্যালটা ঘুরে দেখতে গেলাম।

পার্কের বনেজঙ্গলে-গাছেপালায় রঙিন আলোর মালা, আলোর খেলা। চারিধারে রকমারী ছবি আর সিন এঁকে তৈরি অদ্ভুত সব ঘরবাড়ি। হাজার রকমের জন্তু জানোয়ার ও নানা জাতের মানুষের মুখোস আর সাজপোশাকে সং সেজে যুবক-যুবতী, প্রতিনিধি, অতিথিদের সে কী হুল্লোড়! নাচ গান, অভিনয় আর প্যান্টোমাইম শো জায়গায় জায়গায় চলেছে। রুমানিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের রঙচঙে জাতীয় পোশাকে সেজে-আসা যুবক-যুবতীরা চলেছে দলে দলে নেচে গান গেয়ে। এসব দেখে হকচকিয়ে না গিয়ে উপায় কি? তাছাড়া এগুলো ভালো করে দেখাও তো দরকার, কারণ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য এর থেকে নতুন কিছু আনন্দের খোরাক যদি নিয়ে যেতে পারি। এই ভেবে মিসেস দা আম্মা আর আমি একসঙ্গে ঘুরতে লাগলাম।

খানিক পরে, ওখানেই দেখা হয়ে গেলো মিঃ গ্যামার্স্ক্ল্যাগ আর তাঁর দোভাষী টিল্ডার সঙ্গে। আরও কয়েকজন জানা-পরিচিত জুটে গেলেন দলে। ওঁদের পাল্লায় পড়ে খুব হৈ-হল্লা করে বেড়িয়ে—রাত দেড়টায় হোটেলে ফিরলাম। কিন্তু অত আনন্দের মধ্যেও আমার শখ করে কেনা সুন্দর চশমাটার শোকে মন ভারী হয়ে উঠলো।

উৎসবের শেষে

কার্নির্ভ্যাল থেকে ফিরতে রাত হওয়ায় বারোই আগস্টের সকালে ঘুমটাও ভাঙলো দেরিতেই। লেখালেখির কাজও অনেক জমে গিয়েছে। তাই স্নান ইত্যাদি সারতেই আটটা বাজলো। নীচে নেমে গিয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলাম। এলেনের অপেক্ষা না করেই। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে এসে চিঠি ও ডায়েরী লিখতে বসলাম। হাঙগারীর সাংবাদিক বন্ধুরা এলেন। ও'দের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা গেল। কয়েকখানা গ্রামোফোন রেকর্ড ও পুতুল উপহার দিলাম। ও'রা ভারী খুশি।

দশটার সময় এলেন এসে জানালে—আজ রুমানিয়ার ইকনমিক্যাল এক্জিবিশনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, ইচ্ছা করলে আমি যেতে পারি, আর আর সাংবাদিকদের সঙ্গে। ইচ্ছাটা খুব বেশী না থাকলেও, অনিচ্ছা প্রকাশ করতে ভরসা হলো না। কারণ ক'দিন বড্ড বেশী এলেনকে এড়িয়ে চলেছি। আমি এক্জিবিশন দেখতে যাচ্ছি শুনে মিসেস হ্যামার্সক্ল্যাগও আমার সঙ্গী হতে চাইলেন। মিঃ হ্যামার্সক্ল্যাগ গেলেন আর একটা কারখানা দেখতে। মিসেস হ্যামার্সক্ল্যাগ বললেন—"কারখানায় গেলে আমি অসুস্থ বোধ করি।" কেন সে কথা আর প্রশ্ন করার সাহস হলো না। বুঝলাম যন্ত্রের দেশ অস্ট্রিয়ার মেয়েও রুমানিয়ার মজুরদের যান্ত্রিক কর্ম-ধারাটা সহ্য করতে পারছেন না।

আমরা প্রায় কুড়িজন মহিলা ও পুরুষ সাংবাদিক, আর কয়েকজন দোভাষী বাসে চেপে রওনা হলাম রুমানিয়ার ইকনমিক্যাল ও ইনডাস্ট্রিয়াল প্রদর্শনীটা দেখতে। শহর থেকে বাইরে বেশ খানিক দূরে বিরাট জায়গা জুড়ে এই স্থায়ী প্রদর্শনী গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রদর্শনীটিতে কৃষি, কুটীরশিল্প, বস্ত্রশিল্প, যন্ত্রশিল্প, রসায়ন-

শিল্প প্রভৃতি সব বিভাগের বাছাই করা বেশ কিছু জিনিস এনে— তেমন সুন্দর করে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে দর্শক মাত্রেরই তাক লেগে যায়। আমাদের দেশের সরকারী প্রচার ও বাণিজ্য বিভাগ থেকে মাঝে মাঝে যেমন প্রদর্শনী করে দেশ ও বিদেশের লোককে তেমন বহু জিনিস দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, যেগুলো সচরাচর দোকানে বাজারে দেখা যায় না, এটাও হলো তাই। তবে সত্যি কথা বলতে কি, এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগ সাজানোর মধ্যে শিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ারদের অদ্ভুত দক্ষতা ও নিপুণতার পরিচয় পেলাম। প্রদর্শনীটা আগাগোড়া ঘুরে দেখে এই ধারণাই হলো যে মানুষের নিত্যব্যবহার্য জিনিস, কাপড়চোপড়, জামা-জুতো, ওষুধপত্র, প্রসাধন দ্রব্য, চকলেট, লজেন্স, খেলনা, পুতুল, আসবাবপত্র তৈরির ব্যাপারে রুমানিয়ায় অর্থনৈতিক সাহায্য ও দৃষ্টি ততখানি দেওয়া হয়নি। যতখানি দেওয়া হয়েছে, বড় বড় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, ট্রাক্টর ও ডিজেল মোটর বা অস্ত্রশস্ত্র তৈরির ব্যাপারে।

আরাম ও বিলাসের জিনিসগুলো দেশে বেশী উৎপন্ন হলে সেগুলে খুশিমতো কিনতে পেলে দেশের লোকের বাজে খরচ ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে ব্যক্তিবিশেষের টাকা-পয়সার চাহিদাটা যায় বেড়ে। আয় বাড়াবার দাবি ও চাপটা পড়ে গিয়ে একমাত্র মালিক সরকারের ওপরেই। তাই ওদেশে যে অত্যন্ত সুকৌশলে আরাম ও বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে, মানুষের বাড়তি খরচ করবার ও আরাম ভোগ করবার সমস্ত ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে, সেটা প্রদর্শনীর নমুনাগুলো দেখেই বোঝা গেল।

এই প্রদর্শনীতে আমাদের প্রত্যেককে "Planned Economy of the Rumanian Peoples Republic" বলে যে বইটা দেওয়া হলো—তা পড়ে বুঝলাম এই প্রদর্শনীতে যেটুকু বাহাদুরি দেখছি তার পনেরো আনাই সোভিয়েট ইউনিয়নের! কারণ ঐ বইটির ৪-এর পৃষ্ঠায় রুমানিয়ার সরকারই লিখছেন—

"The Soviet Union places at our disposal not only up-to-date machinery and equipment but also documentary material and blue-prints for the great

constructions achieved in our country, as well as the direct help of Soviet technicians with the highest qualifications; the Soviet Union supplies us with complete factories and plants, furthermore, the assistance rendered through joint Soviet-Rumanian companies is of Paramount importance in the development of our socialist industry."

ঐ বইটির পাতায় এইটুকুই যে শুধু নজরে পড়লো তা নয়। জানা গেল, রুমানিয়ার সবচেয়ে বড় সম্পদ পেট্রোলের ব্যবসা, সেটিও পুরোপুরি রুমানিয়ার নিজস্ব অধিকারে নয়, সেটিও পরিচালনা করছেন—একটি যুক্ত সোভিয়েট-রুমানিয়ান কোম্পানী—"সোভ্রম পেট্রোল" a joint Soviet-Rumanian Company—"Sovrompetrol" রুমানিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির আরও যে একটি বড় উৎস কাঠ এবং কাঠের রকমারী জিনিস তৈরীর কল-কারখানা সেখানেও সোভিয়েট রাশিয়া রুমানিয়ার অংশীদার হয়ে ভাগ বসাচ্ছেন যে, সেকথাও এই বইটির ২৭ পৃষ্ঠাতে স্বীকৃত হয়েছে—

"The 'Sovromlemn'. units (joint Soviet-Rumanian timber companies) foremost units of our national economy, provided with Soviet machinery and equipment and organised in accordance with the rich Soviet experience."

রুমানিয়ার অর্থনীতিকে কিভাবে সোভিয়েট রাশিয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন মহাজন হয়ে বসে—এই বইটিতে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া প্রদর্শনীতে বিভিন্ন জিনিস যে সব স্টলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সেখানেও লিখে রাখতে হয়েছে কোন্ সোভিয়েট কারিগরের বিশেষ পদ্ধতিতে কোন কোন বস্তুটি তৈরী হয়েছে।

প্রদর্শনীতে এক জায়গায় রুমানিয়ার তৈরী রকমারী ছোট বড় রেডিও রয়েছে দেখে এগিয়ে গেলাম। নানা রকম প্রশ্ন ক'রে ও খোঁজ নিয়ে জানলাম রেডিওর অধিকাংশ অংশই সোভিয়েট রাশিয়ায় তৈরী। রুমানিয়ায় মাত্র অ্যাসেম্বল করা হয়েছে। সবচেয়ে অবাক হলাম

রেডিওতে যে সব স্টেশনের নাম রয়েছে, তার মধ্যে ভারতবর্ষ বা অ-কমিউনিস্ট কোনও দেশের নাম না দেখে। দুষ্টুমি করে এলেনকে বললাম—"আমাকে ভারতবর্ষের রেডিও প্রোগ্রাম ধরে একটু শোনাতে বলো তো।"

এলেন ঐ স্টলের লোকটিকে সে অনুরোধ জানাতে তিনি বললেন যে, আমাদের এ রেডিওগুলিতে অ-কমিউনিস্ট দেশের ওয়েভলেংথ ধরবার কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কারণ ঐ সমস্ত দেশ থেকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়।

আমি বললাম—"ভারতবর্ষের কোনও রেডিও স্টেশন কমিউনিস্ট দেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় না। আর আমরা তো সব দেশের রেডিও স্টেশনের প্রোগ্রামই শুনতে পারি।" ওরা অবাক হয়ে গেল।

বুঝলাম এদেশের মানুষের আমাদের দেশওয়ালী ভাইদের মত সব দেশের বেতার-প্রোগ্রাম শোনবার স্বাধীনতা নেই। তবু কমরেড্‌দের কাছে এসব দেশের স্বাধীনতাই সাচ্চা স্বাধীনতা, ভারতের আজাদী বিলকুল ঝুটা হ্যায়! এলেনকে বললাম—"কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীনতার ষোল আনাই যখন সম্ভব হয়েছে, তখন বাইরের দেশগুলি যা খুশি তাই বলুক না কেন? তাতে ভয়ের কি আছে?"

এলেন রীতিমত চটে উঠলো—বললে—"এ সব প্রশ্নের জবাব বৈদেশিক বিভাগে জানতে চাইবেন।" মিসেস হামার্ক্ল্যাগ ইসারা করে আমাকে চুপ করতে বললেন।

প্রদর্শনীর নানা বিভাগ দেখে ঘুরে আসতে বাজলো—বেলা একটা। লাঞ্চ খেয়ে এক ঘণ্টা বিশ্রাম করবার পর রওনা হতে হলো প্রেস-অফিসে।

প্রেস-অফিসের লম্বা হলে—বিভিন্ন টেবিলে প্রায় ষাট জন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও অতিথিকে সাজিয়ে গুজিয়ে বসিয়ে বড় বড় স্টুডিও লাইট জ্বালিয়ে ফিল্ম তোলা হলো। সে এক যন্ত্রণা। একেই গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তারপর ঐ বড় বড় আলো।

তোড়জোড়, ক্লোজ আপ, লং শট করতে করতেই বেলা ছ'টা বেজে গেল ওখানেই।

ছবি তোলা শেষ হলো বটে, তবে ছুটি হলো না। ওখান থেকে গা তুলে বাসে উঠে তখনই রওনা হতে হলো আমাদের তেমন কয়েক-জনকে, যাঁদের রুমানিয়ার লেখক সঙ্ঘ বা 'উনিয়ানা স্ক্রিতোরিল'এ চা-খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। এলেনও সঙ্গে গেল।

১৫নং বুলেভার্দ আনা ইপাতেস্কু রাস্তার ওপর সুন্দর প্রাসাদোপম বাড়িটির সামনে গিয়ে বাস থামলো। রুমানিয়ার লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে মিহাই বেনিনে আমাদের অভ্যর্থনা করে উপরে নিয়ে গেলেন। চমৎকার করে সাজানো একটি হল। ভিতরে তিনধারে টেবিলে বিস্কুট, কেক, আঙুর ও পানীয়ের বোতল সাজানো। লেখক-লেখিকারা সব সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমেই একে একে করমর্দন করে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় পর্ব শেষ করানো হলো।

তারপর মিঃ বেনিনে রুমানিয়ান ভাষায় রুমানিয়ার আধুনিকতম সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির পরিচয় দিয়ে একটি বক্তৃতা দিয়ে বিদেশের সাহিত্যিক অতিথিদের অভ্যর্থনা জানালেন। রুমানিয়ার বিখ্যাত গল্প ও উপন্যাস লেখক পেত্রু দুমিত্রু তাঁর বক্তৃতার ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মানী অনুবাদ করে শোনালেন এবং অতিথিদের যদি কিছু প্রশ্ন করার থাকে, তাহলে সেই প্রশ্ন করবার অনুরোধ জানালেন। অনেকেই নানারকম প্রশ্ন করলেন, আমিও প্রশ্ন করলাম কয়েকটা।

রকমারী প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল—রুমানিয়ায় বর্তমানে সাহিত্যের যা কিছু বই পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়, তার নির্বাচন, অনুমোদন ও প্রকাশের ব্যবস্থা করেন—"উনিয়ানা স্ক্রিতোরিলর" বা রাইটার্স ইউনিয়ন। এই পার্টি-সংস্থার অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া কোনও লেখকেরই ওদেশে কোনও বই বা পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করবার স্বাধীনতা নেই।

লেখকদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ঔপন্যাসিক জাহারিয়া স্তানকু জানালেন, বর্তমানে গবর্নমেন্টের সুব্যবস্থায় লেখকরা রাজার হালে থাকেন, তাঁরা যাতে নিভৃতে নির্জনে, নিশ্চিন্ত মনে বই লিখতে পারেন, সেইজন্য তাঁদের 'সিনাইয়া' পাহাড়ে সুন্দর সুন্দর বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় ইত্যাদি। বুঝলাম এদেশে সরকারের স্তাবক এক লেখক-গোষ্ঠী তৈরি করে সাহিত্যকে প্রচার সাহিত্যে পরিণত করা হয়েছে। জানানো হলো, কলকারখানার মজুরদের ভিতর থেকেও নতুন নতুন লেখক ও কবিকে আবিষ্কার করা হচ্ছে। সবই বুঝলাম এবং ভালোই লাগলো; কিন্তু সাহিত্য ও সাহিত্যিকের স্বাধীন মত প্রকাশ করার কোনও উপায়ই যে সেখানে নেই—এটা এত স্পষ্ট করে বোঝা গেল যে, তাতে করুণায় মন ভরে উঠলো।

আমাদের দেশের সরকার বা তাঁদের তাঁবেদার এক লেখক-গোষ্ঠীর হাতে এইভাব যদি সাহিত্যবিচার ও সাহিত্য-প্রকাশের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে সাহিত্য কি বস্তু হয়ে উঠবে, সেটা বুঝতে কি কারো কষ্ট হবে? (রুমানিয়ায় শুধু নয়, এই ব্যবস্থায় সোভিয়েট ও তার তাঁবেদার সব রাষ্ট্রেই একটি মাত্র মতবাদের প্রচারেই সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রতিভাকে গোলাম করা হয়েছে যে, তাও পরে দেখেছি হাঙ্গারী-পোল্যাণ্ডে গিয়ে)।

ভারতবর্ষে সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত মতামত প্রচারের স্বাধীনতা কিভাবে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে, সে কথা ঐ সভায় জানালাম। এলেন যে এতে খুবই বিরক্ত বোধ করছিল তা বুঝলাম। যাই হোক, বন্ধুবর হ্যামার্সক্ল্যাগও নির্ভীকভাবে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। লেখক-সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা অনেক প্রশ্নের জবাবই ঠিকমত গুছিয়ে দিতে পারলেন না। বক্তৃতা ও প্রশ্নের পর অনেকের সঙ্গেই ঘরোয়া আলাপ জমালাম। পেত্রু দুমিত্রু দোভাষীর কাজ ক'রে এ ব্যাপারে খুব বেশী সাহায্য করলেন।

ঐ সভায় উপস্থিত যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হলো—তার মধ্যে ছিলেন সরকারী প্রকাশনা বিভাগের এডিটর সিলভিয়ান য়োসিপেস্কু, মহিলা কবি নিনা ক্যাসিয়ান ও নাট্যকার অরেল বারাঙ্গা,

"ভিয়াতা রেইনোনিয়োরিয়া" ('নূতন জীবন') মাসিক পত্রের সম্পাদক অরেল মিহাইল, সমালোচক পেত্রে য়োসিফ প্রভৃতি রুমানিয়ার নাম-করা লেখক। ওঁরা সকলেই আমার নোটবুকে নিজের হাতে নাম ঠিকানা পরিচয় লিখে দিলেন। সবচেয়ে মুগ্ধ হলাম স্টেট-প্রাইজ বিজেতা লেখক পেত্রু দুমিত্রুর বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা ও তাঁর কথা বলবার ভঙ্গী দেখে।

সম্বর্ধনা সভার শেষে পেত্রু দুমিত্রু জানালেন যে, ভারতবর্ষের বর্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি আমার সঙ্গে বিশদ আলোচনা করতে চান। জানতে চাইলেন আমি তাঁর বাড়িতে পরের দিন সময় করে যেতে পারি কি না! আমি জানালাম বিশেষ আনন্দের সঙ্গে যেতে রাজি আছি। ঠিক হলো পরের দিন বেলা এগারোটার সময় উনি গাড়ি নিয়ে এসে আমাকে হোটেল থেকে তুলে নিয়ে যাবেন ওঁর বাড়িতে।

ওখান থেকে উঠলাম আমরা রাত ন'টায়। এলেন পথে আসতে আসতে জানালে—"পেত্রু দুমিত্রু আমাদের দেশের তরুণ লেখকদের মধ্যে সব সেরা লেখক। ওঁর বাড়িতে তোমার নিমন্ত্রণ হওয়ায় আমি খুব খুশী। ওঁর স্ত্রীও খুব বিদুষী ও জ্ঞানী মহিলা, আলাপ করে খুশী হবে।" আমি বললাম—"বেশতো তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।" এলেন বললো "অত বড় নাম করা লেখকের বাড়ি তোমারই নিমন্ত্রণ—সঙ্গে আমার যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে?" বুঝলাম এলেনের এই সুযোগে তার দেশের নামকরা লেখকটির বাড়িতে যাওয়ার খুবই ইচ্ছে আছে।

হোটেলে ফিরে ডিনার সারতে সারতেই রাত সাড়ে দশটা। আমি এবং এলেন দুজনেই সারাদিনের ছুটোছুটিতে ক্লান্ত ছিলাম। এলেন তাই চলে গেল তার বাসায়। জানিয়ে গেল কাল সকালে ও আর আসবে না, আমি যেন একলাই যাই মিঃ দুমিত্রুর সঙ্গে। কামরায় গিয়ে ডায়েরী ও লেখাপড়ার কাজ সেরে শুতে গেলাম যখন, তখন রাত বারোটা।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে হলো, আজ এলেন আসবে না। কাজের তাড়াও নেই তেমন। বিছানায় গড়াতে লাগলাম। এমন সময় দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ। তাড়াতাড়ি স্লিপিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে দিলাম। দেখি পোল্যান্ডের সাংবাদিক বন্ধুটি আমার পাসপোর্ট ও আলাদা একটি কাগজে পোল্যান্ডের ভিসাটি নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাকে বলে দিলেন, পোল্যান্ডে গিয়ে কিভাবে কোথায় থাকতে হবে। কাকে কি বলতে হবে ইত্যাদি। তাঁর সঙ্গে ওখানে আমার কোথায় কিভাবে দেখা হবে সমস্তই বাৎলে দিয়ে বন্ধুটি চলে গেলেন। স্নান ও অন্যান্য কাজ সেরে আমি যখন নীচে নামবো ভাবছি, তখন টেলিফোন বেজে উঠলো। এলেন এসেছে। বুঝলাম ও আমার সঙ্গে যাবে।

নীচে নামলাম। এলেন বললে—"আমি তোমার সঙ্গে গেলে মিঃ দুমিত্রু কিছু মনে করবেন নাকি?"" আমি বললাম—"না! না! মনে আবার করবেন কি? সে ব্যবস্থা আমি করে নেবো।"

বেলা এগারোটায় মিঃ দুমিত্রু গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন। উনি এলেনকে আমার সঙ্গে দেখে তাকেও যাবার অনুরোধ জানালেন।

মিঃ দুমিত্রুর বাড়ি হোটেল থেকে বেশ দূরে। তাঁর বাড়িতে যাবার পর তাঁর স্ত্রী ও আর একটি মহিলা মিসেস নাস্তার সঙ্গে আলাপ হলো। ওঁরা দুজনেও লেখিকা। ভারতবর্ষের সাহিত্য ও সমাজ নিয়ে ওঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করা গেল। এলেন চুপ করে বসে আমাদের আলাপ-আলোচনা শুনতে লাগলো। মিসেস দুমিত্রু ইংরেজী বলতে পারেন না, অন্য মহিলাটি ইংরেজী বলতে পারেন। বেলা যখন বারোটা বাজলো, তখন মিঃ দুমিত্রু জানালেন তাঁকে একবার তাঁর আপিসে যেতে হবে। আমি বললাম—"আমরাও উঠি তাহলে।" মিসেস দুমিত্রু বললেন—"অসুবিধা না হলে আপনার আমাদের সঙ্গে আরও একটু গল্প করলে এখানেই লাঞ্চ খেলে খুশী হবো।" মিঃ দুমিত্রুরও একান্ত ইচ্ছা তাই জানালেন। অগত্যা আমাকে থাকতেই হলো। এলেন জানালে—তার অসুবিধা

আছে। সেও যেতে চায় মিঃ দুমিত্রুর সঙ্গে। এলেন ও মিঃ দুমিত্রু চলে গেল।

মিসেস দুমিত্রু ভারতবর্ষের সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন আমাকে। অন্য মহিলাটি আমাদের দোভাষীর কাজ করতে লাগলেন। বেলা দুটোর সময় খেতে বসলাম আমরা তিনজনে। দেখি ভাত, মাখন, দুধ আলু ভাজা ও আলুসিদ্ধ সমস্তই নিরামিষ। জানা গেল, মিসেস দুমিত্রু নিরামিষ খান। খাওয়ার শেষ পর্বে মিষ্টি পিঠে পায়েস! বসবার ঘরে কফি এলো। শুরু হলো আলোচনা, গল্প। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও দর্শন সম্পর্কে মিসেস দুমিত্রুর অশেষ কৌতূহল। তিনি রুমানিয়ান ভাষায় কবির "সাধনা", "গীতাঞ্জলি" ও "ঘরে বাইরে" বইটির অনুবাদ পড়েছেন। ওঁর কাছেই শুনলাম রুমানিয়ার সবচেয়ে প্রবীণ ও নামকরা লেখক মিহাইল সাদুভিয়ানুর পরিচয়।

চারটে নাগাদ মিঃ দুমিত্রু আপিস থেকে ফিরলেন। আমি হোটেলে ফেরবার জন্য বিদায় চাইলাম ওঁদের কাছে। মিসেস দুমিত্রু ও মিসেস নাস্তা আমাকে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে আবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার অনুরোধ জানালেন। অদ্ভুত এঁদের ক'জনের আন্তরিকতা ও ব্যবহার! কয়েক ঘণ্টার অকপট ব্যবহারে তাঁরা আমাকে যেভাবে আপন করে নিলেন তা কোনওদিনই ভুলতে পারবো না। মিঃ দুমিত্রু "Nights of June" নামে তাঁর একখানি ইংরেজী বইয়ের (অনুবাদ) প্রথম পাতায় অটোগ্রাফ করে আমাকে উপহার দিলেন।

পাঁচটার সময় হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন মিঃ দুমিত্রু। সন্ধ্যা নাগাদ এলেন এলো। জানালে আজ রাত্রে ও আমাকে সোভিয়েট রাশিয়ার নাচগানের অনুষ্ঠান দেখাতে নিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি তাই খেতে গেলাম।

খাওয়া সেরে রওনা হলাম C. C. S. থিয়েটারে। শুনলাম

এ থিয়েটারটা রাশিয়ানদের দানে তৈরী হয়েছে। সেখানে রাশিয়ান অভিনয় ও নাচগান হয়—বুখারেস্ট প্রবাসী রুশ বড় বড় চাঁইদের জন্যে। ন'টায় সেখানে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রোগ্রাম আরম্ভ হলো। গোড়া থেকেই অনুষ্ঠানটি জমে উঠলো। প্রথমে মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী দলের সমবেত সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো। স্বনামধন্যা "ইউজিনি স্বেতলানোফ্" সঙ্গীত পরিচালনা করলেন। এই অনুষ্ঠানে জর্জিয়ার একদল যুবতী অদ্ভুত লোকনৃত্য দেখালে। মস্কো স্টেট অ্যাকাডেমি থিয়েটারের নাম করা গাইয়ে ল্যারিসা আওদিওয়া তাঁর মিষ্টি গলার একক সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করলেন। বিখ্যাত ব্যালে নাচিয়ে শ্রীমতী কুর্গাপ্‌চিনাও তাঁর ব্যালে নাচের কৃতিত্ব দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। একদল বেহালা বাজিয়ে বেহালার সুরে রাশিয়ার একটা গ্রাম্য সঙ্গীতের গৎ যখন শুরু করলে, তখন আমারও মন মেতে উঠলো। সোভিয়েট রাশিয়ার অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা ও পরিচালনার দিক থেকে সত্যিই নিখুঁত মনে হলো। এই অনুষ্ঠানে সোভিয়েট রাশিয়ার নামকরা অনেক নাচিয়ে গাইয়ে অংশ গ্রহণ করলেন। তাঁদের মধ্যে জোসিফ তুমানোফ ভ্লাদিমির ওতদেলিনফ, আঁদ্রেয়ী ক্লিমফ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন তা অনেকদিন পর্যন্ত ভোলা যাবে না। শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটি না দেখে উঠতে পারলাম না। হোটেলে ফিরতে সেদিন রাত একটা হলো।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে গেল—ঠাণ্ডা হাওয়ার সুড়-সুড়িতে। চোখ রগড়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, আশপাশের ঘরবাড়ির ছাদ দেওয়াল সব ভিজে, জলে ধোওয়া। বুঝলাম আগের দিন রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টি ভেজা স্যাঁৎসেঁতে হাওয়ার ছোঁয়াচ লেগে মনটা যেন কুঁড়েমির বায়না ধরলে। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম চাদর মুড়ি দিয়ে। মনে পড়ে গেল, মাসটা শ্রাবণ, বাঙলাদেশে বর্ষণ শুরু হয়েছে! তেমন বৃষ্টি

এখানেও ঝরলো, অথচ বাদল-ঝরার গানই শোনা হলো না। কিছু টের পাইনি!

ভাবতে ভাবতে সবে দো-মেটে ঘুমটি আসছে, এমন সময় ক্রিরিং-রিং ক্রিরিং-রিং! টেলিফোন কানে তুললাম।

ডাকছে ইয়োভান্নী। বললে—"লুসিয়ার বাড়ি যাচ্ছি, ওখানে একবার আসতে পারবে কি? বিশেষ দরকার আছে।"

আমি বললাম—"বেশ, যাচ্ছি। মিনিট কুড়ি পঁচিশ দেরি হবে।" তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে প্রার্থনা সেরে তৈরি হলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, অচেনা কত বন্ধুকে ভারতবর্ষ থেকে আনা উপহার দিলাম, কিন্তু লুসিয়া ইয়োভান্নী যারা আমায় সবচেয়ে বেশী সাহায্য করছে, সবচেয়ে বেশী আদর যত্ন শ্রদ্ধা-ভালবাসা দিচ্ছে, তাদেরই তো কিছু দেওয়া হয়নি।

তাই শ্রীহরি ভাইয়ের দেওয়া ক্যালকাটা কেমিক্যালের তিনটি প্ল্যাস্টিকের ক্যালেন্ডার, স্বামিজী, নেহরু ও মহাত্মা গান্ধীর লেখা কয়েকটি বই ও ভারতবর্ষের নানা জায়গার কিছু ছবি ইত্যাদি একটা প্যাকেটে বেঁধে নিয়ে লুসিয়ার বাড়ি রওনা হলাম।

লুসিয়ার ফ্ল্যাটে পেঁছিলাম যখন, তখন বেলা সাড়ে ছটা। গিয়ে দেখি ঘরের চারিধারে আমার দেওয়া কয়েকটা ধূপকাঠি ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। ফুলদানীতে টাটকা সাদা একগোছা ফুল। ঘরের মেঝেতে ছোট্ট একটি কার্পেট পাতা।

ঘরে ঢুকতেই লুসিয়া আমাকে বললে—"ঐ কার্পেটে বসে ভারতীয় পদ্ধতিতে আজ তুমি উপাসনা করবে, আমরা যোগ দেবো তোমার সঙ্গে।" ওদের কান্ড দেখে আমি অবাক। থতমত খেয়ে কার্পেটে গিয়ে বসলাম।

ইয়োভান্নী বললে—"কদিন পরেই তো তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে, আর হয়তো তোমাকে কোনও দিন দেখতেও পাবো না। তাই আমাদের ভারী ইচ্ছে তুমি আমাদের একটি সংস্কৃত প্রার্থনা-মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে যাও। সেই প্রার্থনা-মন্ত্রটি আমরা রেখে দেবো, তোমার

স্মরণ চিহ্ন হিসাবে। ঐ প্রার্থনার মধ্যে তোমাকে আমরা মনে করবো, অন্তরে পাবো।

ঐ সুন্দর পরিবেশে—লুসিয়া ও ইয়োভান্নীর অন্তরের শ্রদ্ধাভরা দাবিটুকুকে অস্বীকার করবার উপায় নেই! কিন্তু কোন্ প্রার্থনাটি শেখাবো ভাবছি। এমন সময় লুসিয়া একটি পুরানো বই বার করে এনে তাতে কয়েকটি ইংরেজী লাইন দেখিয়ে দিলে। বললে—ঋগ্বেদের এই প্রার্থনার মূল সংস্কৃত মন্ত্রটি শিখিয়ে দাও। যাক ভগবান আমার সহায় হলেন। ইংরেজী অনুবাদটি পড়ে ভারী খুশী হয়ে উঠলাম, কারণ সে মন্ত্রটি আমারও প্রিয়, আমারও একটি প্রার্থনা। আমি বললাম—হ্যাঁ এই প্রার্থনাটি আমি জানি এবং করেও থাকি।

ওরা কার্পেটের ওপরে হাঁটু মুড়ে বসলো আমার পাশে। মন্ত্রটি আমি কয়েকবার আবৃত্তি করলাম—"অসতো মা সদ্গময়ঃ তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ মৃত্যোর্মাহমৃতং গময় আবীরাবীর্ম এধি।" তারপর ওরা দুজনে আরও কয়েকবার আমার সঙ্গে মন্ত্রের সুর ও উচ্চারণ অনুসরণ করে মন্ত্রটি আবৃত্তি করলে। আমি শ্রীরামকৃষ্ণ স্তোত্রম আবৃত্তি করলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমাদের এইভাবে প্রার্থনা চললো। তারপর ওরা দুজনে রোমান অক্ষরে ঋগ্বেদের ঐ সংস্কৃত মন্ত্রটি লিখে নিলে।

প্রার্থনার পর লুসিয়া চা করে আনলে। চা খেতে খেতে ওরা দুজনেই বার বার বলতে লাগলো—"বিশ্বযুব উৎসবে তুমি এসেছিলে—তাই আমাদের জীবনের কটি দিনও উৎসবের আনন্দে ভরে উঠেছিল। কদিন পরেই তুমি চলে যাবে। কিন্তু আমাদের অন্তরে ভারতবর্ষ আগের মতই উপাস্য হয়ে থাকবে।"

আমি বললাম—"ভারতবর্ষের প্রতি তোমদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পরিচয়ে—তোমরাও ভারতবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার আসন পাবে।"

এরপর আমি প্যাকেট খুলে—ওদের উপহারগুলি দিয়ে বললাম,

"এগুলি তোমরা এবং তোমাদের বন্ধুরা সবাই মিলে ভাগাভাগি করে নিও। ভারতবর্ষের বন্ধুদের পাঠানো সামান্য প্রীতি উপহার।"

লুসিয়া জলভরা চোখে বললে—আমি আর ইয়োভান্নী সবচেয়ে দামী উপহার পেয়ে গেছি, এগুলো বাকি সবাইকে ভাগ করে দেবো। তবে বইগুলি তুমি ফেরৎ নিয়ে যাও, ঐ অমূল্য বইগুলি রাখতে পারলে আমরা খুবই খুশী হতাম। কিন্তু ওগুলি নিয়ে ঘরে রাখা বর্তমানে এদেশে নিরাপদ নয়। তাই বেদনা ও দুঃখের সঙ্গে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে, তুমি কিছু মনে করো না।"

বইগুলি আবার প্যাকেটে বেঁধে নিলাম। কোনও কথাই বলতে পারলাম না। ঘড়িতে নজর পড়তেই দেখলাম সাড়ে আটটা বেজে গেছে। বললাম—"লুসিয়া তুমি আজ আপিসে যাবে না?" লুসিয়া বললে—"আজ একটু দেরি করেই আপিসে যাবো বলে এসেছি, ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই। আমাকে কয়েকটা বাঙলা কথা শেখাও। রোমান হরফে কিছু বাঙলা কথা আর তার ইংরেজী আমার খাতায় লিখে দিয়ে যাও।"

আমি ওর খাতায় তাড়াহুড়ো করে রোমান হরফে কিছু বাঙলা কথা আর ইংরেজী অনুবাদ লিখে দিলাম। লুসিয়া দু'একবার চেষ্টা করেই চমৎকার উচ্চারণ করতে লাগলো সেই কথাগুলির।

নটা যখন বাজলো—তখন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠলাম। ওরা বিশেষ করে অনুরোধ করলে বিকেল চারটার সময় ওদের সঙ্গে দেখা করতে।

হোটেলে ফিরে খোঁজ নিয়ে জানলাম এলেন তখনও আসেনি। উপরে গিয়ে বইয়ের প্যাকেটটি রেখে এসে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলাম।

সাড়ে ন'টা বাজলো, এলেনও এলো। ওকে জানালাম—"পাইওনীয়ার প্যালেসে যেতে চাই।" এলেন বললে—"প্যালেসটাই দেখতে পাবে, এখন সেখানে ছেলেমেয়েদের কাউকে দেখা যাবে না। কারণ সেপ্টেম্বর থেকে জুন এই দশ মাস পাইওনীয়ার প্যালেসের কাজ চলে। জুলাই আগস্ট দু' মাস কাজ বন্ধ থাকে।"

আমি বললাম—"এদেশের পাইওনীয়ার আন্দোলন সম্পর্কে কিছু খবর আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। অতএব ওখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে সুখী হবো।" এলেন বেচারা কি করে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমাকে নিয়ে পাইওনীয়ার প্যালেসের পথে রওনা হলো।

বুখারেস্ট শহরের এক প্রান্তে—কোত্রোচেনী নামে ছোট্ট একটা পাহাড়ে টিলা। তার উপরে শত শত বছরের পুরানো বুড়োগাছ-পালা,—চেস্টনাট, বার্চ আর ওকের সারি। মাঝখানে—রুমানিয়ার কিশোর নিকেতন ইয়ং পাইওনীয়ারস প্যালেস। আগে এই প্রাসাদে রুমানিয়ার রাজারা থাকতেন। এখন সেই বিরাট প্রাসাদের বড় বড় কামরায় কিশোর-কিশোরী পাইওনীয়ারদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার নানা বিভাগ চালু করা হয়েছে। এসব কথা গাড়িতে যেতে যেতে এলেনের মুখেই শুনলাম।

পাইওনীয়ার প্যালেসে পৌঁছে দেখলাম আরও বহু প্রতিনিধি ও অতিথি সেটি দেখতে গেছেন। প্যালেসটি ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য সেখানে গাইডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ওখানকার ভূগোলের অধ্যাপিকা মার্গারিটা আমাকে প্যালেসটি ঘুরিয়ে দেখালেন।

"চার্কুল দি এয়ারোমোদেলাজ" বা বিমান চক্র, এখানে কিশোর-কিশোরীদের রকমারী বিমান সম্বন্ধে নানাকথা শেখানো হয়, হাতে কলমে কাঠ, কাগজ ইত্যাদি দিয়ে রকমারী বিমানের মডেল তৈরি করতে শেখানো হয়, দেখালেন। "চার্কুল দি ম্যুজিকা", "সঙ্গীত চক্র", ছোটদের এখানে নানারকম গান, বাজনা শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে দেখলাম। এছাড়া "বিজ্ঞান-চক্র", "নৃত্য-চক্র", "শিল্প-চক্র" প্রভৃতি নানা বিভাগই আমরা ঘুরে দেখলাম। চমৎকার ব্যবস্থা। কিন্তু কোনও বিভাগেই কিশোর-কিশোরীদের দেখতে না পেয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আমাদের গাইড অধ্যাপিকা মার্গারিটা জানালেন—সেপ্টেম্বর থেকে জুন এই দশ মাসের প্রতিদিন নশো'টি করে পাইওনীয়ার এক এক দলে ভাগ হয়ে পালা অনুযায়ী তাদের অবসর সময়ে

এখানে আসে এবং দু'ঘণ্টা করে পছন্দমত কাজটি এখানে শিখতে পারে। বাকি দু' মাস ছুটির সময় পাইওনীয়াররা বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করতে যায়। এখন ছুটি, তাই পাইওনীয়ারদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ষাট জন অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা আছেন। পাইওনীয়ারদের কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, মনের গঠন, বয়স এবং যোগ্যতার সামঞ্জস্য কিভাবে বজায় রাখা হয়, সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে বুঝলাম, এই পাইওনীয়ার ভবনের ব্যবস্থা বন্দোবস্তটি সবই ভালো। তবে শেখাবার পদ্ধতিটা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক এবং সোভিয়েট ছাঁচে ঢালবার প্রয়াসটা বড় প্রকট। ঘড়ি-ধরা, রুটিন-বাঁধা কাজের ফিরিস্তি আর গ্রাফ চার্টেই তার প্রমাণ পেলাম।

মিস্ মার্গারিটা বিনয়ের সঙ্গে যত্ন করে আমাকে সব দেখালেন ও বোঝালেন। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও— পাইওনীয়ার প্যালেসের বাগান ও প্রাঙ্গণের মধ্যেই ছোটদের বিভিন্ন খেলা খেলবার জায়গা, সাঁতার কাটবার জায়গা, সিনেমা, থিয়েটার, ফুলের বাগানও রয়েছে দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হলো।

সবচেয়ে ভাল লাগলো ওখানকার 'রেলওয়ে সার্কেল'। মডেলের সাহায্যে রেলপথের নানা রকম গাড়ি, স্টেশন, লাইন, সিগন্যাল, টানেল, পুল ইত্যাদির বিশেষত্বটুকু শেখানোর যে অদ্ভুত ব্যবস্থা এখানে দেখলাম, তা বাস্তবিকই খুব মজার এবং শিক্ষাপ্রদ। সুইচ টিপে সিগন্যাল ফেলা, গাড়ি চালানো, গাড়ি থামানোর কাজ চলে এই মডেলে। আর একটি বিভাগ হচ্ছে "ক্যামেরা পোভিস্তিলর" বা 'গল্প শোনাবার ঘর'। এই ঘরটিতে সত্যিই রূপকথার গল্প শোনবার মতো পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে বিচিত্র সব ছবি মূর্তি আর আসবাবপত্রে ঘরটিকে সাজিয়ে। কমিউনিজমের বাস্তববাদের আওতায় এই ঘরের দেওয়ালে—মেঘেওড়া পক্ষীরাজ ঘোড়া, চোখমুখ নাককানওয়ালা গাছপালার মতো অবাস্তব কল্পনাকেও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কল্পনা অবাস্তব হলেও তাকে আশ্রয় করে মানুষের প্রকাশ ও চিন্তাশক্তি যে বেড়ে ওঠে—এটা কার্যক্ষেত্রে ওঁরাও

এখন স্বীকার করতে শুরু করেছেন যে, সেটা দেখে মনে মনে ভারী খুশী হলাম।

বেলা একটা নাগাদ পাইওনীয়ার প্যালেস থেকে আমরা হোটেলের পথে রওনা হলাম। ফেরার পথে ফটোর দোকানে গিয়ে আমার তোলা ফটোর নেগেটিভ ও প্রিন্টগুলো নিলাম। হোটেলে ফিরে লাঞ্চ খেতে বেজে গেল বেলা আড়াইটা। এলেনকে জানালাম, "সন্ধ্যার আগে আজ বেরুবো না। তুমি বরং প্রেস অফিসে যাও। তাগিদ দিয়ে আমার বক্তৃতার কয়েকটা ইংরেজী নকল যেমন করে পারো নিয়ে এসো।"

এলেন বললে—"রোজই তো তাগাদা দিচ্ছি, ওরা বলছে তোমার বক্তৃতার ইংরেজী নকল এখনও তৈরী হয়নি।"

আমি বললাম—"যাবার আগে আর বোধ হয় ওটা তৈরী হয়েও আসবে না। তবু তুমি চেষ্টা করো। আর একান্ত না পাও, ফরাসী অনুবাদই আরও কয়েকটা নিয়ে এসো।" এলেন বিদায় নিয়ে চলে গেল। জানিয়ে গেল সন্ধ্যার সময় আসবে।

ঘরের চাবি আনতে রিসেপশনে যেতেই ওঁরা আমাকে একটি বিল দিলেন। ২৭শে জুলাই থেকে ১০ই আগস্ট পর্যন্ত ১৫ দিন হোটেলে থাকবার খরচ বাবদ ১৮০০ লেই ওঁদের পাওনা হয়েছে। বিল দেখেই তো চক্ষু ছানাবড়া। পনেরো দিনে এই হোটেলে থাকা খাওয়ার খরচ প্রায় আটশো টাকা। অবশ্য এ টাকাটা যে আমাকে দিতে হবে না তাও ঐ লোকটি আমাকে জানালেন—এবং বললেন বিলটি কেবল সই করে দিতে। উৎসব কমিটি টাকাটার উশুল দেবেন। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। তবে আর একদফা নমুনা পেলাম, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে গণ্যমান্যদের জীবনযাত্রার খরচটার কতখানি তফাৎ! ১৮০ লেই যে দেশের মজুর কেরানীর এক মাসের বেতন; সে দেশের হোটেলে একজনের খরচ পনেরো দিনের ১৮০০ লেই!

উপরে গিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলাম। চারটে বাজে দেখে

উঠে পোশাক পরতে শুরু করেছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। কি ব্যাপার! এলেনের তো আসবার কথা নয় এমন সময়। টেলিফোন ধরলাম।

লেখক-বন্ধুর স্ত্রী ইয়োভান্নী জানালেন—তিনি গাড়ি নিয়ে এসেছেন, তাড়াতাড়ি আমি যেন নীচে নামি।

নীচে নেমে বললাম—"কী ব্যাপার! তুমি যে নিজে হোটেলে চলে এলে?" ও বললে—"এই রোদে তুমি আবার হাঁটবে, তাই গাড়ি নিয়ে এলাম।" "বেশ চলো।"

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা এখন কোথায় যাবো? ইয়োভান্নী জানালে—"লুসিয়াকে তুলে নিয়ে তোমাকে আমাদের দেশের কয়েকটা দোকান আর গির্জা দেখাবো।" আমি বললাম—"চমৎকার! তোমাদের দোকান দেখবার এবং কিছু জিনিস কেনবার ইচ্ছে আমারও ছিল; কিন্তু সময়ের অভাবে আর এলেনের গাফিলতিতে সেটা ঘটে উঠছিল না, ভালই হবে।"

লুসিয়াকে তুলে নিয়ে ওদের সঙ্গে কয়েকটা জামা-কাপড় ও মনোহারী জিনিসের দোকান ঘুরলাম। দেখলাম অসম্ভব সব জিনিসের দাম। একটি সুতী শার্টের দাম—৮০ লেই অর্থাৎ প্রায় ৩০৲ টাকা, একটি নক্সাতোলা জর্জেটের ব্লাউজের দাম—১০০৲ থেকে ২০০৲ টাকা, ছোট একটা ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক—৪০ লেই অর্থাৎ প্রায় ১৫৲ টাকা।

শুধু যে দামই বেশী তা নয়, জিনিসগুলি অত্যন্ত খেলো ধরনের। ব্লাউসে জামায় রঙীন সুতোর নক্সার কাজগুলি দেখবার মতো। যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি নিখুঁত। ইয়োভান্নী আমাকে বার বার বলতে লাগলো—"তোমার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর জন্য কিছু জিনিস পছন্দ করো, আমরাই সেগুলি কিনে তাদের উপহার দেবো।" আমি বললাম—"না আমাকে মাপ করো, তোমরা যেটুকু করেছ তাই যথেষ্ট, এর উপর পয়সা খরচ করে উপহার কিনে দেওয়ার দরকার নেই!"

আমি কয়েকটা ছোট ছোট স্মারকচিহ্ন কিনলাম নিজের পয়সা দিয়েই, যেমন মানিব্যাগ—৪০ লেই (১৫৲ টাকা) অটোগ্রাফের খাতা

১৮ লেই (৭৲ টাকা) দুটো সুতী গেঞ্জী ৭৲ টাকা করে এক একটা; যার দাম এদেশে ২৲ টাকার বেশী কোনওমতেই নয়। আমার একটা সুটকেস কেনার দরকার ছিল, তাই সুটকেসের দোকানও দেখলাম। সর্বনাশ। পিজবোর্ড ও ফাইবারের অতি লক্কড়-মার্কা সুটকেস, তার দাম একশো থেকে দেড়শো টাকা! সুটকেস কেনা হলো না।

দোকান থেকে বেরিয়ে আমরা গাড়ি করে কয়েকটা গির্জা ঘুরে এলাম। তার মধ্যে অ্যাংলিকান গির্জার বাড়িটা বহুকালের পুরানো। সেটার গড়নও তাই ভারি অদ্ভুত ধরনের। বুখারেস্টের সবচেয়ে বড় গির্জা সেণ্ট জোসেফ'স্ ক্যাথলিক চার্চটা সেদিন দেখলাম। মেরী ও যীশুর মূর্তি সেখানে অনেক। গির্জার আশেপাশেও সৈনিকরা টহল দিচ্ছে কোথাও কোথাও, এটা নজরে পড়লো। অ্যাংলিক্যান গির্জায় গিয়ে আমরা সন্ধ্যার প্রার্থনা করলাম। দেখলাম বহু লোক সেখানে প্রার্থনা করতে জড়ো হয়েছে। সন্ধ্যার পরে ওরা আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিলে। জানিয়ে গেল সময় করতে পারলেই যেন ওদের সঙ্গে দেখা করি।

হোটেলে ফিরে স্নান করলাম। পোশাক বদলে নীচে নামবার কিছুক্ষণ পরেই এলেন এসে হাজির হলো, জানালে আজকে রাত্রে স্টেট অপেরা হাউসে কোরিয়ানদের গ্যালা প্রোগ্রামে মাত্র একখানা টিকিটই পাওয়া গেছে আমার জন্যে। খাওয়ার পর এলেন আমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ফিরতে হবে আমাকে একাই।

আমি বললাম—"এ কেমন ব্যবস্থা! তুমি সঙ্গে না গেলে আমি একলা কি করে যাবো?"

এলেন বললে—"না। এ প্রোগ্রামটা তুমি বাদ দিও না। ফেরবার অসুবিধা কিছু হবে না, হোটেলের অনেক চেনা লোকই পাবে সেখানে। অদ্ভুত নাচ আর গান কোরিয়ানদের প্রোগ্রামে।" আমিও শুনেছি সে কথা দুচারজনের মুখে। তাই লোভটা শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারলাম না। এলেনের পরামর্শ মতোই ডিনার খেয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হলাম স্টেট অপেরা হাউসে।

নতুন স্টেট অপেরা হাউস ম্যাজিক থিয়েটারের বাড়িটা দূর থেকে

আগেই দেখেছিলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম সত্যিই একটা বিরাট ব্যাপার। দরজায় অসম্ভব ভিড়। এলেনকে সঙ্গে নিয়ে ঢোকবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই পারা গেল না। এলেন অপেরার অপ্সরালোকে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিলে। আমি থিয়েটারের ভিতরে গিয়ে দেখলাম—প্রকাণ্ড হল আর প্রকাণ্ড মঞ্চ। প্রায় দু-তিন হাজার লোক বসবার জায়গা।

স্টেট অপেরার সুন্দরী আসন-প্রদর্শিকাদের একজন আমাকে আমার বক্সের আসনটি দেখিয়ে দিলে। দেখলাম বক্সের ভিতর চারটি চেয়ার, তার মধ্যে একটিতে বসে রয়েছেন একটি সুন্দরী মহিলা। আশপাশের বক্সগুলির ধারে কাছে চারপাশে পুলিশ ও দেহরক্ষীদের ঘোরাফেরা করতে দেখেই বুঝলাম, রুমানিয়ার গণ্যমান্য মন্ত্রী ও হোমরা চোমরারা অনেকেই এসেছেন

আমি বক্সে গিয়ে বসতেই মহিলাটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললেন—"আসুন! আপনি নিশ্চয়ই ভারতীয়?" আমি বললাম "হ্যাঁ, আপনি কোন দেশের?" মহিলাটি জানালেন—তাঁর নাম Ekaterina Popova তিনি বুলগারিয়ার মেয়ে, গায়িকা। বিশ্বযুব উৎসবে একক সঙ্গীতে সোপরানো বিভাগে প্রথম হয়ে সোনার মেডেল পুরস্কার পেয়েছেন। খুব খুশী হয়ে বললাম ঃ "এখানে আসার পর বুলগারিয়ার মানুষের সঙ্গে পরিচয় আজই আমার প্রথম হলো। আজ নিতান্তই সৌভাগ্যের দিন।" উনিও জানালেন ভারতবাসী হিসাবে আমিও তাঁর প্রথম পরিচিত। প্রোগ্রাম আরম্ভ হতে দেরি থাকলেও আলাপ জমতে দেরি হলো না। মেয়েটি ভারতবর্ষের মেয়েদের বিয়ের প্রসঙ্গ তুলে গল্প জুড়ে দিলে। প্রোগ্রাম আরম্ভ হতে গল্প থামলো।

প্রথমেই সঙ্গীত পরিচালক লি-গানের পরিচালনায় কম্যুনিস্ট কোরিয়ার যুবক-যুবতীরা দল বেঁধে সোভিয়েট সঙ্গীত রচয়িতা আলেকজান্দ্রোফের রচিত—স্ত্যালিন-স্তব সঙ্গীতটি গাইলে রুশ ভাষায়। তারপর তারাই কোরিয়ার কম্যুনিস্ট নেতা "কিম আর সেন"-এর প্রশস্তি ও 'কোরিয়ার যুদ্ধ জয়ের গাথা' নামে আরও দুটি সমবেত

সঙ্গীত গাইলে। কোরিয়ায় সোভিয়েট প্রভাব ও চাপ কতদূর পৌঁছেছে তার মস্ত প্রমাণ পাওয়া গেল—কোরিয়ানদের মুখে রুশ ভাষায় স্ত্যালিন-প্রশস্তির গান শুনেই। সমবেত সঙ্গীতের পর কোরিয়ার বিখ্যাত নাচিয়ে মেয়ে "রুক-সুক-হি" তার অদ্ভুত তরবারি নৃত্য দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলে। নাচটা আমারও খুবই ভালো লাগলো, কারণ নাচবার ভঙ্গী ও মুদ্রাগুলো অনেকটা ভারতীয় নাচের মতই। সাজ-পোশাকও যেমন রঙচঙে তেমনি জমজমাট। সঙ্গে যে বাজনা বাজলো তা মনে হলো ভারতীয় সুরেরই প্রতিধ্বনি।

এরপর আরও একটি নামকরা নাচিয়ে মেয়ে 'আন-সেন-হি' 'নতুন-প্রভাত' নামে একটি নাচ দেখালে—গ্রামের মেয়ের সহজ জীবনে প্রশান্ত প্রভাতের মতই প্রেম ভালবাসার যে শান্ত কামনাটি লুকিয়ে থাকে তা অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুললে—এই মেয়েটি তার নাচে। আবহসঙ্গীত ও দৃশ্যপটেও পাওয়া গেল যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয়। নাচের পর ঘন ঘন হাততালি ও ফুল দেওয়ার হিড়িক পড়ে গেল। এইখানেই ইন্‌টারভ্যাল বা বিরতি হলো।

একাতেরিনা আবার গল্প শুরু করলে—এবার আমি জানতে চাইলাম—বুলগারিয়ার খবর। জানতে পারলাম—সে দেশেও অভাব কষ্ট আছে। দই আর আলুসিদ্ধই ওদের প্রধান খাদ্য।

বিরামের পর প্রায় পঞ্চাশটি মেয়ে সেতারের মতো দেখতে কোরিয়ার তারের যন্ত্র 'আরি-না'তে তাদের 'আভিরান' লোক-সঙ্গীতের গৎটি বাজিয়ে শোনালে। চললো পর পর কোরিয়ার দু-তিনটি লোকনৃত্য ও গ্রাম্য নৃত্য। দেখালে শহরের যুবক-যুবতীরা। ভারী সুন্দর ও সহজ তাদের নাচের ভঙ্গী—আর হাত-পায়ের কাজ। পোশাকগুলিও খুব ঢিলেঢালা, ভারতীয় ধরনের। প্রোগ্রামে নাচ-গুলির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা থাকায় আনন্দটা কিছু পরিমাণে উপভোগ করা গেল। কিন্তু সবচেয়ে তাক লাগিয়ে দিলে কোরিয়ার ছেলে-মেয়েরা রুমানিয়ানদের পোশাক পরে এসে রুমানিয়ান লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত পরিবেশন করে!

চারিধার থেকে পাঁচ সাত মিনিট ধ'রে হাততালি পড়তে লাগলো।

সব শেষে কোরিয়ার প্রোগ্রামে ওরা গাইলে বিশ্বযুব সঙ্ঘের সমবেত সঙ্গীতটি। দর্শকরাও অনেকে গাইতে লাগলেন গানটি। প্রোগ্রাম শেষ হলো রাত সাড়ে বারোটায়। ওখানেই অ্যাম্বাসাডার হোটেলে ফেরবার বাস পেয়ে গেলাম। শুতে শুতে রাত একটা বাজলো।

সকাল বেলা ডায়েরীর পাতা ওল্টাতেই নজরে পড়লো পনেরোই আগস্ট!—মনে পড়ে গেল—দেশের কথা। ভারতবর্ষ জুড়ে আজ স্বাধীনতা উৎসবের দিনটি পালিত হবে। পতাকা তুলবে সবাই আজ জায়গায় জায়গায়। রুমানিয়ায় ভারতীয় দূতাবাস থাকলে, সেখানেও পালিত হতো এই দিনটি সগৌরবে। তাও নেই! তবে এই দিনটিতেই রুমানিয়ায় থাকবো জেনেই আমিও তৈরী হয়েই এসেছি' সঙ্গে নিয়ে এসেছি কাপড় এবং কাগজে ছাপা ভারতবর্ষের অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রীয় পতাকা। সেইগুলি আজ বিদেশী বন্ধুদের বুকে পরিয়ে দিয়ে পালন করবো স্বাধীনতা দিবস। এরাও খুশী হবে, আমারও মনটা ভরে উঠবে আনন্দে আর গর্বে।

তাই তাড়াতাড়ি স্নান সেরে—স্বাধীন ভারতের উন্নতি ও কল্যাণ প্রার্থনা করে—সাদা খদ্দরের পোশাকের উপরে তিনরঙা পতাকাটি লাগিয়ে লাউঞ্জে নামলাম। সেখানে চেনা অচেনা বন্ধু বান্ধব যাদের সঙ্গেই দেখা হলো—সকলকে জানালাম ভারতের স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা, পরিয়ে দিলাম প্রত্যেকের বুকে একটি করে ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকার তিনরঙা প্রতীক।

বিদেশী বন্ধুরা সবাই ভারী খুশী! ও'রাও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও উন্নতির শুভেচ্ছা জানালেন। হঠাৎ ওখানেই দেখা হলো রুমানিয়ার সেণ্ট্রাল কমিটি অব ওয়ার্কিং ইয়ুথের অন্যতম সম্পাদক মিঃ পল কর্নিয়ার সঙ্গে। তাঁর বুকেও একটি ছোট পতাকা লাগিয়ে দিলাম। তিনি ছোট্ট পতাকাটির খুব তারিফ করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বললেন আমি যদি রুমানিয়ার সরকারী দপ্তরে গিয়ে রুমানিয়ার মন্ত্রীদের সবাইকে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে পতাকা উপহার দিয়ে আসি, তবে তাঁরাও খুব

খুশী হবেন। আমি বললাম—"এতো অতি সুন্দর প্রস্তাব। আপনি যদি দয়া করে সে ব্যবস্থাটি করে দেন, তাহলে সত্যিই কৃতার্থ হবো। এ ক'দিন এখানে শুধু নাচগান দেখাই হচ্ছে, সরকারী দপ্তর দেখবার সৌভাগ্যই হয়নি।"

মিঃ কর্নিয়া তখনই টেলিফোন করে সরকারী দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে সেখানে আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলাম। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর—সাড়ে আটটা অবধি এলেন এলো না দেখে, মিঃ কর্নিয়া আমাকে আর একটি নতুন দোভাষীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁকেই বলে দিলেন—আমাকে সরকারী দপ্তরে কোথায় কার কাছে নিয়ে যেতে হবে। রওনা হলাম তাঁর সঙ্গে।

গাড়িতে যেতে যেতে জানলাম নতুন দোভাষী মেয়েটির নাম—ম্যারিয়া। ইস্কুলে মাস্টারি করেন। এলেনকে উনি চেনেন না। রুমানিয়ার স্কুল ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে ম্যারিয়ার সঙ্গে আলোচনা হলো। জানলাম রুমানিয়ায় সাত বছর বয়স থেকে স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিকও বটে। তবে বড় বড় শহর ছাড়া *গ্রামাঞ্চলে এখনও চাহিদা মতো সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত যথেষ্ট সংখ্যক Scoala বা স্কুল গড়ে* তোলা সম্ভব হয়নি। বুখারেস্ট শহরে যে সব স্কুল আছে, সেগুলোও বর্তমানে over-crowded। নতুন সব স্কুল বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেগুলো তৈরি হলেই সে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে—এটাও অবশ্য ম্যারিয়া জানালেন। তাঁর কথাগুলো যে বাজে নয়,—এবং সেখানে অসংখ্য স্টেডিয়াম আর থিয়েটার গড়া হলেও এই ক' বছরে সেখানকার গ্রামগুলিতে দরকার মতো স্কুল গড়ার কাজ যে শেষ হয়নি, তার প্রমাণ ২৯।৭।৫৩ তারিখের "Agerpress" বুলেটিনে বলা হয়েছে—

"A great number of schools are being constructed and fitted out in the country-side."

স্কুলের পাঠ্যপুস্তক কিভাবে বাছাই হয়?' কিভাবে প্রকাশিত হয়। সে সম্বন্ধেও দু'চারটে প্রশ্ন করে ম্যারিয়ার কাছ থেকে যেটুকু

জানতে পারলাম, তাতে বুঝলাম সরকার ও পার্টি-মনোনীত একটি শিক্ষা বোর্ডই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, তথা স্কুল কলেজের বই নির্বাচন ও প্রকাশন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং পুরোপুরি সোভিয়েট পদ্ধতিতেই বর্তমানে ছোটদের শিক্ষা দেওয়া হয়। রুমানিয়ান ফ্যাকাল্টি অফ পেডাগগীতে ছোটদের কিভাবে পড়াতে হবে তার জন্য শিক্ষয়িত্রীদের রুশ-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। জানা গেল, প্রাথমিক স্কুলে চার বছর পড়তে হয়। মাধ্যমিক স্কুলে সাত বছর। মাধ্যমিক শিক্ষার পর শতকরা ৭৫ জন ছেলেমেয়েকে বৃত্তিকরী শিক্ষা নিতে—Vocational Schoolএ পাঠানো হয়। এবং ঐ সময়ে ছাত্রদের প্রত্যেককেই কলকারখানায় খাটতে হয়। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা নিতে হয়। মাত্র শতকরা ২৫জনকে উচ্চশিক্ষা বা বিশেষজ্ঞের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ফ্যাকাল্টী ও কলেজে পাঠানো হয়। বিশ্ব যুব উৎসবের জন্য স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় সেগুলো দেখবার সুযোগ পেলাম না ব'লে দুঃখ জানালাম।

আলাপ আলোচনা করতে করতে আমরা পেঁছে গেলাম বৈদেশিক দপ্তরের "প্যালাতুল মিনিস্তারুলুই দে একস্তারনে" বা বৈদেশিক দপ্তরের নতুন বাড়িটার সামনে। সরকারী দপ্তরের ভিতরে বাইরে চারিধারে পুলিশতো রয়েছেই দেখলাম, সৈনিকরাও বন্দুক নিয়ে চারিধারে টহল মারছে। ম্যারিয়া সরকারী দপ্তরের পুলিশ অফিসে গিয়ে আমার পরিচয়-পত্র ও উৎসবের নিমন্ত্রণপত্রটি দেখিয়ে ভিতরে যাওয়ার ছাড়পত্র নিয়ে এলো। বুঝলাম, সাম্যের দেশে সরকারী দপ্তরে আমাদের সরকারী দপ্তরের চেয়ে ঢের বেশী কড়া পাহারা রাখা হয়।

যাক, প্রথমেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার গ্রিগোরে প্রিয়োতিয়াসার (Grigore Preoteasa) কাছে। আমার পরিচয় জেনে তিনি খুব আদর যত্ন করে বসালেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বুকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পতাকা লাগিয়ে দিলাম। তিনি খুব খুশী হয়ে জানতে চাইলেন—রুমানিয়ার উৎসব কেমন উপভোগ করলাম। আমি বললাম—"প্রচুর! অদ্ভুত আপনাদের আতিথেয়তা ও আদর

আপ্যায়নের ব্যবস্থা, সবই একদম যন্ত্রের মত চলছে। রুমানিয়াবাসী-দের আন্তরিকতা ও ভাবপ্রবণতা আমাদের দেশের লোকের মতোই, তাই কটাদিন খুবই আনন্দে কেটেছে। এখানকার রোদ, আলো, হাওয়া মানুষ সবই আমাদের দেশের মতন।"

ভারতবর্ষ ও পণ্ডিত নেহরুর নিরপেক্ষতার নীতি সম্বন্ধেও তিনি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমিও তাঁকে কিছু প্রশ্ন করলাম।

আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তাঁকে ঘুরিয়ে বললাম—"আমার মনে হয়েছে—গোড়ার দিকের এই কয়েকটি বছর আপনারা নতুন রাস্তা, নতুন রেলপথ তৈরী এবং দানিয়ুব ও কৃষ্ণ সাগরের খালকাটা প্রভৃতির মত কাজ ও পরিকল্পনার উপরই বেশী জোর দিয়েছেন। এসব কাজেই দেশের অধিকাংশ বেকারকে লাগিয়েছেন তাদের কাজের সংস্থান করে দিতে। অবিশ্যি এতে কোনও সন্দেহ নেই যে কোনও বিশেষ ধরনের কাজ না-জানা বেকারের সংখ্যা বাড়লে তাদের কাজে লাগানোর এটাই একমাত্র উপায়। তাছাড়া একটা রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের সময়, রাষ্ট্রে যখন কাঁচা মাল ও কলকারখানার পরিমাণটা ঘাটতির দিকেই থাকে—তখন 'সমাজের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়' ব্যবস্থাগুলিকে গড়ে তোলার পক্ষে বাধ্যতামূলক মজদুরীই সহজ পথ, এটুকু নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করেন না?"

মিঃ প্রিয়োতিয়াসা হেসে ঘাড় নাড়লেন। আমার এই কথা-গুলোকে সরাসরি অস্বীকার করে কোনও জবাব দিলেন না। যাক আমি এটুকুতেই যথেষ্ট খুশী হলাম। কারণ এতেই বোঝা গেল বেকার-সমস্যার সমাধানে ওদেশে জবরদস্তির শ্রমে মানুষকে কি কাজে লাগানো হয়েছে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, উদ্বাস্তুদেরও এইভাবে (জোর করে কোনও শ্রমের) কাজে লাগাবার চেষ্টা করলে—তার নিন্দায় ও প্রতিবাদে সবাই মুখর হয়ে ওঠে। অথচ কম্যুনিস্ট দেশ মাত্রেই বেকার-সমস্যা সমাধানের এই হলো মূলনীতি, প্রাথমিক ব্যবস্থা।

মিঃ প্রিয়োতিয়াসা আমাকে পানীয় দিয়ে পরিতৃপ্ত করবার ইচ্ছা

জানালেন। আমি এক গ্লাস অরেঞ্জাদ পান করে তাঁর স্বাস্থ্য কামনা করলাম। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম ঘণ্টাখানেক পরে।

বৈদেশিক দপ্তর থেকে বেরিয়ে ম্যারিয়াকে জানালাম, কৃষিমন্ত্রীর দপ্তরে যেতে চাই। ম্যারিয়া জানালে সেটি আর একটি বাড়িতে। সেখানে রওনা হলাম।

কৃষি-দপ্তরে গিয়ে দেখি সে বাড়িটা পুরানো। আগের কালের প্রাসাদই হবে। সেখানেও পাহারার কড়াকড়ি। দু' তিন জায়গায় আমাদের পরিচয়পত্র ও প্রবেশপত্র তদারক করে তবে ঢুকতে দেওয়া হলো। ভাবলাম কৃষক-মজুরই যে দেশের মালিক সরকার, সে দেশের কৃষিমন্ত্রীর দপ্তরে এত কড়া পাহারা কেন? সাধারণ চাষীরা তাহলে এখানেও অবাধে আসা-যাওয়া করতে পারে না!

ম্যারিয়া খোঁজ খবর নিয়ে জানালে—কৃষি-মন্ত্রী দপ্তরে উপস্থিত নেই। যাই হোক সাধারণ খাদ্যশস্য বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল ক্রেনিচিয়ানু কন্স্তান্তিন (Crainiceanu Constantin) আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁকেও স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাষ্ট্রীয়-পতাকা উপহার দিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি বিভাগ দেখালেন। আর আলাপ করিয়ে দিলেন অ্যাসিস্টাণ্ট ডিরেক্টার জেনারেল "তোমা জর্জে" (Toma Gheorghe) ও Zootachnica বা পশুপালন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল "মিহালি ফ্রান্চিস্ক" (Mihaly Francisc)এর সঙ্গে। দোভাষী মারফৎ ওঁদের সঙ্গে কিছু আলাপ আলোচনা হলো। ওঁরা জানতে চাইলেন —স্বাধীন ভারতবর্ষের কৃষি-ব্যবস্থা, জমিবন্টন সম্বন্ধে নানা কথা। আমি ওঁদের কাছে বিনোবাজীর ভূদানযজ্ঞের এবং জমিদারী প্রথা বিলোপের চেষ্টার কথা বললাম। ওঁরা সে কথা শুনে সকলেই খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। শুধু তাই নয়—মিঃ কনস্তান্তিন এই মন্তব্য করলেন যে, ভারতবর্ষ বিরাট ঐতিহ্যশালী দেশ, তা ছাড়া পণ্ডিত নেহরুও এক বিরাট চিন্তানায়ক, তিনি তাঁর নিরপেক্ষতার নীতিতে ও নিজস্ব চিন্তার পথে নতুন সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন করে—ভারতবর্ষকে যে এক নতুন রূপ দিতে পারবেন, এ বিশ্বাস তাঁদেরও আছে।

কম্যুনিস্ট রুমানিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের মুখ থেকে ভারতবর্ষ ও পণ্ডিত নেহরু সম্বন্ধে এমন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উক্তি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট-প্রতিনিধিদের কয়েকজনকে সঙ্গে এনে এই কথাগুলি শোনাতে পারলে খুশী হতাম।

আমি ও'দের প্রশ্ন করলাম—আপনাদের এখানে "শহরের লোক-সংখ্যা বাড়ছে না কমছে?" ও'রা সহজভাবেই জবাব দিলেন, রুমানিয়ার শহরগুলিতে লোকসংখ্যা বাড়ছে। গ্রাম ছেড়ে লোকে শহরে এসে জুটছে বড় বেশী। আরও জানালেন গত পাঁচ বছরে রুমানিয়ার শহর-গুলিতে জনসংখ্যার হার দাঁড়িয়েছে, গড়ে ৩·৮ মিলিয়ন (৩৮ লক্ষ) থেকে ৫.৫ মিলিয়ন (৫৫ লক্ষ)।

আমি বললাম—"গ্রামের চেয়ে তারা শহরেই রোজগার ও আরাম-আনন্দের সুযোগটা বেশী পাচ্ছে বলেই কি গ্রাম ছেড়ে আসছে?"

ও'রা বললেন—"তাতো বটেই!" (এতেই বোঝা গেল কম্যুনিস্ট দেশেও গ্রাম এখনও পিছনে পড়ে আছে, চাষবাসের কাজে গ্রামের বাসিন্দারা শহরের মানুষদের সমান সুখ-সুবিধা পাচ্ছে না)।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"আচ্ছা সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ও কো-অপারেটিভ ফার্মে ব্যক্তিগত জমির চেয়ে ফসল বেশী ফলে নিশ্চয়ই?"

ও'রা জানালেন—"তা বৈকি!" এই বলে ও'রা আমাকে ১৯৫৩ সালের ২৯শে জুলাই তারিখের "Ager Press" বুলেটিনের ৭-এর পাতায় এই কটি লাইন দেখালেন। ছাপা রয়েছে—

"The state and collective farms have yielded higher crops than the individual peasant holdings. Thus, the state farms have had average yields of 1,700 to 2,500 kgs wheat per hectare and the collective farms of 1,500 to 2,200 kgs wheat per hectare."

অর্থাৎ সরকারী ফার্মে প্রতি হেক্টর বা ৮ বিঘা জমিতে ৪২ থেকে ৬০ মণ গম উৎপাদন হয়। যৌথ চাষের জমিতে তার চেয়ে কম এবং ব্যক্তিগত জমিতে তার চেয়েও কম উৎপন্ন হচ্ছে গম।

এই বিবৃতি থেকে ধরে নেওয়া যায় না কি—ব্যক্তিগত জমির চাষ আবাদে—সরকারী সাহায্য যতখানি দেওয়া হচ্ছে বলে প্রচার করা হচ্ছে, হয় তা দেওয়া হচ্ছে না, নয়তো ব্যক্তিগত জমিতে যারা চাষ করছে, তারা

সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য চাষের ফসলের উৎপাদন কম করে দেখাচ্ছে। এই দুটো অবস্থার কোন একটা সে দেশে নিশ্চয়ই ঘটছে। কৃষি দপ্তরে আলোচনা করতে করতেই বেলা এগারোটা বেজে গেলো। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো—ভারতীয় প্রতিনিধি বন্ধুদের আস্তানাতে যেতে হবে। মণিমেলার যে সব ছবি ও পোস্টার সঙ্গে এনেছিলাম সেগুলি ওদের জিম্মাতেই রয়েছে। ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কৃষিদপ্তর থেকে বেরিয়ে ম্যারিয়া জানতে চাইলেন, আমি আর কোনও মন্ত্রীর দপ্তরে যাব কিনা? আমি বললাম—"অনেক ধন্যবাদ! যেতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু হাতে সময় নেই। বিশেষ কাজে আমাকে একবার ভারতীয় প্রতিনিধিদের আস্তানা—৫৬, স্রাভা পোপভে যেতে হবে! ওখানেই আমাকে নামিয়ে দিয়ে যান।"

স্রাতা পোপভে ভারতীয় বন্ধুদের আস্তানাতে ম্যারিয়া নামিয়ে দিয়ে গেলেন আমাকে। ভারতীয় বন্ধুদের স্বাধীনতা দিবসের শুভকামনা জানালাম। ওখানে প্রশান্ত মুখার্জির কাছ থেকে খবর পেলাম—আগামীকাল বিকালে ছবি ও পোস্টারগুলো ফেরত পাওয়া যাবে। প্রশান্তভায়াই সেগুলি জোগাড় করে রাখবে।

ভারতীয় বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তায় জানতে পারলাম—উৎসবের শেষে ওঁরা কেউ কেউ রাশিয়া ও চীন ঘুরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আমিও ইচ্ছা করলে রাশিয়া ও চীন ঘুরে ওঁদের সঙ্গে দেশে ফিরতে পারি একথাও বন্ধুরা কেউ কেউ জানালেন। আমি বললাম, "গেলে ভালই হতো, কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে যাওয়ার ব্যবস্থা যে আগে থেকেই করে এসেছি।"

শ্রীযুক্ত শাণ্ডিল্য, শ্রীযুক্ত আর কে সিন্‌হা ও ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নেতা বীরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা গেল। ওঁদের সৌজন্য ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার আমি কোনওদিনই ভুলবো না। বীরেন্দ্র সিংহ ভায়া ঐ দুপুর রোদে আমাকে হোটেলের পথে খানিকটা রাস্তা এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

হোটেলে ফিরে এলেনের সঙ্গে দেখা। তার কাছে সরকারী দপ্তরখানায় যাওয়ার কথাটা চেপেই গেলাম। শুধু বললাম—

"ভারতীয় বন্ধুদের আস্তানাতে গিয়েছিলাম—কয়েকটা জরুরী কাজ সারতে।" এলেন বড় বিশেষ কিছু বললে না। খাওয়ার টেবিলে শুধু জানালে, আমি কবে রওনা হতে চাই এবং কোন্ পথে কোথায় যেতে চাই, সেটা আগামীকালই ফেস্টিভ্যাল আপিসে জানাতে হবে এবং সেইমত তাঁরা আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি ওঁকে বললাম—"ভেবে দেখে কাল তোমায় জানাবো।"

খাওয়ার পর এলেনকে বললাম—"পারতো তুমি একবার "Flacara" পত্রিকায় মিঃ ব্যাবোইয়ান্ ডিককে ফোন করে জেনে নিও, আমার পারিশ্রমিকটা কবে পাবো।" এলেন চলে গেলো। জানিয়ে গেলো, সন্ধ্যার পর আবার আসবে।

খাওয়া সেরে ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করলাম। তারপর লেখাপড়ার কাজ নিয়ে বসলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে লেখালেখির কাজ চললো। চারটের সময় ইয়োভান্নী টেলিফোন করলে। বললে—"সময় থাকে তো একবারটি লুসিয়ার ফ্ল্যাটে এসো, আমি ওখানেই যাচ্ছি।"

লুসিয়ার বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখি সেখানে আরও দু'তিনটি অচেনা অজানা পুরুষ ও নারী এসেছেন। কি ব্যাপার! না, ওঁরা আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান, আর চান আমাকে অন্তরের শুভ-কামনা জানাতে। ভারী ভালো লাগলো, ওঁদের এই আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার স্পর্শ। ওঁরা প্রত্যেকেই ওঁদের ফটো ও একটি করে রকমারি উপহার বা ফুলের তোড়া দিলেন। আমি ওঁদের সবাইকে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে ছোট ছোট পতাকা যেগুলি পকেটেই ছিল উপহার দিলাম। ওঁদের মধ্যে সেদিন পল ব'লে একটি যুবকও ছিল। পলের বয়স আঠারো উনিশ। ওর দিদির মুখে আমার কথা শুনে ও ছুটে এসেছে, কারণ সেও ভগবান বিশ্বাস করে।

অন্য সকলেই শুভেচ্ছা ও উপহার বিনিময় করে দু'চার-দশ মিনিটের মধ্যেই চলে গেলো। পল কিন্তু নড়লো না। বুঝলাম আমার সঙ্গে তার কিছু কথা বলবার ইচ্ছা।

আমি রুমানিয়ান ভাষাতে তার সঙ্গে আলাপ করে জানতে

পারলাম, সে বেকার, তার দিদি কারখানায় মজুরের কাজ করে যেটুকু পায় তাতে ভাইবোনে কোনওরকমে খেয়ে পরে বাঁচে। তাই সে সম্প্রতি ঠিক করেছে। Scolile S. F. U. অর্থাৎ যুব-শ্রমিক-বাহিনীতে নাম লিখিয়ে কোনওরকমে তার নিজের জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত কোনও একটা শিক্ষা নেবে। তবে সেখানেও ঢোকা খুব শক্ত।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—এই শ্রমিক বাহিনীতে নাম লেখাতে হলে কি কি যোগ্যতার দরকার হয়। সে ঐ বিষয়ের বিজ্ঞপ্তি ছাপা একটি কাগজ আমার হাতে দিলে। (কাগজটি সঙ্গে এনেছি)

পড়ে দেখলাম এই ব্যবস্থাটি আধা-সামরিক করা হয়—

Director Generala a Rezervelor de Munca বা "ডিরেক্টার জেনারেল অফ ওয়ার্কার্স রিজার্ভ ফোর্স" নামে সরকারী এক বিভাগ থেকে। এই শ্রমিক-বাহিনীতে নাম লিখিয়ে কাজ শিখতে হলে—কি কি দরকার তা কাগজটিতেই লেখা রয়েছে, এইভাবে—

Cei ce inscriu in scolile S. F. U. trebue sa indeplineasca urmatoaree conditi:—

—Sa aiba varsta intre 18-25 ani;

—Sa aiba avizul medical;

—Sa aiba Buletin de identitate;

—Sa aiba situation Militara lamuita.

এর বাঙলা অনুবাদ হচ্ছেঃ—"যাহারা এস-এফ-ইউ শ্রমিক-বাহিনী শিক্ষা ব্যবস্থায় যোগ দিতে চাহে—তাহাদের নিম্নলিখিত সর্তগুলি পূরণ করিতে হইবেঃ—

—তাহাদের বয়স ১৮ হইতে ২৫ বছরের মধ্যে হওয়া চাই।

—তাহাদের শারীরিক যোগ্যতা ও সুস্থতার মেডিক্যাল সার্টিফিকেট থাকা চাই।

—তাহাদের আইডেনটিটি বুলেটিন (কম্যুনিস্ট দেশে প্রত্যেক বয়স্ক মানুষের ফটোসহ পরিচয়পত্র রাখতে হয়) থাকা চাই।

—তাহাদের সৈন্যবাহিনীর প্রাথমিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা থাকা চাই"

পলের কাছ থেকে এই কাগজটি পাওয়ায় মনে হলো কম্যুনিস্ট রুমানিয়ার তরুণদের সুখের জীবনের এমন একটা সার্থক প্রমাণ পাওয়া গেল, যেটির খবর কম্যুনিস্ট দেশের প্রচারপত্রগুলির মারফৎ আমাদের দেশের তরুণদের কাছে এখনও পৌঁছে দেওয়া হয়নি।

পলের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম। পল বিদায় নেওয়ার আগে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল।

সবাই চলে যাওয়ার পর লুসিয়া ও ইয়োভান্নীকে বললাম—"এবার আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করার তাগিদ এসেছে এবং কোনদিক দিয়ে কিভাবে ফিরবো তা কালই জানাতে হবে, তাই লেখক বন্ধুটির পরামর্শ বিশেষ দরকার।" ওরা বললে, "বেশ, আজ রাত্রে যদি একবার আসো সব ঠিক হয়ে যাবে।" ওখানে গল্প করতে করতে চা-খাওয়া গেলো। হোটেলে ফিরলাম সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ।

সন্ধ্যায় স্নান সেরে লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম। বিশিষ্ট অতিথিরাও অনেকেই দেশে ফেরবার আগে পরস্পরের পরিচয়ের চিহ্ন হিসাবে অটোগ্রাফ ও বাণী সংগ্রহ করছেন দেখলাম। আমিও অনেকের খাতায় শুভেচ্ছা ও বাণী লিখে দিলাম। অনেকেই আমার অটোগ্রাফের খাতায় নিজের নিজের ভাষায় ও অক্ষরে শুভেচ্ছা ও প্রীতির বাণী লিখে দিলেন। সত্যিই এ এক অমূল্য-সঞ্চয়।

এলেন এলো সাড়ে আটটায়। ডিনার টেবিলে মিঃ হ্যামার্সক্ল্যাগ ও মিসেস হ্যামার্সক্ল্যাগের সঙ্গে দেখা হলো। ওঁরা জানালেন, ওঁরা আগামী কালই ভিয়েনা রওনা হয়ে যাচ্ছেন। আমি যেন ফেরার পথে অবশ্যই ওঁদের সঙ্গে ভিয়েনাতে কটা দিন কষ্ট করে কাটাই—সে অনুরোধ বারবার জানালেন।

এলেন জানালে, আজ রাত্রে তেমন ভালো কোনও প্রোগ্রামের টিকিট পাওয়া যায়নি। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম—"ভালই

হয়েছে! আমারও শরীর বইছে না। গোছগাছও করতে হবে।"

খাওয়ার পর এলেনের সঙ্গে একটু হাওয়া খেতে গেলাম। খানিক ঘুরে ও বাড়ি চলে গেল ট্রাম ধরে। আমি লুসিয়ার ফ্ল্যাটে গেলাম।

লেখক-বন্ধু ইয়োভান্নী, লুসিয়া ও তার স্বামী সবাই পথ চেয়ে ছিল। লেখক-বন্ধুকে সব কথা জানালাম—উনি পরামর্শ দিলেন—আমি যেন 'বুদাপেস্টে ব্রেক জার্নি করে হাঙ্গারী দেখে ভিয়েনায় ফিরবো' এই কথা জানিয়ে টিকিট চাই। তাহলে এক মাসের মেয়াদী টিকিট পাবো। পোলাণ্ডের ভিসা ও কিছু টাকা তো জোগাড় করাই হয়ে গেছে। রুমানিয়ার মোট যতো লেই যাওয়ার দিন আমার হাতে থাকবে, সেটা দিতে হবে লেখক-বন্ধুকে। তিনি সেগুলোর বদলে হাঙ্গারীর ফোরিণ্ট জোগাড় করে দেবেন আমাকে। আর হাঙ্গারীর সরকারী টুরিস্ট প্রতিষ্ঠান "IBUSZ" অফিসে তাঁর পরিচিত এক বন্ধুর নামে আমার হাতে একটা চিঠি দিয়ে দেবেন। তিনি সেই ফোরিণ্ট দিয়ে বুদাপেস্ট থেকে ওয়ারশ যাবার প্লেনের যাতায়াতী টিকিট কিনে দেবেন ও হাঙ্গারীর কয়েকটা জায়গা দেখবার ব্যবস্থা করে দেবেন। লেখক বন্ধুটি জানালেন, তাঁর চিঠি ও পরিচয়পত্র আমার সঙ্গে থাকলে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গারীতেও কোনও অসুবিধা ঘটবে না। কারণ ওসব দেশেও তাঁর নাম অনেকেই জানেন। তাছাড়া তিনি জানালেন, রুমানিয়ার যেসব পত্র-পত্রিকায় আমার ছবি ও লেখা বেরিয়েছে, তিনি সেগলিও সঙ্গে দিয়ে দেবেন—তাহলে সর্বত্রই আমি রুমানিয়ার মতই খাতির যত্ন পাবো।

লেখক বন্ধুটির কাছ থেকে এমন সব পরামর্শ ও ভরসা পেয়ে মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ওদের সঙ্গে প্রাণ খুলে রাত এগারোটা অবধি গল্প করা গেল। ওখান থেকে ওঠবার সময় লুসিয়া ও ইয়োভান্নী জানালে, কাল রবিবার। ওদের ভারী ইচ্ছে,—কাল ভোরে গির্জায় গিয়ে সবাই আমরা শেষ উপাসনায় মিলিত হই। আমি বললাম—"খুব ভালো কথা!" প্রার্থনায় নিশ্চয়ই যোগ দেবো, জানিয়ে বিদায় নিলাম।

কাল সারারাত ভাল ঘুম হয়নি। অনেক রাত পর্যন্ত ফেরবার পথের ভাবনায় মনটা অস্থির হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। আবার নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, নতুন দেশ! আশা-আনন্দও যেমন, শঙ্কাটাও তেমন কম নয় এই একমতবাদের দেশে। বেসামাল কথা বেটক্করে বললে, বেহিসেবী ভুল চালে চললে পদে পদেই যে বিপদ তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি এই কদিনের প্রবাস-বাসে।

পনেরটা দিন উৎসবের নাচ-গান-হৈ-হল্লার মেরী-গো-রাউণ্ডে চড়িয়ে এ্যাইসা ঘোরান ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল যে, ত্রিশ হাজার অতিথির প্রায় সকলেরই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ঘুরপাক খেতে খেতে যা দেখা যায়, তাকে কি আর দেখা বলে? উৎসবের চরকি থেকে মাঝে মাঝে ফাঁক কাটিয়ে তাই তো আমি পালাতে চেষ্টা করেছি রুমানিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে। নিভৃতে নিরালায় দেখতে চেয়েছি রুমানিয়ার বন-জঙ্গল, নদী, পথ ঘাট। রক্ষে! তাই মাথাটা কম ঘুরেছে। মনে এঁকে নিতে পেরেছি উৎসবের বাইরে রুমানিয়ার স্থির শাশ্বত জীবনের সত্যিকারের ছবি। কিন্তু তেমন করে কি দেখতে পারবো আর আর দেশগুলোকে—পাবো কি এখানকার বন্ধুদের মতো বন্ধু ইউরোপের সব জায়গায়!

এলোমেলো এমন সব ভাবনায় অগোছালো মনটাকে গুছিয়ে এনে ঘুম পাড়াতে বেশ দেরিই হয়ে গেছলো। মানুষটা ঘুমুলেও মনটা ঘুমোয়নি, রকমারি স্বপ্নের ভাঙাগড়া নিয়ে দৌরাত্মিপনা করেছে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে মানুষটাকে জাগিয়ে দিলে। জেগে উঠে দেখলাম পাঁচটা বেজেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে স্নান সেরে সাদা পোশাকটি পরলাম। বেরিয়ে পড়লাম পথে। উৎসবের হুড়োহুড়ি শেষ হয়েছে, অতিথি অভ্যাগত অনেকেই যে যার দেশে ফিরেও গেছেন। অনেকেই ক্লান্ত। তাছাড়া অত ভোরে এখানে বড় কেউ ওঠে না। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে মাথায় ছড়িয়ে পড়ে—সারারাতের ক্লান্তির অবসাদ যেন মুছিয়ে দিলে। আকাশের আঙিনায় লাল

আবির ছড়িয়ে সূর্যদেব তাঁর লালমুখ লুকিয়ে রেখেছেন শহরের ঘর-বাড়িগুলোর আড়ালে।

লুসিয়ার দরজায় পেঁছলাম। গোটা বাড়িটা ঘুমুচ্ছে। ভয়ে ভয়ে কলিং বেলটাকে জাগালাম। ইয়োভান্নী এসে দরজা খুলে দিলে। অবাক কান্ড! লুসিয়ার বদলে ইয়োভান্নী!

সুপ্রভাত জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "এত ভোরে তুমি কি করে এলে?" ইয়োভান্নী জানালে—"কাল রাত্রে বাড়ি যেতে পারিনি। লুসিয়া যেতে দেয়নি। সারা রাত বেচারা ঘুমোয়নি, কেঁদেছে!"

আমি বললাম—"তোমরা বড় ভাবপ্রবণ।"

ঘরে গিয়ে দেখলাম, লুসিয়ার চোখ মুখ লাল, তখনও চোখ জলে ভরা। আমি বললাম—"এই মন নিয়ে তুমি যোগ-সাধনা করবে কি করে লুসিয়া? তুমি নাকি কেঁদেছ কাল সারারাত? কেন?"

লুসিয়া ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে কাঁদতে বললে—"কেঁদেছি ভারতবাসীর মুখ থেকে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ধর্ম ও সাধনার কথা আর শুনতে পাবো না বলে। কেঁদেছি মুক্তির ব্যাকুলতায়! কেঁদেছি ইউরোপের মানুষ তোমাকে বুঝতে পারবে কি পারবে না এই ভেবে।"

আমিও তার কথায় চোখের জল ধরে রাখতে পারলাম না। শুধু বললাম—"লুসিয়া! ভাবনাটা ভগবানের, তোমার আমার নয়—এই বিশ্বাস মনে নিয়ে চোখের জল মুছে ফেলো। ভারতবর্ষের ধর্ম, চরিত্র ও জ্ঞানের যেটুকু পুঁজি আছে সঙ্গে—তাতে কোথাও আমার বন্ধু ও সহায়ের অভাব হবে না। নুতন পরিচিতের মধ্যে চিরপরিচিত চিরপুরাতন বন্ধু ঈশ্বর যে রয়েছেন সে কথা না ভুললে বিদেশের সব জায়গাতেই তোমাদের মতো আপনজন খুঁজে পাবো। এখন ওসব না ভেবে আনন্দে মন ভরিয়ে নাও চলো যাই গির্জাতে।"

ওরা বাথরুমে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে স্নান করে পোশাক বদলে তৈরী হয়ে এলো। তারপর আমরা গেলাম—প্রথম দিন যে মোনাস্ট্রীতে গিয়েছিলাম সেখানেই।

মোমবাতি ও ধূপ জ্বালিয়ে আসনের বদলে নিলিং-কুশন টেনে

নিয়ে বসলাম। খুব ভোরেই গেছলাম, তাই আর কেউ তখনও উপাসনায় যোগ দিতে আসেনি। আমরা তিনজনে মঠের নিভৃত মন্দিরে মন মিলিয়ে প্রার্থনা করলাম—পেলাম অপূর্ব আনন্দ। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের স্তবগানে মনভরা পরিতৃপ্তি। তারপর একে একে বহুলোক ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি উপাসনায় যোগ দিতে এলো। দেখলাম দাঁড়িয়ে, বসে, হাঁটুগেড়ে যার যেমন ইচ্ছে সে তেমন করেই উপাসনা করছে। ভিড় যখন বেড়ে গেলো তখন ইয়োভান্নী বললে—"এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা নিরাপদ নয়, রবিবার ভিড় বড় বেশী হয়। চলো এবার বাড়ি ফেরা যাক।"

গির্জা থেকে লুসিয়ার বাড়িতে ফিরে সবাই আমরা চা ও খাবার খেলাম। কয়েক মিনিট পরেই লুসিয়ার স্বামী এলেন কাগজের একটা প্যাকেটে কি যেন মুড়ে নিয়ে। প্যাকেট খুলে আমার হাতে দিলেন সুন্দর একটি ছবির ফ্রেম। ছবির ফ্রেমটির চারি ধারে ব্রোকেডের উঁচু প্যাডের ওপর জরি ও রঙিন সুতো দিয়ে ফুলপাতার নক্সা করা অদ্ভুত কাজ। বহুকালের পুরানো দামী একটি জিনিস। জানালেন তাঁর বন্ধুত্বের নিদর্শনের প্রীতি-উপহার এটি। আমাকে নিতে হবে।

লুসিয়া জানালে—ঐ ছবির ফ্রেমটিতে আমি যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি রাখি। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর দেওয়া সেই উপহারটি গ্রহণ করলাম (দেশে ফিরে সে ফ্রেমটিতে ঠাকুরের ছবিই রেখেছি—লুসিয়ার অনুরোধমতো)।

গল্প করতে করতে সাড়ে আটটা বাজলো। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ওরা জানালে রাত্রে ওরা সবাই অপেক্ষা করবে আমার জন্যে ওখানেই।

হোটেলে এসে উপরে গেছি—উপহারটি গুছিয়ে রাখতে। তেমন সময় এলেন নীচে থেকে ফোনে সাড়া পাঠিয়ে তাড়া লাগালে। বুঝলাম যাওয়ার ব্যবস্থাটা জানতে এসেছে। তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট নিয়ে নীচে নামলাম। ওকে জানালাম—"আমি বুদাপেস্টে নেমে হাঙ্গারী দেখে ভিয়েনায় যেতে চাই। সেই জন্য আমার চাই এক

মাসের মেয়াদী টিকিট এবং স্লীপিং কোচে রিজার্ভ বার্থ। এটাই তুমি ফেস্টিভ্যাল আফিসে জানিয়ে সেই মতো ব্যবস্থা করো। আগামী-কালই রওনা হতে যাতে পারি তারই চেষ্টা কোরো।"

এরপর আমরা ব্রেকফাস্ট খেতে গেলাম। ব্রেকফাস্ট টেবিলে এলেন চার'শ লেই দিলে। জানালে—"ফ্ল্যাকারা" পত্রিকা সম্মান-দক্ষিণা দিয়েছে। আর বললে—"আজ আর কোথাও বেরিওনা, ঘরেই থেকো, কারণ বুখারেস্ট রেডিও থেকে লোক আসবে তোমার মন্তব্য রেকর্ড করে নিতে। ঘরে থাকলে দরকারমতো প্রেস অফিস থেকে আমিও তোমার সঙ্গে ফোনেই কথা বলে নিতে পারবো।" এলেন চলে গেলো।

দেখলাম লাউঞ্জের ভিড় অনেক হাল্কা। যে কজন অতিথি রয়েছেন, তাঁরাও ব্যস্ত দোভাষীদের সঙ্গে যাওয়ার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত নিয়ে। লাউঞ্জের একপাশে হাঙ্গারীর বন্ধুরা জটলা করছে। ও'দের মধ্যে মিঃ কোভিসী (Kovieci) ছিলেন। তিনি আমার সামনের ঘরে থাকেন। কদিন আগে ভারতবর্ষের কয়েকখানা গ্রামোফোন রেকর্ড ও পুতুল ও'দের উপহার দিয়েছি। তাই ও'রা ভারী খুশী হয়েছেন। তিনি এগিয়ে এসে হাঙ্গারীর আর সব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। জানালেন, ও'রা আজই হাঙ্গারী রওনা হচ্ছেন। হাঙ্গারীর প্রতিনিধিদলের নেতা ইসত্ফান দেনেসের (Istvan Denes) সঙ্গেও আলাপ হলো। তিনি হচ্ছেন হাঙ্গারীর ওয়ার্কিং ইয়ুথ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জানালেন যে, ২০শে আগস্ট বুদাপেস্টে ওখানকার সবচেয়ে বড় স্টেডিয়ামের উদ্বোধন উৎসব হবে, সে উৎসবে আমি যদি যোগ দিই তাহলে ও'রা খুবই খুশী হবেন। উৎসবের আমন্ত্রণপত্র দিলেন। হাঙ্গারী দেখবার ব্যবস্থা বন্দোবস্তে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তাই তিনি সেই সঙ্গে একটি পরিচয়পত্রও দিয়ে দিলেন। মিঃ কোভিসী, মিঃ দেনেস ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা গেল। ধন্যবাদ ও "বোঁ ভয়াজ" (নিরাপদ যাত্রার শুভেচ্ছা) জানিয়ে নিজের কোটরে গেলাম।

বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ টোকা পড়লো। দরজা খুলে দিলাম। দেখলাম মুখচেনা একটি দোভাষী, সঙ্গে দুটি ভদ্রলোক। ও'রা এসেছেন বুখারেস্ট রেডিওর পক্ষ থেকে। জানালেন রুমানিয়া সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ও শুভেচ্ছা রেকর্ড করে নিতে চান।

তৈরী তো ছিলামই, ও'দের অনুসরণ করলাম। নিয়ে গেলেন আমাদের হোটেলেরই আটতলার এক কামরায়। গিয়ে দেখি সেখানেই বাণী রেকর্ড করবার পোর্টেবল যন্ত্রপাতি বসিয়েছেন।

বললাম—"আমি আমার মাতৃভাষা বাঙলাতেই আমার যা কিছু বক্তব্য বলতে চাই।" ও'রা শুনে খুব খুশী। শুধু অনুরোধ করলেন, তার ইংরেজী অনুবাদটা লিখে দিতে—কারণ, ও'রা আবার সেটির থেকে রুমানিয়ান ভাষায় আমার বক্তব্যটি অনুবাদ করে সেটি বাঙলা ভাষার সঙ্গেই শোনাবেন।

পাঁচ মিনিটের ছোট্ট এক বক্তৃতায় রুমানিয়ার সাধারণ মানুষদের অমায়িক অকপট ব্যবহার, আতিথেয়তার মধ্যে বাঙলা দেশের হৃদয়ের সুর পেয়েছি যে তা বললাম। বললাম, রুমানিয়ার মানুষদের চেহারা, আলো, হাওয়া, রোদ, গাছপালার সঙ্গে আমাদের দেশের কোথায় কি ভাবে মিল আছে তারই কথা। রুমানিয়ানদের মতো আমরাও ভাত খাই, তরকারিতে লঙ্কা ও মসলা দিই সেটাও উল্লেখ করলাম। কুটীর-শিল্পের ব্যাপারেও কাঠ ও মাটির ঘট, খেলনা ইত্যাদির নক্সা ও কারু-কার্যের মধ্যে আমাদের দেশের কুটীরশিল্পের ছায়া ও ছবি দেখেছি সেটা বললাম। অর্থাৎ রাজনীতি আর উৎসবের প্রোপাগান্ডার ব্যাপারটাকে এড়িয়ে—ওদের ঘরোয়া জীবনকে যে খুব কাছ থেকে দেখেছি এবং দেখে খুশী হয়েছি, সেই কথাটা জানিয়ে দিলাম।

আমার বক্তৃতার পর তার ইংরেজী অনুবাদটা দেখে তখন দোভাষী মহিলাটি রুমানিয়ান ভাষায় অনুবাদ করে গেলেন। দুটোই পর পর রেকর্ড করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শোনানো হলো। রেডিওর লোকরা খুব খুশী! ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন—"রুমানিয়ার সাধারণ মানুষ আপনার বক্তৃতা শুনে খুব খুশী হবে, খুব তারিফ করবে।

আপনি শুধু উৎসবই দেখেননি, দেখেছেন রুমানিয়ার মানুষ ও তাদের জীবনকে।"

এরপর ও'রা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে চারশো লেই দক্ষিণা চুকিয়ে দিলেন। (লণ্ডনে গিয়ে রুমানিয়ার বন্ধু লুসিয়ার তিনটি চিঠি পাই, তাতে জেনেছিলাম, চলে আসার পর ১৯শে আগস্ট আমার রেকর্ড-করা বক্তৃতা বুখারেস্ট রেডিও থেকে প্রচার করা হয়েছিল।)

রেডিওর বক্তৃতা রেকর্ড-করার হাঙ্গামা চুকিয়ে খেতে বেলা দুটো বেজে গেল। এলেনের কাছ থেকে কোন খবর পাত্তা এলো না, তার দেখাও পেলাম না দুপুরে। লাউঞ্জেই খবর পেলাম আজ বিকালে বিশ্বযুব উৎসবের সমাপ্তি সমাবেশ হবে "28 Martie" (২৮শে মার্চ) স্কোয়ারে। স্তালিন স্কোয়ার থেকে প্রতিনিধিদের শোভাযাত্রা বার হবে। যাবে হোটেলের সামনে দিয়েই। ঠিক করলাম হোটেলের বারান্দা থেকেই শোভাযাত্রা দেখা যাবে।

খাওয়া সেরে শোওয়ার চেষ্টায় ঘরে গেলাম। পরিচারিকা মাদাম পেরেশা আর তার স্বামী হাজির। রবিবার পেরেশার স্বামীর কারখানার কাজে ছুটি, তাই দুজনে গল্প করতে এসেছে। ওদের সঙ্গে গল্প করলাম—ভাঙা ভাঙা রুমানিয়ান ভাষাতেই। ওদের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু খেলনা পুতুল উপহার দিলাম এবং পেরেশাকে বললাম—হোটেলের আর আর পরিচারিকা যাদের ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তেমন কয়েকজনকে ডেকে আনতে। কয়েকজন এলো। ছেলেমেয়েদের দেওয়ার জন্যে তাদেরও কিছু কিছু খেলনা পুতুল ও দশ দশ লেই বখশিস দিলাম। বখশিস পেয়ে ওরা আশিষ কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাতে লাগলো।

বিকেল ছ'টা নাগাদ হোটেলের সামনের রাস্তায় শোভাযাত্রা এসে পৌঁছলো। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা চললো —আগের মতো সেই একই কায়দায়। বাজনা বাদ্যি করে নিশান উড়িয়ে, নেচে গেয়ে পায়ের তালে তাল মিলিয়ে। অতিথি-সাংবাদিকরা বারো তলা হোটেল বাড়ির ওপর নীচের অসংখ্য বারান্দা থেকে ফুল আর কাগজ কুচিয়ে শোভাযাত্রীদের ওপর ছিটোতে লাগলেন।

অসংখ্য কাগজের কুচো শোভাযাত্রীদের মাথায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে সে এক অদ্ভুত দৃশ্যের সৃষ্টি করলে। সকালেই ক্যামেরার ফিল্ম ফুরিয়ে গেছে। তাই শোভাযাত্রীদের কোনও ছবি তুলতে পারলাম না বলে ভারী অস্বস্তি রয়ে গেল। শোভাযাত্রা শেষ হতে হতেই—দিনও শেষ হলো। সন্ধ্যা নেমে এলো।

স্নান করে পোশাক বদলিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম এলেনের জন্যে।—এলেন আর আসে না। আটটার সময় নীচে নামলাম ডিনার খেতে।

খেতে বসেছি এমন সময় এলেন হন্তদন্ত হয়ে হাজির। জানালে শোভাযাত্রার জন্য ট্রাম বাস বন্ধ ছিল। তাই তার আসতে দেরি হয়ে গেল।

আমি বললাম—তাড়াহুড়োর "আর কি আছে? উৎসব তো শেষ এখন বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা কতদূর এগুলো বলো?"

এলেন জানালে—"পরশু রাত্রের গাড়িতে স্লিপিং বার্থ পাওয়া যেতে পারে, তার আগে নয়। সেই ব্যবস্থা করে এসেছি, আপাতত।"

আমি বললাম—"অশেষ ধন্যবাদ! আর নতুন খবর কি বলো? তোমাদের আর কোনও প্রোগ্রাম বা এনগেজমেণ্ট নেই তো?"

এলেন জানালে—"আগামী কাল সকাল এগারোটায় আন্তর্জাতিক উৎসব কমিটির শেষ অধিবেশন বসবে—আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাঘরে। অর্থাৎ প্রেস অফিসেরই এক দিকে। সেখানে তোমার নিমন্ত্রণ আছে—ওখানে যাওয়া দরকার।"

আমি বললাম—"বেশ! যাওয়া যাবে। তুমি ঠিক সময়মতো এসো।"

গল্প করতে করতে খেয়ে উঠতেই সাড়ে নটা বেজে গেলো। খাওয়ার পর এলেনকে বললাম—"চলো তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে বেড়িয়ে আসি।" ইউনিভার্সিটি স্কোয়ার অবধি এলেনকে এগিয়ে দিয়ে ফেরবার পথে লুসিয়ার বাড়িতে গেলাম।

গিয়ে দেখি আসর গুলজার! লুসিয়া, লুসিয়ার স্বামী ইয়োভান্নী, কর্নেলিয়া, নিকোলাই, নিনা, ওরা সবাই জুটেছেন।

অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। লেখক বন্ধুকে দেখতে না পেয়ে ইয়োভান্নীকে জিজ্ঞেস করলাম তাঁর খবর?

ইয়োভান্নী জানালে—"এসে পড়বেন তিনিও—এখন বলো কবে তোমার যাওয়া ঠিক হলো?"

আমি বললাম—"আগামী কাল গাড়িতে জায়গা পাওয়া যাবে না। হয়তো পরশু রাত্রের গাড়িতে।"

আমার যাওয়া একদিন পিছিয়ে গেছে জেনে ওরা সবাই আহ্লাদে আটখানা!

ইয়োভান্নী বললে—"বেশ তাহলে কালকে দুপুরের খাওয়াটা আমার বাড়িতেই। নেমন্তন্ন রইলো।"

লুসিয়া জানালে—"আর রাত্রে আমাদের বাড়িতে খেলে খুব খুশী হবো।"

আমি বললাম—"ধন্যবাদ! তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, তবে সময়মতো এসে জুটতে পারা না-পারাটা নির্ভর করছে সবই আমার বরাতের উপর। তাই পাকা কথা দিতে পারছি না।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই লেখক বন্ধু এসে পড়লেন। তারপর ও'রা সেদিন শুনতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথের কথা, আর কবিতা। ও'দের কাছে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বললাম, কয়েকটা কবিতাও বাঙলাতে আবৃত্তি করে শোনালাম। সেগুলির ভাবার্থ মোটামুটি বুঝিয়ে দিলাম। তাতেই ওরা ভারী খুশী। নিনাও তার স্বরচিত কয়েকটি কবিতা ও তার ব্যাখ্যা শোনালে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্যান্য বন্ধুরা একে একে আমাকে যাত্রাপথের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সবাইকার মুখে এক কথা—"আমাকে ভুলো না, আমাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করো।" সবাই আমার খাতায় নাম ঠিকানা লিখে দিলে—কিন্তু অনুরোধ করলে—"তুমি যেন চিঠি লিখো না, আমরা সময় এবং সুবিধা মতো লিখবো।" (ওরা প্রায় সকলেই চিঠি লিখেছে আমাকে—কিন্তু আমি লিখতে পারিনি, কারণ আমার চিঠিতে ওদের ঠিকানা দেখে—পুলিস ওদের বিপদে ফেলবে) লুসিয়ার স্বামীও বিদায় নিলে।

লুসিয়া, ইয়োভান্নী ও লেখক-বন্ধুর সঙ্গে আমি তারপর আরও

ঘণ্টা দুই গল্প করলাম। লেখক-বন্ধু জানতে চাইলেন "সাধনা" বলতে কি বোঝায়? বিরাট শক্ত প্রশ্ন। ছোটবেলায় মায়ের মুখে "সাধনা"র ব্যাখ্যা যেভাবে শুনেছিলাম, আমি তাকে তাই বললাম। তিনি শুনে অবাক। বললেন, তোমার মায়ের মতো মা পাওয়া খুবই ভাগ্যের কথা। গল্প শেষ করে উঠতে যাচ্ছি—তখন লেখক-বন্ধু আমার হাতে হাঙ্গারীর মুদ্রা তিন হাজার ফোরিণ্টের নোট গুঁজে দিলেন। আমি বললাম—"এত ফোরিণ্টের দাম দেবার মতো রুমানিয়ান লেই তো আমার কাছে নেই। খরচখরচা বাদে হাজার দেড়েক লেই আছে হয়তো।"

লেখক-বন্ধুটি বললেন—"যাওয়ার সময় তোমার কাছে মোট যা লেই থাকবে সেটা দিয়ে যেও, তাহলেই হবে। ঐ লেইগুলোর বদলে রুমানিয়ার বাইরে তোমায় কেউ অন্য দেশের মুদ্রা দেবে না।"

আমি আর কি করি! ফোরিণ্টের নোটগুলো পকেটে পুরে নিলাম। ওদের সঙ্গে কথা রইলো আগামীকাল দুপুরে লুসিয়ার বাড়িতে যাবো, সেখান থেকে লেখক-বন্ধু গাড়ি করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাবেন।

হোটেল অবধি আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন লেখক-বন্ধু। হোটেলের ঘরে এসে মুখ হাত ধুয়ে যখন শুতে গেলাম—রাত তখন দেড়টা!

বিশ্বযুব উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান—বেলা এগারোটায়। তাই সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে শুরু করলাম। তারপর স্নান করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দোভাষী এলেনের দেখা নেই। তার বদলে দেখা দিলে সুভাষিণী এলেনা। ওপাশের জানালা থেকে ও যেন আমাকে কি বলছে। আমিও আমার ঘরের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

জিজ্ঞেস করলে "কবে যাচ্ছেন?" আমি জানালাম—"সম্ভবত আগামী কাল।" এলেনা ইসারা করে জানাল, ও ফোনে কথা বলবে। যথারীতি আমার ঘরের ফোন বেজে উঠলো। এলেনা ফোনে অনুরোধ করলে আজ বিকালে পাঁচটায় সময় আমি যেন হোটেলের দরজায়

অপেক্ষা করি। ওরা কয়েকজন বন্ধু মিলে আজ আমাকে নিয়ে একটু বেড়াতে যেতে চায়, গল্প করতে চায় নিরিবিলিতে বসে।

আমি বললাম—"এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তোমাদের মত অকপট বন্ধুদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে পারলে খুবই খুশী হবো। হোটেলের দরজায় নিশ্চয়ই মিলিত হবো—আর কোনও ঝামেলা বেধে না উঠলে বেড়াতেও যাবো তোমাদের সঙ্গে। এলেনা খুশী হয়ে অনেক ধন্যবাদ জানালে—আর বললে ফ্লোরিকাকেও ও এখুনি এই খবরটা দিয়ে দেবে।

বেলা দশটায় এলেন এলো। ওর সঙ্গে গেলাম প্রেস অফিসে পারহন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকাল্টি ভবনে সভাঘরে। সভা-ঘরটি খুব বড় না হলেও ব্যবস্থা বন্দোবস্ত খুব সুন্দর। দেখলাম মঞ্চের উপর আন্তর্জাতিক উৎসব কমিটির হোমরাচোমরারা সবাই বসে গেছেন। বিভিন্ন দেশের যুব প্রতিনিধি দলের নেতারা, বিশিষ্ট অতিথি ও সাংবাদিকরা সবাই একে একে জুটছেন।

বেলা এগারোটা বাজতেই বিশ্বযুব উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। W. F. D. Y-র চেয়ারম্যান ব্রুনোবারনিনি সভার উদ্বোধন-বক্তৃতা দিলেন। তারপর জেনারেল সেক্রেটারী গত ২রা আগস্ট থেকে ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত বিশ্বযুব উৎসবের মোটামুটি যা হয়েছে, তার দীর্ঘ বিবৃতি পেশ করলেন। আমাদের সবাইকে ছাপানো বিবৃতি দেওয়া হলো।

বিবৃতিতে সমস্ত খবরই মোটামুটি জানানো হলো, শুধু জানানো হলো না, পনেরো দিনব্যাপী এই বিরাট উৎসবে কত টাকা খরচ হলো—আর সে টাকাটা কোথা থেকে কিভাবে এসেছে।

এলেনকে জানালাম, সোভিয়েট রাশিয়া এই উৎসবে কত কোটি রুবল দিয়েছে, আমি এই ব্যাপারটা প্রশ্ন করে জেনে নিতে চাই।

এলেন রীতিমত চটে উঠলো। ও বললে, "যতটুকু জানতে পেরেছ তাতেই খুশী থাকো—এর বেশী জেনে তোমার লাভ কি?"

ওর কথা শুনে আমারও মেজাজ বিগড়ে গেল। কোনও জবাব না দিয়ে ছাপা রিপোর্টের পাতা ওল্টাতে লাগলাম।

রিপোর্টে যেসব খবর পেলাম—তাতে জানা গেল ফ্রান্স থেকে এসেছিল ৩৫০০ প্রতিনিধি, অকম্যুনিষ্ট দেশগলির মধ্যে ওরাই সব-চেয়ে বড় দল। ৫০টি দেশ থেকে এসেছিলেন ৪৮৯ জন সাংবাদিক—তার মধ্যে ৩৩৮ জনই হলেন, পশ্চিম ইউরোপ, আমেরিকার প্রভাবান্বিত দেশ জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ঊনচল্লিশটি অকম্যুনিস্ট দেশের ছোট বড় নানা কম্যুনিস্ট পত্রিকার প্রতিনিধি। খাস কম্যুনিস্ট দেশের সাংবাদিক ছিলেন প্রায় একশো জন। বাকি পাঁচ-সাত জন আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। এর থেকেই বোঝা উচিত বিশ্বযুব উৎসবটা কাদের উদ্যোগে, কি উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

রিপোর্টের সবচেয়ে তাক লাগানো খবর হচ্ছে-উৎসব উপলক্ষে ৯২৪৩৪টি সোনার ব্যাজ, ৫৮৬৬৪টি রুপোর ব্যাজ ও ৪৫৫৯২টি ব্রোঞ্জের ব্যাজ মোট ১৯৬৬৯০টি ব্যাজ উপহার দেওয়া হয়েছে কেবল-মাত্র খেলাধুলার ব্যাপারেই। খেলাধুলায় সোনার ব্যাজের শতকরা ৯৫টি পেয়েছে রাশিয়া ও কম্যুনিষ্ট দেশগুলির খেলোয়াড়রা। এছাড়া অসংখ্য সোনা রুপোর মেডেলও দেওয়া হয়েছে অন্যান্য বিষয়ে। ভারতবর্ষের সেরা গল্প লিখিয়ে হিসেবে 'নব[illegible]' ছদ্মনামধারী পাঞ্জাবী লেখকটি (যিনি প্রতিনিধি দলে আমাদের সঙ্গে ছিলেন)। একটি সোনার মেডেল পেয়েছেন, আর উৎসবের সবসেরা একক নাচিয়ে হিসেবে ঘোষণা করে 'মিস' ইণ্ডিয়াকে (মিসেস ইন্দ্রাণী রহমানকে) একটা সোনার মেডেল দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই দুটো পুরস্কারে ভারতবর্ষের গৌরব সত্যি কতখানি বেড়েছে, তা ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে।

বিভিন্ন ধরণের গান-বাজনা ও নাচের প্রতিযোগিতায় ১১টি বিভাগে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ২৭টি সোনার মেডেল পেয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া, তারপর বুলগেরিয়া ৫টি, রুমানিয়া ৪টি, চেকোশ্লোভাকিয়া ৩টি, চীন ৩টি, হাঙ্গারী ২টি, ভারতবর্ষ ১টি

(ইন্দ্রাণী রহমান)। এছাড়া এই পনেরো দিন ধরে বাকি আর যেসব দেশের যুবক-যুবতীরা অত নাচানাচি করলো তারা কেউই প্রথম পুরস্কারের সোনার মেডেল পায়নি। তার কারণ সোভিয়েট রাশিয়া ও কম্যুনিস্ট দেশ ছাড়া অন্য কোন দেশের সত্যিকারের বড় বড় খেলোয়াড়, নাচিয়ে গাইয়ে বা বাজিয়েরা কেউ ঐ বিশ্বযুব উৎসবে যোগ দেননি না বা তাদের যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণও করা হয়নি। অথচ এই একদলীয় ঘরোয়া পুরস্কার ভাগ বাঁটরার ব্যাপারটাই বিশ্ব প্রতিযোগিতা বলে' জাহির হবে। "সোভিয়েট ও কম্যুনিস্ট দেশ-গুলি খেলাধুলা, নাচগানে, অভিনয়ে জগতের সবসেরা" এই ঢাক পেটাতে পেটাতে বাকি দেশগুলোর হ্যাংলারা নাচতে নাচতে নিজের নিজের দেশে ফিরে যাবে। চমৎকার প্রচার কৌশল। অদ্ভুত ব্যবস্থা! আর আমার মত আমন্ত্রিত অতিথি, সোনার মেডেল যাদের দেওয়া হয়নি, তাদের খাদ্য, পানীয়, রমণীয় উপচার যুগিয়ে লেখা ও বক্তৃতার সম্মান-দক্ষিণা বাবদ শত শত মুদ্রা দিয়ে খুশী করবার ব্যবস্থা যে ছিল, তার প্রমাণ তো আমি নিজেই পেয়েছি। অতএব এসব দেশের তুলনা নেই—একথা বলতেই হবে। (না বলতে পারলেই 'আমেরিকার দালাল'—'মার্কিন ডলার পকেটে পড়েছে' এমন অপবাদ রটান তারাই, যাঁরা ওসব দেশের প্রচার-পুস্তিকা আর সাহিত্য বেচে—সেই পয়সায় এদেশে পার্টি চালান। আর পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে স্বদেশের কুৎসা রটনা করেন, গণতান্ত্রিক ভারত সরকারের উদার নীতির সুযোগ নিয়ে।)

যাক সেক্রেটারীর বিবৃতির পর একজনের পর একজন উঠে যখন শুরু করলেন বিশ্ব-উৎসব, বিশ্ব-প্রতিযোগিতা তথা সোভিয়েট রাশিয়ার জয়গান। তখন একে একে অনেকেই উঠে পড়লেন। আমিও আর বসে থাকতে পারলাম না।

এলেনকে বললাম, "আমি হোটেলে ফিরতে চাই—বেলা হয়ে গেছে। এলেন ব্যাজার হয়েই উঠতে বাধ্য হলো। সভাঘর থেকে বেরিয়ে এলেনকে বললাম—"কাল চলে যাচ্ছি, অথচ আমার বক্তৃতার ইংরেজী নকলটা বারবার তাগিদ দিয়ে আজ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। এটা ভারী আশ্চর্য ব্যাপার।"

এলেন বললে, "ইংরেজী নকল পাওয়া যাবে না। ওটা সাইক্লোস্টাইল করে ছাপা হয়নি; ফরাসী অনুবাদের নকল কয়েকটা পেতে পারো।"

আমি বললাম—"তাই কয়েকটা এনে দিলে খুশী হবো।" এলেন বললে—বেশ তা'হ'লে তুমি একলাই গাড়ি নিয়ে হোটেলে যাও, আমি ওগুলো জোগাড় করে নিয়ে যাচ্ছি।"

(এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, ওঁদের সাইক্লোস্টাইলে ছাপা আমার বক্তৃতার ফরাসী অনুবাদ ও খবরের কাগজের কাটিং কয়েকটা সঙ্গে এনেছিলাম, তাই রক্ষে। তা না হলে হয়েছিল আর কি! কারণ ওঁরা বিশ্বযুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে বইটি পাঠিয়েছেন তাতে আমার বক্তৃতার আসল বক্তব্যের পনেরো আনা বাদ দিয়ে ছেপেছেন W. F. D. Y. সম্পর্কে আমার উদার ও সরল বিশ্বাসের সেই প্রশংসাসূচক উক্তিগুলি—যেগুলি তাঁদের প্রচারকার্যের সহায়ক। আমার ছবিটিও ছেপেছেন পাকিস্থানের প্রতিনিধি ডাঃ হামদানীর বক্তৃতার সঙ্গে। প্রচার-ব্যবস্থায় সাম্যবাদীরা যে কতবড় সুবিধাবাদী ও অসাধু তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঐ রিপোর্ট বইটি। সেটি পেয়ে বিশ্বযুব সঙ্ঘের প্রতি যেটুকু আস্থা জন্মেছিল, তাও হারিয়েছি। তাছাড়া World Federation of Democratic Youth-এ মুখপত্র যেটি এখনও আমি নিয়মিত পাচ্ছি—তাতেও অকম্যুনিস্ট দেশগুলির বিরুদ্ধে উগ্র ও মিথ্যা প্রচারকার্য চালানো হয়। ভারতের কম্যুনিস্ট বন্ধুরা কি রকম মিথ্যা প্রচার করেন—তার একটু নমুনা শিক্ষক ধর্মঘটের ব্যাপারে জেনে রাখুন। ১৯৫৪ সালের জুন মাসের "World Youth" পত্রিকায় লেখা হয়েছে—"A big demonstration of teachers in Calcutta going to see the prime minister of Bengal was stopped by the local police, but they would not leave and sat on the streets for four days. Some of the teachers were oldmen over sixty years of age, but this did not prevent the police from launching an attack in which eight were killed and hundreds arrested.")

(গত বছরের শিক্ষক ধর্মঘটে আটজন মারা গেছেলেন! এমন সব বিকৃত তথ্যও যাঁরা পরিবেশন করেন—সেই বিশ্ব যুব সংগঠনের সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখি কি করে?)

গাড়ি চড়ে হোটেলে ফেরার পথে একাই ফটোর দোকানে গেলাম—কয়েকটা ফিল্ম কিনলাম। ফটোর দোকানের বন্ধুদের জানালাম, কালই রুমানিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তবে কোনও দিন ভুলবো না তাঁদের সুন্দর ব্যবহার ও সহযোগিতার কথা। ওঁরা ভারতবাসীদের সকলকে ওঁদের শুভেচ্ছা জানাবার অনুরোধ জানিয়ে কয়েকটি ফটো উপহার দিলেন।

হোটেলে ফিরলাম বেলা দেড়টায়। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চললাম লুসিয়ার বাড়িতে। ইয়োভান্নী সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন গাড়ি নিয়ে। ওখান থেকে গেলাম লেখক বন্ধুর বাড়িতে।

আমরা সবাই মিলে নিরামিশ রান্না খেলাম—ভাত, মাখন, পনির, আলুভাজা, আলুসেদ্ধ, তরমুজ আর ফলের পায়েস জাতীয় একটা জিনিস।

খাওয়ার পর সোফায় গা এলিয়ে অনেকক্ষণ গল্প চললো। সাড়ে চারটার সময় ওখান থেকে যখন উঠতে চাইলাম—দেখি কি ইয়োভান্নী ফাইবারের তৈরি একটি নতুন সুটকেস এনে হাজির করলে।

আমি বললাম—"এটা কি হবে?" ওরা জানালো—"এখান থেকে কাগজ বই ও অন্যান্য জিনিস নেওয়ার জন্য তুমি একটা সুটকেস্ কিনতে চেয়েছিলে, আমরা তাই এটা তোমাকে উপহার দিলাম। আর সামান্য কিছু উপহার দিলাম তোমার ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীর জন্যে।'

আমি ওদের কান্ড দেখে অবাক! খুবই সঙ্কোচ বোধ করলাম। বললাম, "কেন তোমরা এভাবে এত পয়সা নষ্ট করলে?"

ইয়োভান্নী বললে—"অমন কথা বলো না বিমল। তোমার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী যে আমাদের একান্ত আপনার জন। তাদের কিছুই তো পাঠাতে পারলাম না, ভবিষ্যতে আর কোনও দিন কিছু পাঠাতেও পারবো না। সামান্য উপহারগুলি তুমি নিয়ে যাও।"

এর উপর কোনও কথাই বলতে পারলাম না। শুধু মনে হতে

লাগলো ওদের ঋণ কোনও দিনই শোধ করতো পারবো না। ওরাই আবার গাড়ি করেই হোটেলে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। সুটকেসটা উপরে আমার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে হোটেলের বাইরের দরজায় অপেক্ষা করতে লাগলাম এলেনা আর তার বন্ধুদের জন্যে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে এলেনা আর ফ্লোরিকা হাজির। সঙ্গে তাদের একটি ভদ্রলোক। তিনি চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন। জানতে চাইলেন তিনি যদি আমাদের দলে যোগ দেন, আপত্তি হবে না তো। আমি বললাম, "মোটেই না, বরং খুশী হবো আমরা সবাই!" তারপর ভদ্রলোক জানালেন কিছুটা দূর হেঁটে গিয়ে ট্রাম ধরতে হবে, কারণ তাঁর স্ত্রীও অপেক্ষা করছেন তাঁর আপিসের সামনে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার মতলবেই। ভারী ভালো লাগল আসার আগের দিন রুমানিয়ান আরও-কয়েকটি নতুন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবে, আনন্দ করা যাবে, এই কথা ভেবে। কিন্তু মানুষের মন সন্দিগ্ধ, তাই একটু একটু ভয়ও করতে লাগলো, অচেনা অজানা মানুষগুলির মনের মধ্যে কি না কি মতলব আছে ভেবে।

কিছু দূর হেঁটে গেলাম। একটা দোকানের সামনে ভদ্রলোকের স্ত্রী অপেক্ষা করছিলেন। তিনিও আমাদের দলে যোগ দিলেন। দল বেঁধে ট্রামে চড়লাম, ট্রামে অসম্ভব ভিড়। লোক ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে।

ট্রাম থেকে নেমে বেশ খানিকটা অলিগলি বেয়ে পৌঁছলাম শহর থেকে দূরে শহরতলীর এক পাশে। জানলাম এটাকে 'লেনিন' অঞ্চল বা Rainul Lenin বলে। লক্ষ্য করলাম, এর আগে শহরের যে সব অঞ্চল গাড়িতে যেতে যেতে দেখেছি, সে তুলনায় এ অঞ্চলটা বেশ নোংরা। ঘর বাড়িগুলো পুরানো। দৈন্য ও জীর্ণতার ছাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কনডাক্টেড ট্যুরের পথে দেখানো, আর প্রচার-পুস্তিকার ছাপা নতুন ওয়ার্কার্স, রেসিডেন্সিয়াল ডিস্ট্রিক্টের বিরাট বিরাট ব্যারাকের ছবির সঙ্গে এখানকার ঘরবাড়ির কোনও মিল নেই। কলকাতার চৌরঙ্গীর সঙ্গে বেলেঘাটা উল্টোডিঙির যা

তফাৎ—এখানেও তা নজরে পড়লো। রাস্তার আশে পাশে ফেরিওয়ালা, মুচি ও দরজীরা পুরানো জামা জুতোর দোকান সাজিয়ে বসেছে। শুধু পায়ে, শুধু গায়ে অনেক ছেলেমেয়েই খেলা করছে।

বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করে জানলাম—এ অঞ্চলে তেমন সব পরিবারই থাকে, যারা কল-কারখানায় সাধারণ মজুর ও আপিসের সাধারণ কেরাণী কিংবা ঝাড়ুদার, মালী ইত্যাদির কাজ করে।

ওরা আমাকে Strata Zahari Carcale রাস্তায় একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানেই এঁদের মধ্যে কোনও একটি বন্ধু থাকেন যে তা জানালেন। ছোট ছোট দু'খানা ঘর। আসবাবপত্র বলতে বড় বিশেষ কিছুই নেই, সাদা মাটা একটা কাঠের খাট, টুল জাতীয় গোটা দুই বসবার আসন। কোনও রকমে সবাই মিলে ঠেসাঠেসি করে খাট আর টুলগুলিতে বসা গেল। কালো কফি আর কিছু বিস্কুটও এলো।

চা-বিস্কুট খাওয়ার পর ওরা সবাই রুমানিয়ার নানা জায়গার রকমারী ছবি বার করে তার ওপর রুমানিয়ান ভাষায় শুভেচ্ছা ও প্রীতির বাণী লিখে লিখে আমায় উপহার দিলে। এলেনার ছবিটির পিছনে সে লিখে দিয়েছে—

"Un simbol al prieteniei pentru fina, cand veti fi departe de tara care o'a primit on multa placere. O fica a Romaniei....

এর বাঙলা হচ্ছে—"মধুর বন্ধুত্ব ও সুন্দর দিনগুলির একটি স্মরণ চিহ্ন—এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর যা তোমায় গভীর ভালবাসায় মনে করিয়ে দেবে—একটি রুমানিয়ান বান্ধবীকে।"

আমি বললাম—"বিশ্বযুব উৎসব আমাকে যত না আনন্দ দিয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ পেয়েছি রুমানিয়াবাসী সাধারণ মানুষের গভীর আন্তরিকতার স্পর্শে। রুমানিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার আগের দিনের—এই সন্ধ্যায় তোমরা আমাকে যে আনন্দ দিলে তা কোনওদিন ভুলতে পারবো না।"

ভদ্রলোকটি বললেন—"রুমানিয়ার উৎসব আড়ম্বরের জাঁকজমক আর কনডাক্‌টেড ট্যুরের ভালো দিকটা দেখেই যাতে ফিরে না যান—তাই কষ্ট দিয়ে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি। যা দেখাতে চেয়েছি

তা নিশ্চয়ই দেখেছেন? আপনি রুমানিয়ার সাধারণ মানুষকে কত যে ভালবাসেন তার পরিচয় আমরা পেয়েছি, আপনার ব্যবহারে। আজকের দিনটিও আমাদের কাছে স্মরণীয় দিন, আপনি আমাদের মনে রাখবেন।"

এরপর ওখান থেকে আমরা সবাই উঠলাম। ও'রা একে একে যে যার বাড়ির পথে রওনা হলেন। এলেনা একলাই কেবল আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এগিয়ে দিতে এল ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে আমাকে সেদিন একলা পেয়ে মনের কথা খুলে বললে। জানালে—ও দেশে যুব-ইউনিয়ন, ক্লাব আর পার্টির মধ্যে অবাধ মেলামেশায় যুবক-যুবতীরা কি পরিমাণ ব্যাভিচারী হয়ে উঠেছে। ট্রামে চড়বার আগে সে জলভরা চোখে আমার হাতটির পিঠে একটি চুমো খেলে। আমিও ওকে আদর করে আশীর্বাদ করলাম।

ট্রামে যখন চড়লাম—"তখন আটটা বাজে। সাড়ে আটটায় হোটেলে পে'ছিলাম। দেখি এলেন লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে। আমার বক্তৃতার কয়েকটা ফরাসী অনুবাদের নকল দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"কোথায় যাওয়া হয়েছিল?" জবাব তৈরীই ছিল—বললাম— "আর বলো কেন? ভারতীয় বন্ধুদের ক্যাম্পে গেছলাম—আমার সঙ্গে আনা ছবিগুলো ফিরিয়ে আনতে। সেগুলো আজও পাওয়া গেলো না। ওখানেই খেয়ে এলাম, ওরা ছাড়লে না। তুমি খেয়ে নেবে চলো।"

এলেনের সঙ্গে টেবিলে গিয়ে বসলাম, ও খেয়ে নিলে—আমি খেলাম না। দেখলাম, হোটেলের অতিথির ভিড় অনেক কমে গেছে। "নিউ স্টেটসম্যান"-এর মিঃ নরম্যান ম্যাকেঞ্জী ও অস্ট্রিয়ার সাংবাদিক মিঃ লীবেগ জানালেন, ও'রা আগামী কাল স্লিপিং কোচে জায়গা পেয়েছেন। এলেনকে সে কথা জানালাম, বললাম ও'দের কোচেই যাতে আমার বার্থটা পাই তার ব্যবস্থা করো।

এলেন জানালে—"খুব সম্ভব পাওয়া যাবে তবে কাল আর কোথাও বেরিও না। কারণ তোমাকে আবার নতুন করে অস্ট্রিয়ার ভিসা নিতে হবে বোধ হয়। কখন কোথায় গেলে সেটি পাওয়া

যাবে, টিকিট আনতে কখন যেতে হবে, কালই সব তোমাকে জানাবো।"

এলেনের খাওয়া শেষ হতে তাকে উঠিয়ে দিয়ে এলাম ট্রামে। নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম লুসিয়ার বাড়িতে। সেখানেই রাত্রের খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল।

খাওয়ার টেবিলে খাবার সাজানোই ছিল—আমরা প্রার্থনা করে সবাই খেতে বসলাম। খেতে খেতে ওদের বললাম—এলেনা ফ্লোরিকা ও আর-আর বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার গল্প। দেখালাম ওদের দেওয়া ছবি ও উপহারগুলি।

লুসিয়া মন্তব্য করলে—"সত্যিই তুমি ভাগ্যবান! রুমানিয়ার কত অচেনা অজানা মানুষ তোমাকে বিশ্বাস করেছে, ভালবেসেছে! এদের বিশ্বাস ও ভালবাসার বিনিময়ে রুমানিয়ার মুক্তি ও কল্যাণ প্রার্থনা কোরো।"

খাওয়ার পর অনেক রাত অবধি গল্প হলো। লেখক বন্ধুটি হাঙ্গারী ও পোল্যাণ্ডে তাঁর পরিচিত বন্ধুদের কয়েকজনের ঠিকানা আমার নোটবুকে নিজে হাতে লিখে দিলেন। আর দিয়ে দিলেন কয়েকজনের নামে লেখা কয়েকটা চিঠিতে আমার পরিচয়-পত্র। ঐ প্রসঙ্গে তাঁর বিদেশ ভ্রমণের কথা উঠলো। আমি বললাম, "তুমি তো এ দেশের নাম করা লেখক, রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তি, বই লিখে টাকাও রোজগার করো যথেষ্ট—তুমি পারো না চেষ্টা করে ভারতবর্ষ বেড়িয়ে আসতে?"

উনি জানালেন, "টাকা রোজগার করলেও তা জমানো যায়নি বড় বিশেষ, কারণ এই ক' বছরের মধ্যে দু'বার কারেন্সী ফ্রিজ করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কে যার যা মজুদ ছিল, সবই জলে গেছে। নতুন হারের কারেন্সী ধরা হয়েছে, নতুন নোট ও মুদ্রা চালু করা হয়েছে। তাছাড়া দেশের বাইরে যাওয়ার জন্যে—সরকারের বিশেষ অনুমতি ছাড়া জমানো টাকাকড়িও খরচ করা যায় না। অকমিউনিস্ট দেশে যেতে হলে কেবল পার্টি বা সরকারের প্রতিনিধি হয়ে যাওয়া যায়।"

কমিউনিস্ট দেশের অর্থনীতিক আলোচনায় সেদিন যে সব আলাপ-আলোচনা হলো, তাতে এটুকুই বুঝতে পারলাম যে, প্রজা-সাধারণের মধ্যে সমভাবে জাতীয় সম্পদ বণ্টন করার অজুহাতে প্রজা-সাধারণের সম্পদ ও শক্তি লুণ্ঠন করেছে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল। এইভাবে একদলীয় ও একমতবাদীয় রাজশক্তিকে প্রবল করা হচ্ছে। তারই দাপটে প্রজা-সাধারণকে দাবিয়ে রেখে সোভিয়েট-অনুগত পার্টি ব্যুরোক্রেসী কায়েম হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন প্রভৃতি কোনও কিছুর হিসাবই সংখ্যাগত পরিমাণে না দিয়ে শতকরা হারে কত পারসেণ্ট বেড়েছে তাই দেখানো হয়, যাতে করে প্রজা-সাধারণ বা অন্য দেশের অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা ঐ সব দেশের সংখ্যাগত হিসাব নিয়ে অর্থনীতির সঠিক ব্যবস্থাটা বুঝতে না পারেন। এ ব্যবস্থাটি কমিউনিস্ট দেশগুলির হিসাব-পত্রে সর্বত্রই একরকমভাবে প্রবর্তিত হয়েছে।

কথাপ্রসঙ্গে লেখক বন্ধুটি জানালেন যে, যাঁরা রুমানিয়াকে রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছিলেন সব চেয়ে বেশী তাঁদের মধ্যে পররাস্ট্র মন্ত্রী মিসেস আনা পুকার (Anna Pauker) ও অর্থমন্ত্রী ভাসিলি জি লুকাকে পদচ্যুত ও বন্দী করা হয়েছে। বললেন—এই লুকাই ১৯৪৮ সালে কোমিনফর্মের বৈঠকে মার্শাল টিটোকে ও যুগোশ্লাভিয়াকে কম্যুনিস্ট ব্লক থেকে বার করে দেওয়ার প্রস্তাব আনে। যুগোশ্লাভিয়া বেঁচেছে। টিটোর প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদে যেভাবে জাতীয় সম্পদ বণ্টন এবং রাষ্ট্রশক্তি ও একদলীয় শাসনপ্রথাকে বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা চলছে, তার প্রশংসা করলেন।

রুমানিয়ার সভাপতি পেত্রু গ্রোজা ও মিসেস আনা পুকারের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা গেল। বললেন—"পেত্রু গ্রোজা ছিল রুমানিয়ার মস্ত ধনী ব্যবসায়ী আর কৃষক পার্টির চিরশত্রু। তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েট রাশিয়া নিজেদের স্বার্থে তাকে ঠুঁটো জগন্নাথ খাড়া করেছেন। আনা পুকারই তাকে চালাতো। এখন ক্ষমতা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই লেগেছে মারামারি জেগেছে অবিশ্বাস। আনা পুকার সোভিয়েট রাষ্ট্রে বারো বছর

কাটিয়েছে। দু' রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও সেও পারলে না—সোভিয়েট পীড়ন বরদাস্ত করতে। আনা পুকার সোভিয়েটের স্বরূপ আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে—তাকে চুপি চুপি জেলখানায় পাঠানো হয়েছে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে। কদিন পরেই সে মরবে।

"জানো ঘোষ! আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি—জননী জন্মভূমির সঙ্গে। ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সুখ-সুবিধার জন্যে দেশমাকে করেছি বন্ধুবেশী শত্রুর রক্ষিতা, অঙ্কশায়িনী। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়েছে। উৎসবের রঙ্গমঞ্চের উপরের অভিনয়টা সবাই দেখে যাবে—তুমি জেনে যাও—রঙ্গমঞ্চের নীচে ছাইয়ের তলায় চাপা আগুন জ্বলছে। জ্বলছি আমরা তিলে তিলে—হয়ে উঠেছে ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের মৃত্যু অনিবার্য।"

লেখক-বন্ধুর মুখে রুমানিয়ার রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চের নাটক শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়ে গেল। লুসিয়া আর ইয়োভান্নী তাড়া লাগালে, বললে—"আজ ওঠো! কাল আমরা দুজনে সারাদিন ওখানেই অপেক্ষা করবো। ফাঁক পেলেই এসো!"

হোটেলে ফিরে যখন ঘুমোতে গেলাম তার এক ঘণ্টা আগে তারিখ বদলে গেছে।

সকাল থেকে উঠে সোয়াস্তি নেই। এলেনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কারণ সে শাসিয়ে গেছে, আজ আমার যাওয়ার দিন। টিকিট, ভিসা এইসবের ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই কোথাও যেন না যাই সে না আসা পর্যন্ত।

বারোটা অবধি অপেক্ষা করে বসে রইলাম। এলেন এলো না। চিন্তিত হয়ে পড়লাম। যাই হোক খাওয়ার সময় এলেন হাজির হলো। জানালে তিনটের সময় যেতে হবে অস্ট্রিয়ান দূতাবাসে।

বেলা তিনটেয় অস্ট্রিয়ান দূতাবাসে যেতেই ভিসা মিললো। তারপর ফেস্টিভ্যাল আফিস থেকে টিকিট নিয়ে ফিরতে পাঁচটা বাজলো। স্লিপিং কোচেরই টিকিট পাওয়া গেলো—বুদাপেস্ট পর্যন্ত। ভিয়েনার ব্যবস্থা পরে করা চলবে—ঐ টিকিটেই।

এলেনকে জানালাম, আমার সঙ্গে আনা মণিমেলার ছবিগুলো

ফেরৎ পাইনি, তার সন্ধানে যেতে হবে ভারতীয় প্রতিনিধিদের ক্যাম্পে। ও জানালে ওর অনেক কাজ আছে প্রেস অফিসে। ও যেতে পারবে না আমার সঙ্গে। রাত আটটার সময় হোটেলে আসবে—দশটায় আমাকে নিয়ে স্টেশনে যাবে।

কি আর করি! একটা ট্যাক্সী নিয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদের ক্যাম্পে গেলাম। ওখানে প্রশান্ত ভায়া জানালে—মণিমেলার ফটো-গুলোর কোনো হদিস্ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মণিভাইবোনদের হাতে আঁকা ছবিগুলো ফেরত পাওয়া যাবে স্টেট মিউজিয়মের প্রদর্শনী থেকে।

ভারতীয় বন্ধুদের সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে প্রশান্ত ভায়াকে তুলে নিয়ে সেই ট্যাক্সীতেই গেলাম—মিউজিয়মে। যাওয়া মাত্রই সেখান থেকে হাতেআঁকা ছবিগুলো উদ্ধার হলো। আর ফোটোর খালি বাক্সটাও পাওয়া গেলো; কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও ফটোগুলির হদিস মিললো না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ওখান থেকে ছবিগুলো আর ফটোর খালি বাক্সটা নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। প্রশান্ত ভায়াও সঙ্গে এলো। চিঠি লিখলাম নির্মল বসুকে—ফটোগুলি খুঁজে বার করে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফেরবার অনুরোধ জানিয়ে। ফটোর বাক্সটা তাঁর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। (এইখানে জানিয়ে রাখি বন্ধুবর নির্মল বসুর সহৃদয় সহযোগিতায় 'মণিমেলা'র মূল্যবান ফটোগুলি ফেরৎ পেয়েছি। ছ' মাস পরে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন ফটোগুলি)।

স্নান করে পোশাক পরে একেবারে তৈরী হয়ে নিলাম। তারপর ছুটতে ছুটতে গেলাম লুসিয়ার বাড়িতে—বন্ধুদের সঙ্গে শেষ দেখা করতে। গিয়ে দেখি লুসিয়া আর ইয়োভান্নী দুজনেই কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ লাল করে ফেলেছে, টেবিলের ওপর খাবারেরও পেলট ইত্যাদি সাজানো। জানলাম সকাল থেকে ওরাও না খেয়ে বসে আছে আমার প্রতীক্ষায়! আমি খুব রাগ করলাম। বললাম, "কালই তো তোমাদের বলে গিয়েছিলাম, আজকে আসতেই হয়তো পারবো না; তবু তোমরা এমন ছেলেমানুষী কান্ড করে বসে আছো?" ওরা

দ্‌জনেই কাঁদতে লাগলো—বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলো। আমিও চোখের জল ধরে রাখতে পারলাম না। বললাম—"চলো খেতে বসা যাক্ !"

খেতে বসেছি, তেমন সময় লেখক বন্ধ্‌ এসে হাজির হলো। কেউই খেতে পারলাম না বড় বিশেষ কিছ্‌। ইয়োভান্নী আর ল্‌সিয়া স্টেশনে আমাকে তুলে দিতে যাওয়ার বায়না ধরলে। লেখক বন্ধ্‌ ওদের ব্‌ঝিয়ে বললে—সেটা মোটেই য্‌ক্তিয্‌ক্ত ও নিরাপদ হবে না। আমিও অনেক করে ব্‌ঝিয়ে ওদের ক্ষান্ত করলাম। ওরা সবাই এমন কি লেখক বন্ধ্‌টিও বার বার আমার হাত ধরে জলভরা চোখে বলতে লাগলো—"আমাদের ভুলো না, আমাদের প্রণাম জানিও তোমার গ্‌র্‌ ও সাধ্‌সন্তদের পায়ে। প্রার্থনা কোরো রোজ আমাদের জন্যে।"

আমি বললাম — "তোমরাও করো প্রার্থনা — নিরাপদে যেন ইউরোপের সব দেশ দেখে নিজের দেশে ফিরতে পারি।" তারপর লেখক বন্ধ্‌র হাতে ১৭৫৫ লেইএর নোট দিলাম। বন্ধ্‌টি খ্‌চরো ৫৫ লেই আমাকে দিয়ে বললেন, "এটা সঙ্গে রাখো দরকার হতে পারে। দরকার না হলে দান করে যেও।" উঠতে যাবো তেমন সময় ল্‌সিয়া ও ইয়োভান্নী আমার হাতে একটা চিঠি দিলে—কি ব্যাপার! চিঠিটা ওরা দ্‌জনে মিলে লিখেছে আমার স্ত্রীর কাছে। অন্‌রোধ করলে ওটা যেন আমি তাকে স্‌বিধে মতো পাঠিয়ে দিই।

সময় বেশী ছিল না—পরিবেশটাও বড় কর্‌ণ হয়ে উঠলো। তাই তাড়াতাড়ি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম—কান্নাভরা মন নিয়ে। হোটেলের ঘরে এসে চুপটি করে বসে রইলাম আটটার সময় এলেন এলো। খেতে ডাকলে। আমি জানালাম, "আজ আর আমি কিছ্‌ খাবো না, তুমি খেয়ে নাও, গাড়ি এলেই আমাকে ডেকো।"

দশটার সময় মালপত্তর গ্‌ছিয়ে নিয়ে হোটেলের সকলকে বিদায় জানিয়ে আমরা প্রায় কুড়িজন অতিথি ব্‌খারেস্ট নর্থ স্টেশনে পেশছলাম।

স্টেশনে প্রতিনিধিদের অসম্ভব ভিড়। আসার দিনের মতোই লোকে লোকারণ্য! বাজনাবাদ্যি, ফ্‌ল দেওয়ার হ্‌ড়োহ্‌ড়ি। ভিড়ের

মধ্যে এলেন যে কোথায় হারিয়ে গেল খুঁজে পেলাম না। যাক্‌ ভলাণ্টিয়াররা আমার মালপত্তর সামলে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দিলে। বন্ধুবর লীবেগ আমাকে ডেকে নিয়ে আমার বার্থটা দেখিয়ে দিলেন। দেখা গেলো ওঁদের সঙ্গে এক কোচেই জায়গা পেয়েছি। মালপত্র তুলে ফেললাম, কিন্তু এলেনের আর দেখা পেলাম না।

গাড়ি ছাড়বার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেনা-অচেনা কত বন্ধু এসে ফুল দিলে, বিদায় সম্বর্ধনা জানালে, করমর্দন করলে—এলেন কিন্তু এলো না! রাত ১১টা ১৫ মিনিটে আমাদের ট্রান্স কণ্টিনেণ্টাল এক্সপ্রেস ছাড়লো বুকুরেস্তি গারা নর্দ বা বুখারেস্ট নর্থ স্টেশন থেকে। আমি ছাড়লাম বুখারেস্টের প্রবাস ডেরা। শান্তি ও বন্ধুত্বের ধ্বনি উঠলো নানা ভাষায়। একা ভারতীয় আমি মনে মনে ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ প্রার্থনা করে রওনা হলাম হাঙ্গারীর পথে।

হাঙ্গারী অভিমুখে

বুখারেস্ট থেকে গাড়ি ছাড়ার পর আমরা যে যার কুপে'তে গেলাম। আমার 'কুপে'র নীচের বার্থটাই আমি পেয়েছিলাম। ধব্‌ধবে বিছানা পাতা, গরম কম্বলে ঢাকা। উপরের বার্থে যাঁর জায়গা, তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি হচ্ছেন পশ্চিম জার্মানির ডেমোক্রাটিক সোস্যালিস্ট ট্রেড ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী। নাম তাঁর কার্ল হাইন্‌জ্‌ গের্ৎস (Karl Heinz Gertz)। ওঁর সঙ্গে আলোচনায় বুঝলাম, লোকটির মতবাদের গোঁড়ামি নেই। পশ্চিম জার্মানিতে আমেরিকানদের আধিপত্য ও রুমানিয়াতে রুশ আধিপত্যকে তুল্য-মূল্য চোখেই দেখেন। অর্থাৎ ব্যক্তিটি প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পূজারী। ওঁর সঙ্গে গল্প করছি, তেমন সময় 'ফ্রাঁসোই দ্য জিয়োফ্রে' এসে ঢুকলেন আমাদের কুপেতে। উনি প্যারিতে থাকেন। গত মহাযুদ্ধে ছিলেন বৈমানিক, বর্তমানে সাংবাদিকের কাজ করেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বুখারেস্টেই।

মিঃ লীবেগও এসে জুটলেন। বললেন—"গাড়িটা ঘুরে দেখছি চেনা জানা লোক ক'জন পাই।" আমি বললাম—"আপনাদের দোস্ত-স্যাঙাতের অভাব হবে না, তবে ভারতীয় বলতে আমি একাই।" ওঁরা বললেন—"তাতে কি হয়েছে! আমরা তো আছি, অসুবিধে হবে না।"

এরপর সবাই আমরা কুপে ছেড়ে গাড়ির গলি বেয়ে ঘুরতে বার হলাম। মিঃ নরম্যান ম্যাকেঞ্জীর কুপেতে উঁকি দিতেই তিনি জানালেন—"মিঃ ঘোষ। আপনার দোভাষী মিস্‌ এলেন আপনাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে না পেয়ে আপনার খাবারের প্যাকেট ও জলের বোতলটা আমার জিম্মাতেই রেখে গেছে। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় দুঃখ জানিয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "অশেষ ধন্যবাদ! এলেনকে ও আপনাকে। ওটা থাক আপনার কাছে, দরকারের সময় চেয়ে নেবো।"

বগির পর বগির গলি পার হয়ে চলতে চলতে—দেখলাম বিশ্ব-যুব সম্মেলনের প্রতিনিধি যুবক-যুবতীদের হুড়োহুড়ি, হল্লা। গড়াগড়ি আর জড়াজড়ির পাল্লায় সারা গাড়িতে ফূর্তির বান ডেকেছে। পাছে বানে ভেসে যাই, তাই পালিয়ে এলাম আমার খাবারের প্যাকেট আর জলের বোতলটা সংগ্রহ করে নিয়ে। নিজের 'কুপে'তে ফিরে কূপ-মণ্ডুক হয়ে বসে পড়লাম। ভারতীয় সঙ্গীদের সঙ্গছাড়া হওয়ায় খারাপ লাগতে লাগলো।

গাড়ি থামছে একটার পর একটা স্টেশনে। এত রাত্রেও সব স্টেশনেই প্রায় একদল করে লোক দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের ফুল-দেওয়ার ও বিদায়-সংগীত শোনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দুপুর রাত পর্যন্ত স্টেশনে স্টেশনে দুমদাম্ ব্যাণ্ডের বাদ্য। সাধ্য কি যে ঘুমোই! বাধ্য হয়েই বারে বারে উঠে গিয়ে দাঁড়াই জানলায়। ফুল দেওয়া আর করমর্দনের পালা চললো রাত দুটো পর্যন্ত। তারপর আর পারা গেল না। আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙলো সাড়ে সাতটায়। জানলা দিয়ে দেখলাম গাড়ি চলেছে রুমানিয়ার পার্বত্য অঞ্চল দিয়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে। মুখ ধুতে যাওয়ার পথে দেখলাম, গাড়ির আর সকলের তখন মাঝরাত! সারারাত মাতামাতি ক'রে এ ওর গায়ে কাৎ!

খুব ক্ষিধে পেয়েছিল। মুখ ধুয়ে খাবারের প্যাকেটে যে বিস্কুট ও জ্যাম ছিল তাই নিয়ে প্রথম প্রস্থ ব্রেকফাস্টে বসলাম। বিস্কুট-গুলো বেশ শক্ত! দাঁত দিয়ে ভাঙতে না পেরে হাত দিয়ে ভেঙে খাচ্ছি, তেমন সময় আমাদের বগির কেয়ারটেকার ও টিকিট চেকার এসে 'বুনা জিওয়া' (সুপ্রভাত) জানালেন। আমি ও'কে রুমানিয়ান ভাষায় অভ্যর্থনা করে বসতে অনুরোধ জানালাম। নিরিবিলিতে আমার মুখে রুমানিয়ান কথা শুনে চেকার মশাই ভারি খুশী। কুপের দরজাটা বন্ধ করে আমার গা ঘেঁষে বসলেন। আমার খাবারের প্যাকেটটা থেকে ও'কে কিছু খাবার নিতে অনুরোধ করলাম।

'মুল্তু' 'মুল্তু' (অনেক, অনেক) করে মুঠো ভরে বিস্কুট, আঙুর মুখে পুরতে লাগলেন। বুঝলাম, তিনিও ক্ষুধার্ত।

দুজনে খেতে খেতে সুখ-দুঃখের গল্প হলো। জানা গেল ওঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ে, মাইনে যা পান তাতে কুলোয় না। অভাব কষ্টের দুর্দশাটা কতদূর, তা দেখাবার জন্যে তিনি আমাকে রেলের ইউনিফর্মের নীচের শতছিন্ন ময়লা গেঞ্জীটা দেখালেন। ওঁর হাতে আমি মাত্র কুড়ি লেই-এর নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, বন্ধুত্বের সামান্য উপহার। লোকটি দানের প্রতিদানে আমার কিছু উপকার করতে চাইলে। তাই ওঁর মারফৎ লুসিয়া ও বন্ধুবর সারদা মিত্রকে দুটো জরুরী চিঠি পাঠালাম।

দশটা নাগাদ 'দেব' (Deva) স্টেশনে পেঁছিলাম। ওখানে পাহাড়ের উপরে পুরানো দুর্গ দেখা গেল। 'দেব' বলে এই গ্রামটি খুব পুরোনো এবং এই জায়গাটির সঙ্গে প্রাচীন যুগের গ্রীক দেবদেবীদের অনেক কাহিনী জড়ানো আছে। নামটা নাকি তাই 'দেব'। এই জায়গাটির কথা আমাকে লেখক বন্ধু বলে দিয়েছিলেন।

এরপর আরও ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল। পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প গুজবেই। বারোটার সময় "রাদ্‌বা" "Radva" স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়বার পর, পাহাড়ের পালা শেষ হলো।

গাড়ি চললো সমতল নামো-জমির শহর গ্রাম ডিঙিয়ে। গাড়ির কামরা থেকে মাঠে মাঠে চাষী মেয়েপুরুষদের কাজ করতে দেখলাম। নজরে পড়লো—তাদের জামা কাপড়ের দুর্দশা। চোখ বুজে না থাকলে এগুলো চোখে পড়বেই।

আবার সেই মস্ত স্টেশন 'আরাদ'। সেখানেও খুব নাচগান ফুল-ছোঁড়াছুঁড়ি। গাড়ি থামলো অনেকক্ষণ। যাত্রীরা অনেকেই নামলেন দেখে, আমিও নামলাম। ভারি একটা মজার ব্যাপার দেখলাম। অন্য লাইনে রুমানিয়ার যাত্রীবাহী যে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিল দেখলাম সেটাতে লোক ঠাসাঠাসি। তবুও যে যেখানে পারে চড়ে বসার চেষ্টা করছে। পুলিস রীতিমত তাড়া লাগাচ্ছে। উৎসবের

অতিথি আমরা চলেছি আরাম করে, কিন্তু তার জন্যে ও দেশের লোকদের ট্রেনে চড়া যে দায় হয়ে উঠেছে, সেটা বুঝতে দেরি হলো না।

'আরাদ' থেকে গাড়ি ছেড়ে রুমানিয়ার সীমান্ত স্টেশন কুর্তিচিতে পৌঁছুলো—বেলা একটা পনেরো মিনিটে। সেখানেও প্রায় দু'ঘণ্টা গাড়ি দাঁড়ালো। আমাদের রুমানিয়ার ভিসা কার্ডটা ফিরিয়ে নিলে সীমান্তরক্ষীরা। কয়েক প্যাকেট সিগারেট ও পানীয় পাওয়া গেল। গাড়ি থেকে নেমে চারপাশ ঘুরে বেড়িয়ে কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ বন্ধুত্বও করলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কয়েকজনকে—আমার খাবারের প্যাকেট থেকে কিছু বিস্কুট ও ফল দিলাম। বাকী লেই-গুলো আমার আর কাজে লাগবে না জানিয়ে কয়েকজনকে দিলাম। কেউ নিতে আপত্তি করলেন না। বরং খুশি হয়ে বারবার ধন্যবাদ জানাতে লাগলো।

ওখান থেকে গাড়ি ছাড়বার পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছলাম হাঙ্গারী সীমান্তের "লোকোশ্লাজা" স্টেশনে—সেখানেও আবার পাসপোর্ট ও কাস্টমস চেকিং হলো। আমাদের কেউ বড় বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস করলে না। বাক্স প্যাঁটরাও হাঁটকা-হাঁটকি করলে না। গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাদের খেতে দেওয়া হলো—দুটো করে সিদ্ধ সসেজ, একটা করে মাঝারী পাঁউরুটি আর কালো কফি। নাচ-গানও হলো। ওখান থেকে এসব হাঙ্গামা চুকিয়ে গাড়ি ছাড়তে বাজলো সাড়ে পাঁচটা।

তারপর হাঙ্গারীর 'বেকেস্‌ক্‌সাবা', 'মেজোটুর', 'সোলনক' প্রভৃতি ছোট ছোট কয়েকটা শহরের স্টেশনে গাড়ি বেশ কিছুক্ষণ করে দাঁড়ালো। আমি ঐ করমর্দন, চুমো খাওয়া, জড়াজড়ি, হুড়োহুড়িতে না ভিড়ে, ইংরেজীভাষী দোভাষী খুঁজে নিয়ে—ঐসব শহর সম্বন্ধে অল্পের মধ্যে যতটা পারি খোঁজ খবর সংগ্রহ করে নোট বইতে লিখে নিলাম।

জানতে পারলাম 'বেকেসকসাবা' কাউন্টিতে একটা কাপড়ের কল ও একটা যন্ত্রপাতির কারখানা ও একটা বেকারী তৈরী হচ্ছে। জানা গেল ও আর্ল অব ভেঙ্ক হাইমের প্রাসাদ ও দুর্গটিতে বর্তমানে

একটি সংগীত শিক্ষার কলেজ খোলা হয়েছে। শুনলাম ঐ অঞ্চলে মদাইয়র বা হাঙ্গারীয়ানরা ছাড়া রুমানিয়ান ও শ্লোভাক মাইনরিটিরাও কিছু কিছু বাস করে। স্পষ্ট করে বলতে সাহস না পেলেও—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওরা বললে—'কলকারখানা আরও গড়ে উঠলে ও অঞ্চলের বেকার সমস্যার সমাধান হবে।' অর্থাৎ এখনও বহু লোক বেকার আছে।

হাঙ্গারীর রাজধানী—বুদাপেস্ট স্টেশনে পৌঁছলাম—রাত ন'টায়। গান্ধীটুপি মাথায় জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখছিলাম আমি চারিদিক। টুপি দেখেই গাড়ির সঙ্গে ছুটতে লাগলো একটি মেয়ে। গাড়ি থামতেই মেয়েটি আমার জানলার সামনে এসে প্রশ্ন করলে—"আপনি ভারতবাসী? আপনি মিঃ ঘোষ?"

আমি বললাম—"হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন।" মেয়েটি তাড়াতাড়ি আমার কামরায় উঠে এলো—বললে—"আমি ভারতবর্ষকে খুব ভালবাসি, তাই আমি আপনাকে রিসিভ করার ভার নিয়েছি। আপনি নামুন, আমি আপনার মালপত্র সব নামিয়ে নিচ্ছি।"

গাড়ি থেকে নামলাম। দেখলাম, সহযাত্রীদের মধ্যে মুখচেনা আরও কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ও প্রতিনিধি তাঁদের মালপত্র নিয়ে নেমেছেন। বুঝলাম ওঁরাও হাঙ্গারী দেখবার আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন আমার মতো। মিঃ নরম্যান ম্যাকেঞ্জী আমাকে নামতে দেখে অবাক! ওঁকে জানালাম, হাঙ্গারী ও পোল্যান্ড ঘুরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। বললেন—"ইউ আর লাকী!"

গাড়ি ছেড়ে গেল। ওঁদের বিদায় জানিয়ে, আমি সেই মেয়েটির নির্দেশমত, আরও যাঁরা নেমেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে, স্টেশনের রিসেপশান আপিসে গেলাম। দোভাষী মেয়েটি অনর্গল কথা বলে' ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বার বার যেভাবে ব্যক্ত করতে লাগলো, তাতে বুঝলাম, ওর মনেও জমে আছে ভারতবাসীকে বলবার মতো অনেক কথা।

চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি ভারতবাসীদের কেন এত পছন্দ করো?" ও জানালে—"ভারতবাসীরা ঈশ্বর বিশ্বাসী, ধর্ম-প্রাণ, আর চরিত্রবান বলে।" মেয়েটি জানালে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের

খেলোয়াড়দের অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় হয়েছে—এর আগে যখন তাঁরা বুদাপেস্ট হয়ে বুখারেস্ট যাচ্ছিলেন। ভারতীয় খেলোয়াড়রা তার সঙ্গে যেমন ভদ্র ব্যবহার করেছেন, তেমন ভদ্র ব্যবহার অন্য কোনও দেশের যুবকরা দেখায়নি তার প্রতি। তাই সে ভারতবাসীর দোভাষী হতে অতখানি আগ্রহশীলা। শুধু তাই নয়, মেয়েটি আমাকে বললে—"তুমি আমাদের দলের নেত্রীর কাছে—আমাকেই তোমার দোভাষী হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছাটা জানিয়ো—ভারতবাসীর সঙ্গে থাকতে পেলে আমি যেমন আনন্দ পাই, তেমন আনন্দ পাইনা ইউরোপের লোকের দোভাষী হয়ে।"

মেয়েটির আন্তরিক সরলতা ও প্রীতিমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। মনে হলো, রুমানিয়ার দোভাষী এলেনের সঙ্গে এর কত তফাৎ!

কিছু পরে মিস্ গ্যাবিয়া বলে একটি সুন্দরী যুবতী—তিনি অভ্যর্থনা ব্যবস্থার ব্যবস্থাপিকা—আমার কাছে এলেন। জানতে চাইলেন—আমি হাঙ্গারীতে কদিন থাকতে চাই, কি কি দেখতে চাই, হাঙ্গারীতে ঘোরার খরচ আমি নিজেই বহন করবো কি না ইত্যাদি। ওঁকে সব জানালাম। বললাম খরচ আমিই করবো, আপনারা শুধু ব্যবস্থা করে দিলেই খুশী হবো। ওকে হাঙ্গারীর প্রতিনিধি দলের নেতা ইস্তভান ডোনিসের দেওয়া পরিচয়পত্র, আমন্ত্রণপত্র এবং রুমানিয়ার পত্র-পত্রিকায় আমার যে সব ছবি ও বার্তা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে, তা দেখালাম।

মিস্ গ্যাবিয়া সমস্ত দেখে খুব খুশী হলেন, বললেন, "আপনার যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে ব্যবস্থা করে দিতে পারবো।" ওঁকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম, আর অনুরোধ করলাম,—সেই মেয়েটিকে যদি তিনি আমার দোভাষীরূপে দেন তবে বড়ই বাধিত হবো।

এই প্রস্তাবে মিস্ গ্যাবিয়া হেসে বললেন—"দোভাষীর জন্যে কোনও চিন্তা নেই, ওর চেয়ে সুন্দরী ও যোগ্যতর দোভাষীই আপনাকে দেওয়ার চেষ্টা করবো।"

তারপর মিস্ গ্যাবিয়া অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে আলাপ

আলোচনা করতে গেলেন। তখন মেয়েটি মুখ কাঁচুমাচু করে আমাকে বললে—"মিস্ গ্যাবিয়া আপনার কাজে আমায় পাঠাবে না বলেই মনে হচ্ছে।"

আমি বললাম, "ঐ প্রস্তাব করতে বলেই তো তুমি ও'র মনে খটকা লাগিয়ে দিলে।" কি আর করা যাবে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনের লাগেজ রুমে আমার বড় দুটো সুটকেস জমা করে দিলাম—এয়ার-ট্র্যাভেল ব্যাগে কিছু জামা-কাপড়, দরকারী জিনিসপত্র ভরে নিয়ে।

এরপর আরও ঘণ্টাখানেক ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করতে হলো। নানা কথার পর কথা পাড়লাম "ভগবান মানো না তোমরা নিশ্চয়ই?"

মেয়েটি বললে—"খুব মানি! অনেকেই মানে তবে বলতে ভরসা পায় না।" তারপর চুপি চুপি বললে—"আমার ভগবান সম্বন্ধে জানবার ভারী ইচ্ছে, তাইতো আপনার দোভাষী হতে চাইছিলাম। প্রাণ খুলে দুটো কথা বলতে পারতাম, কিন্তু তা বোধ হয় অদৃষ্টে ঘটবে না। মিস্ গ্যাবিয়া আমায় পাঠাবে না আপনার কাছে।" মেয়েটির আনন্দের জোয়ারে ভাটা পড়লো। ও যেন একেবারে মুষড়ে পড়লো।

ওদিকে ডাক পড়লো—বাসে ওঠবার জন্যে। মিস্ গ্যাবিয়া ও আরও কয়েকটি দোভাষী মেয়ে আমাদের দলের প্রায় কুড়িজনকে সঙ্গে নিয়ে বাসে করে রওনা হলেন বুদাপেস্ট স্টেশন থেকে। রাত তখন এগারোটা।

শহরের চওড়া রাস্তাগুলো আলোয় ঝলমল্ করছে—বুখারেস্টের চেয়ে বুদাপেস্টের রাস্তাগুলো অনেক চওড়া, রাতের বিজলী বাতির বাহার ও বহরটা এ শহরে যেন বেশী! মিস্ গ্যাবিয়া চেঁচিয়ে শোনালেন, হাঙ্গারীর রাজধানী বুদাপেস্ট আসলে—'বুদা' আর 'পেস্ট' এই দু'টো অঞ্চল মিলিয়ে গড়া। শহরের পুব দিকের আধখানা হলো 'বুদা'—দানিয়ুব নদীর ওপারে। আর এখন গাড়ি চলেছে নদীর পশ্চিম পারে 'পেস্ট' অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে।"

দেখতে দেখতে দানিয়ুব নদীর উপর চওড়া নতুন একটা পুল

পার হয়ে বাস পৌঁছুলো 'বুদা' অঞ্চলে। ও অঞ্চলের রাস্তাঘাট উঁচু নিচু এবং ততটা চওড়া নয়। বাস থেকে শহরের ঘরবাড়ির আলো আর উঁচু নিচু রাস্তা দেখেই বোঝা গেল—'বুদা' অঞ্চলটা ছোট ছোট পাহাড়ে উঁচু জমির উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের বাস গিয়ে থামলো একটা রেস্তোরাঁর সামনে। "রোজভিলে" রেস্তোরাঁ। রাত দুপুরে ওখানেই যার যার লটবহর নিয়ে নামবার অনুরোধ জানানো হলো। মালপত্তর নামিয়ে রেস্তোরাঁর একপাশে সেগুলো রেখে কিউ দিলাম রেস্তোরাঁর ওয়াশবেসিন আর টয়লেটের সামনে। বাইশ ঘণ্টা রেল সওয়ারীর ক্লান্তি অবসাদে সবাই আধমরা। একে ঐ গরম, তার ওপর নাওয়া খাওয়া ঠিক মত হয়নি। ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। তাই সবাই হাতমুখ ধোওয়ার কাজটা যথাসম্ভব তৎপরতার সঙ্গেই সংক্ষেপেই সারলেন।

খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসলাম। আমাদের মাঝে দোভাষী মেয়ে ক'টি এমনভাবে ছড়িয়ে বসলেন, যাতে করে জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা বলিয়ে অতিথিরা নিজের নিজের ভাষা-বোলনেওয়ালী দোভাষীটির কাছাকাছি থাকতে পারে।

খাবার এলো সাদা সাপ্টা। পানীয় বলতে মদের নামগন্ধ নেই। মিনারেল ওয়াটার, লেমোনেদ। প্রথমেই লাল টকটকে টমাটোর স্যুপ! এক চুমুক খেতেই মালুম হলো হাঙ্গারীর লোকরা ঝাল দিয়েই ঝোল রাঁধে। তার ওপর বাড়তি লঙ্কার গুঁড়োও যে ছিটোয়, সেটাও বুঝলাম ঝোলে লঙ্কা গুঁড়ো ছিটোনোর বহর দেখে। স্যুপের পরে মোটা চালের ভাত, মাংসের কিমা আর টমাটো কুচি দিয়ে রাঁধা খিচুড়ির মতো একটা পদার্থ এলো—ঝালমসলা দিয়ে রান্না। মন্দ লাগলো না। হু-হা করতে করতে খেয়ে ফেললাম আমি। কিন্তু ফরাসী, জার্মান ও সুইস যে সঙ্গীরা ছিলেন আমার সঙ্গে, তাঁদের অবস্থা কাহিল, সবাই একেবারে নাকের-জলে চোখের-জলে। ভাতের পাশে সবজি-সিদ্ধ ও স্যালাড্ যা দেওয়া হয়েছে তার ভিতরেও তিন জাতের লঙ্কা, ধাড়ি লঙ্কা, ধানি লঙ্কা, আর লাল লঙ্কা, রীতিমত লঙ্কাকান্ড। তবে টমাটো আর আলু সিদ্ধও ছিল,

তাই বেচারাদের প্রাণ বাঁচলো। সবশেষে একটা করে মিষ্টি পিঠে যখন দেওয়া হলো—তখন সবাইয়ের ঠোঁটে হাসি ফুটলো।

কোনও রকমে খাওয়া তো সারা হলো। তারপরে যে যার ব্যাগ স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে বেরোলাম, দোভাষীদের সঙ্গে। মিস্ গ্যাবিয়া ওখান থেকেই বিদায় নিলেন। জানিয়ে গেলেন, কাল সকালে দোভাষীরা আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাবে। দোভাষী মেয়ে ক'টির সঙ্গে আমরা উঁচু-পাহাড়ে রাস্তা ভেঙে বেশ অনেকটা হেঁটে গেলাম। তারপর হাজির হলাম একটা টিলার উপরে অনেকগুলো পাথরের সিঁড়ি বেয়ে—একটা পুরানো প্রাসাদের সামনে। চারিদিক অন্ধকার। ডাকাডাকি করতে ভিতর থেকে একটি লোক আলো জ্বালিয়ে দরজা খুলে দিলে।

বাড়িটির ভিতরে গিয়ে জানতে পারলাম—ওটি আগে কোনও ধনীর প্রাসাদ ছিল, এখন একটা টেকনিক্যাল স্কুলের হোস্টেল হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। হোস্টেলের ছেলেমেয়েরা ছুটিতে বাড়ি গেছে—কেউ সেখানে নেই। তাই তাদের বিছানাগুলি আমাদের দেওয়া হলো। লোহার খাটের ওপর সাদা ধব্ধবে চাদর ঢাকা বিছানা, কম্বল রয়েছে দু'খানা করে। ভাবলাম ঘুমনো যাবে আরাম করে।

দলের মধ্যে আমিই একলা ভারতীয়। অন্য যে সব দেশের যুবক-যুবতী অতিথিরা তারা এক এক দেশের তিনজন চারজন করে রয়েছে, তাই তারা অল্পবিস্তর এক একখানা ঘর দখল করে নিলে। আমি একলা একটা ঘরে গিয়ে বিছানা নিলাম। বাকি তিনটে বিছানা খালিই পড়ে রইল। ভালোই হলো—নিরিবিলিতে একলা থাকতে পারবো।

শোওয়ার আগে গরম জলে বেশ করে স্নান সেরে এলাম বাথরুমে গিয়ে। বুখারেস্টের আম্বাসাডার হোটেলের বাথরুম তো নয়। তাই যেমন নোংরা, তেমনি অগোছালো। তবে তাতেই কাজ চালিয়ে নিতে হলো।

দোভাষী মেয়েগুলি ও দলের অন্যান্য মহিলারা দোতালার ঘরের

বিছানাগুলিতে শুতে গেলেন—শুভরাত্রি জানিয়ে। শুতে না শুতেই ঘুম।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল—সকলের ওঠবার আগেই। বাথরুমে কিউ দেবার ভয়ে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এলাম। প্রার্থনা শেষ করে, সঙ্গের খাবারের প্যাকেটে যে ফল আর বিস্কুটগুলি বাকী ছিল তা খেলাম। বাড়িতে ও আপিসে চিঠি লিখলাম, হাঙ্গারীতে পৌঁছানোর খবর জানিয়ে। দুদিনের ডায়েরীও লিখে শেষ করলাম।

আর সকলের ঘুম ভাঙলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো আগের রাতের সেই রেস্তোরাঁতে। ওখানেই আমাদের ব্রেকফাস্ট খাওয়ানো হলো—কফি, রুটি, মাখন আর জ্যাম! মাছ-মাংসের বালাই ছিল না। তারপর দোভাষীরা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে চললো—বুদা শহরের উঁচু নিচু পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে।

হেঁটে যেতে যেতে দেখলাম—বুদা শহরের বাড়িঘরগুলো বেশির ভাগই পুরানো—গত মহাযুদ্ধের বোমা ও গুলীর ক্ষতচিহ্ন নিয়ে দীর্ণ জীর্ণ বেশে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্বংসাবশেষেরও কিছু কিছু নজরে পড়লো। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর আমরা পৌঁছলাম 'ক্যাসল হিল' পাহাড়ের টিলার উপর। নজরে পড়লো বুদাপেস্টের প্রাচীনকালের রাজাদের প্রাসাদ ও দুর্গ। বুদা শহরের সব চেয়ে উঁচু এই জায়গায় হেঁটে হেঁটে পৌঁছুতে বেশ কষ্টই হলো। তবু দেখা গেল—প্রাচীন হাঙ্গারীর অনেকগুলি নিদর্শন। "Szent Istvan Bazilika Benseje" বা সেণ্ট স্টিফান গির্জা। দোভাষী জানালে খৃীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা মাথিয়াসের অভিষেকের সময় এটি তৈরী হয়েছিল। "Szent Istvan Szoboc" বা সেণ্ট স্তিফানের স্মৃতিস্তম্ভ। কাজ করা সাদা পাথরের বেদীর উপরে ব্রোঞ্জের তৈরী ঘোড়ায়-চড়া সেণ্ট স্টিফানের বর্মাবৃত যোধমূর্তি। দুর্গটির ভিতরে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না।

গির্জার ভিতরে গিয়ে দেখলাম—অদ্ভুত কারুকার্য করা, আর সাজ-সজ্জায় সাজানো এই গির্জা। গির্জার হলে কয়েক শত ছেলে-

বুড়ো মেয়েপুরুষ প্রার্থনায় সমবেত হয়েছে। দাড়িওলা ক্যাথলিক পাদ্রী উপদেশ বর্ষণ করছেন। এত ভিড় যে ঠেলে সেখানে ঢোকা দায়। গির্জা দেখে ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা গিয়ে উঠলাম শ্বেত পাথরে গড়া আর একটি দুর্গ বা টাওয়ারের উপরে—এটিকে বলা হয় Fisherman's Bastion বা জেলেদের দুর্গ। প্রকান্ড জায়গা জুড়ে দানিয়ুব নদীর ধারে পাহাড়ের উপর এমন জায়গায় এটি দাঁড়িয়ে আছে, যে ঐ দুর্গের ছাদ থেকে বুদাপেস্টের অনেকখানি দেখা গেল। দানিয়ুব নদীর উপর সারি সারি অসংখ্য পুল—বুদা ও পেস্ট এই দু অঞ্চলকে যুক্ত করেছে। পুলগুলি চিনিয়ে নাম বলে দিলেন দোভাষী। সবচেয়ে বড় ও নতুন পুলটার নাম "স্তালিন সেতু"। অন্যগুলির নাম "মার্গারেট সেতু", "কোশুথ সেতু" ইত্যাদি। সত্যিই দেখবার মতো দৃশ্য। ঐ পাহাড়ের চুড়ো থেকেই দোভাষীরা আমাদের দেখালে—নদীর ওপারে হাঙ্গারীর বিরাট পার্লামেণ্ট ভবনটি।

এগুলি দেখে আমরা সবাই দল বেঁধে পাহাড়ের নীচে একটা রেস্তোরাঁ ও পানালয়ে গেলাম। সেখানে লেমনেদ মদ ও বীয়ার খেয়ে—যে যার তেষ্টা মেটালে। ওখানে আরও কয়েকজন নতুন দোভাষী মেয়ে এসে আমাদের দলে যোগ দিলে। আমি তখন আমাদের সঙ্গের দোভাষী দলের নেত্রীকে জানালাম যে, আমি একজন সাংবাদিক, কাজেই এইভাবে হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘরবাড়ি আর প্রাসাদ ইত্যাদি দেখলে আমার কাজ চটপট শেষ হবে না। আমার সঙ্গে একজন আলাদা দোভাষী দিলে ট্যাক্সী নিয়ে আমি এখানকার কয়েকটা বিশেষ জায়গা দেখে আসতে পারি, কয়েকটি বিশেষ কাজও সেরে আসতে পারি—কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে। ওঁকে দেখালাম—বুদাপেস্টের যে সব লেখক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামে পরিচয়-পত্র ছিল, তার খামের ঠিকানাগুলি। জানালাম "IBUSZ" টুরিস্ট আপিসে গিয়ে আমি আমার হাঙ্গারী ও পোল্যান্ড বেড়ানোর ব্যবস্থা করে নিতে চাই।

ভদ্রমহিলা কি আর করেন, ম্যারিয়া হাস্‌দু (Maria Hasdu) নামে একটি মেয়েকে দিলেন আমার সঙ্গে। মেয়েটির বয়স পনেরো

ষোলো—আমার মেয়ের বয়সী। ভারী সুন্দর স্বাস্থ্য আর চেহারা মেয়েটির সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছে—ভারী সরল, মেয়েটির বাবাও ওখানকার একজন সাংবাদিক। ম্যারিয়াকে দোভাষী পেয়ে আমি ভারী খুশী হলাম। ও চমৎকার ইংরেজী বলতে পারে।

ম্যারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় খানিকটা হেঁটে গিয়ে আমরা একটা ট্যাক্সী ডেকে নিলাম। ম্যারিয়া বললে—ট্যাক্সী নিলে অনেক খরচ! উপায় কি! ট্যাক্সীতে চেপে ম্যারিয়াকে "IBUSZ" আপিসের সেই ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা দেখালাম। দানিয়ুবের পুল পেরিয়ে আবার আমরা পেস্ট অঞ্চলে পেঁাছে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পথে ম্যারিয়া মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে আমাকে বুদাপেস্ট শহরের ন্যাশনাল মিউজিয়ম ও প্রাচীন অপেরা হাউসের বাড়িটা দেখিয়ে দিলে। বুদাপেস্টের সবচেয়ে লম্বা ও চওড়া রাস্তার উপরেই প্রাচীন অপেরা হাউসের বিরাট বাড়িটা। একদিকটা বোমার ঘায়ে ভেঙে গেছলো—তবে সেটাকে সারিয়ে তুলে সংস্কার করা হয়েছে যে, সেটাও দেখলাম। অপেরা হাউস থেকে একটু দূরেই আরও একটি বড় গির্জা দেখলাম, সেটিরও নাম St. Stephans Cathedral. ম্যারিয়াকে বললাম—ফেরবার পথে সময় থাকলে মিউজিয়ামের আর্ট গ্যালারীটা দেখে যাবো।

বেলা দশটা নাগাদ আমরা পেঁাছলাম—হাঙ্গেরীর টুরিস্ট এজেন্সী "IBUSZ"-এর আপিসে ৬৭নং লেনিন কোরুত-এ (অ্যাভিনিউ)। আমার কার্ডের উপর রুমানিয়ার লেখক বন্ধুর নাম লিখে তাঁর কাছ থেকে আসছি জানিয়ে কার্ডটি পাঠালাম—যথাস্থানে। যাঁর নামে চিঠি ছিল, তিনি স্বয়ং হাজির হলেন—খুব খুশী। বললেন, আমি আসছি যে, সে খবর তিনি লেখক বন্ধুর হাওয়াই ডাকের চিঠিতে আজই জানতে পেরেছেন। ম্যারিয়াকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে, ভিতরে তাঁর নিজের বসবার কামরায় তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন। বললেন—"আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে লাঞ্চ খেতে চলুন, সেখানেই কথাবার্তা হবে।" আমি বললাম—"এতে যদি কোনও বিপদ বা অসুবিধা না

ঘটে তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার দোভাষী —ম্যারিয়া কিছু মনে করবে না তো?"

ভদ্রলোক বললেন, সে ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না—আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। তারপর উনি ম্যারিয়াকে ঘরে ডাকিয়ে নিয়ে হাঙ্গারীয়ান ভাষায় কি যে সব বললেন, কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে, ম্যারিয়া যেন আগের চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে আমার করমর্দন করে বিদায় নিলে। বললে— "আমার বাবাকে বলবো আপনার কথা, তিনিও হয়তো খুশী হবেন আপনার মতো গুণী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করে।"

ম্যারিয়াকে বিদায় দিয়ে "মিঃ বি" (পুরো নামটা বলা চলবে না) আপিসের গাড়ি করে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আপিস থেকে বেশ দূরে তাঁর বাড়িটা যেখানে সেখানে নতুন ঘরবাড়ি গড়ে উঠছে। জায়গাটা বুদাপেস্টের ৪নং ডিস্ট্রিক্টে এইটুকু শুধু জানালেন।

মিঃ 'বি'র বাড়িতে পেঁছতেই তাঁর স্ত্রী ও দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমার অদ্ভুত পোশাক ও টুপি দেখে অবাক! মিসেস্ 'বি'ও চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন। তিনি খুব খুশী হয়ে করমর্দন করে জানালেন,—"আপনি আসছেন শুনে অবধি আমরা সবাই চঞ্চল হয়ে আছি। আমার ছেলেমেয়েদের তো কৌতুহলের অন্ত নেই।" দেখলাম ছেলেমেয়ে দুটি খুবই সপ্রতিভ। ওরা দুজনে আমার দুটি হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বসালো ওদের ড্রয়িং-কাম্ ডাইনিং রুমে।

মিসেস 'বি' তাড়াতাড়ি এক গেলাস লেবুর সরবৎ এনে দিলেন। তারপর ওঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বুখারেস্টের বিশ্বযুব উৎসব কেমন দেখলাম। লেখক বন্ধু ও তাঁর স্ত্রীকে কেমন লাগলো ইত্যাদি নানা কথা। মন খুলে ওঁদের কাছে সব কথাই বললাম, ওরাও বললেন খোলাখুলি অনেক কথা।

ওঁদের সঙ্গে হাঙ্গারীর রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল যে, ১৯৫৩ সালের ১৭ই মে হাঙ্গারীর নতুন পার্লামেন্টের নির্বাচন হয় এবং ৩রা জুলাই পার্লামেন্টের নব-

নির্বাচিত সদস্যরা মিলিত হয়ে হাঙ্গারীর প্রে[illegible]ন্টস কাউন্সিল ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নির্বাচন করেছেন। হাঙ্গারীর নতুন মন্ত্রিসভার সভাপতি বা প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন—ইমরে নদ্যাই (Imre Nagy), তিনি পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনে নতুন গবর্নমেন্টের যে সমস্ত কার্যসূচী উপস্থিত করেন, সে সম্বন্ধে ওঁরা আমাকে কিছু কাগজপত্রও দেখালেন। তাতে দেখলাম বলা হয়েছে,—

"The policy of the Government is designed to make a steady improvement in the standard of living of the population. A whole series of measures will be passed which will increase the peoples purchasing power as regar[illegible] foodstuffs and manufactured articles."

এ ছাড়া নতুন গবর্নমেন্টের পক্ষ থেকে নতুন প্রধান মন্ত্রী বলছেন,— "The Government's economic programmes will also make far-reaching provisions to improve living conditions in rural areas. It will help the working peasantry by granting sowing-seed loans, providing them with machinery, fertilizers etc. It [illegible]ll further see to it that vill[illegible] receive [illegible]le supplies of a wide range of goods, improve [illegible]d enlarge village schools, and make many other provisions."

নতুন মন্ত্রিসভার এই ঘোষণা পড়েই বোঝা গেল যে, সাত-আট বছরের কম্যুনিস্ট শাসন পদ্ধতিতে এখনও ওদেশের মানুষের জীবন-যাত্রার মান ও কেনা-কাটা করার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলে ততটা সুখের দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, যতটা সুখের রাজ্য হিসাবে বাইরের আর পাঁচটা দেশে প্রচার করা হয়। ওদেশের মানুষ খাবার-দাবারের জিনিসগুলো পর্যন্ত দরকারমতো কিনে উঠতে পারে না যে, এটাও বোঝা যায় না কি? তাছাড়া ঐ ঘোষণা থেকেই জানা যায় যে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান, এদেশের মতোই ঐ সাম্যের দেশেও এখনও পিছনে পড়ে আছে। সাত আট বছরেও ঘোচেনি

সেখানে চাষীদের বীজ এবং সার পাওয়ার অসুবিধা ও কষ্ট। গ্রামের দোকানে এখনও সে দেশে জুগিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি রকমারী জিনিস। গ্রামের স্কুল পাঠশালা এখনও সেখানে তেমন করে উন্নত করে তোলা হয়নি যে এটাই কি প্রমাণিত হয় না—নতুন প্রধান মন্ত্রীর ১৯৫৩ সালের এই বিবৃতি থেকে?

ওঁদের দেওয়া কাগজপত্রগুলোতে চোখ বুলোতেই মোটামুটি ওদেশের সব খবর পাওয়া গেল। তবু কথা প্রসঙ্গে জানতে চাইলাম, "মন্ত্রিসভার রদ-বদলই বা কেন হলো? আর নতুন করে এসব ঘোষণা করার প্রয়োজনটাই বা কেন পড়লো?" ওঁরা জানালেন,—স্তালিনের নীতিতে পরিচালিত হাঙ্গারীর পুরানো গবর্ণমেণ্টের স্বৈরাচারে দেশের মধ্যে চাপা-বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল। সে বিদ্রোহকে দমন করার জন্য প্রজা সাধারণের দুঃখ কষ্টের লাঘব করার চেষ্টা না করে স্বৈরাচারী পার্টি ও সরকার জোর-জবরদস্তি করে মানুষকে খাটিয়ে উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করেছে, কারণ অকারণে হাজার হাজার লোককে জেলে ও কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছে। তাতে বিশেষ সুফল ফলেনি—সোভিয়েট অধীনতার গোলামীতে মানুষ ক্ষেপে উঠেছে, পার্টিতেও ভাঙন ধরেছে। শহরের কল-কারখানার মজুর ও স্ট্যাখানোভাইটদের নিয়ে বাড়াবাড়ির ঘটা দেখে চাষীরা ক্ষেপে উঠেছে। যাক্ স্তালিনের মৃত্যুতে ম্যালেনকফ সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক হওয়ায় তিনি সোভিয়েট তাঁবেদার দেশগুলি সম্বন্ধে আগের স্তালিনী পদ্ধতির কঠোর শোষণ ও শাসন-নীতিকে অনেকখানি শিথিল করে আনছেন। চাইছেন এসব দেশের বিদ্রোহের আগুনে ছাই-চাপা দিতে।

সোভিয়েট রাশিয়া এই ক'বছরে শহরে শহরে বড় বড় কলকার-খানা বসিয়ে যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে মুষ্টিমেয় লোককে খুশি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও শক্তি বৃদ্ধি করারই যে চেষ্টা করেছে, সেটা আজ আর কারুর বুঝতে বাকি নেই। তলে তলে এসব দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। তাই নতুন মন্ত্রিসভা গড়া হচ্ছে। 'শান্তি'র ধুয়ো তুলে এসব দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আমদানী করা হচ্ছে—অকম্যুনিস্ট সব দেশ থেকে 'কম্যুনিজমের' অনুরাগী বন্ধুদের।

শান্তি সম্মেলন, যুব-সম্মেলন, নারী-সম্মেলনে বিদেশীদের আমন্ত্রণ করে এনে তাদের মুখ দিয়ে সোভিয়েট স্তুতি গাইয়ে এসব দেশকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টাটা তাইতো ইদানীং এতো প্রবল হয়েছে।" আমি ওঁদের কথাবার্তা শুনে অবাক!

জিজ্ঞেস করলাম, "নতুন গবর্ণমেণ্ট আগের দমননীতিকে কি কিছুটা শিথিল করবেন বলে আপনাদের মনে হয়?" ওঁরা নতুন প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতার একটি জায়গা দেখিয়ে দিলেন—সেখানে বলা হয়েছে:—

"One of the essential aims of the Government's domestic policy is the further strengthening of law and order. A Bill will be placed before parliament for the release of all those who committed crimes of a not too serious nature and whose release will not endanger the security of the State or public."

মন্ত্রীর বিবৃতিটি পড়লে বুঝতে বাকি থাকে [illegible] যে, এর আগে গবর্ণমেণ্ট এর আগে বহুলোককেই লঘু পাপে [illegible]দণ্ড দিয়ে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন; নতুন গবর্ণমেণ্ট তাদের [illegible]ড়ে দেওয়ার উদারতা দেখাচ্ছেন—এই সর্তটি জুড়ে দিয়ে যে "য[illegible] মুক্তি রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা ও শান্তিকে বিঘ্নিত [illegible]ব না, তাদের মুক্তি দেওয়া হবে।" অবশ্য এই বিচারটি করবেন সে দেশের একদলীয় গবর্ণমেণ্ট ও পুলিশ, সেটা মনে রাখলেই সব গোল মিটে যাবে। (উপরে হাঙ্গারীর নতুন গবর্ণমেণ্টের যে বিবৃতিগুলি উদ্ধৃত করলাম তা "Hungary" নামে ইংরাজী মাসিক পত্রের ১৯৫৩ সালের জুলাই সংখ্যাতেও প্রকাশিত হয়েছে। ঐ পত্রিকাটি এবং ঐ দেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক তথ্যসম্বলিত আরও যে সমস্ত কাগজপত্র তাঁরা আমাকে দেন, সেগুলি সঙ্গে এনেছি, প্রয়োজন হলে ব্যবহার করবো)।

ঘণ্টা দুয়েক এইসব রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনাতেই কাটলো। তারপর খাওয়ার ডাক পড়লো। খাবার টেবিলে মিসেস 'বি' নিজেই খাবার সাজিয়ে দিলেন। ছেলেমেয়ে দুটি আগেই রান্নাঘরে খেয়ে নিয়েছিল। আমরা তিনজন খেতে বসলাম। প্রথমই লঙ্কা আর

টমাটোর লাল সুপ, তারপর লঙ্কার গুঁড়ো আর মশলা দিয়ে রান্না মাংসের কিমা ও ভাতের পুর পেটে ঠাসা বড় বড় লঙ্কার দোর্মা। হাঙ্গারীর ভাষায় এ খাবারটাকে বলে 'গুলিয়াস' (Gulyas) সেই সঙ্গে ভিনিগারে ভেজানো লঙ্কার আচার, আর সবশেষে ভুট্টার গুঁড়ো দিয়ে তৈরী হালুয়ার মতো একটা মিষ্টান্ন। মোটকথা খাবার কটা ভারতীয় জিভের উগ্র স্বাদের পরিতৃপ্তি ঘটাবার মতোই।

খাওয়ার পর মিঃ 'বি' ও মিসেস 'বি' আমাকে ওঁদের নতুন সরকারী ফ্ল্যাটের দু' কামরার ঘর-সংসার দেখালেন। অল্পের মধ্যে বেশ সাজানো গোছানো। সংসারটি দেখেই বুঝলাম যে, ঘরের গৃহিণী পাকা লোক। বসলাম এসে আবার আগের সেই ঘরেই। কাজের কথা শুরু হলো অর্থাৎ আমার হাঙ্গারী ও পোল্যান্ড বেড়ানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা। টাকা পয়সা অঙ্ক কষে হিসেব খতিয়ে মিঃ 'বি' আমার কোথায় কি কি মোটামুটি দেখা সম্ভব তা বাৎলিয়ে দিলেন।

আমি ওঁকে আমার পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদি দিলাম এবং লেখক বন্ধুর দেওয়া আড়াই হাজার ফোরিণ্ট গুণে দিয়ে বললাম আপনি এই ফোরিণ্টগুলো দিয়ে আমার পোল্যান্ড যাওয়ার প্লেনের টিকিট কিনবেন ও হাঙ্গারী বেড়ানোর যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে দিলে খুশি হবো। উনি বললেন, "আপনার হাতে খরচের জন্য কিছু 'ফোরিণ্ট' সঙ্গে রাখুন। বাকীটা দিয়ে আমি যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে দেবো।" আমি জানালাম—"কিছু ফোরিণ্ট সঙ্গে রেখেছি।" উনি জানালেন, তিনটার সময় বুদাপেস্টের "পিপলস্ স্টেডিয়ামের" উদ্বোধন অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে, কাজেই উঠতে হয়। ঠিক হলো মিসেস 'বি' আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন সেখানে। উনি আপিস হয়ে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন স্টেডিয়ামেই।

দুটো নাগাদ আমি আর 'মিসেস বি' রওনা হলাম, তাঁর আপিসের গাড়িতেই। বুদাপেস্টের স্টেডিয়ামের কাছাকাছি যেতেও দেখি বুখারেস্টের উৎসবের প্রথম দিনের মতোই পথে ঘাটে অসম্ভব ভিড়! কোনও রকমে ভিড় ঠেলে হাজির হলাম আমরা স্টেডিয়ামের উপরে।

উঃ সত্যিই কি বিরাট স্টেডিয়াম! তবে বুখারেস্টের '২৩শে আগস্ট স্টেডিয়ামের চেয়ে যেন ছোট বলেই মনে হলো।

তাছাড়া এটির গঠন-কৌশলটাও একটু অ... ...ণের বলেই মনে হলো। জানা গেল হাঙ্গারীর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী এটি তৈরী হয়েছে চার বছর ধরে—সাতাশ হেক্টার বা দুশো কুড়ি বিঘা জায়গা জুড়ে। প্রতি শনি ও রবিবার ছুটির দিনে হাজার হাজার যুবক যুবতীকে দলের নির্দেশে ভলাণ্টিয়ার হয়ে বেগার খাটতে হয়েছে মিস্ত্রী মজুরদের সঙ্গে, এটিকে গড়ে তুলতে। এমন কথা বুখারেস্টেও শুনেছি, হাঙ্গারীতেও শুনলাম। এতেই বুঝলাম কমিউনিস্টদের নীতিই হলো—কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে যুবক ও জনসাধারণকে রাষ্ট্র ও দেশের কল্যাণে জোর করে খাটানো আর অ-কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র গড়ে তোলার কু-মতলবে যুবক ও জনসাধারণকে কাজ থেকে হটানো, ধর্মঘট ও গোলমাল ঘটানো।

২০শে আগস্ট হাঙ্গারীর কনস্টিটিউশন দিবসের স্মরণীয় উৎসব উপলক্ষে সেই স্টেডিয়ামেরই উদ্বোধন হচ্ছে। তাই প্রায় লক্ষ দর্শক জমা হয়েছে স্টেডিয়ামের গ্যালারী ও আশেপাশে। জানতে পারলাম মোট তিপান্ন হাজার লোকের বসবার জায়গা ও পঁচিশ হাজার লোকের দাঁড়াবার মতো জায়গা হয়েছে এই স্টেডিয়ামে।

বুখারেস্টের যুব উৎসবের মতোই নানা রঙের পতাকা ... নানা রঙের পোশাক পরা হাঙ্গারীয়ান যুবক যুবতীদের শো...যাত্রা বাজনা বাদ্যি পতাকা উত্তোলন, পায়রা ওড়ানো ইত্যাদি দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হলো। রঙচঙে পোশাক পরা হাজার হাজার যুবক যুবতীর সমবেত ব্যায়ামগুলি সত্যিই দেখবার মতো। এছাড়া হাই-জাম্প, দৌড় ইত্যাদির বাজিতেও নরওয়ে, হাঙ্গারী ও সোভিয়েট রুশিয়ার নামকরা কয়েকজন চ্যাম্পিয়ন তাঁদের বাহাদুরী দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন। ওখানে আবার দেখতে পেলাম, রাশিয়ার দৌড়বাজ জোসেফ কোভাকস, বর্শা-নিক্ষেপকারিণী চিউডিনা, লিটুয়েভ জেসজেনিস্কি প্রভৃতি বিখ্যাত খেলোয়াড়দের। বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল দল বুদাপেস্ট হনভেড ও মস্কোর "মস্কো স্পার্টাক" দলের মধ্যে খানিকক্ষণ ফুটবল খেলাও দেখানো হলো।

ট্রিবিউনে হাঙ্গারী ও অন্যান্য দেশের বিশিষ্ট অতিথি যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনকে চিনিয়ে দিলেন মিসেস 'বি'। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেণ্ট (Avery Brundage) ও ফিনল্যাণ্ডের অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেণ্ট ফ্রুকেল (Erich von Freuckell)-কেও দেখলাম। আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ ও করমর্দন করলাম। সকলের নাম মনে নেই, ভিড়ের মধ্যে লিখে রাখা সম্ভবও হয়নি।

স্টেডিয়ামের উদ্বোধন উৎসব শেষ হবার আগেই মিস্টার 'বি' এসে মিলিত হলেন আমাদের সঙ্গে। জানালেন উৎসবের ভিড় ভাঙবার আগে বেরিয়ে পড়তে পারলেই সুবিধে। তাহলে সন্ধ্যে হওয়ার আগেই হাঙ্গারীর রাজধানীর আরও কয়েকটা জিনিস দেখা সম্ভব হবে। কাজেই আমরা উঠে পড়লাম। স্টেডিয়ামের বাইরে নীচে গাড়ি আর মানুষের ভিড় ঠেলে মিঃ 'বি'র গাড়িতে উঠে রওনা হলাম।

প্রথমেই গেলাম আমরা বুদাপেস্টের Szepmuveszeti Muzeum বা আর্ট গ্যালারী দেখতে। গ্যালারীর সামনে আমাকে ও মিসেস 'বি'কে নামিয়ে দিয়ে মিঃ 'বি' তাঁর আপিসে চলে গেলেন। জানিয়ে গেলেন, ঘণ্টা খানেক পর তিনি ফিরে এসে আমাদের তুলে নেবেন।

পুরোনো ধরনের প্রকাণ্ড থামওয়ালা বাড়িতে ছবির যাদুঘর। অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। ভিতরে প্রকাণ্ড হল। ঢুকেই বাঁ ধারে টিকিট কেনবার কাউণ্টার সেখানেই ক্যামেরা ও সঙ্গের জিনিসপত্র জমা দিয়ে টিকিট কিনে আমরা দোতলায় গিয়ে ছবি দেখা শুরু করলাম। লক্ষ্য করলাম, হাঙ্গারীর এক একজন শিল্পীর কতকগুলি বাছাই করা ছবি গ্যালারীর এক এক অংশে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রথমেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি যা আমার নজরে ধরলো তা হচ্ছে লাশলো (Mednyanozky Laszlo)-র আঁকা দু'খানি অপূর্ব ছবি। একটি হচ্ছে "জেলেরা আর টিসু নদী" অপরটি "সৈনিকের কবর"। ছবিগুলির নাম অবশ্য আমার পক্ষে জানা

সম্ভব হতো না যদি না মিসেস 'বি' আমাকে সেগুলি বলে দিতেন। দৃশ্যচিত্র বা ল্যাণ্ডস্কেপের মধ্যে রেতি ইস্তভান (Reti Istvan)-এর আঁকা ছবিগুলিই আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো। হাঙ্গারীর সহজ গ্রাম্য জীবনের মধুর একটি ছবি যেটি আমার মনকে সবচেয়ে দোলা দিয়ে গেলো—সেটি হচ্ছে (Hollosy Simon)-এর আঁকা "Tengerihantas" বা ভুট্টা সাফাই। ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে ভুট্টার ক্ষেতে রাশি রাশি পাকা ভুট্টার স্তূপের আড়ালে একটি তরুণ চাষী কাজ ভুলে তার তরুণী প্রেমিকা সরল চাষী মেয়েটির হাত ধরে চুমো খাচ্ছে। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই আশঙ্কা ও সেই সঙ্গে প্রেমিকের আদর পাওয়ার আনন্দ এই দুই অনুভূতির যে ভাবটি মেয়েটির চোখে মুখে শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই অপূর্ব। এ ছাড়া হাঙ্গারীর আর একটি বিখ্যাত ছবি দেখলাম মের্সে পল্ (Szumuyei Merse Pal)-এর আঁকা Majalis বা মে মাস। পাহাড়ের উঁচু জমিতে রকমারী বুনো ফুলের মাঝখানে ফুলের মতো সুন্দরী দুটি তরুণী ও চারটি তরুণের অবসর বিনোদনের লাস্য মধুর ছবি।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত আঁকা হাঙ্গারীর শিল্পীদের অধিকাংশ ছবিতেই ফ্লেমিশ ও ডাচ পদ্ধতির প্রভাবটাই বেশী। তবে ভাবের দিক থেকে সেগুলির মধ্যে সত্যকার শিল্পী মন ও শিল্পীর দৃষ্টির যেমন সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় আধুনিক হাঙ্গারীয়ান শিউপীদের আঁকা ছবিতে তেমন পরিচয় বড় একটা পেলাম না। আধুনিক ছবিগুলির বিষয়বস্তু বড় বেশী স্থূল ও কম্যুনিজম মতবাদের প্রচার ধর্মী। Vaszery Iacos ও Egry Iosef-এর শেষ বয়সের আঁকা ছবিগুলির অধিকাংশই উগ্র আধুনিকতাধর্মী।

গ্যালারী ঘুরে কত যে সুন্দর ছবি দেখলাম তা এখানে বলে শেষ করা যাবে না। তবে হাঙ্গারীর সবসেরা শিল্পী জগৎ-বিখ্যাত মাইকেল মুন্‌কাচীর (Munkacsy Mihaly) ছবিগুলির কথা না বলে পারছি না। মিসেস বি'র মুখে শুনলাম "মুনকাচী" প্রথম জীবনে আসবাব ব্যবসায়ীর দোকানে শিক্ষানবীশ ছিলেন,

আসবাবপত্রের নক্সা করতেই করতেই তাঁর ড্রয়িংয়ের হাত খুলে যায়। তিনি তাঁর নিজের চেষ্টায় ও নীরব সাধনায় জগতের অন্যতম সেরা শিল্পীরূপে গণ্য হন। 'মুনকাচী' মারা যান ১৯০০ খৃষ্টাব্দে।

'মুনকাচীর গ্যালারীতে গিয়ে দেখলাম তাঁর আঁকা স্টিল-লাইফ্, ল্যাণ্ডস্কেপ ও পোট্রেট্ সব কিছুর মধ্যেই একটা নিপুণ বলিষ্ঠতার ছাপ রয়েছে। তাঁর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগলো অন্ধ কবি মিলটনের "প্যারাডাইস লস্ট" মহাকাব্য ডিক্টেট করার শান্ত ছবিটি। মিলটন কবিতা বলে যাচ্ছেন তাঁর মেয়ে লিখে নিচ্ছেন। ছবিটি দেখলে মনে হয় মিলটনের কবিতা বলা এখনও শেষ হয়নি। ছবিটি যেন রঙে ও রেখায় জীবন্ত। তাঁর আর একটি অপূর্ব সৃষ্টি অত্যাচারী পিলেটাসের সামনে যীশুকে ধ'রে আনার করুণ ছবিটি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মবিষয়ক শিল্প সৃষ্টির মধ্যে এটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি হিসাবে ধরা যায়। 'মুনকাচী'র জগৎপ্রসিদ্ধ 'হাই-তোলা'র মূল চিত্রটিও দেখবার সৌভাগ্য হ'লো। ঐ ছবিটি এমনই অপূর্ব যে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই দর্শকমাত্রেই অজান্তে একটা হাই তোলেন।

গ্যালারী ঘুরে প্রায় দু' ঘণ্টা পরে আমরা মিউজিয়ামের নীচে নামলাম। বিখ্যাত ছবিগুলির কয়েকটি ফটো কিনে নিয়ে বাইরে এলাম। দেখা গেল মিস্টার বি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। বাইরে আসতেই তিনি জানালেন—"বিশেষ একটা আনন্দের খবর আছে—"আমাদের কনষ্টিটিউশন দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ ভোজসভা হবে তাতে দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে এদেশের গণ্যমান্যেরা মিলিত হবেন। আপনারও সেখানে নিমন্ত্রণ আছে। আমি নিজেই আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো, সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। তাছাড়া ভোজসভা থেকে ফিরে আজ মাঝরাতেই আপনাকে রওনা করে দেবো হাঙ্গারী ভ্রমণের পথে। সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি। কাজেই চলুন আপনার আস্তানা থেকে আপনার মালপত্র-গুলো নিয়ে এসে সেগুলির ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করি।"

আমি জানালাম—সঙ্গে আমার শুধু ছোট একটি এয়ার ট্রাভেল

ব্যাগে সামান্য কিছু পোশাক ও জিনিসপত্র আছে, বাকি সবই জমা দেওয়া হয়েছে, বুদাপেস্ট স্টেশনের লাগেজ-রুমে।

উনি হেসে বললেন—"তবে তো ঠিক ব্যবস্থাই করে রেখেছেন—ঝামেলা ঝঞ্ঝাট কিছুই নেই।"

আবার সেই দানিয়ুব নদীর পুল পেরিয়ে 'বুদা' অঞ্চলে আমাদের হোস্টেলের আস্তানায় গেলাম। ওখানে তখনও আগের রাতের সঙ্গীরা কেউই ফেরেন নি। মিঃ বি সেই হোস্টেলের রক্ষককে কি সব বললেন। তারপর ওখানে মুখহাত ধুয়ে পোশাক বদলে আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। ব্যাগটি বগলদাবা করে ওঁদের সঙ্গে গাড়িতে চাপলাম।

ভোজসভায় যাওয়ার পথে 'মিসেস বি'কে ওঁদের বাড়িতে নামিয়ে দিলাম। মিসেস বি জানালেন—স্টেশনে আবার রাত্রে দেখা হবে।

গাড়ি ছুটতে লাগল ভোজসভার পথে। মন আমার তখন স্তব্ধ হয়ে শুধু ভাবতে লাগলো—"ঠাকুরের দয়ায় দেশ ছাড়ার পর থেকে কি অপূর্ব সব যোগাযোগ ঘটছে। এই অবিশ্বাস ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিবেশে বিশ্বাস ও ভালবাসার প্রতিমূর্তি এমন সব মানুষকে বন্ধু হিসাবে পাওয়া কতখানি ভাগ্যের কথা!"

ভোজসভায় পৌঁছে দেখি—অসংখ্য রঙ-বেরঙের পতাকা ও ফুলে সাজানো মনোজ্ঞ পরিবেশ। তার চেয়েও সুন্দর হাঙ্গারীর জাতীয় পোশাকে সেজে-আসা নাচিয়ে ছেলে-মেয়েদের রূপসজ্জা। দেশে যতই খাদ্যের অভাব থাক না কেন, ভোজসভায় আহার্য ও পানীয় ও গীতবাদ্যের অভাব বুখারেস্টেও যেমন দেখিনি, এখানেও তেমনই তা নজরে পড়লো। খাওয়া-দাওয়ার মাঝখানেই মাঝে মাঝে বক্তৃতা এবং টোষ্ট করা চললো। বার বার রব তুলতে হলো Bekes! Bekes! অর্থাৎ শান্তি! শান্তি!

ভোজসভায় সেদিন যাঁদের পরিচয় জানা গেল তাঁদের সকলের নাম মনে করে আনতে পারিনি। যে কজনের নাম মনে রেখে লিখে নিতে পেরেছিলাম তাঁরা হচ্ছেন—হাঙ্গারীর একাডেমী অব সায়েন্সের সভাপতি—মেডিসিনের অধ্যাপক Istvan Ruszuyak আন্তর্জাতিক

বুখারেস্ট সহরের বাইরে আজও দেখা যায় পাশাপাশি কুটীর আর প্রাসাদ। জমিদারের বদলে প্রাসাদে থাকেন এখন ইউনিয়ন ও পার্টির নেতারা।

তেই হ্রদের তীরে বুখারেস্টের অধিবাসীরা মাছ ধরছে।
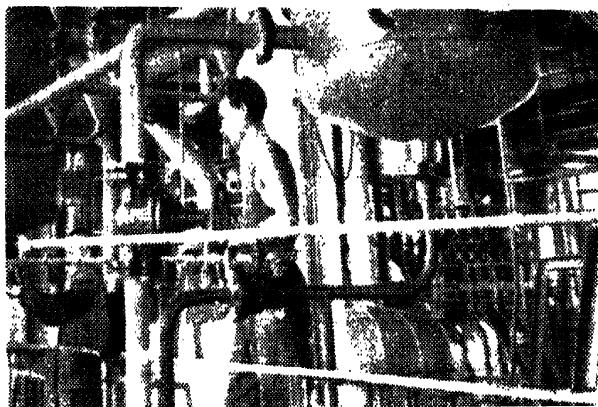
খ্যাতিসম্পন্ন কোশুথ পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী পল গামবাস ও লেখক পিটার ভেরেস এবং বেলা ইলেস। শিশুশিক্ষা বিশেষজ্ঞা শ্রীযুক্তা এরৎসেবেৎ ডাভিদা বিরো প্রভৃতি। হাঙ্গারীর সব সেরা সরকারী সংবাদপত্র "Szabad Nep" পত্রিকার প্রতিনিধি কোভেসী এনদ্রে, যাঁর সঙ্গে আমার বুখারেস্টেই ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছিল, তাঁর সঙ্গেও দেখা হলো, তিনি খুব খুশী হয়ে হাঙ্গারীর আরও বহু সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বুখারেস্টের পরিচিত-মুখ আরও অনেককেই দেখলাম, তাঁরাও হাজির হয়েছিলেন হাঙ্গারীর স্টেডিয়াম উদ্বোধন উৎসবে। তবে ভারতীয় আমি একাই।

ভোজসভায় খাওয়া-দাওয়া ও পরিচয় পর্বের পর নাচ-গান যখন শুরু হ'লো, তখন আমরা ওখান থেকে রওনা হয়ে সোজা স্টেশনে গেলাম।

স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন 'মিসেস বি' আর তাঁর সঙ্গে বেশ একটি গোলগাল মোটাসোটা তরুণী। মেয়েটির সঙ্গে মিসেস বি ও মিস্টার বি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, জানালেন ঐ মেয়েটি আমার দোভাষী সহচরী হিসাবে সঙ্গে যাবে। মেয়েটির নাম ইভা, তার মিষ্টি মধুর কথাবার্তায় বুঝলাম মেয়েটি যেমন বিনয়ী, তেমনই শান্ত ও ভদ্র।

গাড়ি ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা বেজে উঠলো। 'মিস্টার বি' আমাকে তাড়াতাড়ি গাড়িতে তুলে দিলেন। 'মিসেস বি' বললেন—"সময় আপনার অল্প। খুবই তাড়াহুড়োর মধ্যে আপনাকে সময় কাটাতে হবে। নইলে আপনাকে আমাদের বাড়িতে রেখে ভারতবর্ষের গল্প শুনতাম। যাইহোক ইভাকে বলবেন সব গল্প—ওর কাছেই শুনে নেবো সব কথা।"

ও'রা হাতে হাত মিলিয়ে মাঝরাতে বিদায় দিলেন—বুদাপেস্ট থেকে। রওনা হলাম সদ্যচেনা নতুন সঙ্গিনীর সঙ্গে—হাঙ্গারীর অজানা পথে।

সরকারী ব্যবস্থায় হাঙ্গারী দেখার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু কি

যে ব্যবস্থা হলো—কোথায় যে চলেছি ...ই তো জানা হলো না তাড়াহুড়োর চোটে। গাড়ি ছাড়বার পরে স্লিপিং কোচের ক্যুপেতে গিয়ে যখন বসলাম, তখন কেমন জানি ভয় ভয় করতে লাগলো। মনে হলো আবার সেই কম্যুনিস্ট দেশের তরুণী দোভাষীর পাল্লায় পড়া গেল! চুপটি করে বসে রইলাম। ভাবতে লাগলাম আকাশ-পাতাল, আবোল-তাবোল!

আমাকে ঐভাবে মনমরা হয়ে চুপ করে বসে থাকতে দেখে হাঙ্গারীয়ান দোভাষী ইভা বললে,—"ভাবনার কিছু নেই। কোনও অসুবিধা হবে না আপনার। মিঃ বি আপনার ট্যুর প্রোগ্রাম ও সমস্ত ব্যবস্থা এমন সুন্দর ক'রে করে দিয়েছেন, যাতে খুব কম সময়ের মধ্যেই আপনি হাঙ্গারী দেখে অবস্থা-ব্যবস্থাটা যথাসম্ভব বুঝে নিতে পারবেন। মিসেস বি আমার দিদি হন, তিনিও আমাকে বলেছেন—আপনার সব কথা।"

আমি বললাম—"সেই ব্যবস্থাটা যে কি হলো তা তো ও'রা জানিয়ে গেলেন না!" ইভা হেসে বললেন—"সেটা জানাবার ভার আমাকেই দিয়ে গেছেন।"

ইভা জানালে সরকারী ব্যবস্থায় আর পাঁচজন বিদেশী অতিথিকে যেমন করে বুদাপেস্টের কয়েকটা বড় বড় কলকারখানা, হাসপাতাল, স্বাস্থ্য নিবাস, বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়ে দেওয়া হয়, আমার জন্য ঠিক সে ব্যবস্থা হয়নি।

ওদেশের গ্রামাঞ্চলের বাস্তব অবস্থাটাও মিঃ বি আমাকে দেখিয়ে দিতে চান; তাই শহরের গুপ্তচর ও গোয়েন্দাদের দৃষ্টি আমার ওপর পড়বার আগেই বিদায় করে দিলেন বুদাপেস্ট থেকে। আমরা চলেছি হাঙ্গারীর পূর্বদিকের শহর দেব্রেচেনে (Debrecen) ভোর বেলাতেই সেখানে পৌঁছে যাবো। ইভার মুখে এ সব কথা শুনে বুঝলাম—'ইভা' ঠিক এলেনের মতো সরকারী গুপ্তচরী নয়। তবুও মিঃ বি'র ব্যবস্থাটা যে কতখানি নিরাপদ তাই ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

মনের উদ্বেগটা চাপতে না পেরে বলে ফেললাম—"মিঃ বি' আমার

জন্যে এত ঝামেলা না করলেই পারতেন। আমার জন্যে তোমরা কোনও বিপদে পড়ো এটা আমি চাই না।"

ইভা হেসে বললে—"আপনি আমাদের বিপদে না ফেললে বিপদের ভয় নেই। মিঃ বি পাকা লোক। তাই আমাকেই সঙ্গে পাঠিয়েছেন।" ও'র কথা শুনে শঙ্কা ভঙ্গ হয়—নিশ্চিন্ত অন্তরঙ্গতার পরিবেশ খুঁজে পাই।

এরপর অনেকক্ষণ অবধি আমরা দুজনে গল্প করলাম। ইভাকে শোনালাম ভারতবর্ষের গল্প, ওর কাছে শুনলাম হাঙ্গারীর গল্প। মেয়েটির কথাবার্তায় বুঝলাম ও বেশ পড়াশুনো করেছে। গোঁড়া কমিউনিস্টদের মতো কূপমণ্ডূক ও শ্রেণীগত ঘৃণাবোধের উগ্রতাও তার নেই। মেয়েটির মধ্যে মানবতাবোধ ও সত্য এবং সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলাম।

ওর কাছেই জানতে পারলাম—হাঙ্গারীর ভয়ঙ্কর সরকারী গোয়েন্দা পুলিশ—Allam Vedelmi Hatosag বা AVHদের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথা। এই গোয়েন্দা বিভাগের কবলে পড়ে হাজার হাজার শিক্ষক, আইনজ্ঞ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ীকে নির্বাসিত হতে হয়েছে। জোর করে লাগানো হয়েছে জনবিরল অঞ্চলের সরকারী চাষবাড়ি ও রাস্তাঘাট তৈরীর অমানুষিক কঠোর পরিশ্রমের কাজে। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা মধ্যবিত্ত ও স্বাধীন মতবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবি। আর অপরাধ হাঙ্গারীর রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থায় তারা সোভিয়েট হস্তক্ষেপের বিরোধী।

আমি বললাম—তোমাদের দেশে "পিপ্‌লস রিপাবলিক" জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেই জানি, সেখানে সোভিয়েট হস্তক্ষেপ কি উপায়ে সম্ভব? ইভা হেসে বললে—"পিপ্‌লস রিপাবলিকের প্রতিটি দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগে কলে কারখানায়—সোভিয়েট পরামর্শদাতা ও বিশেষজ্ঞ হিসাবে শত শত রাশিয়ানকে রাখতে হয়েছে, হাজার হাজার রুশ সৈন্য এই সমস্ত দেশে ছড়িয়ে আছে। তাদের গুপ্তচর বৃত্তি ও অত্যাচারের ভয়ে—আমাদের রাষ্ট্রনায়করা সর্বদাই তটস্থ। সোভিয়েট স্তুতিগানে তারা পঞ্চমুখ—এ জিনিসটা আপনি কি টের পাননি রুমানিয়ায় এতদিন কাটিয়ে এসেও!"

ওর কথার কোনও জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসলাম, বললাম—"এ সব দেশে ডেকে এনে তোমরা কি সব জিনিস ঠাউরে বুঝে দেখবার সুযোগ দাও? এত কড়াকড়ি, দৌড়োদৌড়ি আর নাচগানের হুড়োহুড়িতে কিছু কি দেখতে পাওয়া যায়?"

ইভা বললে—"পাওয়া যায়, যদি কেউ চোখ খুলে রেখে মুখ বুজে সব দেখতে পারে?" আমি বললাম—"ঠিক বলেছো! রাত অনেক হয়েছে, এখন চোখ মুখ দুটোই আমাদের পক্ষে বন্ধ করা নিরাপদ। মুখ বুজে চোখ খুলেই আমি সব দেখতে পারবো। মন খুলে তুমি কিন্তু সব কথা বোলো।" এরপরই আমরা যে যার বার্থে, গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ভোর রাতে গাড়ি এসে থামলো—"Puspokladmy" স্টেশনে। ওখান থেকে গাড়ি বদল করে সকাল বেলা পেঁছিলাম আমরা Debrecen স্টেশনে। স্টেশনটা বেশ পুরানো, প্রাচীন ধরণের।

ইভা জানালে 'দেব্রেচেন' হলো বুদাপেস্টের ১৩৫ মাইল পূবে হাঙ্গারীর একটা পুরানো শহর, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাচীন কেন্দ্র। বর্তমানে ওখানে কয়েকটা নতুন কলকারখানাও গড়ে উঠেছে।

সরকারী ট্যুরিস্ট আফিস 'ইবুস্‌জ'এর 'দেব্রেচেন' শাখা থেকে স্টেশনে গাড়ি পাঠানো হয়েছিল আমাদের নিতে। সেই গাড়িতে করে ছোট বড় নানা রাস্তা ঘুরে চললাম। শহরের ঘরবাড়িগুলো সেকেলে ধরণের। বুদাপেস্টের মতো আধুনিক ঘরবাড়ি [illegible] কিছুই সেখানে গড়া হয়নি। যেতে যেতে নানা রাস্তার নাম নজরে পড়লো। হাঙ্গারীতে Utza 'উৎশা' মানে 'স্ট্রীট' বা রাস্তা, কোরুত (Korut) মানে এভিনিউ এটা জানা গেল ইভার কাছ থেকে।

হাজির হলাম দেব্রেচেনের Voros hadesereg Utza নামে রাস্তার উপর ইবুস্‌জ প্রতিষ্ঠানের Szallo বা সরাইখানায়। ওখানে গিয়েই বাথরুমে ঢুকে স্নান করে পোশাক বদলে নিলাম। তারপর কফি, মাখন রুটি ও জ্যাম দিয়ে "Egyagyas" বা ব্রেকফাস্ট সারা গেলো।

ইভা জানালে—"এখানকার গ্রাম-শহর দেখা শেষ করে বিকেলের প্লেনে আমরা বুদাপেস্ট ফিরতে পারবো।" হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, মনটা অনেকখানি হাল্কা হলো।

গাড়ি চড়ে রওনা হলাম সাতটার সময়। গাড়িতে যেতে যেতে ইভার কাছে শুনলাম—দেব্রেচেনের গৌরবময় ইতিহাস। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে হাঙ্গারীর বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা লুই কোশুথ (Lajos Kossuth) এই শহরেই সব প্রথম হ্যাপসবুর্গস রাজ-পরিবারের সিংহাসনচ্যুতি ঘটান। এই মানুষটি হাঙ্গারীকে স্বাধীন করে নিজেকে ডিক্টেটর বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ান জেনারেল জর্জির কাছে হেরে গিয়ে তিনি তুরস্কে পালিয়ে যান। সেখানে দু'বছর থাকবার পর তিনি আমেরিকায় আশ্রয় নেন। জীবনের বাকি দিনগুলি তিনি সেখানেই নির্বাসনে কাটান। এই লুই কোশুথের নামেই আজ হাঙ্গারীর জনসাধারণ অনুপ্রেরণা পায়। আর তাই রাশিয়ার স্ত্যালিন-পুরস্কারের মতোই হাঙ্গারীর সাংস্কৃতিক উন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে "কোশুথ পুরস্কার" দেওয়া হয় কৃতীদের।

ইভার মুখে শুনলাম, ওখানে খুব পুরানো ও সুন্দর একটি গির্জা আছে। প্রথমেই আমরা গেলাম সেখানে। ইউরোপের বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক জন কলভিনের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত দেব্রেচেনের প্রাচীন কলভিনিস্ট চার্চ। আগাগোড়া পাথরের তৈরী। সুন্দর কাজ করা। গির্জার ভিতরে গিয়ে দেখলাম—সেখানেও অসংখ্য লোকের ভিড়! কোনও দেশের গির্জায় গেলেই সেখানকার মানুষকে একসঙ্গে দেখা যায়, তাদের স্বাভাবিক বেশভূষায়। চোখে মুখে পাওয়া যায় তাদের অবস্থার পরিচয়, এটা বুখারেস্টের গির্জায় গির্জায় ঘুরে শিখেছি। অথচ ভারত থেকে ডেলিগেশন ও আমন্ত্রণে যাঁরা বিদেশে যান, তাঁরা কেউ কেউ ঐ গির্জা বা হাটে-বাজারে গিয়ে সাধারণ মানুষের চেহারাটা দেখে আসেন না।

'দেব্রেচেনের' এই গির্জাতে গিয়েও দেখলাম আগে যা দেখেছি তাই। ছেলে-বুড়ো, মেয়ে পুরুষ শত শত লোক আসছে, হাঁটু গেড়ে

ক্রুশ করে চোখের জলে তাদের অন্তরের আকুল বেদনার প্রার্থনা জানাচ্ছে। পোশাক-পরিচ্ছদের দীনতা তারা ঢেকে আসতে পারেনি 'ফেষ্টিভ্যাল' ও কংগ্রেসে সমবেত জনতার মতো!

গির্জাঘর ঘুরে গেলাম দেব্রেচেনের 'দেরী' মিউজিয়ামে (Deri Musuem)। পুরানো ধরনের দোতালা বাড়ি। যাদুঘরে যেতে পথের দু'পাশে কনক্রীটে তৈরী বসবার বেঞ্চ, সুন্দর বাগান ও লন। প্রধান দরজার সিঁড়ির দুপাশে হাঙ্গারীর প্রাচীন ভাস্কর্যের নমুনা পুরুষ ও নারীর চারটি মূর্তি। মাঝখানের বিরাট গোল গম্বুজাকৃতি হলের ভিতর দিয়ে যাদুঘরে ঢুকতে হয়। যাদুঘরটিতে হাঙ্গারীর প্রাচীন রাজ-পরিবারের অনেক সংগ্রহ ও সম্পদ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সময়ের অভাবে গোটা যাদুঘরটা ঘুরে দেখা হলো না। কয়েকটা ঘর দেখেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

তারপর গেলাম দেব্রেচেন বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। এটি আগের যুগের রাজাদের তৈরী প্রকাণ্ড একটি প্রাসাদ বিশেষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কিছু ঘুরে দেখা হলো না। তবে যেটুকু দেখলাম, তা খুবই ভালো লাগল। ওখান থেকে গেলাম আমরা দেব্রেচেন কলেজ ভবনে। আগে এটাই ছিল রাজ-পরিবারের প্রমোদ ভবন। অসংখ্য গাছপালায় সাজানো সুন্দর বাগানের মধ্যে এই প্রাসাদেই এখন কলেজ বসে। প্রাসাদের সামনে স্তব্ধ পুকুরের কালোজলে শালুক ও পদ্মজাতীয় ফুলের মেলা। নিজের দেশের কথা মনে পড়ে গেল। ভারী ভালো লাগলো আমার ঐ যায়গাটি, ইভাকে বললাম—"এমন শান্ত স্নিগ্ধ জায়গা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছা করছে না।"

ইভা হেসে বললে—"নড়তেই হবে—ঘড়ির কাঁটা তো অপেক্ষা করছে না। চলুন আপনাকে গ্রামের পথে খানিকটা ঘুরিয়ে আনি। কয়েকটি গ্রাম দেখিয়ে তারপর কলকারখানায় নিয়ে যাবো। গ্রাম আপনার ভালো লাগবে নিশ্চয়ই?" আমি বললাম—"কারখানায় না গিয়ে গ্রামের পথে ঘুরেই ফিরবো।" ইভা বললে—"কারখানাতেও অনেক মজার জিনিস দেখতে পাবেন।"

গির্জা যাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ দেখা চটপট সেরে আমরা চললাম দেব্রেচেন শহরের বাইরে। চওড়া মোটর-সড়ক ধরে। রাস্তার দু' পাশে চাষের জমি, গম, ভুট্টা আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্যমুখী ফুলের ক্ষেত। ইভার কাছে জানা গেল—রাত জাগতে হলে গ্রামের মেয়েরা সূর্যমুখী বীজ কাঁচাই চিবিয়ে খায়। তাছাড়া সিদ্ধ করেও খায়। মাঝে মাঝে বড় রাস্তার পাশেই পুরু মাটির দেওয়াল-দেওয়া ঘরের সারি। পাথরের টালি দিয়ে ছাওয়া। ছোট ছোট ঘরবাড়িতে সাজানো গ্রাম। ওখানেও দেখেছি ঘরে ঘরে হাঙ্গারীর গ্রামের মানুষের সেই একই হাঘরের দশা। যেমনটা দেখেছিলাম—ভিয়েনা থেকে হেগেয়াশালোম আসবার পথে।

হাঙ্গারীর শহরের লোকদের সঙ্গে গ্রামের লোকের সাজ-পোশাকের অনেক ফারাক। গ্রামের মেয়েরা সেখানে কেউ ইউরোপের আধুনিক ফ্যাসানের কাটছাঁটওয়ালা রঙচঙে গাউন পরে না—সকলের গায়ে ঢিলেঢালা সেমিজের মত মোটাসোটা কাপড়ের জামা। সকলের মাথায় ঘোমটা দেওয়ার মতো করে একটা বড় রুমাল বা স্কার্ফ জড়ানো। মুখটি বার করে রেখে আগাগোড়া মাথাটি ঢাকা। পুরুষদের অধিকাংশেরই গায়ে জামা দেখলাম না। খালাসীদের মতো ঢিলেঢোলা পায়জামা। অনেকের পায়েই জুতো নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও খেলা করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে খালি গায়ে খালি পায়ে। অনেক যায়গাতেই তা নজরে পড়লো।

চাষের ক্ষেতে ঘোড়ায় টানা লাঙলও চলছে, আবার এখানে ওখানে ট্রাক্টর ও যন্ত্রপাতি দিয়েও কাজ হচ্ছে। ঘোড়ায় টানা গাড়ি ও আধুনিক ধরনের লরী চলেছে, শস্য বোঝাই করে নিয়ে। সব রকম ব্যবস্থাই দেখেছি। আধুনিক ধরনের লরীতে করে মাল বয়ে নেওয়ার উন্নত ব্যবস্থা হলেও লরীর উপরে চেপে যারা যাচ্ছে, তাদের অনেকেরই খালি পা ও খালি গা দেখেছি।

মোটরের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দূরে কয়েকটা ছোট ছোট কলকারখানার বাড়িও নজরে পড়লো। ইভা মোটামুটি সেগুলির পরিচয়ও জানালে। জানা গেল, দেব্রেচেন অঞ্চলের আশে পাশে একটা

কাপড়ের কল, ডাক্তারী যন্ত্রপাতির কারখানা, একটা ঢালাই কারখানা ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। তবে দেব্রেচেনের সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো ওষুধ তৈরীর কারখানা। সেটা আমাকে দেখে যেতেই হবে শেষকালে, কারণ সরকারী প্রোগ্রামে ওটাই আমার দেব্রেচেনের আসল দ্রষ্টব্য। ওটা দেখাবার নাম করেই আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে।

ইভা জানালে—দেব্রেচেনের আশপাশের গ্রামগুলোর নামেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে— বেশির ভাগই 'Hajdu' দিয়ে আরম্ভ যেমন Hajduhadhaz Hajdudorog, Hajdusamson ইত্যাদি। আরও জানতে পারলাম হাঙ্গারীর মেয়েপুরুষ যাদের পদবী "Hajdu" তাদের আদি বাড়িই নাকি এই সব অঞ্চলে।

যাক শেষে পৌঁছলাম আমরা দেব্রেচেন থেকে মাইল কুড়ি দূরে Hajduhadhaz গ্রামে। এই গ্রামটি বেশ বড়। শুনলাম এখানে সমবায় প্রথায় চাষ আবাদ শুরু হয়েছে। এই গ্রামে একটা প্রাইমারী স্কুল ও পাইওনীয়ার দল গড়ে উঠেছে। কিন্তু গ্রামের স্কুল ও পাইওনীয়ারদের যা অবস্থা দেখলাম, তাতে চোখ ছানাবড়া! হাঙ্গারীর গ্রামের পাইওনীয়ার দলের ইউনিফর্ম বলে বিশেষ কিছু নেই। কম্যুনিস্ট দেশের প্রোপাগান্ডা সাহিত্যের পাইওনীয়ারদের ছবির সঙ্গে এদের ইউনিফর্মিটি বা মিল খুঁজে পেলাম না। অনেকেরই খালি গা, খালি পা। তবে হ্যাঁ পার্টির মাতব্বরা তাদের আইন আর নিয়মের শাসনে শাসিয়ে জোর-জবরদস্তি গান বাজনা শিখিয়ে সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করছেন যে সে পরিচয় পেলাম। পাইওনীয়ার দলের বাঁশি শেখার ক্লাশ বসেছে। গ্রামের মুক্ত স্বাধীন ছেলেমেয়েরা বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে, হাসি নেই চোখে মুখে।

সরকারের ব্যবস্থায় হাঙ্গারীর সরকারী চাষবাড়িগুলিতে কিছু কিছু চাষীদের নতুন ঘরবাড়ি তোলা হচ্ছে তারও নমুনা দেখলাম। কিন্তু বুদাপেস্টের স্ট্যাখানোভাইট ও শ্রমিকদের জন্যে গড়া নতুন ঘরবাড়ির সঙ্গে চাষবাড়ির চাষীদের ঘরবাড়িগুলোর যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, এটা নিজে চোখে দেখেছি, তা ছাড়া ওদেশের যে সব পত্র-পত্রিকা এনেছি, তা থেকেও পাঁচজনকে দেখিয়েছি ব্যাপারটা।

যাক গ্রাম দেখে দেব্রেচেনে ফেরার পথে আমরা Hajdusag বলে একটা জায়গায় গেলাম। আগে সেখানে বনজঙ্গলে ভরা গ্রাম ছিল যে তা বোঝা যায় পুরানো গাছপালা ঘেরা রাস্তাগুলো দেখেই। এখন রাসায়নিকদ্রব্য ও ওষুধপত্র তৈরীর নতুন কারখানা গড়ে ওঠায়, জায়গাটা শহরের চেহারা নিচ্ছে।

নতুন চওড়া পাকা রাস্তাটা দিয়ে খানিকটা এগুতেই নতুন হাঙ্গারীর গৌরব দেব্রেচেনের রাসায়নিক কারখানার সামনে এসে পড়লাম। কারখানার নতুন বাড়িটি আকারে খুব বিরাট না হলেও সুন্দর তার ডিজাইনটি। লাল গেরী মাটি রঙের ইঁট-দাগা বাড়ির দেওয়াল—সামনে সিমেণ্টে বাঁধানো চওড়া চওড়া রাস্তা, চারপাশে সবুজ ঘাসে ঢাকা লনের মাঝখানে অসংখ্য রঙীন ফুলের চারার কেয়ারী। ভারী ভালো লাগলো বাইরে থেকে কারখানাটি।

ভিতরে যেতেই সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী আমাকে কারখানাটি ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে যাওয়া হলো। কর্তৃপক্ষ জানতে চাইলেন আমার এত দেরী হলো কেন? ইভা দেখলাম—গ্রাম দেখতে যাওয়ার কথাটা বেমালুম চেপে গিয়ে ওঁদের বললে—মিঃ ঘোষ একজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক তাই মিউজিয়াম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছু দেখতেই ঝুঁকে পড়েছিলেন বড্ড বেশী।

প্রথমেই আমাকে কারখানার ল্যাবরেটরী অফিস ইত্যাদিতে নিয়ে যাওয়া হলো। সুন্দর সাজানো গোছানো বিরাট ল্যাবরেটরী—সেখানে যারা কাজ করছে—অধিকাংশই দেখলাম তরুণী। সকলেরই গায়ে বেশ ধব্‌ধবে সাদা এ্যাপরন—তারাও মধুর হেসে করমর্দন করে আমায় অভ্যর্থনা জানালে। ওদের দেখে খুবই ভালো লাগলো। কারখানার কর্তৃপক্ষ জানালেন—হাঙ্গারীতে একমাত্র এই কারখানাতেই 'পেনিসিলিন' তৈরীর গবেষণা চলছে। রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ ও কেমিস্ট-দের সহায়তায় কিছু কিছু পেনিসিলিন যে তৈরীও হচ্ছে, সেটা জানালেন এবং দেখালেন। প্রচার-ব্যবস্থা অনুযায়ী আমাকে ওঁদের কারখানার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বললেন—বোঝালেন যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থায় কারখানার কাজ

আরম্ভ করবার আগে প্রতিটি কর্মীকেই কারখানা থেকে দেওয়া বিশেষ ধরনের পোশাক পরে নিতে হয়। এবং কাজ শেষ করে বাড়ি যাওয়ার আগে সবাই কারখানার বাথরুমে গিয়ে গরম জলে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে বেরোয়। চুপ করে শুনলাম। তবে বুঝতে দেরি হলো না—ল্যাবরেটরী এসিস্ট্যাণ্ট মেয়েদের গায়ের সাদা এ্যাপরনে ঢাকা হয়েছে ভিতরকার জীর্ণ মলিন পোশাক তার রহস্য ঢাকতেই এই বক্তৃতা।

ল্যাবরেটরী ছাড়া কারখানার আর সব ডিপার্টমেণ্টে যেখানে পুরুষরা ভারী ভারী কাজ করছে, সেখানে যেতেই সাধারণ মজুরদের আসল চেহারাটা নজরে পড়ে গেল। দেখলাম দলের সর্দার বা টেকনিসিয়ান জাতীয় কর্মীদের গায়ে কারখানার এ্যাপরণ বা ইউনিফর্ম ধরনের পোশাক থাকলেও—সাধারণ মজুরদের অধিকাংশের গায়ে হাত-কাটা গেঞ্জী ছাড়া আর কিছুই নেই। দু'একজন খালি গায়ে কাজ করছে তাও দেখলাম। রাশিয়ান এক্সপার্ট ও কেমিস্ট যে দু' চারজনকে দূরে থেকে দেখলাম, তাঁদের সাজ-পোশাক আমাদের কলকারখানার বড় সাহেব ছোট সাহেবদের মতই। কারখানাটি হাঙ্গারী আর রাশিয়ার যৌথ সম্পত্তি, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম রাশিয়াই যুগিয়েছে। অতএব রুশ বিশেষজ্ঞদের চালটা নবাবী হলেও বরদাস্ত করতেই হয়। স্নান করা সম্বন্ধে অত বক্তৃতা শোনবার পর স্নানের ঘঁর দেখতে গিয়ে দেখলাম অত বড় কারখানায় দশটা মাত্র বাথরুম, কয়েকটা ওয়াশবেসিন ও শাওয়ার।

কারখানা দেখতে দেখতেই খাবার সময় হয়ে এলো। আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা হাজির হলাম দেব্রেচেন এয়ারপোর্টে। দেখলাম বুদাপেস্ট যাওয়ার প্লেন এসে গেছে। তার গায়ে লেখা রয়েছে "MASZOVLET" বুঝলাম BOAC আর AIR INDIAর মতোই ওটাই হলো হাঙ্গারীর সরকারী এয়ার লাইনের নাম। মুখহাত ধুয়ে এয়ার পোর্টের রেস্তোরাঁতেই "Ketagyas" বা লাঞ্চ খেলাম দুজনে—পয়সা আমাকে দিতে হলো না। ইভা গুণে দিলে ৪৪ ফোরিণ্ট। প্রায় কুড়ি টাকা! টিকিটপত্রের ব্যবস্থা ইভাই সব করলে। আমাকে কিছুই করতে হলো না। বেলা দেড়টা নাগাদ প্লেন ছাড়লো মোট দশ জন যাত্রী নিয়ে। তার মধ্যে চার পাঁচজন

শিয়ান যে ইভাই আমাকে জানিয়ে দিলে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই মরা দেব্রেচেন থেকে বুদাপেস্টে ফিরে গেলাম।

দেব্রেচেন থেকে বুদাপেস্ট ফেরার পথে—বিমান থেকে হাঙ্গারীর র্বাঞ্চলের গ্রাম শহরগুলো নজরে পড়লো। দেখলাম নীচে বাঙলা শের মতই হরিৎশ্যামল শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে নদী-নালা, খাল-বিল। ছপালার আড়ালে আবডালে গ্রামের কুটীরগুলি।

ইভা জানালে—আমরা উড়ে চলেছি হাঙ্গারীর নামকরা নদী চস্‌্যা (Tisza)র অববাহিকা সমভূমির উপর দিয়ে। ঐ অঞ্চলে ম ও ভুট্টার চেয়ে ধানের চাষটাই বেশী ভালো হয় জানিয়ে—ইভাই বর দিলে, ঐ অঞ্চলের লোকেরা এখন ধানের চাষেই মন দিয়েছে শী।

হরিৎ-শ্যামল ধানের ক্ষেতের ওড়না জড়ানো সমভূমি পার হয়ে মাদের বিমান বুদাপেস্টের পথে উত্তর-পশ্চিমে আরও যখন এগুলো খন ডানদিকে দেখা গেলো হাঙ্গারী আর চেকোশ্লোভাকিয়ার াহাড় পর্বতগুলো। সামনে বাঁদিকে দেখা গেল দানিয়ুব নদীর বাহিকায় ক্ষেত-খামার জলাজমি। নীচে দেখা গেল বুদাপেস্টের াশ-পাশের শহরতলীর কলকারখানা, রেল লাইন।

দেখতে দেখতে বুদাপেস্ট শহরের উপর বিমান এসে পড়লো। পর থেকে বুদাপেস্ট শহরটা ভারী সুন্দর দেখাতে লাগলো। ানিয়ুব নদীর উপর অসংখ্য পুল—গেলার্টবার্গ পাহাড়ের টিলার পরে সোভিয়েট ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর প্রতীক পাথরে খোদাই বিরাট কটি স্ট্যাচু। মূর্তিটি একটি হাঙ্গারিয়ান যুবতীর—দু' হাত তুলে রে আছে খেজুর ডালের মতো একটা কিছু। এছাড়া উপর থেকে জরে পড়লো—স্তালিনের আকাশছোঁওয়া মূর্তি সদম্ভে দাঁড়িয়ে াছে বুদাপেস্ট শহরের বুকে—অধীন জাতিকে সাম্যবাদের াশীর্বাদ দিয়ে তাদের পূজো নিতে! রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের বুকে স্তালিনের বিরাট মূর্তিটির কথা ইভাকে বললাম। ইভা হেসে বললে—লিখে নিন আমাদের দেশে কোথায় কোথায় স্তালিনের নামে—Sztailin Utza বা রাস্তা আছে। আছে

Gyula; Hodmezovasarkely; Keszthely; Nagykanizsa; Stalinovaros; Veszpreni; এই ছ'টা শহরে!

বুদাপেস্ট এয়ারোড্রামে বিমানটা নামবার আগের মুহূর্তে নীচে দেখা গেল—দানিয়ুব নদীর তীরে এক নতুন শহর ও কলকারখানা গড়ে উঠছে। ইভা জানালে—ওটাই হলো নতুন হাঙ্গারীর বড় গৌরব "Stalinovaros" 'স্তালিনোভারোস'। হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর বেকারত্ব ঘোচাতে ওখানে তাদের লাগানো হয়েছে মাটিকাটা, পাথর ভাঙ্গা, ঘরবাড়ি গাঁথার কঠোর শ্রমের কাজে। প্রচার করা হচ্ছে—যুবক-যুবতীর খয়রাতী শ্রমে তৈরী হয়ে—ওটাই হবে হাঙ্গারীর নতুন যৌবনের নিজস্ব শহর—স্তালিন তীর্থ। ওখানকার পলি-ক্লিনিকের বিরাট সাততলা বাড়ি আর তার সামনের মস্ত গোল-ঘরটা বিমান থেকে স্পষ্টই দেখা গেল।

শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে—বুদাপেস্টের বিমান ঘাটি। নতুন এয়ারোড্রোমের বাড়িটি খুব বড় নয়। তবে কংক্রীটে বাঁধানো রানাওয়ের ধারে ধারে সবুজ মাঠ ও ফুলের বাগান দেখবার মতো।

বিমান থেকে নেমে বিমান ঘাটির ওয়েটিং-হলে আমরা গেলাম। কংক্রীটে তৈরী হল—ভিতরে তিনতলা সমান উঁচু ছাদ। হলের তিনধারে তিনতলায় বারান্দা আর কামরা। হলের মাঝখানে সাধারণ চেয়ার টেবিল সাজানো। আমাদের দমদম বিমান ঘাটির মতো অমন সোফা কৌচ দিয়ে সাজানো জমজমাট কিছু নয়। হলের দুটো সিঁড়ির মাঝখানে দরজার দুপাশে স্তালিন আর হাঙ্গারীর প্রেসিডেণ্ট রাকোসীর দুই আবক্ষ মূর্তি। হলের একদিকটা আগাগোড়া কাঁচের জানালা দিয়ে ঢাকা। বিমান থেকে নেমে ওখানে গিয়েই বসলাম। ইভা মিসেস বি'কে ফোন করে দিলে। জানা গেল, কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি গাড়ি নিয়ে পেঁছুবেন।

খানিক পরে মিসেস বি গাড়ি নিয়ে পেঁছলেন। জানালেন পোল্যাণ্ড যাওয়ার বিমানের টিকিট না পাওয়া পর্যন্ত ওঁদের বাড়িতেই আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। আর তারই ফাঁকে যতটা সম্ভব হাঙ্গারীর অবস্থা ব্যবস্থা ওঁরাই আমাকে দেখিয়ে দেবেন।

হাঙ্গারীর গ্রামে—শহরে

বুদাপেস্ট শহরকে কেন্দ্র করে মিঃ বি'র দেওয়া মোটরে চড়ে—মিসেস বি' ও ইভার সঙ্গে হাঙ্গারীর গ্রাম-শহরের যেটুকু দেখেছি, তা বড় কম নয়।

বুদাপেস্ট শহরে আর তার আশে পাশে বড় বড় দু'চারটে কল-কারখানা দেখেছি, তার মধ্যে গানৎশ্ Ganz অঞ্চলে ক্লেমেণ্ট গটওয়াল্ড ইলেকট্রোফ্যাবরিক বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানাটা সত্যিই দেখবার মতো। রাশিয়া কী বিরাট যন্ত্রপাতি জুগিয়েছে! তাছাড়া বুদাপেস্টের কাপড়ের ও সুতোর কলেও গিয়েছি। তবে সেখানে কাপড়ের চেয়েই সুতোটা বেশী তৈরী করা হচ্ছে যে তা দেখলাম। জানতে পারলাম—সোভিয়েট রাশিয়া তুলো জুগিয়ে রুমানিয়ার মতোই হাঙ্গারী থেকেও সুতো তৈরী করিয়ে বেশির ভাগটাই ফিরিয়ে নিয়ে যায় তাদের দেশে, কারণ হাঙ্গারীর সুতো ও কাপড়ের কলের প্রতিটি যন্ত্রপাতিই যে রাশিয়া থেকে আমদানী করা হয়েছে। আর এই কারণেই হাঙ্গারীতে জামা-কাপড়ের দাম অত্যন্ত বেশী।

এছাড়া বুদাপেস্টের Belojannis কারখানায় আধুনিক টেলিফোন ও টেলিফোনের যন্ত্রপাতি তৈরী করবার ব্যবস্থাও আমাকে দেখানো হলো। হাঙ্গারীর কাপড়ের কলে ও টেলিফোনের কারখানায় পুরুষের চেয়ে মেয়ে মজুরদের সংখ্যাটাই ঢের বেশী।

প্রত্যেকটি কারখানার সঙ্গে তাই একটি করে ক্রেশ বা শিশু রক্ষণাগার আছে। সেখানেই মেয়ে মজুরদের ছেলেপুলে আগলানোর ব্যবস্থা। কেবলমাত্র ছেলেপুলে সামলিয়ে ঘরসংসারের রাঁধাবাড়া করেই সে দেশের সাধারণ মেয়েদের বেঁচে থাকার উপায় নেই। অধিকাংশ মেয়ের স্বামী আট ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করে যা রোজগার করে, তাতে তার নিজের খরচ চালিয়ে স্ত্রী-পুত্র পালন

করার মতো বাড়তি বড় কিছু থাকে না। শুনেছি একমাত্র স্ট্যাখানোভাইট ও খনির মজুরদের স্ত্রীরা কলকারখানায় কাজকর্ম না করেও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। তবে তাদেরও ব্যাগার খাটতে হয় পার্টি আর প্রমোদ উৎসবে। হাঙ্গারীর কয়লা আর পেট্রোলের খনিতে যারা কাজ করে তাদেরই পোয়া বারো। সরকার ও ট্রেড ইউনিয়ন তাদের খুবই তোয়াজ করেন। অন্যান্য শ্রমিক মজুরদের চেয়ে তাদের ঢের বেশী সুখ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, কারণ রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় আয় জোগায় তারা।

রুমানিয়ার মতোই হাঙ্গারীর কল কারখানাতেও মেয়েদের এমন সব কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে দেখেছি, যে সব কাজ করতে হলে বাঙলাদেশের নওজোয়ানরাও হিমসিম খেয়ে যাবে। কম্যুনিস্ট তাঁবেদার এইসব দেশে কাজ না করে, পরের ঘাড়ে খেয়ে বসে আড্ডা দিয়ে জীবন কাটাবার উপায় মেয়েপুরুষ কারুরই যে নেই সেটা বেশ ভাল করেই বুঝে এসেছি। প্রত্যেককেই সরকার ও ট্রেড ইউনিয়নের বাঁধা মাইনেতে খুশি হয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে জীবিকা উপার্জন করতে হয়। খুশিমতো চাকরী ছাড়া বা পাওয়া যায় না। তার উপর কলে-কারখানায় স্কুলে কলেজে বাধ্যতামূলক ব্যায়াম ও সামরিক শিক্ষা নিতে হয়।

বুদাপেস্টের কলকারখানা ছাড়া—নতুন সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সব নতুন নতুন এলাকা ও ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে তাও আমাকে দেখানো হয়েছে। মিঃ বি'র বাড়ির কাছে বুদাপেস্টের ৪নং ডিস্ট্রিক্টে সাবাদ স্যাগোরকোস্ Szabadsagharcos স্কোয়ারে (Kobanyaz) শ্রমিক-পল্লীতে (Villanyi Utza-র) ধারে যে সব তিন চারতলা বাড়ি তৈরী হচ্ছে বা হয়েছে, তাও দেখেছি। সত্যিই খুব সুন্দর ব্যবস্থা তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু গোটা বুদাপেস্ট শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট ঘরবাড়িতে এখনও বেশির ভাগ মানুষ যেভাবে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে থাকে, তার সঙ্গে তুলনা করে দেখলে এ উন্নতি ও অগ্রগতিটুকু বড় বেশী কিছু তাজ্জব বলে মনে

হয় না। কিন্তু সেসব না-জেনে, না-দেখে এদেশে প্রচারিত কম্যুনিস্ট তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির প্রচার-পুস্তিকায় শুধু কেবল নতুন নতুন ঘরবাড়ি ও রাস্তার ছবিগুলি দেখে আমরা মোহিত হয়ে যাই। মনে করি ওদেশের সব শহরে সব গ্রামে ঐ রকম উন্নত ব্যবস্থা হয়েছে। সেটাই মস্ত ভুল হচ্ছে। আমাদের দেশেও নতুন নতুন কলকারখানার সঙ্গে মজুরদের জন্যে ঐ রকম ঘর-বাড়ি গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে দেশের অবস্থাটা যে ভয়ানক রকম উন্নত হয়ে উঠেছে, একথাটা মনে হয় কি?

ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজের ব্যবস্থা বুদাপেস্টের মতো শহরের সব জায়গাতেও যে সমান হয়নি, তাও আমি বুঝতে পেরেছি আন্দায়ালিফোল্‌গ্‌ Angyalifold অঞ্চলের নতুন সরকারী স্কুল Budapest Fokacosi Attalanos Iscola আর ইয়াৎশ উৎকা Jasz Utca অঞ্চলের একটা সাধারণ সরকারী স্কুলের মধ্যে ব্যবস্থার পার্থক্যটা দেখে। আগের ঐ স্কুলের তিনতলা বিরাট বাড়িটা দেখলে সত্যিই মাথা ঘুরে যায়। ভিতরকার ব্যবস্থাও ভারী চমৎকার। মস্ত মস্ত কাঁচের জানালা দেওয়া বিরাট বিরাট ঘরে এক একটি ক্লাশ—প্রত্যেকের বসবার জন্যে আলাদা ডেস্ক ও বেঞ্চি। চমৎকার খেলবার জায়গা, জিমনাসিয়াম ও ক্যান্টিন।

কনডাকটেড্‌ ট্যুরে বিদেশী পর্যটকদের ঐ নতুন বড় স্কুলটাই দেখানো হয় সবাইকে। আমাকেও দেখতে যেতে হয়েছিল সেইমতো ঐ স্কুলটি; সেখানে যাঁরা স্কুলটি আমাকে দেখালেন তাঁরা অবশ্য বললেন যে, হাঙ্গারীর সমস্ত স্কুলেই এখন এমনই উন্নতি হয়েছে। কথাটা হয়তো বিশ্বাস করে ফিরতে হতো এদেশে, যদিনা মিসেস বি. আমাকে বুদাপেস্টের ইয়াৎশ উৎকা Jasz Utca নামে ঘিঞ্জি পল্লীর সাধারণ স্কুলটা দেখাতেন। এই স্কুলটাতে গিয়ে দেখলাম আগের ঐ স্কুলের তুলনায় এর আসবাবপত্র ব্যবস্থা বন্দোবস্ত অনেক খারাপ। ঘরগুলোর দশাও তেমনি। সবচেয়ে অবাক হয়েছিলাম Kerta কের্তা বলে একটি জায়গায় 'কিন্ডার গার্টেন' স্কুল দেখতে গিয়ে।

কের্তায়, প্লুদ (Pflug) গ্রামে যৌথ-প্রথার চাষ বাড়ি গড়ে উঠেছে—সেটাই দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে। কের্তা গ্রামের "রেড স্টার" বা "লাল তারা" কলেক্টিভ্ ফার্মে কাজ আরম্ভ হয়েছে ১৯৫১ সালে। সরকারী সহযোগিতায় চাষবাড়ির বিরাট ব্যবস্থায় যে সব গোয়াল আস্তাবল ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে, যে সমস্ত ট্রাক্টর, কমবাইন ও যন্ত্রপাতি মজুত করা হয়েছে, তা সবই দেখানো হলো আমাকে। সত্যিই সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি নেই, কিন্তু কলেক্টিভ্ ফার্মের আস্তাবলে, গোয়ালে—গরু ঘোড়া একটিও দেখতে পেলাম না। জনমজুরও তেমন বেশী দেখলাম না ধারে কাছে। তবে হ্যাঁ, ফার্মের কর্তারা বেশ স্মার্ট, বলিয়ে-কইয়ে। চাষবাড়ির সাধারণ চাষী-মজুরদের তুলনায় তাঁরা বেশ ফিটফাট্। শুনলাম তাঁদের মুখে সোভিয়েট ব্যবস্থার প্রশস্তি। তাঁরাই দেখালেন তাঁদের ফার্মের দপ্তর ও বৈঠক-ঘর। গ্রামের চাষ-বাড়ির বৈঠক ঘরেও বসানো হয়েছে শ্বেতপাথরে গড়া স্তালিনের বিরাট আবক্ষ মূর্তি।

ফার্ম দেখে ফেরার পথে আবার নজরে পড়ে গাছপালার বেড়া দেওয়া গ্রামের চাষীদের কুটীর ও জীর্ণ ঘরবাড়ি। সেগুলোর সংস্কার হয়নি। সাংস্কৃতিক উন্নতির কাজ চলছে পুরোদমে। পার্টি থেকে ট্রেনার এসেছে। চাষীদের ইউনিফর্ম পরিয়ে ভাঙা ঘরের পাশে মাঠে জড়ো করে ফুটবল খেলার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, গ্রামের যুবতীদের নাচ শেখানো হচ্ছে তাড়া লাগিয়ে। ঐ গ্রামেই তা দেখা গেল।

কের্তা অঞ্চলে—গ্রামের কিণ্ডারগার্টেনে গেলাম। ছোট ছেলে-মেয়ে যারা পড়তে এসেছে, তাদের বেশভূষা, আর স্কুল বাড়ির দশা দেখে চোখে ভেসে উঠলো—বুদাপেস্টের বিরাট সেই স্কুল-বাড়িটার ছবি, আর শহরের ভাগ্যবান স্ট্যাখানোভাইট আর হোমরা-চোমরাদের ছেলেমেয়ের সাজ-পোশাক।

শহর আর গ্রামের জীবনে তফাৎটা আর সব দেশের মতই এখানে এমন করে যে দেখবো, সত্যি এটা ভাবতে পারিনি, তাই খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম কের্তা অঞ্চলে গিয়ে।

বুদাপেস্টের ৪নং ডিস্ট্রিক্টে একটা নতুন হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়েছে। সেটিও আমাকে দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রকাণ্ড আটতলা বাড়ি, বড় বড় কাঁচের জানলা দিয়ে গড়া খোলা-মেলা এ এক অপূর্ব হাসপাতাল। রোগীদের বিছানাপত্র সাজ-সরঞ্জাম, সত্যিই দেখবার মতো।

মিঃ বি আমাকে নিয়ে গেছলেন—বুদাপেস্টের People's Youth of Hungary নামে কেন্দ্রীয় যুব-সংগঠনের অফিসে। বুদাপেস্টের ৮নং ডিস্ট্রিক্টের মিউজিয়ম উৎকা নামে রাস্তার ওপরে বিরাট বাড়িতে। সেখানেই দেখা হলো তরুণ লেখক ও ডেপুটি মন্ত্রী Sandor Nagyর সঙ্গে। তিনি ১৯৫২ সালে স্তালিন পুরস্কার পেয়েছেন। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি! ওঁর কাছে জানতে পারলাম —রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' ও 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ করেছেন Bartos Zoltan ও Zsddas Beno.

বুদাপেস্টের বন্ধুদের সহায়তায় ওখানকার দোকান বাজার দেখবার, সাধারণ মানুষের আয়ব্যয়ের খোঁজখবর জানবার সুযোগও পেয়েছিলাম। ওখানে একেবারে যারা গতরে খেটে মজুরিগিরি করে তাদের মাস-মাইনে ৩০০ থেকে ৪০০ ফোরিণ্ট অর্থাৎ প্রায় ১৩০ থেকে ১৭০ টাকা। যারা ওদের চেয়ে একটু নিপুণ বা আধা-ওস্তাদ মজুর—তারা মাইনে পায় ৪৮০ থেকে ৬০০ ফোরিণ্ট অর্থাৎ ২১০ থেকে ২৬০ টাকা। যারা হাতেকলমে কোনও বিশেষ ধরনের কাজ শিখেছে—বা 'স্কিল্‌ড্‌ লেবার' তেমন লোকেরা ও খনির মজুররা মাইনে প্রায় ১০০০ থেকে ১২০০ ফোরিণ্ট। আর যারা ইঞ্জিনীয়ার বিশেষজ্ঞ, ম্যানেজার তাঁদের মাস মাইনে ৩০০০ থেকে ৫০০০ ফোরিণ্ট্‌ অর্থাৎ তেরশো থেকে বাইশশো টাকার মতো। বুদ্ধিজীবী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, কেরাণী, অফিসের চাকরদের মাইনে কিন্তু ঐ আধা-ওস্তাদ মজুরদের সমান। তবে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী-দের মাইনে স্কিলড-লেবারদের সমান এটা শুনেছি।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে হাঙ্গারীতে সব জিনিসের দাম কমেছে বলে সারা পৃথিবীতে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু তারও মাসখানেক পরে জিনিসপত্রের দাম কি রকম—তাও দোকান বাজারে

গিয়ে, যেটুকু জেনেছি তাও জানাচ্ছি। এক কিলো (প্রায় পাঁচপো) আলুর দাম ১ ফোরিণ্ট ৫০ ফিলার অর্থাৎ প্রায় ৯ আনা। এক কিলো শসার দাম ২ ফোরিণ্ট—বারো তেরো আনা। গাজর এক সের ৯ আনা, এক কিলো টমাটো ১০ আনা। বাঁধাকপিটা খুব সস্তা—৩ আনায় এক কিলো পাওয়া যায়। ২০ থেকে ২২ ফোরিণ্ট বা দশ টাকা দিলে ১ পাউন্ড শুয়োরের মাংস বা পোর্ক মেলে আর মাখন আধ সেরের দাম—৩২ ফোরিণ্ট বা ১৩৷৷০ টাকা। কাজেই ওদেশের মজুররা মাস মাইনেতে কতটা কি খায় তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্রের দামটা কি রকম তা বুদাপেস্টের ফ্যাসন হাউস "IVATCSARNUK" নামে চারতলা বাড়ির বিরাট দোকানে গিয়ে টের পেয়েছি। জিনিসপত্রের গায়ে আটকানো দামের লেবেল দেখেই লিখে এনেছি। দামের লেবেলে Regi Ar বা Original Price কেটে কমিয়ে যে দাম হয়েছে তা লেখা হয়েছে। যেমন Ferfi Sport বা পুরুষদের স্পোর্টিং স্যুট—অর্থাৎ হাফপ্যাণ্ট ও হাফশার্ট—তার দাম ছিল ৭৫০ ফোরিণ্ট, কেটে হয়েছে ৫৮৫ ফোরিণ্ট। Ferfi cipo বা পুরুষদের জুতোর দাম ছিল ১৯৫ ফোরিণ্ট, কমিয়ে হয়েছে ১৪০ ফোরিণ্ট অর্থাৎ দাম কমেও একজোড়া জুতোর দাম ৬০ টাকা। পুরুষদের গরম পোশাক ১০৪০ ফোরিণ্ট—দাম কমিয়ে করা হয়েছে ৮৫০ ফোরিণ্ট। মেয়েদের গাউন দাম ছিল ৯৪০ ফোরিণ্ট কমে হয়েছে [illegible] ফোরিণ্ট। বাচ্ছাদের সাধারণ জুতো একজোড়া আগে ছিল ৮[illegible] ফোরিণ্ট, কমে ৫৪ ফোরিণ্ট। এই কটা জিনিসের দামের সঙ্গে হাঙ্গারীর জনসাধারণের মাসমাইনের হিসেবটা খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে ওদেশের লোক কেমন সুখে আছে।

কেবলমাত্র জিনিসপত্রের দাম আর আয়ের তারতম্যেই মানুষকে সেখানে দাবিয়ে রাখা হয়নি। এর উপর আরও অনেক রহস্য আছে। কলকারখানায় কম্যুনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি জোর করে শ্রমিক মজুরদের আনুগত্যটুকু বজায় রাখতে হবে। তাই মাস মাইনের বাইরে মজুর শ্রমিকদের বছরে একবার করে পোশাক পরিচ্ছদ

বাবদ বোনাস ও লয়ালটি বোনাস দেওয়ার এক অতি বিচিত্র ব্যবস্থা হয়েছে, তবে সেটা ইউনিয়ন বা দলের কর্তাদের খেয়াল খুশি মাফিকই দেওয়া ও কেড়ে নেওয়া হয়ে থাকে। ব্যাপারটা কি রকম হয় তারও একটা উদাহরণ দিয়েছে আমাকে একজন মজুরের স্ত্রী। তার স্বামী এক বছরে মাত্র তিন দিন কাজে কামাই করেছিল এবং কামাই করার সে যে কারণ দেখিয়েছিল তাতে ইউনিয়নের কর্তারা খুশী হননি। তাই পোশাক পরিচ্ছদের বোনাস বাবদ ৮০০ ফোরিণ্ট লয়ালটি বোনাস বাবদ ৩৫০ ফোরিণ্ট ও তিন দিনের কামাইয়ের জরিমানা বাবদ ৯০ ফোরিণ্ট মোট ১২৪০ ফোরিণ্ট তার পরের বছরের মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হয়েছিল।

শুনলাম অসুস্থতা ছাড়া কাজে কামাই করা ভয়ানক অপরাধ এবং বিশ্বাসঘাতকতা বলেই গণ্য হয়। কামাইয়ের কারণটা কর্তাদের বিশ্বাস করাতে না পারলে কঠোর শাস্তি। বোনাস তো মেলেই না মাইনে কাটা যায়। সময় সময় অন্তরীণ করাও হয়। কারখানার ম্যানেজারদের হাতে অসম্ভব ক্ষমতা। সেটি বজায় রাখতে মজুর চাষীদের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ লোককে গুপ্তচরের কাজে লাগিয়ে বাড়তি পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অভাব কষ্টটা আছে বলেই এই নোংরা কাজেও যথেষ্ট লোক মেলে।

হাঙ্গারী দেখতে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ওদেশের ভিতরকার এইসব রহস্য জানতে পেরে তিক্ত অভিজ্ঞতায় মনটা এমনই মুষড়ে পড়লো ও শঙ্কিত হলো যে মিঃ বি'কে বললাম—এরপর আর পোল্যাণ্ড যেতে সাহস হচ্ছে না।

তিনি বললেন, 'আপনার কোনও ভয় নেই—পোল্যাণ্ডের "ORBIS" (Polskie Biuro Podrozy) সরকারী ট্রাভেল এজেন্সীর কর্তাদের মধ্যেও আমার বন্ধু আছে, তাঁদেরই একজনের কাছে চিঠি দিয়ে দেবো। তারাও আমার মতোই আপনাকে সে দেশটি নিরাপদে দেখিয়ে ফেরত পাঠাবেন আমার কাছে। তাছাড়া কদিন পরেই সেখানে IUS বা ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেণ্টসের উদ্যোগে বিশ্বছাত্র কংগ্রেস আরম্ভ হবে। সেই উপলক্ষে অনেক বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীই এখন সেখানে যাচ্ছে। কাজেই পুলিশ ও

গুপ্তচরদের কড়াকড়িটা কমই থাকবে। তাইতো খুব সহজেই আপনার আসন পাওয়া গেছে—পোল্যাণ্ডের বিমানে। ও'রা খুব যত্ন করে নিয়ে যাবে, দেখাবে—যা যা দেখানো দরকার। তবে হাঙ্গারী ও রুমানিয়ায় সব কিছু দেখে আপনি মুগ্ধ হয়েছেন, খুশী হয়েছেন—এই কথাই অচেনা অজানাদের কাছে সব সময় বলবেন। খুব কম কথা বলবেন।"

মিঃ বি আরও বলে দিলেন—বুদাপেস্টে হয়ে ফেরবার ব্যবস্থা ওখানকার ট্রাভেল এজেন্সী ঠিক সময়ে করে দেবেন। ও'রা খবরটা জানিয়ে দিলে উনি আমার ভিয়েনা যাওয়ার বার্থ রিজার্ভ করে রাখবেন। মালপত্র সব তুলে দেবেন, কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হবে না। মিসেস বি বললেন—"সত্যসন্ধানী শান্তিকামী ভারতবর্ষের সাংবাদিক আপনি বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আপনার এসব দেশ দেখে যাওয়া উচিত।"

ক'দিন আগের অচেনা অজানা হাঙ্গারীয়ান বন্ধুর কাছ থেকে চিরদিনের চেনা বন্ধুর মত ভরসা ও প্রেরণা পেলাম। দুঃসাহসে ভর করে পোল্যাণ্ডের পথে পা বাড়ালাম।

পোল্যাণ্ডে কয়েকদিন

হাঙ্গারীর বুদাপেস্ট বিমানঘাটিতে মিঃ বি ও মিসেস বি'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাসপোর্ট ও ভিসা দেখিয়ে, বিমানঘাটির কাস্টমস চেকিং-হলে গেলাম। দেখি পোল্যাণ্ড যাত্রীদের মধ্যে বুখারেস্ট ফেরৎ অনেক চেনা-মুখ বিদেশী সাংবাদিক আর বিভিন্ন দেশের যুব-প্রতিনিধিদলের ছাত্র-নেতা। চলেছেন পোল্যাণ্ডের আন্তর্জাতিক ছাত্র-কংগ্রেসের অধিবেশনে। ও'দের মধ্যে ইংরেজী-ভাষী সঙ্গী পাবো ভেবে খুবই আনন্দ হলো। আমাকে ও'দের সঙ্গে পেয়ে ও'রাও কেউ কেউ যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করলেন। কাস্টমস চেকিংয়ে একটা মজা দেখলাম, আমরা যারা বুখারেস্ট-ফেরৎ বিদেশী, তাঁদের ব্যাগ স্যুটকেস কিছুই ও'রা তল্লাসী করলেন না। তবে পোলিশ ও হাঙ্গারীয়ান যাত্রীদের বাক্স-পে'টরা, পোশাক-পরিচ্ছদ তন্ন তন্ন করে তল্লাসী হলো।

তল্লাসী শেষ হওয়ার পর আমরা প্রায় আঠারোজন যাত্রী বিমানে গিয়ে উঠলাম। বিমানটার নাকের ডগায় লেখা LOT আর পাশের দিকে গায়ে লেখা রয়েছে—POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT আমাদের দেশের ডাকোটা ধরণের বিমান। ভিতরে দুধারে একদিকে চৌদ্দজন অন্যদিকে সাতজন মোট একুশজনের বসার জায়গা। বসবার আসনগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর বেশ চওড়া। বিমানের পিছনের অংশে বাঁ-দিকের শেষ জানলাটার ধারের দুটি আসনের একটি ইসারায় দেখিয়ে এয়ার হোস্টেস বা পোলিশ হাওয়াই-সখী আমাকে সেখানেই বসবার অনুরোধ জানালেন। একাই আমি সেখানে গিয়ে বসলাম। আর সবাই সামনের আসনগুলিতে যথারীতি আসন গ্রহণ করলেন।

বিমান ছাড়লো। ঘড়িতে তখন সাতটা। একটা জিনিস লক্ষ্য

করলাম, আমাদের দেশের বিমানগুলোর মতো অত বেশী শব্দ শোনা যায় না। বিমান ছাড়বার পর বিমানের যাত্রীদের সবাইকে কফি ও বিস্কুট দুহাতে বিলিয়ে হাওয়াই-সখী আমারই পাশটিতে এসে বসলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললেন—"আপনার সাদা ভারতীয় পোশাক আর টুপিটা ভারী সুন্দর। ভারতীয়দের আমার খুবই ভালো লাগে।" কফিতে চুমুক দিতে দিতে আমি বললাম—"পোলিশদেরও আমার খুব ভাল লাগবে যে তা বুঝতে পারছি।" মেয়েটি তখন হেসে বললে—"ভারতবাসীদের সম্বন্ধে আমাদের ভারী কৌতুহল——তাইতো আপনাকে এখানে বসতে বললাম। ভারতবর্ষের গল্প কিছুটা শুনে নেবো। শোনাবেন তো?"

—অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে! কিন্তু গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আমাকে বিমান থেকে নীচের দ্রষ্টব্যগুলো চিনিয়ে দিতে হবে। বিমানে চড়লেই আমার নীচের ঘরবাড়ি শহর সব কিছু দেখবার নেশাটা পেয়ে বসে।

মেয়েটি বললে—"এটাতো ভারী অদ্ভুত কথা! আমি তো দেখি উপরে উঠলেই সবাই নীচের দিকে তাকাতে ভয় পায়।"

আমি হেসে বললাম—"ভারতবাসী কিনা! নাড়ির টানটা মাটি মায়ের ওপরেই বেশী। মাটিই সত্য, শূন্য মিথ্যা।"

মেয়েটি উৎফুল্ল হয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে বললে—"কি সুন্দর কথা বলেন আপনারা ভারতীয়েরা—ভারতীয় মাত্রেই অত্যন্ত জ্ঞানী. তাই আমার ভারতীয়দের খুব ভাল লাগে।"

এরপর মেয়েটির পরিচয় জানা গেল। নাম তার গোল্‌বায়াকোভা (Golebiakowa) বাড়ি ওয়ারশ শহরের "মুরানোভ্‌" (Muranow) অঞ্চলে।

কথা বলতে বলতে নীচে তাকিয়ে দেখি আমাদের উড়োজাহাজ উড়ে চলেছে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়-পর্বতের উপর দিয়ে। গোল্‌বা জানালে গেলন এখন চলেছে চেকোস্লোভাকিয়ার 'তাত্রা' বা 'তাত্রি' পর্বতশ্রেণীর চূড়োগুলো ডিঙিয়ে পোল্যাণ্ডের ক্রাকুভ্‌ (ক্রাকাও) শহরের দিকে।

ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় দেখতে দেখতে আমাদের বিমান ঘণ্টা খানেক পরে 'ক্রাকাও' বিমানঘাটিতে নামলো। পোলরা বলে 'ক্রাকুভ্'। চারপাশে পাহাড়ের সারি। গোল্‌বা বললে—জুরা ক্রাকুভ্‌স্কি পর্বতমালার মাঝখানেই এই শহর, তাই ঐ নাম।

বিমানের যাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ওখানেই নামলেন—জানালেন ক্রাকাও শহরটা দেখে তারপর 'ওয়ারশ' (ভার্শাভা) যাবেন। বাকি যাত্রী আমরাও নামলাম। সকলের ভিসা ও পাস-পোর্ট ওখানেই পরীক্ষা করা হলো। তারপর বিমানঘাটির রেস্তোরাঁতে কফি, মাখন, রুটি, ডিমভাজা দিয়ে ব্রেকফাস্ট খেলাম, খাওয়ালাম 'গোল্‌বা'কেও। খরচ হলো বারো স্লোতি, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চৌদ্দ টাকা।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মেয়েটির মুখেই শোনা গেল ক্রাকাওয়ের ইতিহাস নাকি হাজার বছরের পুরানো।

দ্বাদশ শতাব্দীতে 'ক্রাকুভ্' শহরই ছিল পোল্যাণ্ডের রাজধানী। তাতাররা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম যেবার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে, সেবার নাকি তারা এই শহরের দুর্গ, প্রাসাদ সব জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তারপর আবার চতুর্দশ শতাব্দীতে পিয়াস্ত বংশের শেষ রাজা কাশিমিরশ ভিয়েল্‌কী (Kazimierz Wielki) এই শহরকে নতুন করে সাজিয়ে গুজিয়ে গড়ে তোলেন। এইখানেই ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে তাঁরই রাজত্বকালে। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাস লেখাপড়া শেখেন। এই সব মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য ওদেশের একজন এয়ার হোস্টেসের মুখ থেকে শুনে মুগ্ধ হলাম। আর তাই পকেট থেকে নোট বই বার করে চটপট সেগুলো লিখেও নিলাম।

গোল্‌বা জানালে ক্রাকুভ্ শহরের জাদুঘরে, বিভিন্ন গির্জায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পোল্যাণ্ডের শিল্পকলার যেমন সব অপূর্ব নিদর্শন সংগ্রহ করা আছে, তেমনটি পোল্যাণ্ডের অন্য কোনও শহরে নেই। গোল্‌বা বললে—হাঙ্গারীতে ফেরবার পথে 'ক্রাকুভ্' শহরটাও যেন

দেখে যাই। আমি বললাম—"আগে এটুকু জানলে এ শহরটা দেখেই 'ওয়ারশ'তে যেতাম।"

গোল্‌বা সরল হাসি হেসে বললে—"না! না! তাহলে ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গটা কতটুকুই বা পেতাম, সেটা করেননি যে ভালোই করেছেন। বেশতো! আমি যেদিন ডিউটিতে 'ক্রাকুভ্' আসবো—সেদিন যদি ফিরতে পারেন—সব দেখিয়ে দেবো।

প্রায় আধঘণ্টা পরে 'ক্রাকুভ্' থেকে বিমান ছাড়লো। নীচে ভিশচুলা নদী দেখা গেল। তারপর পোল্যাণ্ডের সমভূমি গ্রাম শহর পেরিয়ে বিমান উড়ে চললো। ডানদিকে খালি একবার একটা বড় শহর দেখা গেল। গোল্‌বা জানালে—ওটার নাম "রাদম"।

সাড়ে ন'টা নাগাদ বিমান পৌঁছুলো পোল্যাণ্ডের রাজধানী 'ওয়ারশ' শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'ওকেচী' (Okecie) বিমান ঘাটিতে। বাইরে থেকে ওকেচী বিমানঘাটির বাড়িটা দেখতে অনেকটা আমাদের দমদম বিমানঘাটির মতই। প্রশস্ত উঁচু দোতলা বাড়ির উপর অবজারভেশন টাওয়ার।

বিমান থেকে নেমে বিমানঘাটিতে যেতেই আন্তর্জাতিক ছাত্র-কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা এগিয়ে এলেন। আমরা যে পাঁচ সাতজন বিদেশী অতিথি ছিলাম, তাদের সকলকেই তাঁরা ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রত্যেকের কাছেই জানতে চাইলেন, বুখারেস্টের বিশ্ব যুব উৎসব উপলক্ষ্যে পোল্যাণ্ডের কোনও প্রতিনিধির সঙ্গে বন্ধুত্ব বা আলাপ পরিচয় হয়েছিল কিনা। সকলেই পোল্যাণ্ডের বন্ধুদের নাম-ঠিকানা বা রেফারেন্স জানালেন। পোল্যাণ্ডের যেসব বন্ধুর সঙ্গে বুখারেস্টে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিল, তাঁদের নাম ঠিকানাতো জানালামই, অনুরোধ করলাম, ওঁদের যেন খবর দেওয়া হয়, আমি এসেছি জানিয়ে। ও'রা জানালেন সেই খবরটা তাঁদের দেবেন বলেই তো ও'রা রেফারেন্স চাইলেন। আতিথ্যের এই প্রাথমিক ব্যবস্থাটা সত্যিই খুব ভালো লাগলো।

তারপর যখন বিমান কোম্পানীর বাসে গিয়ে চড়লাম আমরা

সবাই, তখন দেখলাম—আমাদের মালপত্তর সব আগেই এসে গেছে গাড়িতে। 'গোল্‌বাও আমাদের সঙ্গে ঐ বাসে উঠলো—আবার পাশে এসে বসলো। বললো—"শহর—পর্যন্ত আপনার সঙ্গী হলাম, এখন বলতে পারেন 'বাস-হোস্টেস'!" আমি বললাম—"আমার খুব সৌভাগ্য, অনেক ধন্যবাদ। আরও খুশী হতাম—বিমানে যাঁর অতিথি ছিলাম—শহরেও তাঁর অতিথি হতে পারলে।"

গোল্‌বা চাপাগলায় বললে—"এ আপনার মহানুভবতা! আপনি আমাদের সরকার ও জাতির অতিথি—আপনাকে কি আমার ঘরে অতিথি করতে পারি, ইচ্ছে থাকলেও তা সম্ভব নয়। তবে আপনার কোনও কাজে লাগতে পারলে, আপনার সঙ্গ মাঝে মাঝে পেলে ধন্য হবো।"

বাস চললো শহরতলির চওড়া রাস্তা দিয়ে। শহরের কেন্দ্র পৌঁছুবার আগে পথে পড়লো 'ওয়ারশ' শহরের রাকোভিচ্ (Rakoweic) ও ওকোটা (Ochota) অঞ্চল। ঐসব অঞ্চলে শ্রমিকদের থাকবার জন্যে একদিকে যেমন নতুন নতুন ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে দেখলাম, অন্যদিকে তেমনি দেখলাম গত মহাযুদ্ধে বোমায় গুঁড়িয়ে দেওয়া ঘরবাড়ি প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ। ইট, পাঁচিল ভাঙা, বাঁকানো দুমড়ানো কড়ি বর্গার পাহাড়। বড় বড় ঘরবাড়িগুলো যেভাবে বোমা ফেলে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা দেখলে চোখফেটে জল আসে, বোঝা যায় আজকালকার যুদ্ধ কি ভয়ঙ্কর বস্তু। দেখলাম চারিদিকে ধ্বংসস্তূপের জঞ্জাল সরানোর কাজে—আর ভারাবাঁধা ঘরবাড়ি ও নতুন নতুন রাস্তা তৈরির কাজে হাজার হাজার লোক লেগেছে।

শ্রমিক, মজুর, রাজমিস্ত্রী যারা এসব কাজ করছে—তাদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ, ছেলেবুড়ো সব বয়সের লোকই দেখতে পেলাম। লক্ষ্য করলাম, পুরুষ শ্রমিকদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই খালি গায়ে কাজ করছে। আমি বললাম—"সত্যি! তোমাদের দেশে বেকার সমস্যা সমাধানের চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে! ছেলে-বুড়ো সকলকেই খাঁটি দেশগড়ার কাজে লাগানো হয়েছে।" গোল্‌বা

গলার স্বর নামিয়ে বললে—"তার চেয়ে চমৎকার আপনার তারিফের ভাষা।"

তারপর আমরা মস্ত চওড়া রাস্তা জেরোস্তোলিমস্কীৎস্ (Al Jerozolimiskich) এভিনিউ ধরে 'ওয়ারশ' শহরের কেন্দ্রীয় রেল স্টেশনের সামনে দিয়ে পড়লাম শহরের মাঝখানে চৌমাথায়। পুরানো রেল স্টেশনটা ভেঙেচুরে বড় করে নতুন স্টেশন তৈরী হচ্ছে। ঐ রাস্তার দু'পাশেও কিছু ভাঙা ঘরবাড়ি দেখলাম।

ওয়ারশ শহরে ঢোকার পর সব অতিথিরই নজরে পড়ে চারিপাশে ঐসব ঘরবাড়ি রাস্তা ও শহর তৈরীর কাজ। চারধার থেকে কানে আসে ক্রেণ, বুলডোজার, আর রিবেট ঠোকার ঘড়ঘড়, ঠকঠক দুম্‌দাম আওয়াজ। তার উপর পুরানো ধরনের ছোট ছোট ট্রাম চলেছে ঘড়াং ঘড়াং ঝং ঝং করে।

শহরের মাঝখানে পাহাড়ের টিলার উপর 'সাইলেশিয়ান-দারোস্কা' নামে নতুন একটা বিরাট পুল তৈরী হয়েছে। এরই নীচে সুড়ঙ্গের তলায় প্লাৎস্ জামকোভী (Plac zamkowy) বা জামকোভী স্কোয়ার। এইটাই হলো পোল্যান্ডের বিখ্যাত নতুন রাস্তা পূব-পশ্চিম সড়কের কেন্দ্রস্থল। এখানে আসতেই পুরানো ওয়ারশ শহরের ঘরবাড়ি ক্যাসল ইত্যাদি দূর থেকে নজরে পড়লো। শহরের মাঝখানে পাহাড়ে টিলার উপর এই জায়গাটা ভারি অদ্ভুত। উপর দিয়ে নীচে দিয়ে বড় বড় চওড়া পুল, সুড়ঙ্গ আর রাস্তা যেভাবে তৈরী করা হয়েছে তাতে অবাক না হয়ে পারা যায় না। ঠিক যেন গোলকধাঁধাঁ। এই সমস্ত পুল ও সুড়ঙ্গ ঘুরপাক খেয়ে বাস চললো জেনারেল স্বিরসডিউস্কী-ভলটার এভিনিউ ধরে। খানিকটা এগিয়ে আমাদের এক ইয়ুথ হোস্টেলে নামানো হলো। 'গোল্‌বা' ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। জানিয়ে গেল, আমার আস্তানাটা তার দেখা রইল। বিকেলে এসে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।

পোলিশ যুব-ইউনিয়ন ZMP (Zwaizku Mlodziezy Polskiej)-এর অধীনে এই হোস্টেল বা অতিথি-আবাস। ছোট্ট

হলেও ভারি সুন্দর ব্যবস্থা বন্দোবস্ত। বিদেশী অতিথিদের সেবায় যুবক-যুবতী স্বেচ্ছাসেবকরাই ওখানে রাঁধাবাড়া পরিবেশন পরিচর্যা করেন যে, তা বুঝতে পারলাম। ওখানে যেসব যুবক-যুবতী কাজ করছে, তাদের মধ্যে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান-রুশ ভাষা জানা ছেলেমেয়েও যে কয়েকজন আছে তাও টের পেলাম তাদের বিভিন্ন ভাষার কথাবার্তা শুনেই।

ছোট্ট একটি ঘরে চারজনের শোবার জায়গা। তবে সে ঘরটিতে আমাকে একলাই থাকতে দেওয়া হলো। বেলা তখন এগারোটা বেজেছে, তাড়াতাড়ি চান সেরে এলাম। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, কিন্তু চাইবার তো উপায় নেই। কি আর করি, বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

এমন সময় একটি যুবক আর একটি যুবতী ঢুকলো কয়েকটি আপেল ও একপাত্র কফি ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে। ঘরের মধ্যে টেবিলে বসে তাই খেলাম। ওরা জানালে—একটু পরেই বাসে করে অতিথিদের নিয়ে যাওয়া হবে ভিশ্‌ৎলা (ভিশচুলা) নদীর ওপারে 'প্রাগা' অঞ্চলটা দেখাতে। আর জানতে চাইলে আমি সে দলের সঙ্গে যাবো, না অন্য কোথাও যেতে চাই।

আমি বললাম—"পোল্যাণ্ডে এর আগে না এলেও পোল্যাণ্ডের গৌরব জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীতস্রষ্টা সাপাঁর (Chopin) প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা আছে। সুরের রাজার বাড়ি শুনেছি পোল্যাণ্ডের রাজধানী 'ওয়ারশ'তেই—সেই মহাতীর্থটি আমি সব আগে দেখতে চাই।"

ছেলেটি বললে—"বেশ্! আপনি সেখানেই ঘুরে আসুন। তবে দলের সঙ্গে না গেলে আপনাকে ট্রামে-বাসেই ঘুরতে হবে, অবশ্য সঙ্গে যাবে এই মেয়েটি—"তাভারিশাইশা (কমরেড) ক্রিশিশা (Kryzyza)। আমি বললাম—"অনেক ধন্যবাদ, ট্রামে-বাসে ঘুরতে বা হাঁটতেও আপত্তি নেই।" তখনই সেই ব্যবস্থা হলো—আমি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ট্রামে চেপে আবার এলাম শহরের মাঝখানে সেই গোল-ধাঁধার

কেন্দ্রে। ছোট বড় কয়েকটা রাস্তা পেরিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে হাজির হলাম শ্যপাঁ যে বাড়িটাতে থাকতেন সেখানে। যেখানে বসে তিনি তাঁর অপূর্ব সব সুরসৃষ্টি করেছিলেন সেই পরম তীর্থে।

নির্জন বাগানের মাঝখানে বাড়িটি ভারী সুন্দর। ঘরগুলো ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। ঘরে ঘরে রয়েছে সুরকারের সাজ-পোশাক, রকমারি বয়সের ছবি। আছে তাঁর বেহালা, পিয়ানো সবই। সুরেগলানো আঙুলের আঁচড়-কাটা স্বরলিপির জীর্ণ কাগজগুলি বুকে আঁকা রয়েছে, তাঁর এতুদ, প্রিল্যুদ, ভালৎশ্-এর সুরদেহ। সুরের দেহ ও কাঠামো ঠিকই আছে—নেই সুরকার, নেই সুরের প্রাণ। এসব দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছলাম। পরিবেশটি ভারী নির্জন। লক্ষ্য করলাম, বিদেশীরা বড় কেউ জায়গাটি দেখতে যায়নি। এর কারণ কি, জানতে চাইলে—ক্রিশিশা ভয়ে ভয়ে চারিধার দেখে নিয়ে বললে,—"কাউকে যদি না বলেন, তবে বলতে পারি। ব্যাপারটা হলো রুশরা একবার পোলরাজ্য দখল করে, তখন শাপাঁ তার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং পালিয়ে গিয়ে প্যারিতে ছিলেন। রুশরা তাই খুব ভালো চোখে দেখে না শাপাঁকে। আর রুশরা অসন্তুষ্ট হবে এই ভয়েই রুশভক্তরা কেউ এখানে আসে না। বলেন, 'শাপাঁ' বুর্জোয়া!' আমরা পোলজাতিরা কিন্তু শাপাঁর জন্যে মনে মনে সবচেয়ে বড় গর্ব অনুভব করি।"

শাপাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ক্রিশিশা তার মনের পরিচয় দিয়ে ফেললে।

শাপাঁর বাড়ি দেখে আবার ফিরলাম সেই জামকোভী স্কোয়ারে। ওয়ারশ শহরের যত বিখ্যাত দ্রষ্টব্য, আর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন ঘরবাড়ি আছে, এরই কাছাকাছি ক্রাকুভ্স্কি প্রশেদমায়েস্কি (Krakowzkie Prozedmiescie) রাস্তার দুধারে। এই রাস্তার উত্তর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে রাজা তৃতীয় সিগিসমুন্দের স্মৃতিস্তম্ভ। মস্ত উঁচু স্তম্ভের মাথায় রাজার মূর্তিটি দাঁড়িয়ে আছে ডান হাতে খোলা তলোয়ার আর বাঁ-হাতে ক্রশ নিয়ে। আর একটু এগিয়ে

গিয়েই আমরা দেখতে পেলাম ঊনবিংশ শতকের পোল্যাণ্ডের মহাকবি আদম মিৎস্‌কাইয়েভিচের (Adam Mickievwicz) মূর্তি। মস্ত উঁচু স্তম্ভের উপর কবি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সৌম্য প্রশান্ত ভঙ্গীতে। মূর্তিটির পিছনে একটি যাদুঘরে কবির রচনার পাণ্ডুলিপি ও বিভিন্ন বয়সের ছবি ইত্যাদি সযত্নে রাখা হয়েছে। ক্রিশিশা আমাকে দেখালে তাঁর লেখা "প্যান্ তাদিয়ুশ্" (Pan Tadeusz), "শিয়াদাই" (Dziady) প্রভৃতি অমর মহাকাব্যের গ্রন্থ। এখান থেকে কিছু দূরে ঐ রাস্তার দক্ষিণ প্রান্তে পুরানো স্তাৎজিক্ প্রাসাদ। তার সামনেই রয়েছে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কোপারনিকাসের মূর্তি। মূর্তিটিতে কোপারনিকাস বসে আছেন বাঁ-হাতে ভূমণ্ডলের প্রতীক একটি গোলক নিয়ে। ঐ পুরানো প্রাসাদটিতে এখন স্থাপিত হয়েছে ওয়ারশর সায়েন্স একাডেমী। বাড়িটার উপরে লেখা রয়েছে Societas Scientiarvm Varsaviensis।

ঐ রাস্তা থেকে আমরা পড়লাম নোভী স্বোয়াত (Nowy swiat) বা নিউ সোভিয়েট স্ট্রীট। নোভী স্বোয়াত স্ট্রীট আর জেরোশোয়েমিস্কী এভিনিউ যেখানে মিশেছে—সেই চৌমাথার মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় ভবনের বিরাট বাড়িটি। এটি পোল্যাণ্ডের শ্রমিকদের স্বেচ্ছাশ্রম ও টাকায় গড়া হয়েছে শুনেই বুঝলাম ভিতরকার রহস্যটা। এখান থেকে কিছু দূরে সেণ্ট আলেকজাণ্ডার গির্জাটি দেখলাম। গির্জার মাঝখানের অংশটা গোল গম্বুজের আকারে গড়া। বহু লোক ঐ অসময়েও সেখানে প্রার্থনা করছে যে তা নজরে পড়লো।

এরপর গেলাম উয়াশদাভ্স্কী এভিনিউর গোড়ার দিকটা থেকে পায়েক্না (Piekna) স্ট্রীট পর্যন্ত যে রাস্তাটুকুর নাম হয়েছে জোসেফ স্তালিন এভিনিউ—সেখানটাতে। পোলিশ ভাষায় 'পায়েক্না' কথাটির মানে 'সুন্দর', 'চমৎকার'! সত্যিই তাই।

সবশেষে গেলাম নতুন ওয়ারশ'র গৌরব প্লাৎস্ কন্স্তিচুয়েয়ী (Plac Konstytueji) বা কনস্টিটিউন স্কোয়ার দেখতে। এই

স্কোয়ারের চারপাশের রাস্তা ও বড় বড় বাড়িগুলি দেখলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। রাস্তার আলোগুলি দেখবার মতো। এই অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত নাম হলো MDM।

শহর ঘুরতে গিয়ে আর একটি জিনিস দেখে আকৃষ্ট হলাম—সেটি হচ্ছে ছোট বড় নানা আকারের রংচঙে পোস্টার ও হোর্ডিং লাগানো হয়েছে শহরের চারিধারে রাস্তার মোড়ে মোড়ে। এই সব পোস্টার ও হোর্ডিং-এর সাহায্যে প্রচার করা হচ্ছে নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নিয়ম, নির্দেশ, পরিকল্পনা, অগ্রগতি। দু' একটা প্রাচীরচিত্রের ছবি ও বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু কিছু নোটও নিলাম। রুমানিয়া ও হাঙ্গারীতে এ ব্যবস্থা দেখেছি। আর লক্ষ্য করেছি—সরকারী পোস্টার ও হোর্ডিং ছাড়া কোথাও কোনও দেওয়ালে বেসরকারী প্রচারপত্র ইস্তাহার বা বিজ্ঞাপন মারবার উপায় নেই। আমাদের দেশে শহরের ঘরবাড়ির বোবা দেওয়ালগুলোই রাজনৈতিক দলগুলোর সবচেয়ে বড় সহায়।

ফেরার পথে দুজনে হাঁটতে হাঁটতেই এলাম। তাই ভালো করেই দেখলাম নতুন ঘরবাড়ি তৈরির কাজে কিশোর, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ী সবাই মুখ বুজে কী অমানুষিক পরিশ্রম করছে। কাজে বেশী মজুরী আর তারিফ জোগাড় করার তাগিদে এক একটা মজুর একসঙ্গে ৩০।৪০টা ভারী ভারী পাথরের ইঁট মরিয়া হয়ে পিঠে করে বয়ে নিয়ে চলেছে। মানুষকে পশুর মতো, যন্ত্রের মতো খাটানো হচ্ছে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। ইঁট গাঁথবার ব্যাপারেও স্টাখানোভাইট প্রথায় প্রতিযোগিতা চলেছে।

শহর দেখার বিস্ময় নিমেষে বিভীষিকায় পরিণত হলো। আর কোথাও না গিয়ে হোস্টেলে ফিরে এলাম—খেতে দেওয়া হলো বেলা তিনটার পর। জানা গেল, ঐ সময়টাতেই নাকি সকলের খাওয়ার ছুটি হয়, আর ওটাই হলো পোল্যাণ্ডের মধ্যাহ্নভোজ খাবার সময়।

পোল্যাণ্ডের রাজধানীতে পৌঁছেই প্রথম চোটেই অত ঘোরাঘুরি! তার ওপর অত অবেলায় বেশ চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় পেটে পড়ায়

দেহটার সাধ হলো সে একটু গড়ায়। বিছানায় পড়া আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে চোখ জোড়া। কিন্তু ঘুমানো আর হলো না। মিনিট পনেরো কুড়ি পরেই বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ দরজায় ঠক্-ঠক্ সাড়া পড়লো। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। তাভারি-শাইশা তাড়া দিয়ে বলে গেলেন, নীচে লাউঞ্জে কয়েকজন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তাঁরা অপেক্ষা করছেন। তাছাড়া তখনই আমাদের ওয়ারশ শহরের আশপাশের কয়েকটি কলকারখানাও দেখতে নিয়ে যাওয়া হবে। কাজেই আমি যেন চটপট তৈরি হয়ে নীচে নামি।

এরপর কি শুয়ে থাকা চলে! গতির দেশে আসার পর থেকে এমন দুর্গতি তো বরাবরই ভোগ করছি। চোখের ঘুম ওয়াশ-বেসিনে ধুয়ে ফেলে তাড়াহুড়ো করে ধড়া-চুড়ো পরে নীচে নামলাম।

নীচে গিয়ে দেখি—বুখারেস্টর পরিচিত সাংবাদিক বন্ধুটি ও হাঙ্গারীর মিঃ বি যাঁর নাম ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে—তিনিও এসে গেছেন যুব ইউনিয়নের মারফৎ আমার ওয়ারশ পৌঁছনোর খবর পেয়ে। তাঁর নামের চিঠিটা পকেটেই ছিল, বার ক'রে তাঁকে দিলাম।

চিঠিটা পড়ে পকেটে পুরতে পুরতে তিনি হেসে বললেন—'সব ঠিক আছে।'

ভাবতে লাগলাম—সরকারী অতিথিদের সম্পর্কে যেখানে যে খবরটি দেওয়া দরকার—এরা কত চটপট দেয়। আর তাঁদের খাতির-যত্ন আদর-অভ্যর্থনায় কোন ত্রুটিও তেমনি রাখে না!

হাঙ্গারীর বন্ধু মিঃ বি যাঁর নামে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন পোল্যাণ্ডের সরকারী ট্রাভেল এজেন্সী ORBIS-এর একজন বড় কর্তা একথাটা পোল্যাণ্ডের সাংবাদিক বন্ধুটি জানালেন আমাকে। আর তাঁর কাছে আমার বুখারেস্টের বক্তৃতার প্রশংসা, তাঁকে 'স্লোতি'র বদলে রুমানিয়ার লেই দেওয়ার কথা শোনালেন। সেই সঙ্গে আমাকে

বললেন—উনি তাঁরও বিশেষ বন্ধু, কাজেই আমার কোনও অসুবিধা হবে না, পোল্যাণ্ডটা ঘুরে দেখার।

আমি বললাম—সেটা হবে না জেনেই তো অজানা দেশে এসেছি। আপনাদের মতো বন্ধু পাওয়া কত বড় সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমি খুব বেশী দিন পোল্যাণ্ডে থাকতে পারবো না—চটপট ফিরতে চাই। কারণ ইউরোপের আরও কয়েকটা দেশের যুব সংগঠন দেখে যাওয়ার মতলব আছে।

ওর্বিসের বন্ধুটি বললেন, আপনি আন্তর্জাতিক ছাত্র কংগ্রেসের অধিবেশন অবধি আছেন তো ?

আমি বললাম—"অতদিন আমি থাকতে পারবো না। তার আগেই আমাকে ফিরতে হবে। কারণ ভিয়েনা ও জুরিখের প্রোগ্রাম আগেই ঠিক করে ফেলেছি।"

উনি বললেন—"বেশ তাহলে আগামীকাল ভোরে একটা স্পেশাল প্লেন যাচ্ছে ছাত্র কংগ্রেসের বিশিষ্ট অতিথিদের লোজ (LODZ), ভ্রোক্লোভ্ (WROCLOW) আর ক্রাকুভ্ (Cracow) শহরের দ্রষ্টব্যগুলি দেখিয়ে আনতে। আপনি সেই প্লেনে গিয়ে ঐ শহরগুলি দেখে কালই ফিরে আসুন।"

আমি বললাম—"যদি কিছু মনে না করেন আর অনুমতি দেন, তাহলে ক্রাকুভ্ শহরটা ভালো করে দেখে—ওখানেই দু' একদিন থেকে বুদাপেস্ট ফিরতে চাই। সেই ব্যবস্থাটুকু করে দিলে বাধিত হবো। ক্রাকুভে শুনেছি অনেক দেখবার জিনিস আছে। তাছাড়া আসবার সময় পাহাড়েঘেরা জায়গাটা আমার ভারী ভালো লেগেছে।"

পোলিশ সাংবাদিক বন্ধুটি হেসে বললেন—"বুখারেস্টের তাড়াহুড়ো ও দৌড়ঝাঁপের ক্লান্তিটা এখন কাটিয়ে উঠতে পারেননি বুঝি!" উনি ওঁর বন্ধুটিকে বললেন—"মিঃ ঘোষের প্রস্তাবটা ভালোই—ভার্শাভার চেয়ে উনি ক্রাকুভেই বেশী আনন্দ পাবেন—দেখতেও পাবেন অনেক কিছু।"

ওর্বিসের অফিসার বন্ধুটি বললেন—"আপনি যাতে খুশী হন, আপনার যাতে সুবিধা হয়, সেই ব্যবস্থাই আমি করে দেবো, তবে

আপনার মত বিশিষ্ট অতিথিকে ক্ষণিকের জন্যে নিবিড় বন্ধুত্বের পরিবেশে পেয়ে আমরাও খুশী হতে চাই। আজ রাত্রের ভোজে আপনি আমার অতিথি হবেন। তাতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না?

আমি বললাম—"নিশ্চয়ই না! তবে হোটেলে খাওয়ালে চলবে না। আপনার বাড়িতে খাঁটি পোলিশ রান্না খেতে চাই। কন্‌-ডাকটেড ট্যুরে ঘুরে ঘুরে আর সরকারী ব্যবস্থার খাতির যত্নে হাঁফিয়ে উঠেছি। এখন ঘরোয়া পরিবেশটাই মন চাইছে বড্ড বেশী। নিজের ঘর তো অনেক দূরে—পরের ঘরের খুশীমাখা সুরেই প্রাণটা ভরিয়ে নিতে চাই।"

উনি মাথা চুলকিয়ে বললেন—তাই হবে।

সাংবাদিক বন্ধুটি ঠাট্টা করে বললেন—"কমরেড ঘোষ! যে রকম ঘর-জ্বরী (হোমসিক্) হয়ে পড়েছেন, তাতে ঘরের চেয়ে ঘরণীর দরকারটা মনে হচ্ছে বেশী!"

আমি হেসে বললাম—"দরকার মনে করলে—ঘরণী জুটিয়ে নিতে কতক্ষণ? সোভিয়েট দেশে তো শুনেছি রাত্রের জন্য বিয়ে করে, সকাল বেলায় তালাক দেওয়া যায়। ও রকম ব্যবস্থা আপনাদের দেশেও হয়েছে আশা করি।"

ওর্বিসের বন্ধুটি হেসে বললেন—"এদেশের ব্যবস্থা অনেকটা তাই বটে! তবে একবার কাউকে ঘরণী করলে ঘাড় থেকে সহজে নামতে চায় না।" বন্ধুটির সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায় মশগুল, এমন সময় ডাক পড়লো। ক্রিশিশ্যা জানালে বাস ছাড়ছে, শহর দেখতে হলে আমাকে উঠতে হবে।

বাস তখনও হোস্টেলের দরজায় দাঁড়িয়ে—বিদেশী অতিথিদের ডাকাডাকি করা হচ্ছে—সবাই এসে জোটেননি। ওর্বিসের বন্ধুটি আমাকে বসিয়ে রেখে—আমার খাওয়া এবং যাওয়ার ব্যবস্থা করতেই বাড়িতে এবং আফিসে ফোন করতে গেলেন। ফিরে আসার পর তাঁর গাড়িতে আমরা রওনা হলাম।

প্রথমে উনি আমাকে নিয়ে গেলেন শহরের দক্ষিণে—Plac Na

Rozdruza বা রেড্ স্কোয়ারে। পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে যে সব সোভিয়েট সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে, তাদের স্মৃতিতে কবরের উপর কোটি কোটি টাকা খরচ করে গড়ে তোলা হয়েছে বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ ও সুন্দর উদ্যান। স্তম্ভের দু'পাশে বিরাট পাথরের বেদীর উপরে সোভিয়েট সৈন্যদের মূর্তি। এরই সামনে সেই জোসেফ স্তালিন এভিনিউ। এটি ছাড়া সোভিয়েট শ্রেষ্ঠত্বকে পোল জাতির সামনে সদাজাগ্রত করে রাখার জন্য—শহরের আর একাংশে গড়ে তোলা হয়েছে—পোল-সোভিয়েট মৈত্রী স্তম্ভ। তবে বুখারেস্টে ও বুদাপেস্টে স্তালিনের যেমন বিরাট মূর্তি দেখেছি এখানে সেটি দেখলাম না।

সোভিয়েট সৈন্যদের কবরের কিছু দূরে উয়াশ্ দাভস্কী পার্ক। এখানে গিয়েও গাড়ি থামলো। বন্ধুটি জানালেন—পার্কের চারপাশে যে সব প্যাভিলিয়ন জাতের অস্থায়ী ঘর দেখা যাচ্ছে—ওখানে ওয়ারশ'র শহর-পরিকল্পনার সরকারী দপ্তর বা টাউন-প্ল্যানিং আপিস। বন্ধুটি আমাকে সেই আপিসে নিয়ে গেলেন।

ঐ আপিসের ডিরেক্টর ইঞ্জিনীয়ার সিগমুণ্ট স্কিবিনিউস্কী আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। প্রোগ্রাম সেকসনের প্রধানা শ্রীমতী হালিনা ভিসিনিউস্কা ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০এর ষড়বার্ষিকী পরিকল্পনার কোথায় কি হবে, সেগুলি রকমারী ম্যাপ ও চার্ট দেখিয়ে এমন করে বোঝালেন যে, মনে হলো—কল্পনার যাদু কার্পেটে সওয়ার করিয়ে তিনি আমাকে তাঁদের পরিকল্পনার মায়াপুরীতে ঘুরিয়ে আনলেন। সেসব বর্ণনা শুনে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ক'দিন পরে স্বর্গরাজ্য ওদের দেশেই নেমে আসবে, কিন্তু রুমানিয়ার বন্ধুরা যেভাবে আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন, হাঙ্গারীতে যেটুকু দেখেছি তাতে দৃষ্টিটা অত সহজে ঘোলাটে হলো না। যদিও রঙীন পানীয়ের পানপত্র সামনে ধরা হলো—চোখজোড়াকে রঙীন করে দিতে। সে পানপাত্র স্পর্শ না করে হর্ষ ভরে স্বচ্ছ জল পান করলাম। স্বচ্ছ মন নিয়েই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

এরপর শহরের সেই কেন্দ্র পেরিয়ে ওয়ারশ'র উত্তর-দক্ষিণে

বিস্তৃত বিরাট চওড়া রাস্তা মার্শালকাভ্স্কা স্ট্রীট ধরে আমাদের গাড়ি ছুটে চললো।

প্রথমেই সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার যেটি নজরে পড়লো—তা হচ্ছে বড় রাস্তা থেকে বহু দূর পর্যন্ত বিরাট একটা বাড়ির কাঠামো খাড়া রয়েছে—এখানকার আকাশছোঁয়া ক্রেণগুলো দূর থেকে আগেই দেখেছিলাম। এই যে তেত্রিশতলা উঁচু বিরাট বাড়িটা তৈরি হচ্ছে ১৯৫৬ সালে এটি নাকি শেষ হবে, আর এইটিই হবে পোল্যাণ্ডের প্যালেস অব্ কালচার এণ্ড সায়েন্সের কেন্দ্রীয় ভবন। নাম হয়েছে স্তালিন প্রাসাদ। এই বিরাট প্রাসাদের মালমশলা, সাজসরঞ্জাম মায় সমস্ত খরচ জুগিয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া। সেই সংগে প্রায় পঞ্চাশ জন রাশিয়ান ইঞ্জিনীয়ার; কারিগর ও শিল্পী পাঠানো হয়েছে এই কাজে। এসব শুনতে শুনতে চললাম গাড়িতে। দেখলাম রাস্তার দু'পাশে ধ্বংসস্তূপের মাঝে মাঝে বহু বিরাট বিরাট নতুন ঘরবাড়ি গড়ে উঠেছে।

বন্ধুটি জানালেন—১৯৪৯-১৯৫৫র ষড়বার্ষিকী পরিকল্পনায় পোল্যাণ্ডে কলকারখানার চেয়ে ঘরবাড়ি ও শহরটি গড়ে তোলার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। আর এই ব্যবস্থাতেই অকুশলী মজুরের কাজে প্রথম থেকেই সবাইকে লাগিয়ে বেকার সমস্যার অনেকখানি সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। আমি বললাম—"যুবক-যুবতীরা যাতে বেকার থেকে অলস ও প্রতিক্রিয়াশীল না হয়ে উঠতে পারে তার জন্যে আপনারা কি ব্যবস্থা করেছেন?

উনি বললেন—এরজন্য আছে ZMP পোলিশ যুব-ইউনিয়ন এবং তারই শাখা "Sluzba Polskie" বা পোলিশ যুব-ব্রিগেড। ষোলো বছরের বেশী বয়স হলেই ছেলেমেয়েদের সকলকে ইয়ুথ-ব্রিগেড বা যুব-বাহিনীতে নাম লেখাতে হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, রুমানিয়া হাংগারীর মতো এখানেও এটি কি বাধ্যতামূলক? জবাব এলো—নিশ্চয়ই এবং ছ' মাসের এক একটি কোর্সে প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা, চাষবাস ও যান্ত্রিক জ্ঞান অর্জন করতে হয় হাতে কলমে কাজ ক'রে। অবশ্য এর জন্য তারা

সাধারণ মজুরদের সঙ্গে সমান হারেই মাইনে পায়। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি—Poland Today বলে পোলিশ সরকার যে বইটি আমাকে দিয়েছেন—সেই বইটির ৪০এর পৃষ্ঠায় এ ব্যবস্থাটাকেই একটু রেখে-ঢেকে বলা হয়েছে এইভাবেঃ—

"The "Service to Poland" organisation is a separate youth organisation developing under the leadership of Union of Polish youth. The task is to direct the contribution of young people in the rebuilding and development of our country, to learn at profession, to intensify political consciousness and to become physically fit.

The "Service to Poland" brigades take part in work on the farms on the building sites and in the factories. Each period of service in the brigade lasts for six-months on the basis of a 32 hours working week, for which members are paid at the same rate as regular workers. The balance of the time is used in professional training, raising the level of their education and in sport and entertainment."

অর্থাৎ ওদেশে জোয়ান ছেলেমেয়েদের সকলকেই সপ্তাহে ৩২ ঘণ্টা সাধারণ শ্রমিক-মজুরের মত খাটতে হয়, তারপর বাকী সময়টুকুতেও লেখাপড়া, নাচগান, খেলাধুলোর চর্চা করতে হয়।

যুবক-যুবতীদের সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতে করতে ওঁর কথাবার্তায় একটা যেন বেদনার সুর বেজে উঠলো। তবু বড় বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেলাম না। খুশী হলাম মানুষটি সত্যাশ্রয়ী ও আদর্শবাদী যে সে পরিচয় পেয়ে।

গাড়িতে যেতে যেতে উনি দেখালেন রাস্তার দুধারে বাড়িগুলো পাঁচ ছ' হাত উঁচু ভিত্তির উপর গেঁথে তোলা হচ্ছে, তার কারণ শহরের ধ্বংসাবশেষে গুঁড়ানো ইট পাথরের ঝামাখোয়াগুলো সরাতে হলে বহু পরিশ্রম ও খরচ হতো। তাই সেগুলো না সরিয়ে তারই

ওপর গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন ঘরবাড়ি। এরপর গেলাম বাঙ্কাওরী স্কোয়ার ছাড়িয়ে বাঁ ধারে ঘুরে মুরানুভ্ (Muranow) অঞ্চলে। যেখানে ধ্বসস্তূপের মধ্যে হাজার হাজার নতুন ঘরবাড়ি গড়ে উঠছে।

দেখলাম ধ্বংসস্তূপের মাঝে মাঝে ভাঙা দেওয়ালের ওপর কোন কোনও জায়গায় তক্তা বা টিনের ছাউনি দিয়ে বহু মানুষ এখনও বাস করছে। সেখানে যারা এখন বাস করে, তারা একদিন নতুন ঘরবাড়িতে বাস করতে পারবে, এই আশাতেই মুখে রক্ত উঠিয়ে কাজ করছে পেটের রুটি জোগাড় করতে।

মুরানুভ্ অঞ্চলে ৩নং ওয়ার্ক সাইটে কিভাবে কাজ চলছে, তা দেখবার জন্য আমাকে গাড়ি থেকে নামানো হলো। সামনেই একটা বড় বাড়ির দেওয়ালে বিরাট বিরাট বোর্ডে কাজের প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি কাজ এগিয়ে দেওয়ার জন্য কি বিচিত্র ব্যবস্থা হয়েছে, তা বন্ধুটি দেখালেন এবং বুঝিয়ে দিলেন। দেওয়ালের চার্ট ও ছবি দেখে বোঝা গেল, এই ওয়ার্ক সাইটে এগারোটি ব্রিগেডে ভাগ হয়ে মজুররা কাজ করছে, তার মধ্যে কোন্ ব্রিগেড কি হারে কতখানি কাজ করে ষড়বার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন্ স্থান অধিকার করছে, তা দেখানো হয়েছে এক দুই তিন ক'রে—পর পর নাম লিখে। সেই সঙ্গে কাজের Tempo ও গতি বোঝাবার জন্যে তার পাশে পাশে আবার ছবিও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন দেখলাম কাজের প্রতিযোগিতায় আর সব ব্রিগেডকে হারিয়ে দিয়ে পাচশ্দিভস্কী (Paczdewski) ব্রিগেড প্রথম হয়েছে ৩৭২ খানা ঘর তৈরি শেষ করে—এই ব্রিগেডটির টেম্পো বোঝাতে পাশে 'হাউই'য়ের ছবি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় 'কোমট ব্রিগেড'—৩৫১ খানা ঘর শেষ করেছে, টেম্পোর ছবি এরোপ্লেন। তেমনি আবার আমব্রোজিয়াস্কি ব্রিগেড সবশেষ বা একাদশ স্থান অধিকার করেছে মাত্র ১৬৪টি ঘর তৈরি করে—তাই তার টেম্পো বোঝাতে দেওয়া হয়েছে কচ্ছপের ছবি।

শক্-ওয়ার্কার বা যারা দানবীয় শক্তিতে কাজ করে এবং অন্যকে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করায়, তাদের কয়েকজনের সঙ্গে

আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো। তাদের কাজের হিসেব শুনে চোখ ছানাবড়া। ওদের হিসেবটার ওপরে পোল্যাণ্ডের সরকারী হিসেব টেক্কা দেয় যে তার প্রমাণ সরকারের ছাপা বইতেও রয়েছে। ইঁট গাঁথার প্রতিযোগিতায় মজুরদরে মরিয়া করে তুলতে ও'রাই ছেপেছেন —মাজোরাভ্স্কী আর শিম্বোরেস্কী নামে দু'জন রাজমিস্ত্রী ন'জন মজুরের সাহায্যে ইটের জোগান নিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর আট ঘণ্টায় এক একজনে ৩৮,০০০ করে ইট গেঁথে রেকর্ড করেছে। একজন রাজমিস্ত্রী জ্যাপকুৎস্উইকজ্ মাত্র দু'জন মজুরের সাহায্য নিয়ে ৮ ঘণ্টায় ১৮,৩২২টা ইট গেঁথেছে ১৯৪৯ সালের ৩রা জুলাই। অথচ ১৯৪৮ সালের ৬ই জুলাই ক্লাজেটস্কী নামে রাজমিস্ত্রী ও দু'জন মজুর ৮ ঘণ্টায় ৩,৪০০ ইট গেঁথে রেকর্ড করেছিল। এই সরকারী হিসেবটাও একটা অসম্ভব আজগুবি মিথ্যা। এর থেকে বোঝা যায় এই সব বাড়ানো মিথ্যা রেকর্ডের ধাপ্পা দিয়ে কি ধরণের কাজের প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করা হয়েছে। 'শক্-ওয়ার্কার' বলে দানবদের মত্ততায় শ্রমিকদের রুজি-রোজগারে খাটুনির মাত্রাটা কিভাবে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। ধর্মঘট করে আয় বাড়াবার উস্কানি না দিয়ে কম্যুনিস্ট দাদারা এদেশের শ্রমিকদের অমন করে খেটে রোজগার বাড়াবার সত্য পথটা বাতলাতেন যদি, তাহলে বোঝা যেত তাঁদের সততা আছে।

"The Six-Year Plan for the reconstruction of Warsaw." নামে পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী বেরুটের বক্তব্য সম্বলিত ষড়বার্ষিকী পরিকল্পনার যে বইটি আমাকে দেওয়া হয়েছে, তারই এক জায়গায় প্রধান মন্ত্রী বেরুত এই অমানুষিক প্রতিযোগিতার সমর্থনে বলেছেন—

Efficiency can be improved only by introducing and expanding labour competition both among individuals and between teams.... This means increased productivity and at the same time achieving a fuller and more rational utilization of manpower and materials."

আর এই সব দানবীয় শক্-ওয়ার্কারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে প্রধান মন্ত্রী বলছেন—

"The superb drive of the shock-workers and innovators movement led by people whose names are now known all over Poland—multiply output by team work in brick laying which resulted in the now famous record-efficiency of the building works."

মুরানুভের ঘরবাড়ি তৈরির কাজ দেখে ওখান থেকে বেরিয়ে গাড়ির কাছে যেতেই দেখি একদল লোক সেখানে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কয়েকজনের হাতে ফুলের তোড়া, কিন্তু অনেকেরই সাজ-পোশাকে দুর্দশা ও অভাবের ছাপ। ওরা বার বার চীৎকার করতে লাগলো "নাইখ শাইখে ইন্দিয়েমু" "পোকোৎশ্-ই-প্রিৎশ্নো" বন্ধুটি বললেন এর মানে—"দীর্ঘজীবি হোক ভারত", "শান্তি ও বন্ধুত্ব" আমিও চট করে কথাটা শিখে ফেলে বললাম—'নাইখ শাইখে পোলস্কী"—দীর্ঘজীবী হোক পোল্যান্ড। ওরা সবাই ভারী খুশী।

এরপর ওখান থেকে রওনা হয়ে ভিশ্চুলা বা ভিশ্‌ৎলা নদীর শ্লাস্কো দোব্রাভ্স্কী পুল পেরিয়ে নদীর পুব পাড়ে প্রাগা অঞ্চলে গেলাম। ওখানে বিরাট নতুন সরকারী ছাপাখানা গড়ে উঠছে। সেটি দেখানো হলো। যন্ত্রপাতি যথারীতি রাশিয়া থেকেই এসেছে যে তা দেখলাম। ওষুধ পত্রের একটি পুরানো কারখানাকে নতুন করে গড়া হচ্ছে তাও দেখলাম। প্রাগা অঞ্চলে আরও কয়েকটা কলকারখানা ছড়িয়ে রয়েছে, তবে কারখানা দেখতে আমার ভালো লাগছে না জানাতে বন্ধুটি আমাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। বললেন—"ভুলায় (WOLA) আমাদের সরকারী পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশনা কেন্দ্রটা আপনাকে দেখিয়ে তারপরেই বাড়ি ফিরবো।"

আবার ভিশ্চুলা নদীর পুল পেরিয়ে সোজা পশ্চিম মুখে গাড়ি চললো—শহরের সীমানা ছাড়িয়ে শহরতলীতে এই ভুলা অঞ্চল। চোখে পড়লো সেখানেও গড়ে উঠছে বহু নতুন কলকারখানা ঘর

বাড়ি। তারই মাঝখানে কতকগুলো একই ধাঁজের আলাদা আলাদা মহল খাড়া করে একটা বিরাট প্রাসাদ গড়ার কাজ চলছে। এই মহলগুলো মিলিয়েই তৈরি হচ্ছে—

Dom Slowa Polskiegu (the House of Polish word).

বা পোল্যাণ্ডের বাণী মন্দির। এই বিরাট প্রাসাদের একটা মাত্র মহল শেষ করে সেখানেই বসানো হয়েছে অতি আধুনিক প্রকাণ্ড একটা রোটারী মেসিন। শুনলাম—পূর্ব জার্মাণীর পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের প্রতীক স্বরূপ এই রোটারী মেসিনটি পোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের উপহার দেওয়া হয়েছে। জানানো হলো ভবিষ্যতে পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির মুখপাত্র দৈনিক খবরের কাজগ "Trybuna Ludu" বড় মাপের কাগজ এখান থেকেই বেরুবে। ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে চললাম খানা খেতে বন্ধুর বাড়িতে।

ওর্বিসের বন্ধুটির সঙ্গে 'ওয়ারশ' শহর, আশপাশের কল-কারখানা, নতুন নতুন ঘরবাড়ি, ছাপাখানা দেখে তাঁর বাড়িতে যখন আমরা পৌঁছলাম—তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। উনি থাকেন শহরের মাঝখানে নামকরা কোনও রাস্তার অভিজাত পল্লীর এক ফ্ল্যাটের চারতলায়। লিফ্‌টের ব্যবস্থা নেই, সিঁড়ি বেয়েই উঠতে হলো ওপরে।

কলিং-বেল টিপতেই দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানালেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন—"আমার স্ত্রী শোফিয়া (Zofia)—আমাদের অতিথি ভারতীয় সাংবাদিক মিঃ ঘোষ।"

ভদ্রমহিলা করমর্দন করে জার্মান ভাষায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং জানতে চাইলেন আমি জার্মান ভাষা বলতে পারি কিনা। আমি তাঁকে জানালাম জার্মান ভাষা বলতে পারি না, তবে বিদেশে আসার পর কিছু কিছু বুঝতে পারি।

শোফিয়া হেসে বললেন—"ইংরেজী জ্ঞানটা আমার ঠিক আপনার

ঐ জার্মাণ জ্ঞানের মতই। বুঝতে পারি, বলতে পারি না।

ভদ্রলোক হেসে বললেন—"তবে আর ভাবনা কি? আপনারা দুজনেই দুজনের ভাষা ঠিক বুঝে নিতে পারবেন।" আমি বললাম—"আপনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।"

ঘরে গিয়ে বসলাম—সুন্দর সাজানো গোজানো। সবচেয়ে ভালো লাগলো ভদ্রলোকের বসবার ঘরে অসংখ্য বই সাজানো রয়েছে দেখে। ছোটখাটো একটা লাইব্রেরী বিশেষ। ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি দুটি বোতল মদ ও কয়েকটা কাঁচের প্লাশ এনে সোফার সামনে গোল-টেবিলে রাখলেন। বোতলের গায়ে লেখা MADEIRA দেখেই অবাক। পোল্যাণ্ডের মদের নাম "মদিরা" হলো কি করে জানতে চাইলাম, ওঁদের জানালাম আমাদের দেশেও মদকে 'মদিরা' বলা হয়। ওঁরা ওঁদের মদের নামের কোনও ইতিহাস জানাতে পারলেন না। বার বার মদিরা পান করবার অনুরোধ জানাতে লাগলেন।

আমি বললাম—"মদের বদলে আমাকে যদি একটু চা কিংবা কফি খাওয়ান তাতেই বেশী খুশী হবো।" মহিলাটি তাড়াতাড়ি কফি করে এনে দিলেন।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সাহিত্যের প্রসঙ্গ দিয়ে আলোচনা শুরু করা গেল। আমি বললাম—"পোল্যাণ্ডের সাহিত্যিক হেন্‌রিক শিঙ্কায়েভিচ্ তাঁর 'কো ভাদিস' উপন্যাসের জন্য বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন।" আমার কথাটা শুনে ও'রা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দুজনের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন এমনভাবে, যাতে করে মনে হলো সে-যুগের ঐ বিখ্যাত লেখকের নাম করা এবং নামটা কানে শোনাও যেন মস্ত অপরাধ।

ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন—"ঐসব প্রাচীন লেখকের আর এখানে আদর নেই।" আমিও প্রসঙ্গটির মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে জানতে চাইলাম—"পোল্যাণ্ডের একালের জীবিত লেখক ও কবিদের মধ্যে কার খুব নাম ডাক?"

ও'রা জানালেন বর্তমান পোল্যাণ্ডের সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন

লেখক ও কবি হচ্ছেন যারোস্লাভ্ য়িভাৎচকায়েভিচ্ (Iaroslaw Iwaszkiewiez)। আরও কয়েকজন নামকরা ঔপন্যাসিক, লেখক ও কবির নাম ও'রা জানালেন এবং ও'দের ঘরের বইয়ের সংগ্রহ থেকে তাঁদের কয়েকজনের কয়েকখানা বিখ্যাত বইও দেখালেন।

পোল্যাণ্ডের শিশু-সাহিত্যের সবচেয়ে নামকরা লেখকের নামটিও জেনে নিলাম—তাঁর নাম, 'য়ান বাইশেখ্ভা' (Ian Bizechwa)। বই দেখতে দেখতে আমি পোল্যাণ্ডের যে কয়েক পত্র-পত্রিকা দেখলাম, যেমন—"Trybuna Robotnicza" (শ্রমিকদের পত্রিকা) "Sizander Mlodych" ইত্যাদি। এগুলির নাম এবং পরিচয়ও জেনে লিখে নিচ্ছি দেখে শোফিয়া জানালেন—"আপনার কাজে লাগবে মনে করলে—এখান থেকে যে কোনও বই বা পত্র-পত্রিকা নিয়ে নিতে পারেন। আপনি কিছু নিলে আমরা খুব খুশী হবো। আপনি বই দেখুন, আমি এবার খাওয়ার জোগাড় করি।"

ভদ্রলোক বললেন "আমি আপনার কাজে লাগবার মতো খুব দরকারী কয়েকটি বই ও পত্রিকা দিয়ে দেবো।" ও'র কথা শুনে আমি একটু চমকে উঠলাম, বুঝে উঠতে পারলাম না এটা আমার অতিরিক্ত কৌতূহলের বিরুদ্ধে সতর্কতা না সহানুভূতি।

আমি বললাম—"ধন্যবাদ! এখান থেকে বই নিয়ে যাওয়ার দরকার হবে না, আমাদের দেশে আপনাদের দেশ সম্বন্ধে অনেক বই অনেক খবর পাওয়া যায়।' উনি হেসে বললেন—"পাওয়া যায় যে তা আমিও জানি, কিন্তু সেসব বইতে যা পড়ছেন, এসব দেশে এসে কি সত্যিই তাই দেখছেন? এটুকু শুধু আমায় বলুন?"

কি যে জবাব দেবো ভেবে পেলাম না, চুপ করে রইলাম।

উনি আমার হাত ধরে বললেন—"আপনার ভয় নেই! আমার সাংবাদিক বন্ধুটির কাছ থেকে আগেই শুনেছি, আপনি নিরপেক্ষ ভারতের একজন নিরপেক্ষ সাংবাদিক। কোনও দল বা মতবাদের গোঁড়ামি আপনার নেই। তাই আমি চাই—আপনাকে এদেশের বাস্তব অবস্থাটা সম্বন্ধে কিছু পরিচিত

দিতে। আপনার কাছ থেকে আমার কোনও বিপদের ভয় নেই
ই ভরসাতেই আপনাকে নিয়ে এসেছি আমার বাড়িতে।
পনিও নির্ভয়ে নির্ভাবনায় কথা বলতে পারেন আমার সঙ্গে।
ন নিতে পারেন যদি কিছু জানবার থাকে।”

এরপর খাবার টেবিলে গিয়ে বসবার আগে—নিভৃতে নিরালায়
জা বন্ধ করে আমরা দু'জনে প্রাণখুলে অনেক কথাই আলোচনা
লাম। সমস্ত কথা খুঁটিয়ে বলতে গেলে অনেক জায়গা লাগবে,
র তার প্রয়োজনও নেই। যে দু'চারটি প্রশ্নের জবাবে তিনি
য়ায় নানা বই ও পত্রিকা দেখিয়েছিলেন ও পড়ে শুনিয়েছিলেন
ই সামান্য কিছু বলবো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—“আপনাদের নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়
বাসের যে নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছিল—তা কি ষোলো
না কাজে পরিণত করা গেছে? চাষীরা কি যৌথ প্রথায় চাষ
বাদ করার কাজে অগ্রণী হয়েছে?”

বন্ধুটি বললেন—“না সেটা সম্ভব হয়নি, কারণ 'পেজাণ্টস
র্টি' ও ওয়ার্কার্স পার্টির মধ্যে জোর করে বাইরের একটা ঐক্য
ড়া করা হয়েছে। কিন্তু আসলে ঐ দু' দলের মধ্যে এখনও বেশ
া কষাকষি চলছে। তাছাড়া ১৯৪৮ সালে কম্যুনিস্ট ও
াস্যালিস্টদের মধ্যে ঐক্যের জন্য যে কংগ্রেস ডাকা হয়, তাতে
' দল মিলিত হলেও—পরে কোমিনফর্মের গোলামরা এদেশের
বচেয়ে বড় দল সোস্যালিস্ট দলটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে
য়েছে—ঐ দলের বহু লোককে নানা অছিলায় হত্যা করে।”

উনিই জানালেন—“মিকোলাইশিক কৃষক পার্টি নামে চাষীদের
বচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী যে দলটি ছিল, সেটির উপরও নানাভাবে
ুলুম চলেছে। সেটিকে দাবিয়ে দিয়ে ওয়ারশ'র মত শহরকে কেন্দ্র
রে ইউনাইটেড পেজাণ্টস্ পার্টি নামে চাষীদের ভূয়ো পার্টি গড়ে
তালা হচ্ছে! আসল চাষীরা তাতে বড় কেউ যোগ দিচ্ছে না।
াষীরা এদেশে এখন ভয়ানক বিগড়ে আছে, যার ফলে ১৯৪৮ সালে
ড়সেম্বর মাসের কংগ্রেসের পর থেকে এপর্যন্ত আর কোনও

কংগ্রেসের অধিবেশনই ডাকতে সাহস পাননি, রাষ্ট্র-বিধাতারা। স্তালিনের উৎসাহ ও ভরসায় ফ্যাসিস্তি কায়দায় জোর জুলুম হত্যার অরাজক চালিয়েছেন। তবে ম্যালেনকফ্-ক্রুশেফের নতুন নীতির প্রভাবে হাওয়াটা হঠাৎ যেন ঘুরেছে—তাঁদের চাপে পড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন ডাকা হয়েছে জানুয়ারীতে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—"আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনে কিছু রদ-বদল হবে বলে মনে করেন?" উনি বললেন যে মিঃ বোল্শলাভ্ বেরুত পরের কংগ্রেসে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হতে পারবেন না। এবং পরের কংগ্রেসে যথেষ্ট গোলমাল হবে। (এইখানে জানিয়ে রাখি তাঁর দেওয়া ঐ খবরগুলি সত্যে পরিণত হয়েছে—১৯৫৪ সালের ১৬ই জানুয়ারী ইউনাইটেড পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টির কংগ্রেস হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল—পোস্টার লাগানো হয়েছিল, অথচ শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের তারিখ পিছিয়ে সেটা করা সম্ভব হয়েছে ১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চ তারিখে। এবং সত্যিই মিঃ বেরুতের জায়গায় মিঃ জোসেফ সিরাঙ্কায়েভিচ্ (Jozef Cyrankiewicz) পোল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, কাগজেই বেরিয়েছে—এই কংগ্রেসে কলকারখানার শ্রমিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন—৮০০ জন, আর ব্যক্তিগত জমিতে চাষ করেন কিংবা কো-অপারেটিভ ফার্মে কাজ করেন তেমন সব চাষীদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন—মাত্র ১০৮ জন। চাষীরা সেখানে কি রকম বিগড়ে আছে, এটাই তার মস্ত প্রমাণ)।

চাষীদের বেগড়াবার কারণটা যা শুনেছি, তা হচ্ছে ওখানকার ক্যাথলিক সম্প্রদায় ও পাদ্রীদের ওপর অত্যাচার। ওদের বিশ্বাস মস্কোর নির্দেশমত পোল্যাণ্ডের ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু কার্ডিন্যাল ভিসিনিস্কিকে (Wyszyniski) বন্দী করা হয়েছে। তবে গির্জায় গিয়ে উপাসনা করতে বাধা দেওয়া হয় না যে, তা আমি দেখেছি।

বন্ধুটিকে প্রশ্ন করেছিলাম—"আপনাদের এখানে রাজনৈতিক দল কয়টি?"

উনি হেসে জবাব দিলেন—"নামে তিনটি, আসলে পার্টি হলো একটাই। ইউনাইটেড পেজাণ্টস্ পার্টি (কৃষক-প্রজা ঐক্য দল)

ওয়ারশতেই আছে—গ্রামে তার কেন্দ্র বড় একটা কোথাও দেখবেন না। আর সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে আর একটি দলের অস্তিত্ব রাখতে বুদ্ধিজীবী কম্যুনিস্টরাই সেখানে কয়েকজন আসর জমিয়ে রেখেছেন।" এটাও জানালেন যে, এই দুটি শিখণ্ডী দল খাড়া করে পোল্যাণ্ডের কম্যুনিস্ট পার্টি ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টি নামে দেশের সবচেয়ে বড় পার্টি হয়েছেন। তাঁরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন। এই পার্টির সদস্য সংখ্যা তেরো লক্ষের মতো (পোল্যাণ্ডের গত মার্চ মাসের কংগ্রেসের রিপোর্টে জানানো হয়েছে—এই পার্টির সদস্য সংখ্যা ১২৭৮২১৬ জন)।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এই পার্টির মেম্বার বা সদস্য কারা হন? উনি জবাব দিলেন, "বিভিন্ন কলকারখানা, সরকারী চাষবাড়িতে যারা কাজ পেয়েছে, তাদের তো পার্টির সদস্য হতেই হবে, অন্য লোকেও হতে পারেন, তবে বড় বিশেষ কেউ এ ব্যাপারে যে উৎসাহ দেখাচ্ছে না, তাতো সংখ্যাটা দেখেই বুঝতে পারছেন।" (এইখানে একটু বলে রাখি, পোল্যাণ্ডের সরকারী হিসাবে বলা হয়েছে, ১৯৫১ সাল পোল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই কোটি (২৪৯৭৬৯২০) এবং সেখানে কাজে নিযুক্ত বা বেকার নয়, এমন লোকের সংখ্যা প্রায় ৫২ লক্ষ—তার মধ্যে বিভিন্ন ইণ্ডাস্ট্রিতে মজুরের সংখ্যা ২২৮৪০০০। বাকি ২৯ লক্ষ লোক চাষ আবাদের কাজ করে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে—হয় শ্রমিক-মজুর-চাষীরা সবাই কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয় না, নয়তো সরকারী হিসাবে বেকার নয়, এমন শ্রমিক-মজুর চাষীর যে হিসাবটি দেওয়া হয়েছে—সেটি মিথ্যা।

রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরও অনেক খবরই জানালেন এবং বই ও কাগজপত্র দেখিয়ে প্রমাণও করলেন।

অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে রুশিয়া কি পরিমাণ রুবল জুগিয়ে দেশটিকে কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীতে রাখবার চেষ্টা করছেন—সেটাও তিনি দেখালেন। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত "People's Poland" পত্রিকায় Dr. Kazimierz Secemski একটি প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখছেন—

"Our growing industry requires the import of

a great number of machines and equipment, as well as indispensable raw materials..."The signing of long term agreements with the Soviet Union in 1948 and 1950 for credit deliveries enabled Poland to expand considerably her investment imports—by the sum of 2.2 thousand million roubles. On the basis of this new type of agreements and co-operation, the Soviet Union is offering Poland all round friendly help."

অর্থাৎ সোভিয়েট সরকার প্রায় দুশো কুড়ি কোটি রুবল দামের মাল দিয়েছে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল এই দু' বছরে। শুধু তাই নয়, রুমানিয়া হাঙ্গারীর মতো একই ব্যবস্থায় মূলধন যুগিয়ে এদেশের শ্রমিকদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির অর্ধেক ফল ভোগ করছেন সোভিয়েট রাষ্ট্র। ব্যাঙ্ক, বিমান কোম্পানী, রেলপথ সমস্তই পোল-সোভিয়েট যৌথ কারবার! ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি অন্যকে টাকা ধার দিয়ে প্রভাবান্বিত ও অধীন করাটা ধনতান্ত্রিকতার পর্যায়ে পড়ে, তাহলে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই বা সেটা ঐ একই পর্যায়ে পড়বে না কেন?

কথায় কথায় জানতে চাইলাম পোল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার অবস্থাটা কি রকম? বন্ধুটি জানালেন ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসের আগে পর্যন্ত মানুষের জীবনযাত্রা চরম দুরবস্থায় ছিল বলা চলে—কারণ প্রতিটি জিনিসই ছিল তখন রেশন ব্যবস্থার অধীন। দাম ছিল আগুন, মাইনের হার ছিল খাটুনির তুলনায় অত্যন্ত কম। চাষীদের নিজেদের খরচের পরে বাড়তি যে শস্য উৎপন্ন হতো—সেগুলি বিক্রির ব্যাপারেও যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিল, সরকার সেগুলি নামমাত্র দামে কেড়ে নিয়ে—রুশিয়ার যুদ্ধ-খেসারৎ শোধ করতে সেখানেই চালান দিতেন। স্তালিনের মৃত্যুর পর মাত্র ক'মাস হলো সেই সব কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়িটা একটু কমেছে। স্তালিনের অনুগত ও প্রিয় যাঁরা ছিলেন—তাঁদের অনেককেই ক্ষমতাচ্যুত করা হচ্ছে।

আমি বললাম—ম্যালেনকফ্ ও ক্রুশেফের নতুন নীতিতেই এমন-তরো ওলটপালট রুমানিয়া ও হাঙ্গারীতেও ঘটানো হয়েছে বলে

শুনে এসেছি। আপনাদের দেশে যে এ পরিবর্তন ঘটেছে এবং আগে রেশনিং ইত্যাদি ছিল তার প্রমাণ হিসাবে কিছু পাওয়া যেতে পারে? উনি আমাকে People's Poland পত্রিকার শেষের দিকের সেই জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন—যেখানে লেখা রয়েছে—

"A turning point in the national economy of People's Poland was the Government Decree of January 1953, concerning the abolition of rationing, price regulation general wages increase and the abolition of restrictions in the sale of surplus agricultural products. The increase in prices of certain goods was compensated to the manual and white-collar workers by the general increase in wages, salaries, pensions, family allowances and student grants. The abolition of restrictions on the sale of surplus agricultural products constitutes an important stimulus to an intensified agricultural production and stock-breeding. This Government decree, adopted in the interests of the broadcast masses of the working people."

আমি ঐ ঘোষণাটি পড়ে জিজ্ঞেস করলাম—"এই ঘোষণার পর নিশ্চয়ই আপনাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য জিনিস পাওয়াটা সহজ হয়েছে।"

উনি হেসে বললেন—"কিছু লোকের পক্ষে সহজ হয়েছে—সবার পক্ষে সহজ হবে কি করে? পোশাক কাপড় যা তৈরী হচ্ছে —তার বেশীর ভাগ যাচ্ছে রাশিয়ায়। বাকি যেটুকু থাকে তা পোলিশ জনসাধারণের চাহিদার তুলনায় খুবই কম। তাও প্রথমে কিনতে পারেন সরকারী কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর অফিসাররা—গোয়েন্দা বিভাগের গুপ্তচররা আর যাদের মুরুব্বির জোর আছে। সাধারণ মানুষকে বেশীর ভাগই নির্ভর করতে হয় সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিসের দোকানের উপর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"নতুন জামা-জুতোর দাম কেমন? উনি জানালেন—আধা-পশমী কাপড়ের একটা সুটের দাম ৪০০ থেকে ৮০০ স্লোতি (অর্থাৎ ৫০০ টাকা

থেকে ১০০০ টাকা) একজোড়া জুতোর দাম ৩০০ থেকে ৪০০ স্লোতি—অর্থাৎ ৩৭৫ থেকে ৫০০ টাকা।

এইসব আলাপ আলোচনার মাঝখানে দু'বার মিসেস শোফিয়া এসে খেতে যাবার তাড়া লাগিয়ে গেলেন। তিনবারের বার উঠে গিয়ে খাবার টেবিলে বসতে হলো।

খাবার টেবিলের মাঝখানে মস্ত লম্বা একটা পোড়া পোড়া পাউরুটি চাকা চাকা করে কাটা—জানলাম পোলিশ ভাষায় ঐ রুটিকে বলে চেব (Chleb) স্যুপকে বলে Zupe। স্যুপের লাল টক্‌টকে রং। জিভে ঠেকিয়ে বুঝলাম—লাল বীট সিদ্ধ জল ছাড়া আর কিছুই নয়—এরপর এলো টক দই, বিট আর বাঁধাকপির পাতা দিয়ে ঘণ্টের মত রাঁধা একটা টক্ টক্ তরকারি, রসুনের চড়া গন্ধে নাড়ি উল্টে আসে। এরপর মাছ পোড়া—রসুন, লঙ্কা আর লেবুর রস দিয়ে চটকানো। সঙ্গে আলুসিদ্ধ, টমাটো আর বড় লঙ্কা। শেষকালে একটা পিঠে জাতীয় মিষ্টি জিনিস। পোলিশ বন্ধুর গিন্নীর হাতের খাঁটি পোলিশ রান্না খেয়ে সেদিন পেট ভরানো গেল। খাওয়ার টেবিলে বন্ধুপত্নী শোফিয়া যে খুব চমৎকার রান্না করতে পারেন এই বলে বার কয়েক তারিফ করাতে তিনিও জানতে চাইলেন আমার গৃহিণী কেমন রান্না করেন—কি কি রান্না আমরা খাই ইত্যাদি। বুঝলাম শোফিয়া সাদাসিধে মানুষ—পাকাগিন্নী, রান্নাবান্নার খোঁজখবরটাই তার কাছে দামী।

খাওয়ার পর আরও খানিকক্ষণ গল্প হলো। শেখা গেল অনেকগুলো পোলিশ কথা। খাতায় সেগুলো লিখেও এনেছি। যেমন "Millionem ludzi w polsece nie jest Szezerliwe" (Millions of People in Poland are not happy). Robotniczo = শ্রমিক; Chlopski = চাষী; Miasta = শহর; Wsie = গ্রাম; Fabryki = কারখানা; Szkol = স্কুল।

বন্ধুটি অনেক ছবি ও পত্র পত্রিকা দিলেন। আমি বললাম—যেসব কাগজপত্র দিলেন—এগুলি নিয়ে নিরাপদে দেশে না ফেরা-পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। আমি তাই তাড়াতাড়ি এসব দেশের বাইরে পালাতে চাই—কিন্তু এগুলি নিয়ে যেতে দেখলে কেউ কিছু বলবে

না তো? উনি বললেন—"আপনি বিশ্বযুব উৎসবের আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথি—এই পরিচয়টুকু জানবার পর আপনাকে কম্যুনিস্ট দেশের সরকারী লোক কেউ কোনও রকমে সন্দেহের চোখে দেখবেনা, কেউ কোনও তকলিফও দেবে না। আর সাধারণ লোক আপনার মনের পরিচয়টি পেলেই মন খুলে দেবে"।

আমি বললাম—"কাল আর নাইবা গেলাম ঐসব শহর দেখতে—খবর তো অনেক জোগাড় হলো—এখান থেকেই ফেরা যাক বরং বুদাপেস্টে।"

উনি বললেন—"না! না! ব্যস্ত হওয়ার বা ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। আপনার সঙ্গে আপনার মনের মতো আমাদের বিশ্বস্ত একটি মেয়েকে ইন্‌টারপ্রেটার হিসাবে পাঠাবো—সে আপনাকে ক্রাকুভ থেকে বুদাপেস্ট রওনা করে দিয়ে তবে ফিরবে।" আমি তখন ওঁকে জানালাম মিস গোলেবায়াকোভা বলে যে এয়ার-হোস্টেসটি আমাকে বুদাপেস্ট থেকে ওয়ারশ অবধি নিয়ে এসেছিল, তার সুন্দর ব্যবহারের কথা।

উনি হেসে বললেন—"বেশতো! গোলেবায়াকোভাকেই আপনার সঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করবো—গোলেবায়াকোভা খুব ভালো মেয়ে—ও আমাদেরই দলের লোক। আপনাকে হোস্টেলে পেঁছে দিয়ে ওকে খবর দিয়ে আসবো। ওকে সঙ্গে পেলে খুশী হবেন তো।

আমি বললাম—"আমার মনে হয় সেও খুশী হবে, কারণ ভারতবাসী ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা ও কৌতূহলের যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি।"

এইসব কথাবার্তার পর এক পোঁটলা বইয়ের সঙ্গে উনি আমাকে সেই ইয়ুথ হোস্টেলে পেঁছে দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন—পরদিন ভোর পাঁচটায় তৈরি থাকতে। বইগুলি ব্যাগে ভরে ফেললাম।

সারাদিন ঘোরাঘুরির পর শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোর পাঁচটায় হোস্টেলের ছেলেরাই আমাকে জাগিয়ে দিলে—চটপট তৈরি হয়ে নিলাম। খানিক পরে ওর্বিসের প্রকাণ্ড বাস নিয়ে আমার সেই বন্ধুটি ও তাঁর দু'একজন সাঙ্গপাঙ্গ এলেন।

পনেরো জন বিদেশী অতিথিকে জুটিয়ে আবার সেই ওকেচী (Okecie) বিমান ঘাটিতে নিয়ে গেলেন।

সেখানে যেতেই মিস গোলেবায়া ছুটে এসে করমর্দন করে অভ্যর্থনা জানালে—বললে—"কাল হোস্টেলে তিনবার গিয়ে আপনার দেখা পাইনি। আপনি আমাকে মনে করার জন্যে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাধ্যমত চেষ্টা করবো—আপনাকে খুশি করবার।"

যাত্রীরা এবং তাঁদের বিভিন্ন ভাষার দোভাষীরা বিমানে উঠলেন—ওর্বিসের বন্ধু বিদায় দিয়ে জানালেন—সময় ও সুবিধা হলে—উনি ক্র্যাকুভে আবার আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। বিমান ছাড়লো সকালের নতুন আলোয় ডানা মেলে। বিমান ঘাটির মাথায় আধা লাল ও আধা সাদা পোল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকাটা যেন ইঙ্গিত করলে—পোল্যাণ্ড পুরো লাল হয়নি!

গোলেবায়া পাশে বসে জানালে—সে সেদিন শুধু আমারই হোস্টেস, ইনটারপ্রেটার—এইটাই তার সবচেয়ে আনন্দ ও গর্ব। আমি যে তার উপরওয়ালার কাছে সুখ্যাতি করে তাকে ডাকিয়ে এনেছি, এজন্য সে বার বার কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগলো।

গোলবায়ার কাছে জানলাম পোল ভাষায় এরোপ্লেনকে বলে সামুলুটুভ" Samolotow, পাইলটকে বলে—পিলোটুভ Pilotow. লিখে দিলে—পোল্যাণ্ডের যুব-সঙ্গীতের প্রথম লাইনটি—"Slubujemy Umacniae Wladze robotnikow i Chlopow"......এমনি করেই সময়টা কেটে গেল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের বিমান Lodz বিমান ঘাটিতে নামলো। ছোট বিমান ঘাটি—আড়ম্বর আয়োজনের ওজন কম। তবে অতিথিদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি নেই। ফুল দেওয়া, করমর্দনের পর ব্রেকফাস্ট খাইয়ে বাসে চড়ানো হলো।

বাস চললো 'লোদশ' শহরের ছোট বড় আঁকা বাঁকা মধ্যযুগের পাথুরে বাঁধানো রাস্তা দিয়ে। সেখানে নেই কোনও প্রাচীন প্রাসাদ। বড় ঘরবাড়িও নজরে পড়লো না। শহরতলির পথে ক্ষেত-খামার, চাষীদের ভাঙা কুঁড়ে। শহরের ভেতরে মজুরদের

নতুন কিছু ঘরবাড়ি চোখে পড়লো। তবে ওয়ারশ শহরে মজুরদের জন্যে যেমন চার পাঁচতলা বাড়ি তৈরি হয়েছে, এখানে তেমন নয়। শ্লেটে ছাওয়া একতলা ছোট ছোট বস্তি-বাড়ি। শুনলাম এই শহরটি বহুদিন থেকেই কাপড়-চোপড়ের কলকারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। এটাকেই নাকি এককালে বলা হতো 'পোল্যাণ্ডের ম্যানচেস্টার'।

এরপর আমরা লোদ্‌শ শহরের সরকারী কটন মিলের কাছাকাছি যখন গেলাম— দেখলাম সেখানে রাস্তাঘাট চওড়া করা হচ্ছে, বড় বড় ঘরবাড়িও কিছু কিছু গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ হয়েছে। কারখানাটাও দেখানো হলো, শুনলাম এটাই পোল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় কটন মিল। তবে কাপড়ের চেয়ে রাশিয়ায় চালান দেবার সুতোই তৈরি হচ্ছে বেশী। এরপর লোদ্‌শ শহরের উত্তরে 'বালুতি' (Baluty) বলে একটা জায়গায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো— জানানো হলো গত মহাযুদ্ধে জার্মানরা যখন পোল্যাণ্ড অধিকার করে, তখন ওখানেই তারা 'ঘেট্টো' বা ইহুদীশিবির করে তিন লক্ষ ইহুদীকে ওখানে আটকে রেখেছিল। এখানেও পুরানো ঘরবাড়ি ও বস্তির পাশাপাশি নতুন ঘরবাড়ি তৈরির কাজ কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে।

শহর ঘুরিয়ে দেখানো হলো, দেখলাম আগের কালের পুরানো ছোটখাটো একটা বাড়িতে ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়। একটা ছোট-খাটো আর্ট গ্যালারীও খোলা হয়েছে—আধুনিক কালের পোলিশ ও রুশ শিল্পীদের প্রচারমূলক ছবি সাজিয়ে। ঘণ্টা তিনেক ওখানে এইভাবে নানা জায়গায় ঘুরিয়ে দেখাবার পর আবার সেই বিমানে চড়ানো হলো।

বিমান ওখান থেকে ছেড়ে ৪৫ মিনিটের মধ্যেই পেঁাছে গেল রোক্লাও বা ভ্রোক্লুভ (WROCLOW) শহর। সেখানেও ঐ একই ব্যবস্থা। করমর্দন, ওঠা, বসা, বেড়ানো ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মেলানো। কম্যুনিস্ট দেশের কন্‌ডাকটেড ট্যুর নাগরদোলার চরকিপাক। নিজের ইচ্ছেমত চলে না, থামে না। আবার বাসে চেপে আমরা সবাই চললাম—রুটিন বাঁধা পথ বেয়ে গন্তব্যগুলির দিকে।

গোল্‌বা জানালে—ভ্রোক্লভ হলো—নিম্ন সাইলেশিয়ার রাজধানী এবং পোল্যাণ্ডের একটা খুব প্রাচীন শহর। জার্মানীর অধীনে যখন এই শহরটা ছিল তখন এটারই নাম ছিল ব্রেসলাউ। জার্মানীর অধীনে এখানে কলকারখানার যে উন্নতি হয়েছিল, সেগুলিকেই এখন পোল্যাণ্ডের গৌরব বলে বোঝানো হচ্ছে দেখে খুব মজা লাগলো। যাই হোক এ শহরটাতে সত্যিই দেখবার মতো প্রাচীন ঘরবাড়ি অনেক নজরে পড়লো। সবগুলোর পরিচয় চলতি বাসে বসে লিখে নিতে পারিনি। ওদ্রা (Oder) নদীর ধারে বড় বড় ঘরবাড়িগুলোতেই সরকারী দপ্তর। শহরের মাঝখানে ভ্রোক্লভ টাউন হলের বাড়িটা পঞ্চদশ শতকের স্থাপত্যবিদ্যার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এরই পাশে ভ্রোক্লভ ক্যাথিড্রাল—ত্রয়োদশ শতকে গথিক পদ্ধতিতে গড়া। যুদ্ধের সময় এই গির্জাটির একাংশ পুড়িয়ে এবং গুঁড়িয়ে দিয়েছিল রুশরা। এখন সেটা আবার গড়ে তোলা হয়েছে। ব্রেসলাউ (এখন ভ্রোক্লভ) শহরের 'ওস্সোলিনিয়াম' গ্রন্থাগারের নাম খুবই বিখ্যাত; এটি আমাদের দেখানো হলো। তিনতলা প্রাচীন বাড়িতে জার্মান ও পোলিশ প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহের অপূর্ব সমাবেশ। কিন্তু ভালো করে দেখবার তো সময় পাওয়া গেল না। গোল্‌বাকে বললাম —"এইজন্যেই তো তোমাদের দেশের কন্‌ডাকটেড্‌ ট্যুরে আমার মন ভরে না।"

গাড়িতে যেতে যেতে শহরের আরও অনেক গির্জা দেখলাম—আর দেখলাম সেখানে বহু লোক যাচ্ছে আসছে। ভ্রোক্লভের গির্জাগুলির কয়েকটার নাম মনে আছে—সেণ্ট এলিজাবেথ গির্জা, সেণ্ট ম্যারী মাগডালেনের গির্জা প্রভৃতি—এগুলি সবই গথিক পদ্ধতিতে গড়া। শহরের রাস্তার দুধারে জার্মান আমলের বহু বড় বড় হোটেল ও রেস্তোরাঁ। ওখানেই একটা রেস্তোরাঁতে আমাদের হাফ লাঞ্চ খাওয়ানো হলো। তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো —রেলগাড়ির ওয়াগন তৈরির মস্ত কারখানায়—এটাও জার্মানদের সময়েই তৈরি। যুদ্ধের সময় জার্মানরা ও শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় এটাকে কিছু কিছু ধ্বংস করে দিয়ে গেছলো; তবে রুশরা আবার সেটিকে গড়ে তুলে নতুনভাবে চালু করেছে। তবে এখানে

এখনও পুরোদমে কাজ শুরু হয়নি যে, তা বোঝা গেল, অনেকগুলো বড় বড় যন্ত্রপাতি এখনও বিকল ও বন্ধ হয়ে পড়ে আছে দেখে।

এখানকার শ্রমিক-মজুরদের মধ্যে যারা কাজ করছে তারা বেশির ভাগই ছেলেছোকরা—বয়স আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে—তাদের সাজপোশাকের যা দশা দেখলুম—তাতে মনে হলো না যে, এরা সুখস্বচ্ছন্দে থাকবার মতো মজুরী পায়। এই শহরের শহরতলিতে 'লায়েদাউ' অঞ্চলে স্তালিনের নামে একটা কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে যে তাও দেখলাম।

'বোলশেলাভিচ' অঞ্চলে তামার তার তৈরির কারখানাটাও দেখানো হলো। কারখানাগুলি ঘুরতে ঘুরতে পাগুলো একবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লো সকলেরই। জানানো হলো ভ্রোক্লভ শহরের আশপাশের অঞ্চলে কয়লা, লোহা ও তামার বহু খনি আছে। সেগুলি অবশ্য ওদের দেখাবার সময় ছিল না আর অতিথিদেরও দেখবার ধৈর্য ছিল না। কাজেই বিমানঘাঁটিতে ফেরার ব্যবস্থা হলো। ফেরার পথে ভ্রোক্লভ শহরের দক্ষিণে সোভিয়েট লালফৌজের কবরের উপর তাদের স্মৃতিতে যে বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ ও সমাধিক্ষেত্র গড়ে তোলা হয়েছে সেটিও দেখানো হলো। লালফৌজের রক্ত যেখানে পড়েছে, কম্যুনিস্ট ধর্মের সেখানেই হয়েছে পীঠস্থান। সেখানে গিয়ে ফুল ছড়াতে হয়, মাথা নোওয়াতে হয়।

ভ্রোক্লভ শহরকে ঝড়ের বেগে ঘুরিয়ে দেখিয়ে—আবার তিন ঘণ্টা পরে বেলা দুটো নাগাদ ওখান থেকে বিমানে চড়ানো হলো।

বিমানে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—ঘুম ভাঙলো ক্রাকুভ্ বা ক্রাকাও পেঁাছে—ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে তিনটা।

ক্রাকুভ বিমান ঘাঁটিতে বিমান থেকে নামলাম। দূর-দিগন্তে চারপাশে কার্পেথিয়ান আর তাত্রা পর্বতশ্রেণী। ছোট বড় নানা শৃঙ্গের সবুজ-অঙ্গে জড়ানো রোদের সোনালী অঞ্চল মনকে চঞ্চল করে তুললো। গোলবাকে বললাম—"গোলবা! তুমি যদি আমাকে ঐ পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো, তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।"

গোল্‌বা হেসে বললে—"শহর না দেখে তো পাহাড়ে যাওয়া চলবে না। তবে পাহাড়ে যাওয়ার প্রোগ্রামও আপনার আছে। দেখা যাক্‌, এখানকার কর্তারা কতদূর কি ব্যবস্থা করেছেন।"

আমি বললাম—"এ সব দেশের ভিতরে অব্যবস্থা থাকলেও বিদেশী আমন্ত্রিত অতিথিদের সরকারী আদর-অভ্যর্থনার ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি তো এ পর্যন্ত দেখিনি।"

গোল্‌বা নিজেকে দেখিয়ে বললে—"এই বে-সরকারের আদর-অভ্যর্থনার অনেক ত্রুটি ঘটল, সেটা কিন্তু নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন, কেমন?"

কথা বলতে বলতে আমরা বিমানঘাটির রেস্তোরাঁতে হাজির হলাম। তিনটা বেজে গেছে, পোল্যাণ্ডের দিনের খাওয়ার সময় হয়েছে। তাই খাওয়ার টেবিলের চামচ কাঁটাগুলো অপেক্ষা করছিল।

হাত মুখ ধুয়ে এসে ছুরি কাঁটা-চামচ ধরা গেল। স্যুপ এবং পাঁউরুটির পর নিলাম স্নিৎশেল (কাটলেট) ব্রাংকার্টোফেল (আলু-ভাজা) সালাড, ডাই গুর্কা (শশা কুচির স্যালাড)। শেষ করা গেল আইসক্রীম দিয়ে। চন্‌চনে ক্ষিদের মুখে খাবারগুলো মনের মতই পাওয়া গেল। দোষের মধ্যে পোলদের রান্নায় রসুনের বাড়াবাড়িটাই যা একটু গোল বাধায়। গোল্‌বাকে জিজ্ঞেস করলাম—এই যে খেলাম, এতে এক একজনের কত শ্লোতি আন্দাজ খরচ পড়লো? ও জানালে—আপনার নিজের পয়সা খরচ করে খেতে হলে লাগতো ৫০ শ্লোতি। (অর্থাৎ সত্তরটি টাকা। কারণ এক পাউণ্ডের ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে পাওয়া যায় এখন ১০ শ্লোতি।)

খাওয়ার পর নিয়ে গিয়ে বসানো হলো লাউঞ্জে। দোভাষীরা যে যার অতিথি বা অতিথি-দলের থাকবার ও যানবাহনের ব্যবস্থা কি রকমটা হয়েছে জানতে গেল। গোল্‌বাও চলে গেল আমাকে বসিয়ে রেখে।

কয়েক মিনিট পরেই গোল্‌বা ফিরে এল। জানালে—ইংরেজী

ভাবী অতিথি আর কেউ নেই বলেই আমার একার জন্যই একটা ছোট গাড়ি পাওয়া গেছে। আমাদের দলের বাকি অতিথি কোরিয়ান, চীনা ও রুশরা আলাদা আলাদা গাড়িতে যাবেন—তাঁদের নিজ নিজ দলের দোভাষীর সঙ্গে।

গাড়িতে গিয়ে ওঠবার আগে প্রথমেই গাড়ির সোফারটির করমর্দন করে তাকে ইংরেজীতে জানালাম—"ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমার জন্য আপনাকে কিছু তক্‌লিফ নিতে হবে তার জন্য ক্ষমা করবেন।"

সোফারটি আমার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল। পোলিশ ভাষায় গোল্‌বা তাকে আমার পরিচয় জানিয়ে বক্তব্যটা বলে দিতে সে ভারী খুশী। তবে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করে জানালে—সে ইংরেজী জানে না এটাই বড় দুর্ভাগ্য! নইলে সে ভারতীয়ের সঙ্গে গল্প করার গর্ব ও আনন্দটা অনুভব করতো আরও অনেক বেশী।"

সোফারটি ইংরেজী জানে না জেনে মনে মনে খুশি হলাম আমি খুবই। কিন্তু ও যে সত্যিই ইংরেজী জানে না, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারলাম না। পনেরো কুড়ি মিনিটেই গাড়ি পৌঁছলো ক্রাকুভ শহরের মাঝখানে, প্রধান রেল স্টেশনের কাছাকাছি। শুনলাম এ জায়গাটা শহরের উত্তর অঞ্চলে পড়ে। স্টেশনের কাছাকাছি প্রাচীন ক্রাকাও শহরের চারিধারে নজরে পড়লো—সেকালের গড়া দুর্গপ্রাকারের ভাঙা ভাঙা পাঁচিলগুলো। কালের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওরাই পুরানো ইতিহাসের সাক্ষ্য দিচ্ছে। এরপর "Planty" অঞ্চলে পৌঁছলাম। সোফার মাঝে মাঝে গাড়ি থামিয়ে আমাকে পুরানোকালের কতকগুলি ঘরবাড়ি ও দুর্গ চিনিয়ে দেয়। তার ইতিহাস ও গল্প বলতে বলতে গাড়ি চালায়। গল্প বলার সময়ে তার ইংরেজী ও জার্মান ভাষার খিচুড়ি বুলি শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। ও সত্যিই ইংরেজী জানে না। সোফারের বলা গল্প আর বিবরণগুলো গোল্‌বা অবশ্য ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিলে আমাকে।

পুরানো দুর্গগুলির মধ্যে ব্রামা ফ্লোরিয়াঁস্‌কা (Brama Florianska) নামে পঞ্চদশ শতকের তৈরী গথিক পদ্ধতিতে গড়া

একটা প্রাচীন মিনার ও বার্বাকান ব'লে শহর রক্ষার একটা দুর্গ দেখলাম।

এরপর শহরের কেন্দ্রস্থলে ক্রাকুভ বা ক্রাকাওয়ের মার্কেট প্লেসে এসে গাড়ি থেকে নামলাম। বাজারের সামনে চওড়া রাস্তা আর পার্ক। বাস ট্রাম মোটরের হুড়োহুড়ি নেই। ঘোড়ায় টানা গাড়ি বোঝাই মাল ও মানুষ চলেছে। গ্রাম্য পোশাক-পরা গ্রামের লোকই সংখ্যায় বেশী। বাজারের মাঝখানে "সুকিয়েন্নিস" নামে মধ্যযুগের তৈরী মূল মিনারটা চিনিয়ে দেওয়া হলো। পুরানো আমলের বিরাট কীর্তি এটি। সেই সঙ্গে দেখানো হলো পরবর্তীকালে সপ্তদশ শতাব্দীতে সেটাকে কিভাবে বাড়িয়ে মার্কেট প্লেস বা বাজারবাড়িটি গড়ে তোলা হয়েছে। নামেই বাজারবাড়ি, দোকান-পসার এখন তেমন কিছুই নেই। বেসাতের চেয়ে বসতের কাজেই লাগানো হয়েছে বেশীর ভাগ জায়গা।

সুকিয়েন্নিসের বিরাট বাজার-বাড়ির একাংশে ক্রাকাওয়ের জাতীয় যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী খোলা হয়েছে শুনে লোভ সামলাতে পারলাম না। যাদুঘর ও ছবিগুলো দেখবার ইচ্ছা জানালাম। গোল্‌বা বললে—"সমস্ত কিছু ঘুরে দেখতে অনেক সময় লাগবে, অত সময় কই! তবে চট্‌ করে আপনাকে বিখ্যাত কয়েকজন শিল্পীর ছবি দেখিয়ে আনি চলুন।"

যাদুঘর আর ঘুরে দেখা হলো না। আর্ট গ্যালারীতে দেখলাম ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকের কয়েকজন শিল্পীর ছবির সংগ্রহটাই এখানে বেশী। তার আগের আমলের ছবি বড় একটা দেখলাম না। ঊনবিংশ শতকের পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত শিল্পী আয়ান মাতিয়েকোর (Jan Matjeko) ছবিগুলি দেখে মুগ্ধ হলাম। পোল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ, চাষী-মজুরের জীবনকেই তিনি রূপায়িত করে রেখে গেছেন জীবন্ত তুলির স্পর্শে।

সুকিয়েন্নিস ভবনের ছবি দেখা শেষ করে বেরিয়ে আসতেই উল্টোদিকে নজর পড়লো—খুব পুরানো ধরণের ছোট্ট একটা গির্জা। জানা গেল ওটা একাদশ শতকের তৈরী—সেণ্ট ওডেনবার্ট। ওরই একটু দূরে দেখা গেল আকাশ-ছোঁয়া দুটো দু' মাপের মিনারওয়ালা

ভারী বিচিত্র এক গির্জা। গোল্‌বা জানালে—ওটির নাম 'ম্যারিয়াকী', সারা পোল্যাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও প্রাচীনতম গির্জা। দ্বাদশ শতকে ও চতুর্দশ শতকে এটির দুটি মিনার দু'বারে তৈরী হয়। ওটির ঐ ৩০০ ফুট লম্বা মিনারের চূড়া থেকে প্রতি ঘণ্টায় মধ্যযুগের বিচিত্র এক সুরে তূর্যনিনাদ ক'রে সময় জানানো হয় এবং বেতার মারফৎ সেই তূর্যধ্বনি সারা পোল্যাণ্ডের টাইম সিগ্‌নাল হিসাবে শোনানো হয়।

ম্যারিয়াকি গির্জাটি দেখতে নিয়ে যাওয়া হলো। সত্যিই অপূর্ব এর ভিতরের কারুকার্য ও স্থপতিশিল্প। আগের কালের পোলিশ জাতির স্থপতি ও ভাস্কর্যশিল্পের নিপুণ কাজগুলি দেখে মন ভরে উঠলো। গির্জার বেদীর পিছনে যীশু, মেরীমাতা ও তাঁর শিষ্যপ্রধানদের খোদাই করা মূর্তিগুলিকে রঙে ও কারুকার্যে অপূর্ব রূপ দেওয়া হয়েছে।

গির্জায় মেয়েপুরুষ বহুলোক আসছে যাচ্ছে। চেহারা দেখেই বুঝলাম অধিকাংশই গ্রামের চাষী শ্রেণীর লোক। তাদের সাজ-পোশাকে দৈন্যের ছাপ। চোখে মুখে লজ্জা, ভয়। বেদনার অভিব্যক্তি। গির্জার বেদীর সামনে হাঁটুগেড়ে বসে আমিও প্রণাম করলাম। শান্তি ও কল্যাণের প্রার্থনায় সকলের সঙ্গে যোগ দিলাম। গোল্‌বাও ভরসা পেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ক্রশ করলে, প্রার্থনা জানালে।

প্রার্থনা সেরে বেরিয়ে আসার সময় গোল্‌বা আমার হাতে ধরে চাপা গলায় প্রশ্ন করলে—"আপনি ভগবান মানেন? প্রার্থনায় বিশ্বাস করেন?"

আমি বললাম—"নিশ্চয়ই মানি, ভগবানে বিশ্বাস ও প্রার্থনা করেই ভারতবাসী তার জীবনের সবসেরা আনন্দকে উপলব্ধি করে। ওতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তেমন আনন্দ আর কিছুতেই নেই।"

গোল্‌বা বললে—"আমারও তাই মনে হয়; কিন্তু সব ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, খুব ভাল হয়েছে। নিরিবিলিতে এক সময়ে আপনার কাছ থেকে এগুলো বুঝে নেবো।"

আমি হেসে বললাম—নিরিবিলি শান্তির তেমন সঙ্গ ও সঙ্গী আমার জুটবে কি?"

গোল্‌বা বললে—"নিশ্চয় জুটবে। আপনার ক্রাকাওর প্রোগ্রামে নোট দেওয়া আছে, 'অতিথি ক্লান্ত ও অবসন্ন—তাঁর পছন্দ মতো ভ্রমণ ব্যবস্থা।" মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম—ওর্বিসের বন্ধুকে।

গোল্‌বা বললে—"ভিশ্চুলা নদী আর তার তীরে ভাভেল-এর (Wawel) ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজপ্রাসাদটা আমাদের ফেরার পথেই পড়বে—ওটা দেখেই আস্তানায় ফেরা যাবে।"

ভিশ্চুলা নদীর তীরে পাথরে বাধাঁনো সড়ক দিয়ে গাড়ি চললো। নদীটি সেখানে শীর্ণকায়া। মাঝখানে বালির চড়ায় রোদ পড়েছে। ওদেশের ডিঙী নৌকো ও ছোট ছোট স্টীমারে ফেরী চলছে। পাহাড়ে উঁচু জমির উপরে পুরানো রাজপ্রাসাদ, ক্যাথিড্রাল ও দুর্গটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে—চারিধারে রুশ ও পোলিশ দু'জাতেরই সেপাই-সাস্ত্রী বুট ঠুকে গট্‌মট্‌ পাহারা দিচ্ছে। অনুমতি-পত্র দেখিয়ে ভিতরে ঢুকতে হলো।

অত বড় ব্যাপার সবটা দেখা সম্ভব নয়। রাজপ্রাসাদের কয়েকটা খাস কামরা আর আগের কালের রাজারাজড়াদের ঐশ্বর্যের ছিঁটে ফোঁটার নমুনা কিছু কিছু দেখালেন রাজপ্রাসাদের গাইড। তিনি জানালেন বহু দামী ট্যাপেস্ট্রী বা কারুকার্য করা কার্পেট ইত্যাদি জার্মাণরা নিয়ে পালিয়ে গেছে। তার মধ্যে Arasএর তৈরী দামী আর বিখ্যাত গালিচা-কার্পেটগুলো এখনও নাকি ক্যানাডায় রয়েছে। পোলিশ গবর্ণমেণ্ট বহু লেখালেখি করেও সেগুলি নাকি আদায় করতে পারছেন না।

রাজবাড়ি, গির্জা দেখে যখন শহরে ফেরার জন্যে গাড়িতে চাপলাম, নদীর ওপারে সূর্যদেবও তখন তাঁর রথে চড়েছেন—ঘরমুখো হয়ে।

এ শহরেও দেওয়ালের গায়ে বড় বড় হোর্ডিং-এ নানারকম পোস্টার ও মন্ত্রীদের বড় বড় ছবি দেখলাম। কয়েকটা প্রাচীরচিত্রের ছবি দেখেই ভাবটা বোঝা গেল। কোনটিতে কি লেখা রয়েছে—জানতে চাইলাম গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে। গোল্‌বা মানে বলে দিলে, আমিও লিখে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে (সে-দেশের প্রাচীরচিত্রের কয়েকটি ছবিও

নিয়ে এসেছি—দুটো এই সঙ্গে ছেপে দিলাম। তাতেই পাওয়া যাবে ও দেশের পরিচয়)।

শহর ঘুরে জুবোমির্স্কী স্ট্রীটের সরাইখানায় নামলাম। ঐখানেই আমদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। জানতে পারলাম এই রাস্তাটি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়েছে কারণ এই রাস্তার কোনও এক বাড়িতেই স্তালিন বহুবার এসে বাস করেছিলেন। স্তালিনের বাসার কাছেই আমার এ নতুন বাসাটা খাসাই পাওয়া গেল।

জিনিসপত্র গুছিয়ে, চান করে নিলাম বেশ করে। তারপরে খেতে গেলাম গোলবার সঙ্গে। খাওয়ার টেবিলে খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের চাহিদাটাই দেখলাম বিদেশী বন্ধুদের কাছে বেশী। রাঙা পানীয় দূরে ঠেলে সাদা স্বচ্ছ পানীয় গ্লাস দুই জল ঢক্‌ঢক করে গিললাম। ব্যাপার দেখে গোলবা অবাক। বিদেশী সঙ্গীরা হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দিলে। মাছ-সিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, মুরগীর রোস্ট দিয়ে পেট ভরানো গেল।

পেট ভরানোর পর মন-ভরানোর পালা। নাচ গান শুরু হলো। পোলিশ মেয়েদের নাচের সাজ-পোশাক আর নাচবার কায়দার তারিফ করলাম কিছুক্ষণ দলে যোগ দিয়ে। তারপর খালি লাউঞ্জে গিয়ে বসলাম আমরা দুজনে—অনেকক্ষণ গল্প করলাম। গোলবার কাছ থেকেও অনেকগুলো পোলিশ শব্দ তার বানান মানে উচ্চারণ খাতায় লিখে নিলাম। গোলবা জানালে পরদিন সকালে পোল্যাণ্ডের নওজোয়ানদের নতুন কীর্তি 'নোভা হুটা' (Nowa Huta) দেখাতে নিয়ে যাওয়া হবে।

ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বন্ধুর দেওয়া একটা পুস্তিকা নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বইটির নাম "The recovered Territories"—১৯৫২ সাল পোল্যাণ্ডের ভাইস-প্রিমিয়ার স্তেফান ইয়েদ্রিচোভস্কী (Stefan Jedrychowski) এইটি প্রকাশ করেছেন। তিনি ঐ পুস্তিকাটির ৩৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"The network of primary schools must be very considerably extended in accordance with the

number of children of school age, and also that nursery schools and creches must be so developed that they can cater for a much higher percentage of children heretofore. This would facilitate the employment of women who constitute a labour reserve."

"শিশুদের জন্য নার্শারী স্কুল ও ক্রেশএর সংখ্যা বাড়াতে পারলে মায়ের জাতকে এনে শ্রমের কাজে লাগানোর সুবিধা হবে"—এই হলো কমিউনিস্ট দেশের মন্ত্রীর নিজের বলা কথা। ঘুম ছুটে গেল, বইটা আগাগোড়া পড়ে আরও অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটন করা গেল।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বিদেশী অতিথিরা সবাই আমরা দল বেঁধে গেলাম 'নোভা হুটার' শোভা দেখতে। পোল্যাণ্ডের বেকার যুবকদের বেকারত্ব ঘোচাতে আর অকুশল শ্রমিক মজুরকে কুশল শ্রমিক করে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে যেখানে। ক্রাকাও থেকে বেশ দূরে নদীর তীরে সমতল জমিতে শত শত মাইল জুড়ে এই নতুন শহর এবং কলকারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে—এই কথা প্রচার ক'রে যে, এইটাই হবে পোল্যাণ্ডের নতুন যুবশক্তির গড়া তাদের নিজস্ব সমাজ-তন্ত্রী শহর।

'নোভা হুটা' অঞ্চলের যন্ত্রপাতি, ক্রেন, আকাশ-ছোঁওয়া লোহার কাঠামো দেখে মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু যারা কাজ করছে তার মধ্যে ১৭ থেকে ২০।২২ বছরের ছেলেমেয়ের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। তারা সবাই এসেছে বাপ-মা, ভাই-বোন, ঘরসংসার ছেড়ে। এখানকার ব্যারাকে থাকে, ক্যাণ্টিনে খায়। ছ'মাস ধরে একনাগাড়ে মাটি কোপানো, ইঁট-গাঁথা, লোহাপেটা, মোট বওয়ার মতো কাজ ক'রে উপরওয়ালাদের খুশি করতে পারলে তবেই ছুটি পাবে। এসব জেনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঐ বয়সের ছেলেমেয়েরা স্বেচ্ছায় যে ঐ কাজে এগিয়ে আসেনি, তাদের জোর করে আধা সামরিক প্রথায় রিক্রুট করে আনা হয়েছে, তা তাদের চালচলন ও চোখমুখের ভাব দেখেই তখন তখনই বুঝলাম। পরে ভাল করে ব্যাপারটা বুঝেছি ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসের 'Peoples Poland' পত্রিকায় 'নোভা হুটা'

সম্পর্কে হেলেনা ভাইয়েলোভিয়েস্কার (Helena Wieloevieska) লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ে। তাতে তিনি লিখছেন—

"Young people constitute 70% of the inhabitants of Nowa Huta: youth, boys and girls attending industrial professional schools, peasant youth after graduating from primary school. Fifty per cent of all the workers receive professional training thus improving their qualifications."

প্রাইমারী স্কুলের বিদ্যেটুকু দিয়েই বৃত্তিগত শিক্ষার দোহাই পেড়ে যুবকদের পাঠানো হয় নতুন শহর ও কলকারখানা গড়ার জবরদস্তি কাজে। এই যুবকদের নোভা হুটায় খাটাচ্ছে আর কাজ শেখাচ্ছে কারা তাও তিনি লিখেছেন--

"About 700 Soviet engineers have ilready lent a hand in Nowa-Huta."

একটা ছোট পরিকল্পনাকে রূপ দিতে কেবল নোভা হুটাতেই রয়েছে—সাতশো সোভিয়েট তদারক-করনেওয়ালা! গোটা পোল্যাণ্ড তাহলে আছেন কতজন সোভিয়েট সর্দার—এর থেকেই আন্দাজ করা যায়।

এই জবরদস্তির কাজে বাধা বিপত্তিও ঘটেছে এবং সে সমস্যা কি করে সমাধান করা হয়েছে তারও ইঙ্গিত ঐ প্রবন্ধেই আছে। তিনি লিখেছেন—

"There are the people whose motto: Work today better than you did yesterday" has helped to free Nowa-Huta from the *deadlock* in which it had been till last year, when monthly plans remained unfulfilled. This motto after being adopted as the principal slogan in Nowa-Huta has helped to recruit thousands of young boys and girls."

নোভা হুটায় পোল্যাণ্ডের তরুণ-তরুণীকে রিক্রুট করে যেভাবে খাটানো হচ্ছে, এভাবে আমাদের দেশের যুবক-যুবতীকে আমাদের জাতীয় সরকার কাজে লাগালে—সেটা কি খুব সুখকর হবে?

নোভা হুটা দেখে ফিরতে তিনটে বাজলো। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম করলাম—বিকেলে গেলাম ক্রাকাওয়ের পাইওনীয়ার (Komsomolu) ভবনে। ছেলেমেয়েরা ঘড়ির কাঁটার মতো বাঁধাধরা পথে যে যার কাজ করে চলেছে। নিয়ম আর নির্দেশের বড় বেশী কড়াকড়ি। তাই সবাই চুপচাপ্। নতুন দেশের নতুন মানুষ দেখেও—ওরা নির্বিকার চিত্তে নিবিষ্ট রইল আপন আপন কাজে। প্রশ্ন করে জানা গেল পোল্যাণ্ডের ছেলেমেয়ে যাদের বয়স ৯ থেকে ১৪ বছর তাদের 'কোমসোমোল্‌' বা পাইওনীয়ার দলে নাম লেখাতেই হয়। প্রত্যেক স্কুলেই 'কোমসোমোল্‌' বাহিনীকে সামরিক কায়দায় নেতার হুকুম মেনে চলতে হয়। তাদের যেদিন যখন পাইওনীয়ার ভবনে এসে কাজ করার ও কাজ শেখার পালা পড়ে, তাকে সেদিন, ঠিক সময়ে হাজির হয়ে সে কাজটি করতে হয়। একটি মেয়েকে আমার খাতায় লিখে দিতে বললাম। সে লিখলে—

Mam 9 Lat, tyle Co-polska Ludowa Ucze Sie by Ja budowac.

'অর্থাৎ' আমার বয়স সবে ৯ বছর—পিপলস্ পোল্যাণ্ডের সমবয়সী—আমি শিখছি সেটাকে গড়ে তুলতে'—এছাড়া পোল্যাণ্ডের পাইওনীয়ররা আমাকে তাদের ব্যাজ ও কতকগুলি উপহার দিলে।

আমরাও পাইওনীয়ার ভবনের কাজ সেরে গাড়িতে চড়লাম। পাহাড়ের গা বেয়ে ক্রাকাওয়ের দক্ষিণ গাড়ি ছুটলো জ্যাকোপেনের পথে। জ্যাকোপেন পাহাড়ের ওপর তিন হাজার ফুট উঁচুতে তাত্রা পাহাড়ের উপত্যকায়। পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম আমরা। মন ভরে গেল। নিরিবিলিতে বসে গোলবার সঙ্গে অনেক কথাই হলো। ওর কাছ থেকে পোল্যাণ্ডের অনেক গল্প শুনলাম, ওকেও বললাম ভারতবর্ষের অনেক কথা।

সন্ধ্যার কিছু আগে পৌঁছানো গেলো জ্যাকোপেনে। সেখান থেকে পোরোনিন হয়ে পাহাড়ের উপর 'বায়ালি দুনাইয়েচ' গ্রামে—লেনিন যে বাড়িটিতে থাকতেন সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। ছোট কাঠের বাড়িটি আর তাঁর জিনিসপত্রগুলি সযত্নে রক্ষা করা

হচ্ছে—সেখানে তৈরি হয়েছে একটি জাদুঘর ও ঐ-গ্রামের সংস্কৃতি কেন্দ্র। গড়ে তোলা হয়েছে লেনিনের স্মৃতিতে তাঁর ধাতুমূর্তি। চারিপাশে শান্ত গভীর পাহাড়। পোরোনিনের যাদুঘরে বিরাট পুরুষ লেনিনের কতনা স্মৃতিচিহ্ন! তাঁর লেখা চিঠি, স্কুলে পাওয়া মেডেল ইত্যাদি দেখে কেবলই মনে হতে লাগলো—এই মহাসাধকের সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদের আদর্শ আজ কতখানি বিকৃত হয়েছে! লেনিনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসব দেখে পাহাড় ঘুরে ঘুরে আস্তানায় ফিরলাম সন্ধ্যার কিছু পরে রাত আটটা নাগাদ।

ফিরে দেখি, ওর্বিসের বন্ধুটি এসে গেছেন, তিনি জানালেন বুদাপেস্ট থেকে মিঃ বি খবর দিয়েছেন পরদিন সকালেই আমি যেন বুদাপেস্ট ফিরি। কী ব্যাপার। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল! ওর্বিসের বন্ধু ভরসা দিয়ে বললেন—ভয় ভাবনার কিছু নেই, আমি আপনাকে কাল সকালের প্লেনেই নিরাপদে রওনা করে দেবো। পরদিনই চলে যেতে হবে বলে ওঁদেরও মন খারাপ হয়ে গেল, গল্প আড্ডা জমলো না তেমন। সারারাত ঘুম হলো না রকমারী দুর্ভাবনায়। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, হাঙ্গারীতে পেঁছেই—সেদিনই রওনা হবো—পশ্চিম-ইউরোপ ভ্রমণের পথে অস্ট্রিয়ায়।

পরদিন সকালে ক্রাকৌ বিমানঘাটি থেকে ওর্বিসের বন্ধু ও গোলবা আমায় রওনা করে দিলে বুদাপেস্টের পথে। গোলবা আমার হাতে দিলে আমার স্ত্রীর জন্যে পোল্যাণ্ডের গ্রামের মেয়েদের তৈরী দুটি মালা। একটি মাটির গড়া বড় বড় পুঁথি দিয়ে গাঁথা অন্যটি কাজ করা গাছের ডালের টুকরো দিয়ে চামড়ায় গাঁথা মালা। জল-ভরা চোখে বললে—"পোলমেয়ে গোলবায়াকে ভুলো না।" ওর্বিসের বন্ধু হাতটি জোরে চেপে বললে—"আমার নামটি ভুলে গেলেই খুশি হবো।" পোলবন্ধুরা কেমন যেন গোল বাধিয়ে দিলে।

বিমানে উঠে ঘুমিয়ে পড়তেই সব গোল মিটে গেল।

বিদায়! পূর্ব ইউরোপ!

ক্রাকুভের বিমান-ঘাটি থেকে বিমান ছাড়ার পর মনমরা হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সে ঘুম ভাঙলো প্রায় এক ঘণ্টা পরে, যখন নতুন হাওয়াই সখী এসে জাগিয়ে দিলেন। জানালেন "বুদাপেস্ট এসে গেছে—সেফ্‌টি বেল্টটা বেঁধে নিন।" ঘড়ি দেখলাম আটটা বেজেছে।

সেফটি বেল্টটা তো বাঁধলাম—কিন্তু এরোপ্লেনের চক্কর মারার সঙ্গে মাথার ভিতরে আবার বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগলো—সেই দুশ্চিন্তা। হাঙ্গারীর বন্ধু মিঃ বি কেন জরুরী ডাক পাঠালেন!

এরপর সেফটির ভরসাই বা কতটুকু! সেফটি বেল্টের বাঁধন খোলবার পর হাতে-কোমরে লৌহপুরীর লোহ-বাঁধন পড়বে না তো!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমান ভূ-যান হলেন। তারপরেই শেষ গর্জন শুনিয়ে—স্তব্ধ, নিশ্চল! আমারও মনের অবস্থা তাই। আশা আনন্দের অমরাপুরী থেকে আশঙ্কার আবর্তে যেন ঝুপ করে পড়ে গেলাম।

নিরাপত্তার বন্ধন খুলে কোমর সোজা করে উঠে দাঁড়ালাম। ঠাকুরকে স্মরণ করে পা বাড়ালাম সিঁড়ির দিকে।

বিমান থেকে নামতেই দেখি মিঃ বি এসে হেসে করমর্দন করে বললেন—"আমাকে মাপ করবেন মিঃ ঘোষ! আমার গাফিলতিতেই আপনার পোল্যাণ্ড ভ্রমণে ব্যাঘাত ঘটলো। এর জন্য আমি ভারী দুঃখিত।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম—"গুরুতর কিছু ঘটেছে নাকি?"

উনি জানালেন—"না! যে সব কিছু নয়, তবে আপনার হাঙ্গারীতে ঢোকবার এবং থাকবার ভিসার মেয়াদ কালই শেষ হয়ে যাবে যে, সেটা আমার আগে খেয়াল হয়নি। এই ভুলটুকুর জন্যই আপনাকে কষ্ট পেতে হলো।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম—"আপনার এ ভুলটুকুর জন্য দুঃখ করবেন না। ঐ ভুল ঘটিয়ে ভগবান আমার ব্যবস্থাটা ঠিক করেই দিয়েছেন। আজই আমি হাঙ্গারী থেকে রওনা হতে চাই ভিয়েনার পথে। সেই ব্যবস্থাটুকু দয়া করে করে দিলে বড়ই বাধিত হবো। ভিয়েনার গাড়ি কখন ছাড়ে?"

উনি হেসে বললেন—"ভগবানের যে ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছেন, সে ব্যবস্থা আমরা বেঠিক করে দিতে পারি না, মিঃ ঘোষ। যেমনটি চান তেমনটিই হবে। আপনার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে, এখন বিশ্রামের ব্যবস্থাটাই দরকার। চলুন বাড়িতে যাওয়া যাক। মিসেস 'বি'ও ভারী দুশ্চিন্তায় আছেন।"

আমি বললাম—"মানুষের দুশ্চিন্তার দুঃখভাগী যাঁরা হন তাঁরাই প্রকৃত বন্ধু।"

বিমান ঘাটির তাবৎ ফর্মালিটি চুকিয়ে বন্ধুবর মিঃ 'বি'এর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গেলাম। মিসেস 'বি' আমাকে দেখে ভারী খুশি! করমর্দন করে ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন—"আমার বেহুঁস স্বামীটির জন্যে এতখানি হয়রান হলেন ব'লে আমি ভারী লজ্জিত। ঠিক সময়ে খবরটি আপনি না পেলে কী ঝঞ্ঝাট বেধে যেতো বলুন তো! ভেবে ভেবে কাল সারারাত ঘুমুতে পারিনি। ভোর রাতে টেলিগ্রাম পেয়েছি আপনি সকালের প্লেনে আসছেন। তবে নিশ্চিন্ত। ভগবান সহায় হোন!"

ভদ্রমহিলার কথা শুনে—তার স্বামী মুচকী হেসে বললেন—"মি' ঘোষ বলেছেন—আমার ভুলের মধ্য দিয়ে ভগবান নাকি ও'র ঠিক ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন। আর সেই ঠিক ব্যবস্থাটি হচ্ছে—উনি আজই ভিয়েনার পথে রওনা হবেন।"

ভদ্রমহিলা যেন একটু মুসড়ে পড়লেন, বললেন—"এই অ-ব্যবস্থার পর উনি কোন্ ভরসায় থাকবেন এখানে?"

আমি বললাম—"না! না। আমার যথেষ্ট ভরসা আছে আপনাদের আন্তরিক বন্ধুত্বে। তবে কি জানেন, সময় আমার বড় কম; কাজও অনেক বাকি রয়েছে। তাই এই অন্যায় ব্যবস্থাটাই

করতে হচ্ছে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপাতত কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা করুন, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

মিসেস বি হেসে বললেন—"আমাদেরও গল্প শোনার ক্ষিদেটা বেড়ে উঠেছে। খাবারের বদলে গল্প চাই কিন্তু। আপনি মুখ হাত ধুয়ে নিন। আমি খাবার নিয়ে আসছি।"

বাথরুমে গিয়ে বেশ করে স্নান করে নি[illegible]। পোশাক বদলালাম। মনের অবস্থাটাও বদলে গেল—ওদের সুখের সংসারের পরিবেশে। বেশ খোস-মেজাজেই খাবার টেবিলে বসলাম। দু পেয়ালা কফি, গোটা দুই রোল (রুটি) ও জ্যাম খেয়ে পেট ভরানো গেল। খেতে খেতে পোল্যাণ্ডের গল্পও কিছু কিছু বললাম ওঁদের দুজনকে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে উঠে বই আর উপহারগুলিও দেখালাম।

মিসেস বি বললেন—"আপনারা ভারতীয়রা জাদু জানেন—চট করে সকলের চিত্ত জয় করবার ক্ষমতা আপনাদের [illegible]ারণ।"

আমি বললাম—"বিত্তের চেয়ে চিত্তকেই আমরা [illegible] চাই বেশী করে। চিত্তের সম্পদেই মানুষ হতে পারে প্রকৃত বিত্ত[illegible]ী।"

মিসেস বি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"আমাদের [illegible] মনের চেয়ে মতের বালাই নিয়েই লোকে মেতেছে বেশী। [illegible]ই বলে দুর্মতি! যন্ত্র আর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গি[illegible] মানুষের এত দুর্গতি!"

এমন সময় টেলিফোন যন্ত্র ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। [illegible]ঃ বি উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। হাঙ্গারীয়ান ভাষায় কি যে কথাবার্তা হলো একবর্ণও বুঝতে পারলাম না। 'মিসেস বি' ফোনে ওঁর স্বামীর আলাপ শুনেই বললেন—ইভা বলে তাঁর যে বোনটি আমাকে দেব্রেচেন নিয়ে গেছলো—সেই ফোন করছে। আমার জন্যে সেও নাকি ভারী উদ্বিগ্ন হয়েছিল।

মিঃ বি ফোনের আলাপ সেরে এসে জানলেন—"আপনি নিরাপদে ফিরে এসেছেন জেনে ইভা ভারী খুশী হয়েছে, তবে আপনি আজই চলে যেতে চান জেনে ভারী দুঃখ জানালো। ও এখনই আসছে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে।"

আমি বললাম—"আপনারা এত আনন্দ দেওয়া সত্ত্বেও আপনাদের সকলের মনে কষ্ট দিয়েই যেতে হবে—একথাটা যতই ভাবছি ততই লজ্জিত হচ্ছি। কিন্তু উপায় কি? ক্ষমা করবেন, আমি একবার স্টেশনে যেতে চাই। আমার বড় স্যুটকেস্ দুটো ওখান থেকে এনে জামা-কাপড় বদল করতে চাই। তাছাড়া জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিতে হবে।"

মিঃ 'বি' বললেন—"তার জন্যে আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। মাল জমা দেওয়ার রসিদটা আমায় দিয়ে দিন। আমি তো আপিসে বেরুচ্ছি—ফেরার সময় আপনার স্যুটকেস্ দুটো নিয়ে আসবো। আর আপনার টিকিটটাও দিয়ে দিন, বার্থ রিজার্ভ করে আসবো। রাত্রি ১০টা নাগাদ একটা গাড়ি ছাড়ে—সেটায় চাপলে কাল ভোরেই ভিয়েনা পৌঁছে যাবেন।"

ওঁর কথা শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে ওঁকে বার বার ধন্যবাদ জানালাম। টিকিট ও মালের রসিদ সব ওঁকে বুঝিয়ে দিলাম। উনি আপিসে রওনা হলেন। যাওয়ার সময় মিসেস বিকে বলে গেলেন—"ইভা এলে তোমরা দুজনে মিলে মিঃ ঘোষকে আজ কোথায় নিয়ে যাবে সেটা ঠিক করে ফেলো।"

মিঃ বি বেরিয়ে যাবার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ইভা এসে হাজির। সাদর সম্ভাষণের পর প্রথমেই অনুযোগের সুর ধ্বনিত হলো ইভার কণ্ঠে। বললে—"হাঙ্গারী আর হাঙ্গারীয়ানদের আপনার ভালো লাগেনি বুঝি? হাঙ্গারীতে পা দিয়েই—পালাই পালাই করছেন কেন বলুন তো?"

মিসেস বি হেসে বললেন—"না পালিয়ে উপায় আছে! বিদেশের অতিথিকেতো তোমরা দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বসতে দাও না। নাকে দড়ি দিয়ে চরকিপাক খাওয়াও। তার ওপর হাঙ্গারীর লঙ্কার মতোই তোমাদের কথার ঝাল!"

ইভা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। আমি বললাম—"না ইভা! ওসব কথায় কান দিও না, হাঙ্গারীকে যতটুকু দেখেছি—তোমাদের মত মানুষের মধ্যে দিয়ে; তাতে হাঙ্গারীকে—হাঙ্গারীর মানুষকেও

আমার খুবই ভালো লেগেছে। গতি ও দুর্গতির ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পূর্ব ইউরোপের একদল সত্য-সন্ধানী মানুষের অন্তরাত্মা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে যে সে পরিচয় আমি পেয়েছি রুমানিয়ার, পোল্যাণ্ডে, হাঙ্গারীতে। 'শান্তম, শিবম্, সুন্দরম'-এর সন্ধানে তারা যে কত ব্যাকুল—তা ভারতবর্ষ ও এই ভারতবাসীর প্রতি তাদের ভালবাসাতেই ব্যক্ত হয়েছে। এখানে আসার পর থেকে দেখছি মানুষ শুধু দিয়েই চলেছে, নেয় না কিছু, চায় না কিছু!

ইভা ভারী গলায় জবাব দিলে—"এটাকে তা... মহানুভবতা বলে ভুল করবেন না। যন্ত্রের সঙ্গে থেকে যন্ত্র হ... গেছি আমরা—যন্ত্রের মত দেওয়াই আমাদের কাজ। নেবার ক্ষ... না চাইবার ও দাবী করার সকল অধিকার আমরা হারিয়েছি।'"

এই গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে দিতে আ... বললাম—"যা হারানো যায়, তাই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাই মানুষের মনে জাগে—মানুষকে জাগায়। ও নিয়ে ভাবনার কি আছে? এখন তুমি কি চাও সেটা বলে ফেলো।"

মিসেস বি'রও মুখে হাসি ফুটলো—উনি বললেন, "ঠিক বলেছেন মিঃ ঘোষ! এখন কি চাস ইভা তাই বল?"

ইভা বললে—"চাইতে তো পারতাম অনেক কিছু। তবে চাইলেই তো সেটা মঞ্জুর করবেন না তোবারিশ ঘোষ। কা...ই চাই না কিছুই।"

"আমার এই বোনটি একটু বেশী রকমের সেণ্টিমে...l, আপনি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করুন, আমি যাই রাঁধা-বাড়ার জোগাড় করতে।" এই বলে মিসেস বি' উঠে চলে গেলেন।

ইভা বললে—"আমিও উঠি, দিদি! তোমার অতিথি দুদণ্ড সুস্থির হয়ে বিশ্রাম করুন।"

আমি ইভার হাত ধরে বসালাম বললাম—"বসো! তোমার সঙ্গে কাজ আছে। আজকে আমি এখানকার কিশোর পাইওনীয়ারদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই—তার একটা ব্যবস্থা করতে পারো?"

ইভা হেসে ফেললে—বললে—"নিশ্চয়ই পারি; তবে চলুন জেনে

আসি দিদির মতটা কি?" এই বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভিতরে।

ইভা আর মিসেস বি দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলেন—মিঃ বি ফিরলে খাবার-দাবার বেঁধে নিয়ে আমরা সবাই মিলে যাবো বুদা পাহাড়ে পাইওনীয়ারদের রেল চড়তে—আর পাইওনীয়ারদের সঙ্গে ভাব করতে। ওখানেই পিক্‌নিক্‌ করা যাবে। বুদা পাহাড়ে দল বেঁধে যাওয়া আর পিক্‌নিকের ব্যবস্থা মঞ্জুর হয়ে যাওয়ায় ইভা বেজায় খুশি। মিঃ 'বি'র ছেলেমেয়ে দুটোকে জুটিয়ে এনে শুরু করে দিলে নাচ-গান। আমাকেও ওদের আনন্দে যোগ দিতে হলো। পোল্যাণ্ডের গল্পও খানিকটা শোনাতে হলো। ইভা আমাকে হাঙ্গারীর ইউনিয়ন অফ ওয়ার্কিং ইয়ুথ দলের মুখপত্র "Szabad Ifjusag" পত্রিকায় হাঙ্গারীর বিবাহ ও প্রেম সমস্যার আলোচনা নিয়ে লেখা—ওদেশের তরুণ-তরুণীদের কয়েকটা চিঠির অনুবাদ করে শোনালে। খুব উপভোগ করলাম চিঠিগুলো। জানাগেল—যৌন ও দাম্পত্যজীবনের সমস্যায় ওরা কি ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। ইভাই আমাকে বললে—স্তালিনের অনুগত Rakosiকে প্রেসিডেণ্টের পদ থেকে সরানোর জন্য হাঙ্গারী জনসাধারণের মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভ চলেছে। 'ন্যাশন্যাল কমিউনিষ্ট' নামে রুশ-বিরোধী নতুন দল গড়ে উঠছে। তাদের দাবী মেনে নিয়ে অচিরে রাকোসীকে গদি থেকে সরাতে হবে কার্ডিন্যাল মিন্দসেন্‌তিকে Cardinal Mindszentyকে মুক্তি দিতে হবে। এই সব আলোচনায় বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

বেলা এগারোটা নাগাদ মিঃ বি বাড়ি ফিরলেন, আমার স্যুটকেস দুটো নিয়ে। জানালেন বার্থ রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। পিক্‌নিকে যাওয়া হবে শুনে উনিও খুব খুশি হলেন। তবে জানালেন—আপিসে তাঁর অনেক কাজ তাই তিনি যেতে পারবেন না বলে ভারী দুঃখিত।

আমি স্নান সেরে এসে পোশাক বদ্‌লিয়ে স্যুটকেস দুটো খুলে গুছোতে বসলাম। এমন সময় ইভা দম্‌কা হাওয়ার মতো চীৎকার করে

চমকে দিলে আমাকে। স্যুটকেসের ডালা বন্ধ ক'রে দিয়ে তার ওপর চড়ে বসে ও জানালে—স্যুটকেস গুছোবার সময় যথেষ্ট পাওয়া যাবে এবং ইভা নিজেই আমার স্যুটকেস গুছিয়ে দেবে।

ইভার রকম সকম দেখে ভাবতে লাগলাম—পূর্ব ইউরোপের মায়া কাটাবার পূর্বক্ষণে এ কোন অভূতপূর্ব মায়া!

যাক কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার-দাবার-গ্রামোফোন, রেকর্ড, সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে মিসেস বি' তাঁর ছেলেমেয়ে দুটি, আর ইভার সঙ্গে মিঃ বি'র গাড়িতে চাপলাম। মিঃ বি আমাদের বুদা পাহাড়ের নীচে পাইওনীয়ারদের রেলস্টেশনের নীচে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

পাহাড়ের টিলার উপরে নতুন স্টেশনটা আধুনিক ফ্যাসানে গড়া—চারধারে ফুলের বাগান। ভারী সুন্দর স্টেশনটি। রাস্তা থেকে একতলা সমান সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। সিঁড়ির নীচে রকমারি ফেরীওয়ালা দোকান পেতে বসেছে। তরমুজ, চীনেবাদাম, রকমারি কাগজ ও কাঠের খেলনা বিক্রী করছে। মিসেস্ বি একটা ছোট তরমুজ কিনলেন। আমি তাঁর বাচ্চাদের কয়েকটা খেলনা কিনে দিলাম। এখানে যেসব ফেরীওয়ালা ও দোকানীপসারী দেখলাম—জামাকাপড় চেহারা দেখেই হাঁড়ির খবর টের পাওয়া গেল। আমাদের দেশের ফেরীওয়ালাদের সঙ্গে বড় বেশী তফাৎ নজরে পড়লো না। অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও তাদের মা-বাবার সঙ্গে আসছে যাচ্ছে। বহু সাধারণ লোক আর মেয়েপুরুষকে তাদের মধ্যেই দেখা গেল।

আমরা তিনজন আমাদের পিক্‌নিকের বোঁচকা বুঁচ্‌কী নিয়ে পাইওনীয়ারদের ট্রেনে চড়বার টিকিট কিনতে কিউ দিলাম। কয়েকটি বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়ে টিকিট বিক্রী করছে।

টিকিট কেনবার পরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। কারণ মাত্র দু বগি আর তিন বগিওয়ালা ডিজেল ইঞ্জিনে-টানা খান তিনেক পাইওনীয়ার ট্রেন ঐ পাইওনীয়ার হিল্‌সে চলাচল করে। একটার পর একটা ট্রেন পাহাড়ের উপরে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে আবার যাত্রী

নিয়ে রওনা হচ্ছে। প্রতিটি ট্রেনেই একদল করে পাইওনীয়ার (১০ থেকে ১৬ বছরের ছেলে মেয়েরা) কনসার্ট বাজাচ্ছে। ট্রেনে গার্ড, স্টেশন মাস্টার সবই পাইওনীয়ার বা কিশোর-কিশোরী। ড্রাইভার, পয়েণ্টসম্যান, কেবিনম্যানের কাজ বয়স্করাই করে দিয়ে ছোটদের সাহায্য করছে যে তা দেখলাম। এই নতুন ব্যবস্থা দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হলো।

দুটো গাড়ি ছাড়বার পর তিন নম্বর গাড়িতে আমাদের ওঠবার পালা এলো। যে কামরায় পাইওনীয়াররা কনসার্ট বাজাচ্ছিল—সেই কামরাটায় ভয়ানক ভিড়। ইভা জোর করে আমাকে সেই কামরাতেই তুলে দিলে—মিসেস বি'. তাঁর ছেলেমেয়ে ও মালপত্তরগুলোকে উঠিয়ে দিলে পাশের কামরাতে। ইভা উঠলো আমার কামরাতেই। রেলিং দেওয়া খোলা গাড়ি—ওপরে ছাদ আছে। পাইওনীয়াররাও আমার অদ্ভুত পোশাক দেখে কৌতুহলী হয়ে উঠলো। ইভার মারফৎ ওদের সঙ্গে আলাপ শুরু করলাম। একটি বারো চৌদ্দ বছরের ছেলে প্রথমেই আমাকে প্রশ্ন করলে—"আপনি কি কমিউনিস্ট?" প্রশ্ন শুনে মেজাজ বিগড়ে গেল। বললাম—আমি মানুষ তোমারই মতো—আর ভারতবর্ষের মানুষ, এই পরিচয়টুকুতেই তোমার খুশি হওয়া উচিত।" আমার জবাবে ও খুশি হলো না। ছেলেটি খুব বিজ্ঞের মতো ভঙ্গিতে মন্তব্য করলে—"ভারতবর্ষের বেশির ভাগ লোক কমিউনিস্ট নয় বলেই শুনেছি সেখানে দুঃখ দুর্দশা খুব।"

আমি চাপতে পারলাম না নিজেকে—বললাম "লোকের মুখে শুনে নিজের দেশ বা অপরের দেশের দুঃখ বা বেদনাটা জানা যায় না বন্ধু। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন সব কথা কার কাছে শুনেছ?" জবাব এলো—"ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে—আর আমাদের পাইওনীয়ার হোমসের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কাছে।"

এরপর আমি আর কি বলবো। ওদেশের কিশোর-কিশোরীদের জন্য আনন্দের ব্যবস্থা দেখে যে আনন্দে মন ভরে উঠেছিল—সে আনন্দ আতঙ্কে পরিণত হলো। ছেলেবেলা থেকে ওদেশের কাঁচ মনে শুধু কেবলমাত্র একটা রাজনৈতিক মতবাদেই মানুষের উন্নতি ও সুখ এবং অ-কমিউনিস্ট মানেই অমানুষ—এমন ধারণা বদ্ধমূল

করে দেওয়ার সর্বনাশা চেষ্টার বিষময় ফল দেখে।

পাহাড়ের উপর এক জায়গায় প্রথম স্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়ালো। আমরা নেমে পড়লাম। স্টেশনেও একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে— গলায় লাল স্কার্ফ বাঁধা—তিন কোনা লোহার রিং বাজিয়ে গান করছে। ওরাও পাইওনীয়ার! ইভা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে— "পাইওনীয়ারদের সঙ্গে আলাপ করবেন নাকি মিঃ ঘোষ!"

আমি বললাম—"কতকগুলো বাঁধাধরা কথা শেখানো তোতার মতই ওরা বুড়োটে কথা কইবে। ও আমার ভালো লাগে না।"

ইভা কানের কাছে মুখ এনে বললে—'বিদেশীর সঙ্গে আলগা কথা বলার বিপদটুকু ছোটরাও জানে। ওদের ভুল বুঝো না।"

এরপর পাহাড়ের উপর গাছপালা-ঘেরা একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেইখানে আমাদের পিক্‌নিকের আসর পাতা হলো। মিসেস বি ও ইভা চটপট ম্যাকিনটস্‌ ক্লথ বিছিয়ে প্লেট, ছুরি, কাঁটা সাজিয়ে খাবার দাবার বার করে ফেললে। লঙ্কার গুঁড়ো, নুন আর লঙ্কার চাটনী দিয়ে মাংসের সালামী, আলুসেদ্ধ আর রুটি খাওয়া গেল। শেষকালে তেষ্টা মিটিয়ে মিষ্টি মুখ করা হলো তরমুজের ফালি কামড়ে।

খাওয়ার পর মিসেস বি'র বাচ্চা দুটো সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লো। মিসেস বি'ও শুয়ে পড়লেন জুতো খুলে। বললেন—"ইভার সঙ্গে আপনি বেড়িয়ে আসুন।" ইভার সঙ্গে আমি পাহাড় ঘুরতে বেরোলাম।

জঙ্গলে ঢাকা গাছপালার ছায়ায় এখানে ওখানে ছোট বড় নানা দল পিকনিক করতে এসেছে। কোথাও খাওয়া দাওয়া হচ্ছে, কোথাও নাচ-গান চলছে। কোথাও বা যুগল মধু-হৃদয় বিশ্রম্ভ আলাপন-আলিঙ্গনে মশগুল। ইভার পাল্লায় পড়ে পায়ে হেঁটে আমাকেও বেড়িয়ে বেড়াতে হলো ক্লান্তি এড়িয়ে। ট্রেনে চড়ে পাহাড়ের আরও উপরে উঠলাম—সেখান থেকে দানিয়ুবের এপারে ওপারে বুদা ও পেস্ট ভারী সুন্দর দেখা গেল। পাহাড়ের ওপর আখরোট, চেস্টনাট, হর্সচেষ্টনাট গাছ মেলাই।

শেষটায় একটা গাছতলায় বসে আমরা দুজনেও অনেকক্ষণ গল্প করলাম। ইভার কাছ থেকে শিখলাম কয়েকটা হাঙ্গারীয়ান কথা— লিখেও নিলাম সেগুলোর উচ্চারণ বানান। যেমন সোম থেকে শুরু করে রবি সপ্তাহের পর্যন্ত সাতটা বারের নাম হলো।— Hetio, Kedd, Szerda, Csutorok, Pentek, Szombat, Vasarnap. ইভার সাহায্য নিয়ে কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভাব করলাম। ফটো তুললাম। তাদের বাঁকা অক্ষরের অটোগ্রাফ নিলাম আমার খাতায়। নামগুলো তাদের ভারী মজার—যেমন ছেলের দলে Pal Papp, Miklos Kerondi Josef Kloti.

মেয়েদের দলে যাদের নাম আছে Valeria Hodos, Kato Nova, Ilonka Kovacs. ছোটদের মুখ থেকেই শুনলাম, মা-বাবাকে ওরা কাছে পায় ছুটির দিনেই বেশী করে—অন্যদিন থাকতে হয় ক্রেশ ও স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও নার্সদের কাছেই। এ ব্যবস্থায় ছোটরা মোটেই খুশি নয়। মা-বাবাকে ছেড়ে সারাটা দিন ক্রেশ ও স্কুলে থাকতে ওদের একটুও ভালো লাগে না।

সারাটা দুপুর এইভাবে পাহাড়ে ঘুরে গল্প ক'রে কাটিয়ে বিকেলে ট্রেনে চেপেই নেমে গেলাম আমাদের পিকনিক ক্যাম্পে। তখন পাতা জ্বালিয়ে চা তৈরি হলো। চা খেয়ে নাচ-গানও করলাম সবাই মিলে। পূর্ব ইউরোপে আসার পর শেষ-বিদায়ের দিনেই সত্যিকারের ছুটি আর আনন্দের পরশ পেলাম।

পাইওনীয়ার পাহাড় থেকে নেমে ট্রাম ধরে সন্ধ্যার আগেই আমরা ফিরলাম—মিসেস বি'র বাড়িতে। ইভা বাড়ি ফিরে তার কথা মতো আমার স্যুটকেস গুছিয়ে দিলে সুন্দর করে। মিসেস বি ব্যস্ত হলেন রাঁধা-বাড়া নিয়ে। এদেশের মেয়েদের ক্লান্তিহীন পরিচর্যার শেষ পরিচয় দেখলাম মুগ্ধ হয়ে।

রাত্রের খাওয়া শেষ হবার পর মিঃ বি' দুঃসংবাদ জানালেন, বললেন—"আমি বা আমার স্ত্রী কারুর পক্ষেই বিশেষ কারণে আপনাকে স্টেশনে গিয়ে বিদায় জানানো সম্ভব হবে না। ইভাই

আপনাকে স্টেশন অবধি পেঁছে দেবে। অবস্থা বুঝে এ ব্যবস্থাটাই করতে হলো, কিছু মনে করবেন না।"

এরপর কোনও কথা জিজ্ঞেস করতে ভরসা হলো না। মনে মনে প্রার্থনা করলাম—ভগবান আমার জন্য এদের যেন কোনও বিপদ না ঘটে। বললাম—"ধন্যবাদ! এতে দুপক্ষই নিরাপদ"।

মিঃ বি স্টেশনে আমার মালপত্র পেঁছে দিয়ে দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন। আমার বিদায়ের মুহূর্তও এলো এগিয়ে।

মিঃ বি ও মিসেস বি' দুজনেই আমার হাত ধরে বার বার এমনভাবে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন, যেন আমিই তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ভালবেসে তাঁদের কৃতার্থ করেছি। ওঁদের ছেলেমেয়ে দুটি আমার হাত ধরে বার বার হাঙ্গারীয়ান ভাষায় কি যেন বলতে লাগলো। ইভা অনুবাদ করে বললে—শুনছো তোবারিশে। ওরাও বলছে—'যেতে দোব না—যেতে দোব না।' চোখ দিয়ে আমারও জল ঝরে পড়লো—বাচ্চা দুটিকে বার বার চুমো খেলাম।

আমার মনে পড়ে গেল—রবীন্দ্রনাথের কবিতা—"তবু যেতে দিতে হয়—"

ট্রাম ধরে আমি আর ইভা স্টেশনে এলাম। গাড়ি ছাড়তে তখনও আধ ঘণ্টা,—তবে প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে গেছে, ইঞ্জিন লাগেনি। আমাকে বসিয়ে দিয়ে ইভা বললে—"আমি চট্ করে ঘুরে আসছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

একলাটি অন্ধকার কামরায় বসে আছি। এমন সময় খট্ খট্ শব্দ! একটি মেয়ে এসে আমার কামরায় ঢুকলো! চমকে উঠে দেখি, সেই মেয়েটি, যে মেয়েটি আমাকে নামিয়ে নিয়েছিল বুদাপেস্ট স্টেশনে। মেয়েটি হাঁপাচ্ছে, কাঁদো কাঁদো গলায় বললে—"আমি আপনার অনেক খোঁজ করেছি, পাইনি। এইমাত্র আমার বন্ধু ইভার কাছে খবর পেলাম আপনি এই গাড়িতে যাচ্ছেন, তাই ছুটে এসেছি—একটি অনুরোধ জানাতে। আপনারা ভারতবাসীরা অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানেন। আমাকে এমন কোনও মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে যান, যে মন্ত্রের বলে অদৃশ্য হয়ে আমি এদেশ ছেড়ে পালাতে পারি।"